শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা

সম্পাদনা :
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী
সুনির্মল দত্ত চৌধুরী
অমলেন্দু ভট্টাচার্য
মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা

প্রকাশক : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী
রবীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগারের পক্ষে
মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব পক্ষে

স্বত্ব : রবীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার, শিলং
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শিলং শাখা

শিলং ১৯৯৬ ইং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণ—
আশীষ দেব
শীতল পাটির আলোকচিত্র
আসাম স্টুডিও, শিলং

মুদ্রক :

দেবব্রত চৌধুরী
জিৎরাজ অফসেট-এর পক্ষে
১০৩/১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬।

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের বহমান ধারায় রাজনৈতিক মানচিত্র প্রায়শঃই বদলে যায়, কিন্তু সংস্কৃতির রূপরেখা পাল্টায় না। প্রাচীন শ্রীহট্টের বৃহদাংশই দেশ বিভাগজনিত কারণে এখন বাংলাদেশের অন্তর্গত হলেও সুরমা-বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রায় অভিন্ন। ভৌগোলিক দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে গাঙ্গেয় সমতলের পূর্বমুখী বিস্তৃতি কোনো ধরনের প্রাকৃতিক বাঁধার সম্মুখীন না হয়ে সরাসরি সুরমা-বরাক উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ এই তিনদিকে যথাক্রমে মেঘালয়, উত্তর-কাছাড়, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরার শৈলশ্রেণী ঘিরে রেখেছে এই সমতল উপত্যকাকে। বঙ্গ-সংস্কৃতির আওতাধীন এ অঞ্চল সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন :

> "বাঙলার পূর্ব-সীমায় উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়; দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা। গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলশ্রেণীর বিন্যাস দেখিলে স্পষ্টতই বুঝা যায়, বাঙলার সীমা এই পার্বত্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।"
>
> "..... বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা তো মেঘনা-উপত্যকারই (মৈমনসিং-ত্রিপুরা-ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে, এবং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ব বাঙলার এই কয়টি জেলার— বিশেষভাবে ত্রিপুরা ও পূর্ব মৈমনসিং জেলার— সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে বিস্তারলাভ করিতে পারিয়াছিল। এখনও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাঙালার পূর্বতম জেলাগুলির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। শুধু তাহাই নয়, লৌকিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনও বাঙলার এই জেলাগুলির সঙ্গে।"

প্রশাসনিক কাঁটাছেঁড়ায় বারবার এ অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক চেহারা পরিবর্তিত হয়েছে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সিলেট এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। প্রথমাবস্থায় সিলেট ছিল বঙ্গদেশের অন্তর্গত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি চিফ্ কমিশনারের অধীনে আসাম রাজ্য গঠিত হলে কাছাড় জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর কয়েকমাস পরে ১২ই সেপ্টেম্বর সিলেট জেলাকেও আসামের সঙ্গে জুড়ে

দেওয়া হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ পুনর্গঠিত হয়ে লেফ্‌টেনান্ট গভর্নরের শাসনাধীনে আসে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে সিলেট কাছাড় সহ আসাম আবার চিফ্‌ কমিশনারের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে সিলেটের রাতাবাড়ী, পাথারকান্দি, বদরপুর থানা এবং করিমগঞ্জ থানার কিয়দংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়— বাকী অংশ চলে যায় তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র দত্ত অনুমান করেছেন বঙ্গদেশে আর্যীকরণের বহু পূর্বেই শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে আর্যপ্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন সেন শ্রীহট্ট ও মিথিলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ঐতিহ্য প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের আর্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। মিথিলা বা উত্তর বিহার থেকেই কালক্রমে বাংলাদেশে আর্য সংস্কৃতির ধাবা সঞ্চারিত হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বৌদ্ধগ্রন্থ এবং গ্রীক্‌ ভ্রমণকারীদের বিবরণ অবলম্বনে ইতিহাসবিদ্‌ কনকলাল বরুয়া তাঁর Early History of Kamrup গ্রন্থে লিখেছেন, শ্রীহট্ট একসময় ছিল সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চল। গোবিন্দকেশবের ভাটেরার তাম্রশাসনে 'সাগরপশ্চিমে' কথাটি লেখা আছে। 'সাগর' শব্দটা এখানে সম্ভবত কোনো বড় বিল বা হ্রদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, সুরমা-বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি অধ্যয়ন করে কোনো কোনো গবেষক এ অঞ্চলের বহু লোকাচারেই নৌ-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ খুঁজে পেয়েছেন। তাম্রলিপিতেও প্রাচীন শ্রীহট্টে নৌ-বাণিজ্যের ঐতিহ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীর শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রলিপি অনুযায়ী ইন্দ্রেশ্বর (বর্তমান ইন্দেশ্বর) ছিল একটি সমৃদ্ধ 'নৌবন্ধ' অর্থাৎ নৌবন্দর। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে পাণিণি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে সুরমস নামক যে জনপদের কথা বলেছেন, পণ্ডিতদের অনুমান সুরমা উপত্যকাই সেই প্রাচীন সুরমস জনপদ। পাণিণি সুরমস-এ রাজতন্ত্রের কথা বললেও শ্রীহট্টে রাজ্যগঠন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতক থেকে। সপ্তম শতকের দ্বিতীয় ভাগে সমতট এবং পরবর্তী সময়ে হরিকেল রাজ্যের উত্থান ঘটে। দশম শতকে চন্দ্র রাজাদের অধীনস্থ শ্রীহট্ট ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি মণ্ডল বা বিভাগ। একাদশ শতকে দেবরাজারা শ্রীহট্টকে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলেন।

পঞ্চম শতক বা তারও কিছু আগে কাছাড় অর্থাৎ বর্তমান বরাক উপত্যকার 'বরবক্র উজানে' খলংমাতে ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী; সমতটের সামন্তরাজা লোকনাথের তাম্রশাসনে (সপ্তম শতক) জয়তুঙ্গবর্ষের অন্তর্গত সুবঙ্গ বিষয়ে অনন্ত নারায়ণের মন্দির নির্মাণ ও একশত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের যে বিবরণ রয়েছে— সে প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ্‌দের বক্তব্য হল— বর্তমান জাটিঙ্গা নদী উপত্যকা এবং কাছাড় জেলার সুবঙ্ চা বাগানই যথাক্রমে জয়তুঙ্গবর্ষ ও সুবঙ্গ বিষয়। প্রাচীন হরিকেল মুদ্রায়

'বরাকো', 'বেরাকো', 'পিরাকো', ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করে গবেষকরা অনুমান করেছেন সমতটের পর এই উপত্যকা হরিকেল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। একাদশ শতকে স্বাধীন শ্রীহট্ট রাজ্যের উত্থানের ফলে এই উপত্যকার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটে এবং শ্রীহট্ট রাজ্যের পতনের পর ক্রমান্বয়ে ত্রিপুরী, কোচ্‌ ও ডিমাসা রাজারা এ অঞ্চল শাসন করেন।

জনবিন্যাসের দিক থেকেও শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে লক্ষ্য করা যাবে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। ভারতীয় আর্য, ইন্দো-মঙ্গোলয়েড, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, প্রটো-অষ্ট্রোলয়েড ইত্যাদি বিভিন্ন নরগোষ্ঠী পাশাপাশি বাস করছেন এই অঞ্চলে। জনবিন্যাসের এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ বরাক উপত্যকাকে আখ্যা দিয়েছেন নৃতত্ত্বের উদ্যান (Anthropological garden) । অধীত অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্য এ অঞ্চলের জনবিন্যাস ও জন-সংস্কৃতি অধ্যয়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সঙ্কলনের মাধ্যমে যে প্রয়াস শুরু হয়েছে এরই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এ ধরনের একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সঙ্কলন প্রকাশের ইচ্ছা উদ্যোক্তাদের আছে।

সুরমা-বরাক উপত্যকার একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উদার ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। প্রাচীন শ্রীহট্টে সংস্কৃত চর্চার একটি বেগবতী ধারা ছিল। ন্যায়শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রে শ্রীহট্টের অবদান সুবিদিত। মন্ত্রচূড়ামণি, তন্ত্রচূড়ামণি, বৌদ্ধগ্রন্থ সাধনমালা এবং নাথপন্থের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে এ অঞ্চলের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, এখানে আর্যব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও নাথপন্থের সহাবস্থান ছিল। গোটা বাংলাদেশ জুড়ে মধ্যযুগের সমাজ জীবনে বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেই আন্দোলনের পুরোধা স্থানীয়দের অনেকেই ছিলেন শ্রীহট্টের সন্তান। এখানে গড়ে উঠেছিল দুটি বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়— কিশোরী ভজন সম্প্রদায় ও জগন্মোহিনী সম্প্রদায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে শাহজালালের আগমনকে কেন্দ্র করে সুফী ভাবাদর্শের সূত্রপাত হয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে এ অঞ্চল বাউল-ভাটিয়ালী-মারফতী-মুর্শিদি গান রচনার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। যে সব সাধক ফকির এই সমন্বয়ের বাণীকে গীতিরূপ দিয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মরমী সাধক। অনুভূতিই তাঁদের প্রধান সম্বল। এই অনুভূতির বশবর্তী হয়েই তাঁরা প্রচার করে গেছেন সম্প্রীতির কথা, মানুষে মানুষে ভালোবাসার কথা।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা করলে দেখা যাবে এ অঞ্চলের জনজীবনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বস্তুনিষ্ঠ একাডেমিক আলোচনার দাবি রাখে। এছাড়াও আজকের পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্রই পুরনো ঐতিহ্যকে পুনর্মূল্যায়ণের চেষ্টা চলছে। বহু স্রোতাম্বয়ী অধ্যয়নের মাধ্যমে অতীতকে জানবার আগ্রহে মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখা সমষ্টিগতভাবে তথ্য ও তত্ত্বের মেলবন্ধন

ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছে। অথচ প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে জীবনধারা— হারিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন সমাজ অধ্যয়নের বহু মূল্যবান উপাদান। প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এসব উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ অসম্ভব। তাই সুরমা-বরাক উপত্যকার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা অর্থাৎ আংশিক পরিচিতিটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান সংকলন-গ্রন্থে। আমাদের অন্বিষ্ঠ আপন অতীতকে জানা, কেননা অতীতের গর্ভেই জন্ম নেয় ভবিষ্যৎ। এ অঞ্চল সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা জাগানো আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। আরও বিস্তৃত অন্বেষণ ও আলোচনার মাধ্যমে অতীতের উন্মোচন এবং প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হবে— এই আশা নিয়েই প্রস্তুত করা হয়েছে বর্তমান সংকলন।

এ ধরনের সংকলনে সবসময়ই আংশিকতা দোষ থেকে যায়। বিশেষতঃ বিভাগ পরবর্তীকালে বর্তমান বাংলাদেশে ঐ বিষয়ক যেসব আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংযোজিত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি।

এ রকমের সংকলনের বিরুদ্ধে অভিযোগও আছে। কারো কারো মতে, এ জাতীয় অন্বেষা অঞ্চল বিশেষকে অহেতুক গৌরবান্বিত করার প্রয়াসমাত্র। কিন্তু আমরা মনে করি বৃহত্তর সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যই আঞ্চলিক অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রিক এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদি ও মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে শেষকথা বলা হয়ে গেছে— এরকম মন্তব্য নিশ্চয়ই কেউ মেনে নেবেন না। বর্তমান সংকলনে এমন অনেক প্রবন্ধই আছে যেখানে লেখকরা অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান এবং নতুন ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সে সব সূত্র অবলম্বন করে বৃহত্তর অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। এভাবেই একদিন শিকড়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে যাত্রা শুরু করে মানুষ যেমন বিশ্বময় নিজেকে ছড়িয়ে দেয় তেমনি আঞ্চলিক অধ্যয়নের মাধ্যমেই মূলধারাকে পরিপুষ্ট করে তোলা যেতে পারে। এখানেই আঞ্চলিক অধ্যয়নের সার্থকতা।

শ্রীহট্ট-কাছাড়ের উপভাষার মধ্যে স্থানীয় পার্থক্য রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে এই উপভাষা বাংলা ভাষারই একটি প্রান্তিক রূপ। বৃহত্তর বঙ্গ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই উপভাষিক অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক ও লোকায়ত ঐতিহ্যকে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। জেলাগত কোনো সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতাকে প্রচার করা কিংবা বাহবা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

এই গ্রন্থের ইতিহাস বিষয়ক নিবন্ধগুলি কালক্রম অনুযায়ী মধ্যযুগের সময়সীমায় বিধৃত। বস্তুত, শ্রীহট্ট-কাছাড়ের জ্ঞাত ও আবিষ্কৃত ইতিহাসের প্রাচীনতা আদি মধ্যযুগ

থেকে। কিন্তু এই ইতিহাস সুদূর অতীতের ইঙ্গিত-বহ। তাই এই গ্রন্থের নাম আমরা দিয়েছি 'শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা'। প্রচীন কথাটা এখানে দূরপ্রসারী এবং তা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

নিধনপুর তাম্রশাসন প্রসঙ্গে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি লেখার দুই বিপরীত সিদ্ধান্ত ছাড়াও, অন্যান্য দু'একটি নিবন্ধেও ইতিহাসের বিশেষ কোনো তথ্যগত ব্যাখ্যায় লেখকদের অনুমিতির কিছু বৈপরীত্য বা গরমিল হয়তো দেখা যাবে। সংকলন জাতীয় গ্রন্থে এ ধরনের গরমিল হতে পারে, বিশেষত বিতর্কমূলক বিষয়ে।

পরিশিষ্টে, লেখক-পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক কিংবা গবেষক হিসেবে তাঁরা অপরিচিত নন। এ গ্রন্থের রচনাগুলি তাঁদের একনিষ্ঠ পরিশ্রম, অধ্যয়ন, চিন্তা ও মনন এবং গবেষণার ফলশ্রুতি। তবু গ্রন্থটি প্রাসঙ্গিকতায় সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ এমন দাবি আমরা অবশ্যই করবো না। শ্রীহট্টের মধ্যযুগের ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের পুরোধা দরবেশ শাহজালাল সম্পর্কে একটি রচনা আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও প্রয়াস সত্ত্বেও এই সংকলনে দেওয়া সম্ভব হলো না। এই অপূর্ণতাব জন্য খেদ রয়ে গেল।

পরিশেষে এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে যাঁরা অর্থ-দান করেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের উদার ও অকৃপণ অর্থসাহায্য, উৎসাহ ও সহযোগিতাই ছিল আমাদের চলার পাথেয়। গ্রন্থটি যদি পাঠকসমাজে সমাদৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা হবে সার্থক। নানা রকমেব ব্যক্তিগত ও বাস্তব জীবনের সমস্যাগত ব্যস্ততার মধ্যেও এই গ্রন্থে সংকলিত নিবন্ধের লেখকরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, এজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম।

ডঃ কামালুদ্দীন আহম্মদ-এর রচনার বিষয় ইতিহাস। সুতরাং এই সংকলনের প্রথম দিকে ইতিহাস পর্যায়ের নিবন্ধের সারিতেই এই রচনার স্থান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রচনাটি অনেক বিলম্বে আমাদের হাতে আসায় তা সম্ভব হলো না। সংস্কৃতি পর্যায়ের নিবন্ধের সারিতেই লেখাটি সন্নিবিষ্ট করতে হয়েছে; এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

এ রকম একটি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা কোনো একক ব্যক্তির সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে না। নানা ব্যক্তির সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগ ব্যতিত রূপায়ণ সম্ভব নয়। এই সহযোগিতা নানা সূত্রে আমরা পেয়েছি। সবার নাম আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে গেলে দু'একটা নাম বাদ পড়ে যাবার আশঙ্কা থেকে যায়। যা হোক, যাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী, তিনি রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থাগারের (শিলং) একনিষ্ঠ ও অক্লান্ত কর্মী, শ্রীসুধীররঞ্জন দাস। এই সংকলনের বেশীরভাগ নিবন্ধের প্রুফ সংশোধন করেছেন তিনি।

অর্থ সংগ্রহে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন কলকাতার শ্রীঅজয় কুমার দেব, গরিফা (নৈহাটি)-র শ্রীঅজিত কুমার চক্রবর্তী, শিলচরের অধ্যাপক অমলেন্দু ভট্টাচার্য, শ্রীশ্যামানন্দ চৌধুরী, করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক জন্মজিৎ রায়, অধ্যাপক মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য, শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীশ্যামানন্দ ভট্টাচার্য ও শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শিলং নেতাজী পাঠাগারের শ্রীতুষার ভট্টাচার্য, শিলং লেডি কীন কলেজের অধ্যাপিকা শিপ্রা চৌধুরী, রবীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগারের শ্রীমনোজিৎ দেব।

সবশেষে যাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, তিনি কিন্তু আমাদের এই প্রচেষ্টার পুরোধা। জীৎরাজ অফ্‌সেটের কর্ণধার ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীদেবব্রত চৌধুরী কোনো স্বার্থের বিনিময়ে নয়, মাতৃভূমির প্রতি মমতা ও তার ইতিহাস ও প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বশতই এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রেসের অভিজ্ঞ কর্মীরাও সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম।

বিষয়ক্রম

পৃষ্ঠা

১. শ্রীহট্টে আর্যব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা : নিধনপুর লিপি ১
— সুজিৎ চৌধুরী

২. ভাটেরা তাম্রশাসন: প্রেক্ষাপট, বিতর্ক ও ব্যাখ্যাসূত্র ২৬
— জন্মজিৎ রায়

৩. ইতিহাসের আলোকে শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত বিষ্ণু (ত্রিবিক্রম) মূর্ত্তি ৪৩
— কমলাকান্ত গুপ্ত

৪. নিধনপুর তাম্রশাসনের পটভূমি— একটি সমীক্ষা ৫২
— সুনির্মল দত্তচৌধুরী

৫. নিধনপুর তাম্রলিপি প্রসঙ্গে তাম্রপত্রে গঙ্গিনিকা কূলবসতি ৭০
— মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য

৬. বরাক উপত্যকার ইতিহাসের রূপরেখা ৭৯
— জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য

৭. প্রাচীন শ্রীহট্টের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ভিষগাচার্য চক্রপাণি দত্ত ৯৬
— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী

৮. তাম্রলিপি প্রভৃতিতে বিধৃত শ্রীহট্ট-কাছাড় জনপদের অলক্ষিত নাথতত্ত্ব ১১৬
— এন. সি. নাথ

৯. হরিকেল ১২৪
— সুনির্মল দত্তচৌধুরী

১০. প্রসঙ্গ : কমলাকান্ত গুপ্তের পুস্তিকা— 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব শ্রীহট্টের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা' ১৩০
— অনুলেখক : মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য

১১. শ্রীহট্টের লোকছড়ায় সমাজচিত্র ১৫৬
— অজিতকুমার চক্রবর্তী

১২. সিলেটি উপভাষা : ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ১৮২
— জন্মজিৎ রায়

১৩. সুরমা-বরাক উপত্যকার নৌকাপূজা : প্রাসঙ্গিক তথ্য— একটি পুনর্বিবেচনা ২০৯
— অমলেন্দু ভট্টাচার্য

১৪. শ্রীহট্টের মেয়েলি ব্রতাচারের উৎস সন্ধানে ২৩৭
— গৌরী সেন

১৫. বাউল কবি রাধারমণ ২৬২
— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী

১৬. হাছনরাজা ও তাঁর গানের দর্শন ও অধ্যাত্মবাদ ২৭৯
— আবুল হোসেন মজুমদার

১৭. বারমাসী গান : প্রেমসঙ্গীত না বৃষ্টির ইন্দ্রজালের গান? ২৮৬
— অমলেন্দু ভট্টাচার্য

১৮. ঐতিহ্যময় শ্রীহট্ট ও তার লোকসংস্কৃতিতে প্রবাদ ২৯৮
— অজিতকুমার চক্রবর্তী

১৯. সুরমা-বরাক উপত্যকার প্রাচীন পুঁথি ৩২৭
— শ্যামানন্দ চৌধুরী

২০. প্রাচীনযুগে শ্রীহট্টের রাজনৈতিক সংযুতি ৩৪১
— কামালুদ্দীন আহমদ

২১. প্রতিবেদন : একটি লুপ্তপ্রায় বাংলা বর্ণমালা প্রসঙ্গে ৩৬২
— কল্যাণকুমার গুপ্ত

২২. সুবমা বরাক উপত্যকা বিষয়ক গ্রন্থ (পরিশিষ্ট ১) ৩৭৭
(একটি অসম্পূর্ণ তালিকা)
— অমলেন্দু ভট্টাচার্য

২৩. লেখক পরিচিতি (পরিশিষ্ট ২) ৩৮৬

শ্রীহট্টে আর্যব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা: নিধনপুর লিপি

সুজিৎ চৌধুরী

সাধারণভাবে পূর্বভারতের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি কতখানি উন্মোচিত, তার আলোকে এবং সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম ও ভুবন পাহাড়ের তীর্থ-স্বীকৃতির পটভূমি বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুমানসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছন সম্ভব যে শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলের আদি-বাসিন্দা ছিলেন অস্ট্রিক ও ভোটব্রহ্ম সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং খ্রীষ্টপূর্বোত্তরকালে এদের নিয়েই এই অঞ্চলের জনসমষ্টি গড়ে উঠেছিল। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা চলে এ দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সংঘাত ও পরবর্তী পর্যায়ে সমন্বয়ের একটা প্রক্রিয়াও বহমান ছিল। তৃতীয় অপর যে জনগোষ্ঠী পূর্বভারতে সুপ্রাচীনকালে কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করেছিল, নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় তাদের বলা হয় ভূমমধ্যসাগরীয়। সাংস্কৃতিক পরিচয়ে এরাই দ্রাবিড় বলে পরিচিত। শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে এই নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও প্রভাবের কোনো প্রাচীন পরিচয় আমাদের হাতে নেই। ভাষিক ক্ষেত্রে কিছু প্রভাব আবিষ্কার করা সম্ভব, কিন্তু তা থেকে কোনো যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌঁছন সম্ভব নয়। অতএব দ্রাবিড়দের আমরা আপাতত আলোচনার বাইরে রাখছি।

অস্ট্রিক ও ভোটব্রহ্মগোষ্ঠীর সমন্বিত জীবনচর্যাকে নূতন যে প্রভাব এসে আগপাশতলা পাল্টে দিল, তাকে সাধারণভাবে আর্য প্রভাব বলা যেতে পারে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন যে ঋগ্বেদের যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের আর্য-সংস্কৃতির যে চারিত্র লক্ষণ ছিল, গাঙ্গের উপত্যকায় আর্যরা নেমে আসার পর তার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে এবং সে পরিবর্তন গুণগত। ইতিমধ্যেই স্থানীয় পূর্ববাসিন্দাদের সঙ্গে ব্যাপক সংমিশ্রণের ফলে আর্যদের রক্তের বিশুদ্ধতাও রইল না, সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতাও নয়। ঋগ্বেদীয় আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশীয় আদি-সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রবাহের সংমিশ্রণে যে নব্য সমন্বিত সংস্কৃতির জন্ম হল তা মূলত দুটো অবয়বে খৃষ্টপূর্ব যুগে প্রকাশিত হল, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। আলোচনার সুবিধার জন্য এই সংস্কৃতিকে আমরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বলে অভিহিত করব।

পাহাড়পুর-মহাস্থানগড়ের প্রত্নাবশেষের আলোকে বিচার করে নীহাররঞ্জন রায় ও অন্যান্য ঐতিহাসিকরা স্থির নিশ্চয় যে উত্তরবঙ্গ বা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও যে আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ঐ অঞ্চলে অন্তরঙ্গ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ প্রত্নকীর্ত্তির মধ্যে লভ্য। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গ পর্যন্তও মৌর্যাধিকার বিস্তৃত হয়েছিল কি না, সে প্রশ্ন ওঠে। সে বিস্তৃতির কোনরূপ প্রত্নপ্রমাণ এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। শ্রীহট্ট পূর্ববঙ্গের পূর্বতম প্রান্তে, অতএব সাধারণ বিচারে মৌর্যদের পরবর্তীকালেই আর্য-ব্রাহ্মণ্য

সংস্কৃতি এদিকে বিস্তৃত হয়েছিল বলে মনে করার কারণ রয়েছে। শুধুমাত্র একটি অন্যধরণের সূত্রকে প্রামাণিক বলে মানলে অন্তত সুরমা উপত্যকায় আর্যপ্রভাবের সময় সীমাটা অনেকখানি এগিয়ে যায়। পাণিনি তার 'অষ্টাধ্যায়ী'তে, প্রাচ্য জনপদের মধ্যে মগধ, কোশল, অবন্তীর সঙ্গে সুরমস্ নামক একটি জনপদের উল্লেখ করেছেন। ডি. এস. আগরওয়ালার মতে, এখানে সুরমস্ বলতে সুরমা উপত্যকাকে বোঝানো হয়েছে (India as Known to Panini, Pp 35 & 468). কাত্যায়ন তাঁর পাণিনি-ভাষ্যে বলেছেন যে এই সমস্ত জনপদে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাণিনির সময় সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হয় নি, এমনি সাধারণ বিচারে ধরে নেওয়া হয় যে তিনি বুদ্ধের আগেকার লোক কারণ তাঁর ব্যাকরণে নানা ধরণের জাতি, গোষ্ঠী, জনপদ ও ধর্মের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের কোনো উল্লেখ নেই। ফলে যদি আগরওয়ালার মত মেনে নিয়ে ধরে নেওয়া হয় যে 'অষ্টাধ্যায়ী'তে উল্লেখকৃত ঐ 'সুরমস্' আর সুরমা উপত্যকা অভিন্ন, তাহলে খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর আগেই আর্যভারতের সঙ্গে এই অঞ্চলের পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল, এ-টুকু মেনে নিতে হয়। শুধুমাত্র শব্দসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে এতটা অনুমান করাটা অন্যতম প্রমাণ ব্যতিরেকে আমরা সঙ্গত বিবেচনা করছি না। বরঞ্চ সন্নিহিত বঙ্গ-সমতটের যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা থেকে বলা যায় যে, মৌর্যযুগ ও গুপ্তযুগের মধ্যবর্তী কোনো পর্যায়ে আর্যপ্রভাব সুরমা উপত্যকাসহ আসাম-পূর্ববঙ্গে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

দুই

এই প্রভাবের সরাসরি প্রমাণ অবশ্য আমরা পাচ্ছি আরো পরবর্তী উপাদানে, সে উপাদান গুপ্তযুগেরও শেষ পর্যায়ের। ভাস্করবর্মার একটি তাম্রলিপিতে রয়েছে যে তার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভূতিবর্মা কিছু ব্রাহ্মণ বসিয়ে ছিলেন ভূমিদানের মাধ্যমে, এবং সে লিপিটি পাওয়া গেছে বিভাগপূর্ব করিমগঞ্জ মহকুমার পঞ্চখণ্ড গ্রামের অদূরে নিধনপুর নামক গ্রামে। সে অনুসারে ঐ লিপিটি নিধনপুর তাম্রফলক (Nidhanpur Copper plate) বলে পরিচিত। ভূতিবর্মার কাল মোটামুটি ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু হয়েছে এবং সেটা গুপ্তযুগের অন্তিম পর্যায়। ঐ সময় দেখা যাচ্ছে তিনি নিজ রাজ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসতি করিয়েছিলেন।

পঞ্চখণ্ড অঞ্চলেই ঐ ব্রাহ্মণদের বসতি করানো হয়েছিল, এ-কথাটুকু অবলীলায় মেনে নিলে বলা যায় খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতকেই শ্রীহট্টে বৈদিক ব্রাহ্মণদের ব্যাপক অবস্থানের একটি অকাট্য প্রমাণ আমরা পাচ্ছি আর তাম্রফলকটি যখন পঞ্চখণ্ড অঞ্চলেই পাওয়া গেছে তখন তা মেনে নিতে বাধা হওয়ারও কথা ছিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যত আবিষ্কার লগ্ন থেকেই নিধনপুর লিপি ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কিত এবং সে বিতর্কের মুখ্য উপাদান হল ভূতিবর্মা বা পরবর্তীকালে ভাস্করবর্মা ব্রাহ্মণদের যে জমি দান করেছিলেন, তার অবস্থান কোথায় ছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা কোথায় জমি পেয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন? লিপির প্রাপ্তিস্থান পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে না বাইরের অন্য কোনো অঞ্চলে? ঐ বিষয়টির

মীমাংসা না হলে শ্রীহট্টের ইতিহাস-প্রসঙ্গে ঐ লিপিটির প্রদত্ত উপাদান আমরা ব্যবহার করতে পারছিনা। এবং যেহেতু ঐ বিতর্কে পূর্বভারত তথা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে খ্যাতনামা পণ্ডিতরা অংশগ্রহণ করে পরস্পর বিরোধী মতামত ব্যক্ত করেছেন, অতএব নিধনপুর লিপি-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণাদির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার পরেই শুধু লিপিটিকে শ্রীহট্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।

১৯২২ সালে পঞ্চখণ্ডের কাছে অবস্থিত নিধনপুর গ্রামে সাতটি তাম্রফলক একটি ধাতুনির্মিত শিলমোহর দ্বারা গ্রথিত অবস্থায় ভূমিগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়। একটি ফলক হারিয়ে যায়। শ্রীহট্টের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের হাতে ছয়টি ফলক এসে পৌঁছায়, তিনিই এর পাঠোদ্ধার করেন। দেখা যায় ছটি ফলক মূলতঃ একটি দলিলেরই অংশ। বিদ্যাবিনোদ এই লিপির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন (Epigraphia Indica Vol XII & XIX এবং 'কামরূপ শাসনাবলী' বাংলাগ্রন্থ)।

লিপিটি একটি ভূমিদানের দলিল। বিভিন্ন গোত্রের দুই শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম এতে রয়েছে জমির প্রাপক হিসাবে। ২০৫ জন ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া গেছে। হারিয়ে যাওয়া লিপিটিতে সম্ভবত আরো কিছু নাম ছিল। লিপিটিতে প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, চন্দ্রপুর বিষয়ে (বিষয় = প্রাচীন জেলা) মহারাজ ভূতিবর্মা ময়ূরশাল্মলী অগ্রহাব ক্ষেত্রের সংরক্ষণ পরিচালনার জন্য এই ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষদের জমিদান করেছিলেন। অগ্নিকাণ্ডে মূল দলিলটি পুড়ে যায়। তখন ভূতিবর্মার বংশধর ভাস্করবর্মাব কাছে তাঁরা নূতন দলিলের জন্য আবেদন করেন। ভাস্করবর্মা তখন কর্ণসুবর্ণ জয়স্কন্ধাবারে (পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কাণসোনা গ্রামই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ) ছিলেন, সেখান থেকেই তিনি এই নূতন তাম্রফলক প্রদান করে বৃদ্ধ প্রপিতামহের দানকে নূতন করে অনুমোদন করেন। যে বিশাল ভূখণ্ড এই ব্রাহ্মণদের দান করা হয়েছিল তার সীমা নির্দেশ করার সময়ে কৌশিক ও শুষ্ক কৌশিক নদী এবং গাংগিনিকা নামে ছোট স্রোতস্বিনীর উল্লেখ রয়েছে।

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদই প্রথমে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে দানকৃত এই জমি শ্রীহট্টে অবস্থিত ছিল না। কামরূপের পরবর্তী এক রাজা বনমালদেব এই ধরনের ভূমিদান করেছিলেন এবং সেই ভূমিদানের তাম্রফলক তেজপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে। বনমালদেবের ঐ লিপিতে চন্দ্রপুর বলে একটি গ্রামের উল্লেখ রয়েছে এবং ঐ গ্রামটি ত্রিস্রোতাব তীরে অবস্থিত বলে উল্লেখ রয়েছে। ত্রিস্রোতারই অপর নাম করোতোয়া। বিদ্যাবিনোদের বক্তব্য হচ্ছে করোতোয়া নদীই ছিল ভাস্করবর্মার সময়ে কামরূপের পশ্চিম সীমা, কারণ, হিউ-এন্ সাঙ্ বলেছেন যে, কো-ল-তু নদী অতিক্রম করেই তিনি কামরূপ রাজ্যে প্রবেশ করেন। শুষ্ক কৌশিক বা কৌশিক বলতে বিহারের কোশী নদীকে বোঝায় বলে তখন যাঁরা দাবী করছিলেন তার প্রতিবাদে বিদ্যাবিনোদের বক্তব্য হল কোশী নদীর কোনো উপনদীর মরাখাতকে সম্ভবত এখানে ঐ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেই অনুসারে বিদ্যাবিনোদের বক্তব্য হল ত্রিস্রোতা ও ঐ মরাখাতের মধ্যবর্তী কোনো

অঞ্চলে ময়ূরশাল্মলী অগ্রহার অবস্থিত ছিল এবং তাঁর মতে জায়গাটা ছিল এখনকার রংপুর জেলায়। তিনি আরো বলেছেন যে পঞ্চখণ্ডের বর্তমান বাসিন্দা যে ব্রাহ্মণরা রয়েছেন, তাঁরা রংপুর ত্যাগ করে পঞ্চখণ্ডে চলে আসার সময়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে ঐ তাম্রলিপিটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। আরেকটি যুক্তি বিদ্যাবিনোদ দেখিয়েছেন; তাঁর মতে প্রাচীন শ্রীহট্ট কামরূপ রাজ্যসীমার মধ্যে ছিল না অতএব ভাস্করবর্মা বা তার পূর্বপুরুষ এখানে জমিদান করতে পারেন না। কারণ হিউ-এন সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সি-যু-কি (S-Yu-Ki) গ্রন্থে শি-লি-চ-ট-ল বলে একটি রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে, সেটাই প্রাচীন শ্রীহট্ট এবং এখানে শ্রীহট্টকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অসমীয়া ঐতিহাসিক কনকলাল বরুয়ার মতেও দানকৃত ঐ ভূমি বা চন্দ্রপুরি বিষয় শ্রীহট্টে ছিল না, তবে রংপুরের ব্যাপারে বিদ্যাবিনোদের সঙ্গে তিনি একমত নন। তাঁর মতে কৌশিক বলতে এখানে বিহারের কোশী নদীকে বোঝানো হয়েছে এবং শুষ্ক কৌশিক ও গাঙ্গিনিকা বলতে ঐ নদীরই দুটো মরাখাতকে বোঝানো হয়েছে। ফ্রান্সিস বুকানন-এর পূর্ণিয়া জেলা সম্পর্কিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে ঐ জেলার কোশী নদীর ঐ ধরনের মরাখাত রয়েছে। বনমালদেবের লিপিতে চন্দ্রপুর গ্রামটি যে ত্রিস্রোতার তীরে বলা হয়েছে সে সম্পর্কে বরুয়ার বক্তব্য হচ্ছে, এতে ত্রিস্রোতার অপর পারের কোনো স্থানের কথা বলা হয়েছে, জায়গাটি যে ঠিক ত্রিস্রোতার তীরেই, তা বোঝানো হয় নি। অতএব বনমালদেবের লিপির চন্দ্রপুর ও নিধনপুর লিপির চন্দ্রপুরি বিষয় দুই-ই বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় অবস্থিত ছিল। বরুয়া আরো বলেছেন যে, পঞ্চখণ্ডের ব্রাহ্মণদের মধ্যে জনশ্রুতি রয়েছে যে, তাঁরা মিথিলা থেকে এসেছিলেন। পূর্ণিয়া জেলা প্রাচীন মিথিলার মধ্যে পড়ে এবং পঞ্চখণ্ডের ব্রাহ্মণরা মিথিলা পবিত্যাগ করার সময়ে তাম্র ফলকটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন (বরুয়ার বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য— Early History of Kamrupa ও Studies in the Ancient History of Assam, Edited by Dr. Maheswar Neog)। মুকুন্দমাধব শর্মা তাঁর Inscriptions of Ancient Assam গ্রন্থে বরুয়ার প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করেছেন।

প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী (History of the Civilization of the People of Assam) কনকলাল বরুয়ার মত অনেকখানি মেনে নিয়েও বিহার পর্যন্ত যেতে রাজি হন নি। তাঁর মতে; It is a far cry from Sylhet to North Bengal and thence to Behar'। তিনি বলেছেন যে, বঙ্গের পালরাজা ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে মাঢ়াশাল্মলী বলে স্থাননাম রয়েছে সেই স্থানটি আবার পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত। পুণ্ড্রবর্দ্ধন বলতে সাধারণত প্রাচীন উত্তরবঙ্গকে বোঝাত। চৌধুরীর মতে ধর্মপালের খালিমপুর লিপি মাঢ়াশাল্মলী ও নিধনপুর লিপির 'ময়ূরশাল্মলী' অভিন্ন। তাঁর মতে, বরুয়ার এ-অনুমান সত্য যে আলোচ্য ভূমি তিস্তা বা ত্রিস্রোতা ও কোশী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল কিন্তু ভূতিবর্মার সময়ে পূর্ণিয়া জেলা গুপ্তাধিকারে ছিল বলে প্রমাণ রয়েছে, সেখানে জমিদান করা কামরূপের রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া 'মাঢ়াশাল্মলী'

ও 'ময়ূরশাল্মলী' যদি অভিন্ন হয় তবে তা ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে। তাই চৌধুরী অনুমান করছেন চন্দ্রপুর বিষয় ছিল দিনাজপুর জেলায়, বঙ্গবিহারের সংযোগস্থলে।

যেহেতু ভাস্করবর্মার তাম্রলিপি মূলতঃ আসামের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ফলে আসামের ঐতিহাসিকরাই এ-নিয়ে সর্বাধিক লেখালেখি করেছেন এবং তাদের মতামতই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্বীকৃত ও প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষত প্রাচীন কামরূপের রাজ্যসীমা নিরূপণের ব্যাপারে লিপি-প্রদত্ত ভূমির স্থান-পরিচয়ের গুরুত্ব থাকায় বিষয়টি অন্যতর চিন্তা দ্বারা অনেক সময়েই প্রভাবিত হয়েছে। পূর্বভারতের ইতিহাস নিয়ে অন্য যে সময় ঐতিহাসিকরা চর্চা করেছেন, তাঁদের কাছে ঐ স্থান নির্বাচনের ব্যাপার আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিধনপুর লিপিকে কোনো সময়ে শ্রীহট্টের ইতিহাসের আলোকে তেমন করে পরীক্ষা করেই দেখা হয় নি— তাছাড়া আরেকটি কারণেও এ-ব্যাপারটি ঘটেছে। ১৯১২ সালে নিধনপুর লিপি আবিষ্কৃত হয়, তার আগের বছরই মাত্র 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে'র (অচ্যুত চরণ চৌধুরী প্রণীত) দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং তাতে নিধনপুর লিপি সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই, থাকা সম্ভব ছিল না। শ্রীহট্টের ইতিহাস নিয়ে এখন পর্যন্ত ওটিই পরিচিত বই এবং তাতে উল্লেখ না থাকায় শ্রীহট্টের ইতিহাসের সঙ্গে নিধনপুর লিপির সম্পর্ক বিষয়ে অনেকেই অনবহিত। নিধনপুর লিপিকে যারা শ্রীহট্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত মনে করতেন, তাঁদের মতামতের সঙ্গেও অনেকেই পরিচিত নন, কারণ সেগুলো প্রধানত প্রকাশিত হয়েছে জার্নালে, পুস্তকাকারে নয় এবং তাও বহু আগে।

তিন

ঐতিহাসিকদের একটা বেশ বড় অংশই কিন্তু মনে করতেন যে ভূতিবর্মা কর্তৃক প্রদত্ত ঐ জমির অবস্থান ছিল পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে। শ্রীহট্টের তৎকালীন তরুণ ঐতিহাসিক কিশোরীমোহন গুপ্ত বিদ্যাবিনোদের বক্তব্য খণ্ডন করে দাবী করেন যে, নিধনপুর লিপির ঐ দত্তভূমি পঞ্চখণ্ড অঞ্চলেই ছিল (Indian Culture, Vol. 11)। পরে কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আর. জি. ভাণ্ডারকার (Indian Culture, Vol 1, Indian Antiquary, Vol LXVI), নলিনীকান্ত ভট্টশালী (Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol 1), জে, সি. ঘোষ (Indian Historical Quarterly, Vol VI) প্রভৃতি। ঘোষ বলেছেন যে কুশীয়ারার সংস্কৃতায়িত রূপ হচ্ছে কৌশিক এবং চন্দ্রপুর বিষয় নামটি এসেছে পঞ্চখণ্ডর নিকটবর্তী বর্দ্ধিষ্ণু চাঁদপুর গ্রাম থেকে। তাঁর ভাষায়, "we need not go to the west of the Trisrota when we can find one nearer to the place in Sylhet," তাছাড়া তিনি আরো বলছেন, "By looking at the map of Sylhet we find that a river named Kusiara is flowing by the north-west of Panchakhanda. This river is perhaps the Kausika mentioned in the plates, which probably gave up its former bed in the east and took the course of the dried Ganginika in

the west after the grant of the plates. তিনি আরো বলেছেন যে গাঙ বলতে শ্রীহট্ট অঞ্চলে সকল ধরণের নদীই বোঝায় এবং 'গাঙ্গিনিকা' হচ্ছে গাঙ-কথাটিরই সংস্কৃত প্রতিরূপ। ভাণ্ডারকার এই যুক্তিকে সমর্থন করে জানাচ্ছেন পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে ছোট গাঙ বলে একটি নদীখাত এখনও রয়েছে। ভাণ্ডারকার আরো বলছেন যে, ভূতিবর্মা যে সময়ে জমিদান করেছিলেন সে সময়ে বিহারের পূর্ণিয়া বা উত্তরবঙ্গ কোনোটাই তার রাজ্যের মধ্যে ছিল না, কারণ ঐ সময়ে অঞ্চলগুলো যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল তার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালীও এই মতের পোষকতা করেছেন। তার মতে ময়ূরশাল্মলী অগ্রহারের অবস্থান ছিল পঞ্চখণ্ড অঞ্চলেই এবং পাশের চাঁদপুরই ছিল চন্দ্রপুর বিষয়ের প্রশাসনিক কেন্দ্র। ভট্টশালী আরেকটা তথ্যের উল্লেখ করেছেন। পঞ্চখণ্ডের ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত একটা ঐতিহ্য রয়েছে যে ত্রিপুরার জনৈক রাজা আনুমানিক ৬৪০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হর্ষবর্দ্ধনেব কালে এবং পরবর্তী আরেকজন ত্রিপুরার রাজা দশম শতকের কোনো এক সময়ে দুটো তাম্রফলকের মাধ্যমে জমিদান করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বসতি করিয়েছিলেন। ভট্টশালীর মতে এত আগে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং ব্রাহ্মণরা ভাস্করবর্মার ঐ তাম্রফলকটির স্মৃতিই বহন করছেন।

এই পুবো বিতর্কটাই চলেছে বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে। ১৯৬১ সালে নূতন একটি তথ্য আবিষ্কৃত হয় এবং সেই তথ্যের আলোকে এই বিতর্কটিব অবসান ঘটাব সুযোগ ঘটে। ঐ বছর শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার পশ্চিমভাগ গ্রামে একটি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়। মহারাজা শ্রীচন্দ্র এই তাম্রফলকটির প্রদাতা। তিনি ও তাব পূর্বপুরুষবা ছিলেন নিম্নবঙ্গের রাজা, পরে পূর্ববঙ্গেব অন্যান্য অঞ্চলও জয় করেন। শ্রীচন্দ্রের সময়ে তাদের রাজধানী ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। পশ্চিমভাগে প্রাপ্ত এই লিপিটির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী (Copper plates of Sylhet), পরে ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার (Epigraphia Indica, Vol xxx vii এবং Select Inscriptions, Vol II গুপ্ত চৌধুরীর পাঠের কিছু পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন করেন। দুজনের পাঠের মূল বক্তব্যে অবশ্য কোনো প্রভেদ নেই। এই তাম্রফলকে বলা হয়েছে যে রাজা শ্রীচন্দ্র ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে চন্দ্রপুর, গবলা ও পগার নামক তিনটি বিষয়ে প্রায় সহস্র বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বসতি করিয়েছিলেন। নিধনপুর লিপিতে আমরা পাচ্ছি চন্দ্রপুরি বিষয় আর এখানে পাচ্ছি চন্দ্রপুর বিষয়। দুটো এক হওয়ারই কথা। ওই লিপিতে কিন্তু স্পষ্ট বলা হয়েছে চন্দ্রপুর বিষয় ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির (ভুক্তি বলতে প্রদেশ বোঝাত) শ্রীহট্ট মণ্ডলের (মণ্ডলকে আধুনিক ডিভিশন বা বিভাগ বলা যায়) অন্তর্গত। মূল শ্লোকটা হচ্ছে: 'শ্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যান্তঃ পাতি শ্রীহট্টমণ্ডল' সাতলবর্গজ সম্বন্ধ অবেড়িকা সমেত-গরলা বিষয়-পগার বিষয়-চন্দ্রপুর বিষয়েষু।' এই ফলকে কৌশিক নেই, সরাসরি কোসিয়া নদীর (অর্থাৎ কুসিয়ারা) নাম রয়েছে: 'উত্তয়েণ কোশিয়ার নদীসীমা।'

নূতন প্রাপ্ত এই তথ্যের ভিত্তিতে কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী নিধনপুর লিপির চন্দ্রপুর বিষয় ও পশ্চিমভাগ লিপির চন্দ্রপুর বিষয় যে এক ও অভিন্ন এবং তার অবস্থিতি ছিল শ্রীহট্ট জেলার

পঞ্চখণ্ড অঞ্চল জুড়ে সে বিষয়ে জোরালো দাবী উত্থাপন করেন। নিধনপুর লিপিতে শুধুমাত্র চন্দ্রপুরি বিষয়ের উল্লেখ ছিল, তা কোন মণ্ডল বা ভুক্তির মধ্যে ছিল, তা বলা হয়নি এবং এই নীরবতার সুযোগ নিয়েই যাবতীয় বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। পশ্চিমভাগ লিপিতে ভুক্তির নাম দেওয়া রয়েছে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি হিসাবে এবং মণ্ডলের নাম সুস্পষ্টই শ্রীহট্ট। নিধনপুর লিপিতে উল্লিখিত কৌশিক এখানে স্বাভাবিক প্রবণতায়ই 'কোসিয়ার' এই দেশজ রূপটি ধারণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ, গুপ্ত চৌধুরী দেখিয়েছেন যে নিধনপুর লিপির ব্রাহ্মণরা যে সমস্ত পদবী, গোত্র ও প্রবর ব্যবহার করতেন, মূলতঃ সেগুলিই পশ্চিমভাগ লিপির ব্রাহ্মণদের নামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো উল্লেখ করে গুপ্ত চৌধুরী বলেছেন :

> Thus Paschimbhag Copper plate of Srichandra supplies us the two important clues to explain the Nidhanpur Copper plates of Bhaskar Varma. These are
>
> 1) A vishaya named Chandrapura with Srihattamandala (Srihatta or Sylhet Division)
>
> 2) A reliable evidence of the existence of Brahmanas (Brahmins) in the 10th Century A.D. bearing surnames Ghosha, Nandi, Sarma, Naga etc similar to those of Nidhanpur copper plates of the 7th century A. D. in Chandrapura Vishaya area of Srihattamandala.

তিনি আরো বিস্তৃত যুক্তি ও তথ্য উল্লেখ করেছেন, তার উল্লেখ প্রয়োজন নেই। আমাদের বিবেচনায়, যে-সমস্ত যুক্তির উপর নির্ভর করে চন্দ্রপুর বা চন্দ্রপুরি বিষয়কে শ্রীহট্ট বহির্ভূত অঞ্চল বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে, পশ্চিমভাগ তাম্রফলক আবিষ্কৃত হওয়ার পর তার চাইতে বহু জোরালো যুক্তি এই অঞ্চলকে শ্রীহট্টের মধ্যে ভাবার পক্ষে পাওয়া যাচ্ছে। বস্তুত প্রাচীন লিপিপ্রমাণ থেকে স্থান নির্দেশের যে পদ্ধতি এ-দেশীয় ইতিহাস চর্চায় ব্যবহৃত হয়, তাতে নিধনপুরে প্রাপ্ত লিপিতে উল্লিখিত চন্দ্রপুরি বিষয় যে শ্রীহট্ট জেলাই ছিল সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা যায় না। করলে অনুরূপ বা তার চাইতে স্বল্প প্রমাণে যে-সমস্ত স্থান-নির্দেশক সিদ্ধান্ত স্বয়ংসিদ্ধ হিসাবেই মেনে নেওয়া হয় তার ভিত্তিমূল ধরেই টান পড়বে। অতএব নিধনপুর লিপির চন্দ্রপুরি বিষয় এবং পশ্চিমভাগ লিপির চন্দ্রপুর বিষয় এক ও অভিন্ন এবং শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ অংশের এলাকা জুড়ে তার বিস্তার ছিল, এটাকে খুবই সঙ্গত ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বলে আমরা মনে করি।

চার

নিধনপুর লিপি শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসের উপর নানা দিক দিয়েই আলোকপাত করে আপাতত আমরা একটিমাত্র প্রসঙ্গেই নিজেদের আবদ্ধ রাখব। সেটা হল নিধনপুর লিপি হচ্ছে এই অঞ্চলের ইতিহাসের প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ স্মারক, সে হিসাবে সমাজদেহের

বিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়ের একমাত্র সাক্ষ্যও বটে। সে পর্যায়টার কী ধরনের চরিত্রলক্ষণ ঐ লিপির সাহায্যে আবিষ্কারযোগ্য, তাই আমাদের প্রাথমিক বিবেচনার লক্ষ্য।

ভাস্করবর্মা ঐ লিপির দাতা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহের দানকে নূতন করে অনুমোদন করেছেন মাত্র, মূল দাতা ছিলেন ভূতিবর্মা— তিনি যাঁদের জমিসহ বসতি করিয়েছিলেন, তাঁদের বংশধররাই সে জমি তখন পর্যন্ত ভোগদখল করছিলেন। যেহেতু অগ্নিকাণ্ডে ভূতিবর্মা-প্রদত্ত দলিলটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই ঐ জমি রাজস্ব আদায়ের আওতায় চলে গিয়েছিল, ভাস্করবর্মা আবার সে জমিকে ঐ লিপিব মাধ্যমে রাজস্বমুক্ত করে দেন। ভূতিবর্মার রাজত্বকাল সঠিকভাবে নিরূপিত নয়, তবে মোটামুটি ৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধরা হয়। সেটা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কাল এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির উত্থানের কালও বটে। পূর্বভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এই সময় স্বতন্ত্র রাজ্যের উদ্ভব হতে দেখি। বঙ্গ-সমতট-ডবাক এই তিনটি রাজ্যই গুপ্তদের সীমান্ত ছিল, তারাও এ-সময় গুপ্তাধিকার থেকে বেরিয়ে আসে। গুপ্ত আমলের কোনো পর্যায়ে শ্রীহট্ট বোধহয় সমতটের অংশ হিসাবে গুপ্তদের অনুগত কোন সামন্ত শাসকের অধীনে ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। আমবা শুধু জানি যে ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে সমতটে বৈণ্যগুপ্ত, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচাবদেব রাজত্ব করেন, কিন্তু তখন শ্রীহট্ট কামরূপরাজ ভূতিবর্মার অধীনে চলে গেছে। 'ডবক বলে যে-রাজ্যটির নাম সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে রয়েছে, সেটি বর্তমান নগাঁও জেলার ডবকা ও সন্নিহিত এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল বলে অনেক পণ্ডিতই মতপ্রকাশ করেছেন। বরগঙ্গা প্রস্তর লিপির সাক্ষ্যে বোঝা যায় যে, ঐ অঞ্চলও ভূতিবর্মার অধীনে চলে গিয়েছিল। আসলে ভূতির্বমার পূর্বতম কামরূপীয় রাজারা গুপ্তদের অনুগত ছিলেন, ভূতিবর্মা বা তার সামান্য আগেই মাত্র এই রাজবংশ গুপ্ত-আনুগত্য ত্যাগ করেন এবং তখনই সম্ভবত গুপ্তদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের অধীনস্থ পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেন (Mukunda Madhav Sarma, Ancient Inscriptions of Assam P. 7)।

পূর্বাঞ্চলে কৃষির বিস্তার সম্পর্কে নিধনপুর লিপিটি আমাদের পরোক্ষভাবে আলোকপাত করে। ভূতিবর্মার মূল ভূমিদানের লিপিটি আমরা পাইনি, আমরা পাচ্ছি তার অন্তত শতবর্ষ পরের আমলের ভাস্কর বর্মার লিপি। কিন্তু এটা তো পরিষ্কার যে ভূতিবর্মাই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে এই জমি ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। অর্থাৎ ভূমিদানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ বসতির সর্বভারতীয় প্রবণতা কামরূপেও বিস্তার লাভ করেছে। ভূতিবর্মার আমলেই আরেকটি সমজাতীয় ভূমিদানের ঘটনা ঘটেছিল। নলবাড়ীর কাছে দবি নামক স্থানে ভাস্করবর্মার আরেকটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তাতেও দেখা যায় যে ভূতিবর্মা ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের বসিয়েছিলেন এবং সেই দানপত্রটি কালক্রমে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভাস্করবর্মাকে আবার নূতন করে দলিল সম্পাদন করতে হয়েছিল। অর্থাৎ ভূতিবর্মা ব্রাহ্মণদের জমিদান কার্যটা একটা রাজকীয় রীতিতে পরিণত করেছিলেন।

এর কাবণ আমরা খুঁজে পাই কামাখ্যা পাহাড়ে প্রাপ্ত সুরেন্দ্রবর্মণের নামাঙ্কিত একটা শিলালিপিতে। সুরেন্দ্রবর্মনকে মহেন্দ্রবর্মণের সঙ্গে অভিন্ন বলেই ধরে নেওয়া হয় এবং তিনি

ছিলেন ভূতিবর্মার পিতামহ। অতএব মোটামুটিভাবে তিনি খ্রিষ্টিয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়কার মানুষ। কামাখ্যা পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ সুরেন্দ্রবর্মণের ঐ লিপিতে জানা যায় যে, তিনি ওখানে বলভদ্র দেবতার একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বলভদ্র হচ্ছেন হলধারী বলরাম এবং কামরূপের প্রাচীন লিপিমালায় ঐ একবারই তাঁর নাম আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। এটাও আপতিক নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে সাতবাহনদের আমলে সেখানে যখন লাঙ্গলভিত্তিক কৃষির বিস্তার ঘটছিল, তখনই দেবতা হিসাবে বলরামের আবির্ভাব। তার আগে দেবতা হিসাবে তার কোনো স্বীকৃতি ছিল না। অর্থাৎ হলধারী বলরামের পূজার প্রচলন ও লাঙ্গলভিত্তিক কৃষির সম্প্রসারণ পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুরেন্দ্রবর্মন ও সম্ভবত তাঁর পূর্ববর্তী দু-একজন রাজা সে কারণেই বলরামের পূজার বিস্তাব ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং ঐ মন্দির নির্মিত হয়েছিল সেই প্রয়োজনেরই তাগিদে।

ভূতিবর্মা ব্রাহ্মণদের বসতি করিয়ে সেই কৃষিবিপ্লবের পথকেই প্রশস্ত করেছিলেন। কোসাম্বী খুব বিস্তৃতভাবেই দেখিয়েছেন যে দূরদূরান্তে লাঙ্গলভিত্তিক কৃষির বিস্তারে ব্রাহ্মণদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাঁরা অগম্য স্থানে দান হিসাবে জমি গ্রহণ করতেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সহায়তায় সে-জমি আবাদ করে নূতন বসতির পত্তন করতেন এবং সেই সঙ্গেই আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতেন। নিধনপুর লিপির পশ্চাৎপটে এই বিবর্তন প্রবাহটির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। লিপিটিতে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণরা জমি পেয়েছেন 'ভূমিচ্ছিদ্র' নীতি অনুসারে। 'ভূমিচ্ছিদ্র' বলতে অনাবাদী জমি বোঝাত এবং 'ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়' বলতে বোঝাত সে-ধরনের অনাবাদী জমিকে চাষের আওতায় আনার বিনিময়ে রাজস্বমুক্ত অবস্থায় সে-জমি ভোগদখলের স্বীকৃত ব্যবস্থাকে ("The principle of the rent-free enjoyment of land by one who brings it under cultivation for the first time"– Indian Epigraphical Glossary, P 58, D. C. Sircar)। বোঝাই যাচ্ছে যে ভূতিবর্মা অনাবাদী পতিত জমি ব্রাহ্মণদের দান করে তাকে রাজস্বমুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং সেই রীতিই ভাস্করবর্মা বজায় রেখেছেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। 'ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়' অনুসারে ভূমিদানের ব্যাপারে রামশরণ শর্মা একটু অন্যরকম মত প্রকাশ করেছেন (Perspective in Social and Economic History of Early India, P 148)। তিনি বলছেন যে ভূমিচ্ছিদ্র, অপ্রহত, খিল প্রভৃতি অভিধা দ্বারা অকর্ষিত ভূমি বোঝাত বটে, এবং সেগুলোর কর্ষণের জন্যই প্রথমে বিনা রাজস্বে ভূমিদানের জন্য ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ের প্রবর্তন ঘটে, কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ শব্দগুলি তাব মূল অর্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ পরবর্তীকালে কর্ষিত ক্ষেত্র বা সমৃদ্ধ গ্রাম যখন দান করা হয়েছে, তখনও কখনও কখনও ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ রাজস্বমুক্ত অঞ্চল মাত্রকেই ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ের আওতায় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রামশরণ শর্মা নিজেই বলেছেন যে পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে অকর্ষিত ক্ষেত্রকে কৃষির আওতায় আনার প্রয়োজনে এবং তার মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে নূতন নূতন কৃষিক্ষেত্র

উন্মোচিত হয়েছে এবং নূতন বসতির বিস্তার ঘটেছে। ভূতিবর্মার মূল দানপত্রটি সে-উদ্দেশ্যই সাধন করেছিল বললে তাই রামশরণ শর্মার অন্যতর বক্তব্যের যাথার্থ্য কিয়ৎ পরিমাণে গ্রাহ্য বলে ধরে নিলেও আমাদের আগেকার বিশ্লেষণের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটে না। অন্যত্রও শর্মা বলেছেন যে, অকর্ষিত ভূমি ব্রাহ্মণদের দান করার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাকে কৃষিযোগ্য করে তোলা ("the underlying idea of making grants of untilled land to the brahmanas was to make it arable")। পঞ্চখণ্ডকে কেন্দ্র করে করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার ও হবিগঞ্জের যে অঞ্চলকে চন্দ্রপুরি বিষয়ের অন্তর্গত বলে কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী চিহ্নিত করেছেন, সে-অঞ্চল টিলাভূমি ও সমভূমির সহাবস্থানে গঠিত এবং ব্রিটিশ কর্তৃক চা-বাগান স্থাপনের আগে অবধি অপেক্ষাকৃত উচ্চ অঞ্চলগুলি রীতিমতো জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, কিছু অঞ্চল এখনও তাই রয়েছে। অর্থাৎ প্রাচীন রাজকীয় দানপত্রগুলিতে যে-ধরনের অঞ্চলকে 'অটবী-ভূমি' বা জঙ্গলাকীর্ণ বলা হয়েছে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে পঞ্চখণ্ড অঞ্চল যে তাই ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। এবং ঐ ধরনের অকর্ষিত বসতিহীন অঞ্চলকে কৃষিভিত্তিক লোকালয়ে পরিণত করতে ভূতিবর্মা আগ্রহী হবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক।

পাঁচ

নিধনপুর লিপিতে বলা হয়েছে যে, ময়ূরশাল্মলী অগ্রহার ক্ষেত্রেই ঐ জমি অবস্থিত ছিল। সাধারণভাবে অগ্রহারক্ষেত্র বলতে বোঝাত ব্রাহ্মণদের জন্য প্রদত্ত রাজস্বমুক্ত অঞ্চল (D.C. Sarcar,. পূর্বোক্ত বই, P, 10)। ভি. বি, মিশ্র বলছেন অগ্রহারক্ষেত্রের আয়তন মোটামুটি একটি তহবিলের মতো ছিল, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তা গড়ে উঠত (Gurjara–Pratihara and Their Times, P. 65)। এই প্রচলিত অর্থের চাইতেও 'অগ্রহার' কথাটির মূলগত অর্থ আমাদেব কাছে গুরুত্বপূর্ণ। অভিধান অনুসারে এর ব্যুৎপত্তিতে রয়েছে 'হৃ' ধাতু। অগ্রে হরণ করা হয়েছে এমন কিছুই হচ্ছে অগ্রহার, তাই অগ্রহারক্ষেত্র হচ্ছে সেই সমস্ত ভূমি যা ব্রাহ্মণরা সকলের আগে এসে অধিকার করেছিলেন। আমাদের আগেব বিশ্লেষণের সঙ্গে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থটা হুবহু মিলে যাচ্ছে, কৃষিবিস্তারে যারা pioneer বা অগ্রবর্তী পথিকৃৎ, তারাই নূতন কর্ষিত অঞ্চলের উপর রাজস্বমুক্ত ভোগাধিকার লাভ করেছিলেন।

ভূতিবর্মা সর্বপ্রথম চন্দ্রপুর বিষয়ের এই অগ্রহারক্ষেত্রটির সূচনা ঘটিয়েছিলেন বলে যদি ধরে নিই, তবে তার আনুমানিক শতবর্ষ পর ঐ অঞ্চলের কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল, তার একটা আনুমানিক চিত্র আমরা নিধনপুর লিপির সাহায্যে গড়ে তুলতে পারি কারণ ঐ লিপিতে আমরা শতবর্ষ পরেকার বিবরণই পাচ্ছি অঞ্চলটি সম্পর্কে। 'ময়ূরশাল্মলীঅগ্রহার' নামটিই এলাকাটির আদিস্বরূপের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ-অঞ্চলের যেটুকু স্বাভাবিক বনাঞ্চল এখনও বজায় রয়েছে, শিমূল গাছ ও ময়ূর এখনও সেখানে দৃষ্টিগোচর হয়, অতএব খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠশতকে নবাগত ব্রাহ্মণদের কাছে নবঅর্জিত ভূমির স্বাভাবিক সৌন্দর্যের এ-দুটি উপাদান যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' জয়পুর গ্রামের বর্ণনায় ময়ূরের উল্লেখ

রয়েছে— চন্দ্রপুরি বিষয়ের যে-সীমানা কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী নির্ণয় করেছেন, জয়পুর গ্রাম তার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত।

ভূতিবর্মার সময়ে বন কেটে বসত যারা স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের নামধাম পরিচয় আমরা জানি না, শুধু এ-টুকু জানি যে, তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁদের বংশধরদের নামধাম, গোত্র-প্রবর, সংশ্লিষ্ট বেদ ও বেদশাখা পরিচয় সবই নিধনপুর লিপিতে আমবা পাচ্ছি। মোট ২০৫ জন ব্রাহ্মণের নাম এতে রয়েছে, অনুমান করা যায় তাম্রলিপিব যে ফলকটি হারিয়ে গেছে, তাতে আরো শ'খানেক নাম ছিল। এই তিনশতাধিক ব্রাহ্মণেব পূর্বপুরুষরাই শতবর্ষ আগে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই আদি আগন্তুকদের সংখ্যা আমরা জানি না, তবে ন্যূনপক্ষে যে ৫৬টি পরিবার এসেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কাবণ যে ২০২ ব্রাহ্মণের নাম আমরা পাচ্ছি, গোত্র-প্রবর-বেদ-বেদশাখা ইত্যাদির হিসাব দিয়ে বিভাজিত করলে অন্তত ৫৬টি স্বতন্ত্র পরিবারকে চিহ্নিত করা সম্ভব।

মাত্র একশত বৎসরের মধ্যে এরা কিন্তু একটি পবিপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। ঋক, সাম ও যজু এই তিন বৈদিক গোষ্ঠীতে এরা বিভক্ত ছিলেন, অথর্ববেদীয় কোনো ব্রাহ্মণকে আমরা তালিকায় দেখছি না। ঋগ্বেদীয়দের বেদশাখা ছিল বাহ্‌বৃচ্য, যজুর্বেদীয়দের চারক্য, তৈত্তিরীয় ও রাজসেনীয় এবং সামবেদীয়দের ছান্দোগ্য। দশটি গোত্রনাম একাধিক বেদশাখায় ব্যবহৃত হয়েছে, যথা ভরদ্বাজ, গার্গ্য, গৌতম, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, কৌণ্ডিণ্য, কৌশিক, মৌদগল্য, পরাশর ও যক্ষ। অন্য যে গোত্রনাম রয়েছে তা হল আগ্নিবেশ্য, আলম্ব্যায়ন, আঙ্গিরস, আশ্লায়ন, ভার্গব, জাতুকর্ণ, কৌটিল্য, কৌৎস, কৃষ্ণাত্রেয়, কবেস্তর, মাণ্ডব্য, পাঙ্কল্য, প্রাচেতস, পৌতিমাষ্য, কৌর্ণ, শাকটায়ন, শালঙ্কয়ান, শাণ্ডিল্য, সাঙ্কীর্তায়ন শৌভক, শৌনক, সাবর্ণিক, বৈষ্ণবৃদ্ধি, বারাহ, বার্হস্পত্য, বশিষ্ঠ, বৎস ও বাৎস্য। অর্থাৎ একটি পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে তোলার জন্য যে-ধরনের ব্রাহ্মণ সমাবেশের প্রয়োজন ছিল, তা পুরোটাই উপস্থিত ছিল।

এদের উপস্থিতিতে যে-ধর্মীয় আবহের সৃষ্টি হয়েছিল, তাও গুপ্তোত্তর ব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লিপিতে আমরা পাচ্ছি যে প্রদত্ত ভূমির সপ্তাংশ বরাদ্দ ছিল একটি বলিচরুসত্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য। আক্ষরিক অর্থে বলি বলতে বোঝায় দেববিগ্রহের নিকট নিবেদিত গন্ধচর্চিত পুষ্প ও ফলমূল আদি উপচার। চরু বলতে বোঝায় দেবতার ভোগে নিবেদিত পায়সান্ন। আর সত্র অর্থ হল যেখান থেকে অতিথি ও দরিদ্রদের অন্নবিতরণ করা হয়। সোজা কথায় বলিচরুসত্রের উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে ময়ূরশাল্মলী অগ্রহারক্ষেত্রে একটি সমৃদ্ধ দেবালয় ছিল, রাজপ্রদত্ত ভূমি থেকে তার ব্যয় সঙ্কুলান হত এবং ঐ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের এক কিংবা একাধিক পরিবার ছিলেন এই দেবালয়ের সেবায়েৎ।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিধনপুরের সন্নিকটে অবস্থিত সুপাতলা গ্রামে একটি প্রস্তরনির্মিত বিষ্ণুমূর্তি মোগল যুগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল একটি পুকুর খোদাই এর সময়ে। প্রাচীন ঐ মূর্তি পঞ্চখণ্ডের বাসুদেববাড়িতে পূজিত হচ্ছে সেই সময় থেকেই, এবং মোগল রাজদরবার থেকে

ঐ বিগ্রহ-সেবার ব্যয় নির্বাহের জন্য বৃত্তিও বরাদ্দ ছিল। কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরীর মতে ঐ বিগ্রহ নিধনপুর লিপির বলিচরুসত্রের বিগ্রহ— রাষ্ট্রবিপ্লব বা প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয়ে বিগ্রহটি হারিয়ে যায়, এবং কয়েক শতাব্দী পর পুনরাবিষ্কৃত হয় (Coper plates of Sylhet, P 66)। গুপ্ত চৌধুরীর ঐ মতের যাথার্থ্য নির্ণয় সুকঠিন, তবে একটি তথ্য তাঁর সমর্থনে উল্লেখ করা যায়। বঙ্গের পালবংশীয় সম্রাট ধর্মপালদেবের খালিমপুর লিপিতে দেখা যায় যে তাঁর জনৈক মহাসামন্তপতি নারায়ণবর্মা শুভস্থলী নামক স্থানে নারায়ণদেবের একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন এবং লাটদেশীয় অর্থাৎ গুজরাট থেকে আগত ব্রাহ্মণদের ঐ মন্দিরের সেবায়েৎ নিযুক্ত করেছিলেন। বহিরাগত ব্রাহ্মণদের জন্য মন্দির নির্মাণ করার আরো অজস্র রাজকীয় দানলিপি সমসাময়িক যুগেই রয়েছে, কিন্তু বিশেষ ঐ লিপিটির 'শুভস্থলী' গ্রামনাম এবং 'লাট' দেশীয় ব্রাহ্মণ, দুটো তথ্যই আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়। পঞ্চখণ্ডের নিকটবর্তী সুপাতলা নামটি 'শুভস্থলী' থেকে নিষ্পন্ন হওয়া খুবই সম্ভব। আমরা এমন কথা বলছি না যে খালিমপুর লিপির 'শুভস্থলী'ই পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা, সেটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু এমন ভাবা আদৌ অযৌক্তিক হবে না যে নবনির্মিত দেবস্থান-কেন্দ্রিক অঞ্চলকে বলা হত 'শুভস্থলী' এবং সুপাতলা নামটি সেই ঐতিহ্যেই বহন করছে। লাটদেশীয় বা গুজরাটি ব্রাহ্মণদের উল্লেখের তাৎপর্য আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব, এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে ঐতিহাসিকদের একটা বড় অংশই মনে করেন নিধনপুর লিপির ব্রাহ্মণরা শ্রীহট্টে এসেছিলেন গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চল থেকে, অথবা সরাসরি সেখান থেকে না এলেও তাঁদের মূল বাসভূমি ছিল ঐ কাথিয়াবাড় অঞ্চল।

'বলিচরুসত্র' সাধারণত বিষ্ণু-উপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অনুমান করা যেতে পারে নবাগত ব্রাহ্মণদের বড় অংশ ছিলেন বিষ্ণুভক্ত, অর্থাৎ শ্রীহট্টে পশ্চিমাগত ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে রূপটি প্রথম প্রবেশ করে তা প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম। অন্যান্য দেবতার উপাসক ঐ দলে ছিলেন কি না, তা নির্ণয় করার মতো নিঃসংশয় কোনো উপাদান লিপিতে নেই। তবে ব্যক্তিনাম অনেক সময় ব্যক্তিগত ধর্মাচারকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং সেই হিসাবে অন্যান্য দেবতার অনুরাগীর অনুসন্ধানও করা যেতে পারে। ব্যক্তিনামের মধ্যেও বৈষ্ণব-প্রভাবিত নামের সংখ্যাই সমধিক, যেমন, মনোরথ স্বামী (সবগুলি নামই স্বামী অন্ত বিশিষ্ট, আমরা ঐ সাধারণ অভিধা বাদ দিয়েই পরবর্তী নামগুলির উল্লেখ করব) বিষ্ণুঘোষ, নন্দদেব, সঙ্কর্ষণ, নাবায়ণ, বিষ্ণু, সুদর্শন, গোপেন্দ্র, মধুসেন, ধ্রুবসোম, বিষ্ণুভূতি, বিষ্ণুদত্ত, কৃষ্ণ, জনার্দনদেব, বিষ্ণুসোম, মধুমিত্র, মধুস্বামী, সনাতন, প্রদ্যুম্ন, নন্দেশ্বর, গোবর্ধন, সুদর্শন নারায়ণবৃদ্ধি, গোপাল, জনার্দন, নন্দভূতি, কেশব প্রভৃতি। যে-নামগুলো একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, লিপিতেও তাই রয়েছে, একনামের একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতি ঐ ধরনের নামকরণের জনপ্রিয়তারই দ্যোতক। দেখা যাচ্ছে ২০২টি নামের মধ্যে মোটামুটি ৩২টি নাম বৈষ্ণব-প্রভাবিত। এর পরে আসছে সৌরধর্ম-প্রভাবিত নাম, যথা বসু, সোমবসু, অর্ক, ভানু, মিত্রপালিত, বসুশ্রী, সোমসেন,

ভাস্করমিত্র, অর্কদিনকর, শনৈশ্চরভূতি, প্রভাকরকীর্তি, হর্ষপ্রভ, খণ্ডসোম, দিবাকর, কর্কদত্ত, সূর্য্য, সবিত্রদেব, অর্কদেব, বসুদত্ত, গায়ত্রীপাল, বসুশ্রী, বৃহস্পতি, ভাস্করমিত্র, অর্ক। এই ২৪টি নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি সৌরধর্মের প্রভাবও ছিল, এবং এ-তথ্যটি ঐ যুগের প্রেক্ষিতে একটু বিস্ময়কর। পরে ঐ তথ্যটির ইঙ্গিত নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

তুলনামূলকভাবে শৈব নাম পাওয়া যাচ্ছে কম, যদিও পূর্ব ভারতের সমসাময়িক অধিকাংশ রাজাই ছিলেন শৈব। ভাস্করবর্মা নিজে শৈব ছিলেন, পূর্ববঙ্গের অন্য রাজারা, বৈণ্যগুপ্ত, সমাচারদেব, লোকনাথ, জীবধারণরাত, এরাও ছিলেন শৈব। নিধনপুর লিপিতে শৈব নাম যে-গুলো পাচ্ছি (শাক্তসহ) সেগুলো হচ্ছে শক্তিকুণ্ডু, গঙ্গস্বামী, সপিনী, হরপ্রভ, গৌরীস্বামী, কালীস্বামী, শিবগণ, রুদ্রভট্টি, ভবদেব, শর্বদেব, তাগেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, গণেশ্বর (?), বুধেশ্বর, জহ্নেশ্বর, রুদ্রঘোষ ও উগ্রদত্ত। প্রাচীন ভাষ্যকার ত্রিকাণ্ড সেন ও মেদিনীনন্দিন-এর মতে 'শালঙ্কায়ন' শব্দদ্বারা গোত্রের ব্রাহ্মণ কিছু পাচ্ছি, কিন্তু তারা সবাই যে শৈব ছিলেন, এমন ভাবার কারণ নেই। আরো কিছু নাম রয়েছে, যেগুলো সরাসরি কোনো দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির দ্যোতক। যথা, বেদঘোষ, যজ্ঞকুণ্ড, ঈশ্বরকুণ্ড, প্রবরনাগ, যজ্ঞস্বামী, দৈবস্বামী, ভৃগু, মহীধর অদ্রিবিলেপন, দিব্যেশ্বর প্রভৃতি। কিছু নামে রয়েছে বৌদ্ধপ্রভাব, যথা, দামোদেব, শুভদাম, শুচিপালিত, সুচরিত, সুরজ্জিত, দামমৃতি, শাশ্বতদাম প্রভৃতি। কিছু নাম একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ, যেমন বকুলস্বামী, শ্রেয়স্কর, রূপাধ্য, বিমর্দন। একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম 'সাধারণ স্বামী', তিনি আবার ছিলেন লিপিপ্রাপক, অর্থাৎ তাম্রলিপিটির সংরক্ষক।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন এ-যুগেও হয়, সে-যুগেও হত। নামগুলির সাক্ষ্য যে-সর্বাংশে বিশ্বস্ত নয় এ-বিষয়ে আমরা সচেতন। এ-সম্পর্কে তাম্রলিপি প্রদত্ত বিপরীত প্রমাণও রয়েছে। প্রাচীন লিপিতে এমন প্রমাণ অনেক পাওয়া যাবে যেখানে শৈব নামধারী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্দিরের সেবায়েৎ নিযুক্ত হয়েছেন, অথবা বৈষ্ণব নামধারী ব্রাহ্মণ শিবদেউলে। তবু নামকরণের মধ্যে সমাজ মানস ও সামাজিক প্রবণতার একটা সাধারণ লক্ষণ যে ধরা পড়ে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সে-অনুসারে আমরা পাচ্ছি যে পশ্চিম বা উত্তর ভারত থেকে নূতন সংস্কৃতির পথিকৃৎ হিসাবে যাঁরা আসছেন, মুখ্যতঃ বৈষ্ণবধর্মই তাঁদের অবলম্বন ছিল। সে-যুগের সাধারণ পটভূমিও ছিল তাই। হরিপদ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে (India as reflected in the Inscription of Gupta Period) খুব বিস্তৃতভাবেই দেখিয়েছেন যে গুপ্তযুগে যে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি পশ্চিম থেকে পূর্বভারতে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল, তা ছিল মূলত বৈষ্ণব-উপাদানের সমৃদ্ধ। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতক থেকেই তা সুরু হয়েছিল। সেটিই ছিল স্বাভাবিক, কারণ বনচারীদের মধ্যে কৃষি-সভ্যতার বিস্তারের জন্য গো-পালক কৃষ্ণ ও হলধারী বলরামের উপযোগিতা ছিল প্রশ্নাতীত। পাশুপত শৈবধর্মের প্রভাব ঐ সময়টাতে পশ্চিম বা উত্তর ভারতে একেবারে কম ছিল না, কিন্তু নূতন অভিযানে ইচ্ছুক ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে বৈষ্ণবরাই অধিকতর অগ্রণী ছিলেন, তার প্রমাণ নিধনপুর লিপিতে রয়েছে। সৌরধর্মের যে দ্বিতীয় প্রধান স্থান আমরা ঐ লিপিতে পাই, তা অবশ্য সাধারণ লক্ষণ

হিসাবে নির্ধারণ করা যায় না, বিশিষ্ট কিছু ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছিল। তার কারণ আমরা যথাস্থানে নির্ণয়ের চেষ্টা করব। নিজেদের-বেদপরিচয় ও গোত্র-পরিচয় সম্পর্কে যে-ব্রাহ্মণবা পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন নামকরণের ব্যাপারে তাঁরা যে বৌদ্ধধর্মের গুণতপ দিকগুলোর দিকে কিয়ৎ পরিমাণে আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এ-টুকু ঔদার্য না থাকলে এরা অভিযাত্রী হিসাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভাগ্যান্বেষণে যেতে পারতেন না, যে-ক্ষেত্রে বাজকীয় কৃপালাভের জন্য হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজার মধ্যে বাছাবাছি সুযোগ তার ছিল না। পরবর্তীকালে পাল আমলে বৌদ্ধধর্মের যে পুনরুজ্জীবন পূর্বভারতে ঘটেছিল, এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের ঔদার্য সহনশীলতা নিশ্চিতই তাতে একটা ভূমিকা নিয়েছিল। সেই সূত্রে অবশ্য পুরো বৌদ্ধধর্মকে আত্মস্থ করতেও তারা সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, পরবর্তীকালে বঙ্গ তথা পূর্বভারতে তান্ত্রিক শাক্তধর্ম, লোকায়ত শৈবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের যে-প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি, নবাগত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তাব বিস্তাবে কোনো ভূমিকা নেয় নি। সেগুলো গড়ে উঠেছে পরবর্তীকালে, পালযুগের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশেষকে আশ্রয় কবে। সেই সময়টাতে ততদিনে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি তান্ত্রিক ধর্মকে পোষকতা করেছে, কিন্তু লোকায়ত শৈবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মকে তাব প্রাণরস খুঁজে নিতে হয়েছে আবহমান বঙ্গ সংস্কৃতিব নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে।

যাই হোক, নবাগত ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় যে-দিকগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, তা শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণেই নয়। নূতন একটা জনগোষ্ঠী নূতন সংস্কৃতি নিয়ে এল, নিয়ে এল নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা, এবং তারই সূত্রে নূতন উৎপাদন-সম্পর্ক এবং নূতন অর্থনীতি ও রাজনীতি। ধর্ম ছিল সে যুগে তাবই উপরি কাঠামো, তাই ধর্মের দিকটাও গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব জীবনের কঠিন ভূমিতে কী ঘটেছিল? আগেই বলেছি, ভূতিবর্মা-প্রদত্ত ভূতিতে প্রাথমিক বসতি-স্থাপনের পর ভাস্করবর্মার আমলে সে-ভূমির উপর অধিকার নূতন করে প্রতিষ্ঠার মাঝখানে শত বৎসরের ব্যবধান। এই শতবর্ষে ময়ূরশাল্মলী অগ্রহারের নিশ্চিতই বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। যে বনাঞ্চলের মধ্যে শিমূল গাছে রক্তপুষ্প ফুটত এবং কেকাধ্বনি-সহযোগে ময়ূর -ময়ূরী নাচত, সে-অঞ্চল পরিণত হয়েছে সমৃদ্ধ জনপদে এবং সে-সমৃদ্ধির মূলে বয়েছে লাঙ্গলভিত্তিক কৃষিব বিস্তার। ভূমিই এই সমৃদ্ধির উৎস, অতএব যে-ভূমি আগে ছিল বনচবদের বিচরণ ভূমি, তা পরিণত হয়েছে মহার্ঘ সম্পদে। বস্তুত এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনই তাম্রলিপির নবীকরণেব প্রয়োজন ঘটিয়েছিল। জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী ভূমি ভূতিবর্মা রাজস্ব ব্যতিরেকেই দান করতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু শতবর্ষ পরে তা যখন শস্যপ্রসবিনী কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হল, তখন রাজপুরুষদের দৃষ্টি তার উপর পড়বেই। লিখিত প্রমাণ ব্যতীত মালিকানা বা রাজস্বমুক্তি কোনো বিবরণই রাজপুরুষদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না (এখনও হয় না, আসামের পূর্ববঙ্গাগত কৃষকদের অভিজ্ঞতা সে সাক্ষ্য দেয)। অতএব ভূমিবর্মার মূল দানপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়াব খেসাবত হিসাবে ময়ূরশাল্মলীর ব্রাহ্মণদের রাজস্ব দেওয়ার বিধান হল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের প্রতিনিধিব কর্ণসুবর্ণ এবং নিধনপুব লিপির সৃষ্টি।

ভূমি যে ততদিন কতখানি মহার্য সম্পদে পরিণত হয়েছে, তার প্রমাণ লিপির মধ্যেই লভ্য। জমির বাঁটোয়ারা হচ্ছে চুলচেরা হিসাব করে, সীমাপ্রদাতা নামে আখ্যাত একজন রাজকর্মচারী সীমা নির্ধারণ করে দিচ্ছেন, সীমানা নির্দেশের বিবরণে ডুমুর গাছ বা কুম্ভকার গর্ত পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। নদীপ্রবাহ সরে গেলে সে-জমির মালিক কে হবে এবং শুকিয়ে যাওয়া নদীখাত, যাকে লিপিতে বলা হয়েছে 'গাঙ্গীনিকা', তার দরুণ যে স্থলভূমির সৃষ্টি হচ্ছে, তার মালিক কে হবে- এ সমস্ত কিছুই বর্ণিত হয়েছে লিপিতে। এবং লিপির আদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব রাজকর্মচারী ও গ্রামপ্রধানকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে। এন. এন. আচার্য উল্লেখ করেছেন যে একটি জমির দলিলকে সবদিক দিয়ে নিখুঁত করার জন্য আধুনিককালে যে সমস্ত উপাদান আবশ্যিক বলে মনে করা হয়, তার প্রায় সবগুলিই নিধনপুর লিপিতে লভ্য (Journal of the Assam Research Society, Vol XXV, P 19)। তাই ঐ তাম্রলিপিতে আমরা পাচ্ছি, (১) দলিল রচয়িতার নাম, (২) লিপিকারের নাম, (৩) খোদাইকারীর নাম, (৪) সুনির্দিষ্ট সীমানা ও সীমাপ্রদাতার নাম (৫) সীমা-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীর নাম (৬) করনিকের নাম (৭) আইনজীবীর নাম (৮) রাজকোষাধ্যক্ষের নাম (৯) রাজস্ব আদায়কারীর নাম (১০) দাতার পূর্ণ পরিচয় (১১) দানগ্রহীতার পূর্ণ পরিচয় (১২) দলিল সম্পাদনের স্থান (১৩) সাক্ষীর নাম (১৪) দানপত্র সম্পাদনের কারণ (১৫) দানপত্রের কার্যকারিতার কালসীমা (১৬) উত্তরাধিকারের নির্দেশ (১৭) রাজস্ব সম্পর্কিত নির্দেশ (১৮) ভবিষ্যৎ শাসকের জন্য নির্দেশ (১৯) সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রীয় বিধানের উল্লেখ। সম্পদের গুরুত্ব বেশি বলেই ভূসম্পদ দানের ক্ষেত্রে এত জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া অনিবার্য ছিল। সেই পদব্রজে বা নৌকাযোগে যাতায়াতের যুগে শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার পঞ্চখণ্ডে গিয়ে জমির নূতন দলিল দূত মারফৎ সম্পাদন করিয়ে আনার মধ্যে যে ব্যাপক প্রস্তুতি ও বিস্তর ঝুঁকির ব্যাপার নিহিত ছিল, ভূ-সম্পদের গুরুত্বের জন্যই সে ঝক্কি ঝামেলা পোহানো সম্ভবপর ছিল।

সমস্ত মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগেই ময়ূরশাল্মলী অগ্রহার ও তৎসন্নিহিত বলিচরুসত্র তথা দেবালয়কে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধ একটি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি আশ্রিত জনপদ গড়ে উঠেছিলো যেখানে অন্তত সহস্র ব্রাহ্মণ (হারানো একটি তাম্রপত্রের মধ্যে ধৃত নামসহ দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ যদি তিনশত হন এবং প্রতি পরিবারে যদি অন্তত তিনজনও সদস্য ধরে নেওয়া হয়) স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সে-সুযোগ সম্ভব হয়েছিল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণে। যে-সমাজ এ-ভাবে গড়ে উঠল সেখানে স্যাকরা (সেক্যকার) ছিলেন, কুম্ভকার ছিলেন, করণিক ছিলেন, ব্যবহারী (ব্যাপারী) ছিলেন, লিপিকার ছিলেন, আইনজীবী বা ভূমি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাজপুরুষরা ছিলেন- এ সমস্ত বিবরণ তো আমরা লিপির মধ্যেই পাচ্ছি। বেদপাঠ, শাস্ত্রচর্চা, পূজা অর্চনার সাক্ষ্যও লিপিতেই লভ্য। এ-ধরনের পরিপূর্ণ একটি গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার জন্য অন্য যে-সমস্ত সহযোগী বৃত্তির মানুষের

থাকার কথা, তাঁরাও নিশ্চয়ই ছিলেন। লিপিতে প্রয়োজন না হওয়ায় তাঁদের কথা আসে নি। সেই যে ব্রাহ্মণ-ভিত্তিক গ্রামসমাজের পত্তন হয়েছিল ষষ্ঠ-সপ্তম-শতকে, ইংরেজ আগমনের পূর্ব অবধি তো সেই সমাজদেহ মোটামুটি অক্ষতই ছিল।

ছয়

একটি তথ্যেব অনুল্লেখ শুধু আমাদের পীড়া দেয়। ভূমিনির্ভর অর্থনীতির বিকাশপর্বে ভূমির মালিকদের পরিচয় তো আমরা বেদ-বেদাংশ গোত্র ইত্যাদি সহ অতি বিস্তৃতভাবেই পাচ্ছি। কিন্তু যাদের সরাসরি অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ভূমি পরিবর্তিত হচ্ছিল কৃষিসম্পদে, কায়িকশ্রমের বিনিময়ে যারা অনাবাদী জমিতে সোনা ফলাচ্ছিল, সেই কৃষক-শ্রমিক কারা ছিল? তাদের সম্পর্কে রাজকীয় লিপিমালা সম্পূর্ণ নীরব। নিধনপুর লিপির মধ্যে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত নামের ছড়াছড়ি, দুটি মাত্র নাম পাচ্ছি একটু অন্যধরনের— প্রথম নাম 'ব্যবহারী' খাসোক, দ্বিতীয় নাম সেক্যকার কালিয়া। 'ব্যবহারী' শব্দটিকে অনেকে lawyer বা ব্যবহারজীবী হিসাবে অনুবাদ করেছেন, কিন্তু সে-অনুবাদ যথার্থ নয় বলেই আমাদের ধাবণা। কারণ নামটি রাজকীয় লিপির আইনগত কোন প্রয়োজনে আসেনি, সে-প্রয়োজনে লিপির শেষাংশে যে-নামটি এসেছে তা হল ব্যবহারী হরদত্ত ও ন্যায়করনিক জনার্দন স্বামী। খাসোক নামটি এসেছে জমি সীমা নির্দেশের সময়, তাব জমি রাজপ্রদত্ত ভূমির সীমা স্পর্শ কবেছিল বলে। অনার্য এই নামটি খাসি-উপজাতিব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে ভাবা যায়। অন্যত্র কপিলাশ্রম-সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে এ-অঞ্চলেব আদিম অধিবাসীরা খাসি ও সমজাতীয় অস্ট্রিক সংস্কৃতিব ধাবক ছিল। তাই যদি হয় তবে এখানে 'ব্যবহারী' বলতে ব্যবসায়ী ব্যাপারী বোঝাবে, মুকুন্দ মাধব শর্মা শব্দটিকে tradesman বলেই অনুবাদ করেছেন। উল্লেখ্য যে পূর্বভারতে চাতুর্বর্ণ্য সমাজ কখনও ছিল না, অতএব উপজাতীয় ব্যক্তির বৈশ্যবৃত্তিতে বাধা পড়ার কোনো সামাজিক কারণ ছিল না। সেই সঙ্গে এও উল্লেখ্য যে, পঞ্চখণ্ডেব সন্নিহিত অঞ্চল আবহমান কাল থেকেই খাসিদের স্বাভাবিক বিচরণ সীমার অন্তর্গত, পঞ্চখণ্ডে দুর্গাদলুই নামক খাসি রাজকর্মচারীব বিবরণ পাওয়া যায় এমনকি পঞ্চদশ শতকেও, আজ পর্যন্ত সে অঞ্চলে হিন্দু সমাজভুক্ত তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে খাসি-সাদৃশ্য নৃতাত্ত্বিক পরিমিতি ব্যতিরেকেই সাধারণ দৃষ্টিতে চোখে পড়ে। সেক্যকার বা স্যাক্‌রা কালিয়া নামটি যদিও তদ্ভবরূপে আর্যভাষায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবুও এতগুলি খাঁটি সংস্কৃত নামের পাশে এ-নামটির নিরাবরণ রূপ অব্রাহ্মণ্য-সংশ্রবকেই মনে করিয়ে দেয়। তিনি নিধনপুর লিপির খোদাই করার কাজটি করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ধাতু নিয়ে কাজ করার সহজাত দক্ষতা খাসিদের ছিল, খাসিয়া পাহাড়ের লভ্য লোহাকে ব্যবহার করার জন্য খাসিরা লোহা গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সে-পদ্ধতিতে খাসি-কামাররা এই সেদিন পর্যন্তও লোহার উপকরণ তৈরী করতেন। কর্মকারের সেক্যকাব বৃত্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া, অর্থাৎ কামারবৃত্তিকে স্যাক্‌রাবৃত্তিতে রূপান্তরিত করার ধারা সমতলীয় সমাজে বহুদিন থেকেই চলছে, খাসিদের ক্ষেত্রেও তা হওয়া খুবই সম্ভাব্য।

যাই হোক, এ-দুটি নিম্নতর বৃত্তিতে দুটি সম্ভাব্য অব্রাহ্মণ্য নাম ছাড়া অন্যত্র কোথাও আমরা স্থানীয় অনার্য-অধিবাসীদের উল্লেখ পাচ্ছি না। কৃষি বিস্তাব দেশের এই পূর্বপ্রান্তে অনেক শতাব্দী পরে হয়েছে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় তা শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকেই'। সেখানে যা ঘটেছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা :

"মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকার অরণ্য-প্রধান অঞ্চল একবার লৌহনির্মিত কুঠার দিয়ে মুক্ত করে লাঙ্গলের লৌহফলার অধীনে নিয়ে আসার পব বসতি স্থাপনের জন্য অবারিত হয় পৃথিবীর এক উর্বরতম অংশ। সম্ভবত জনসমাজের মধ্যে কাজ করাব বিনিময়ে তার প্রদত্ত দানের মাধ্যমে, বা নিজেরাই ছল চাতুরি করে, রাজা ও পুরোহিতবা বিস্তৃত ভূখণ্ড নিজ অধিকারে আনতে সক্ষম হন। সে-জমি তারা নিজেরা চাষ করতে পারতেন না।..... কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষি সমাজে যখন কিছু পরিবাব এমন সম্পদ অধিকাব করেন যা তারা নিজস্ব শ্রমশক্তির দ্বারা পবিপূর্ণ ব্যবহারে অক্ষম, তখন তারা সাধারণত বলপ্রয়োগে শ্রমশক্তি সংগ্রহ করেন ও বিধান ও প্রথার বলে তার যোগান অব্যাহত রাখেন। তার সঙ্গে তারা যোগ করে ভাবাদর্শগত ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। এ-ধরনের বিভিন্ন উপাদান, কিছু ভাবাদর্শগত, কিছু বহিরঙ্গ গঠিত, এবং কিছু বাধ্যতামূলক,— এগুলোকে একসঙ্গে একটি সমাজিক বিন্যাসেব মধ্যে সম্মিলিত করাটাই বর্ণপ্রথার প্রধান উপযোগিতা এবং ঐ উপযোগিতাকে আবিষ্কার করাই প্রচীন ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"

(R. S. Sarma, Sudras in Ancient India, ইংরেজী থেকে অনূদিত)

রামশরণ শর্মা যে বিবরণ দিয়েছেন, আমাদেব আলোচ্য প্রসঙ্গে তার পুরোটা প্রাসঙ্গিক নয়— তিনি কথাগুলি বলেছেন প্রতিষ্ঠিত কৃষি সমাজের পবিপ্রেক্ষিতে— আমাদের আলোচনা নবাগত কৃষি-আদর্শেব প্রেক্ষিতে। কিন্তু মূল কথাটা একই— কোনো ব্যক্তি বা পরিবার যখন নিজে চাষ করে না, অথবা নিজের শ্রমদ্বারা সঙ্কুলান করা যায় না এমন ভূসম্পদ অধিকাব করে, তখন অন্যের শ্রমসম্পদকে ছলে বলে কৌশলে নিজের প্রয়োজনে লাগানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বর্ণাশ্রম-প্রথা সে ধরনের ভূমিশ্রমিকের যোগানের উপযোগী ভাবাদর্শগত পরিমণ্ডল তৈরী করেছিল। ব্রাহ্মণরা নিজেরা চাষ করতেন না, সে-বিষয়ে পরবর্তী যুগে তো নিষেধাজ্ঞাই ছিল, বাইরে থেকে ভূমিশ্রমিক আনানো তাঁদের সাধ্যাতীত ছিল, বিশেষত এত দূর-অঞ্চলে। অতএব তাঁরা কী করেছিলেন তাব আভাষও রামশরণ শর্মা দিয়েছেন, যা আমাদের অঞ্চল সম্পর্কে প্রয়োজ্য :

অসংখ্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বিদেশী উপাদানকে আত্মীকরণের জন্য 'বর্ণসঙ্কর' নামক একটি অলীক কল্পনার সৃষ্টি এবং সে-কল্পনার ফলপ্রসূ ব্যবহারে মনু খুব বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে (আদিবাসী থেকে উদ্ভূত) এই সমস্ত সঙ্করবর্ণকে অন্য প্রতিষ্ঠিত শূদ্র বর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তাদের উপরও বংশানুক্রমিক কর্তব্যের দায় চাপানো হয়েছে।...... সম্ভবত তাদের কৃষিকর্মের নূতন পদ্ধতি শেখানো হয়েছিল, যার ফলে তারা কৃষকে রূপান্তরিত হচ্ছিলেন।

আসল কথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবক্তারা সভ্য-জীবনযাত্রার বাণী প্রচার করে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উত্তরণের ব্যবস্থা যেমন করছিলেন তেমনি উৎপাদন-সম্ভাবনায় ভরপুর এই উপজাতি-গোষ্ঠী সমূহের শ্রমশক্তিকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহাব কবে ব্রাহ্মণ্যসমাজ নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

(Sudras in Ancient India থেকে অনূদিত)

নিধপুর লিপি বা সমজাতীয় দানপত্রের সাহায্যে পশ্চিমাগত ব্রাহ্মণবা যখন ভূমির মালিক হয়ে নূতন জমিকে কৃষিকাজের আওতায় আনছিলেন, তখন এই অঞ্চলের সমাজদেহের মধ্যে কী বিবর্তন-প্রক্রিয়া চলছিল, তার অবয়বটি এবারে স্পষ্ট হচ্ছে। এ-অঞ্চলে অষ্ট্রিক-ভাষী খাসি ও অন্য উপজাতি যারা ছিলেন, এবং পরবর্তী ভোটব্রহ্ম বা মঙ্গোলযেড উপজাতি যারা এখানে বিচরণশীল ছিলেন, তাদের বড় অংশটা নূতন ধরনের কৃষিকাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৃত্তিসমূহ শিখে নিয়েছিলেন, বা তাদের তা শিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ভূমি-মালিকদের কৃষি-শ্রমিক সংগ্রহের সমস্যা এভাবেই মিটেছিল। সেই সঙ্গে ঐ নবসৃষ্ট কৃষক ও শ্রমিকদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে, শূদ্র হিসাবে। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবা পশ্চিম বা উত্তর ভারত থেকে দলবদ্ধভাবে পূর্বভারতে বড় একটা আসেন নি, তাই এখানে চাতুবর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে নি। গড়ে উঠল দ্বিবর্ণ সমাজ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের নিয়ে। শূদ্রদের মূল অংশটা এলেন উপজাতীয়দের মধ্য থেকে- তাদেরই কেউ কেউ নিজ দক্ষতাব বলে ও সামাজিক প্রয়োজনে কায়িক শ্রম ছাড়া অন্য কিছু বৃত্তিতে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন- এদেব উত্তম শূদ্র ও মধ্যম শূদ্রের মর্যাদা দেওয়া হল। শ্রমজীবীরা রইলেন অধম শূদ্রের পর্যায়ে। এভাবে নূতন ব্রাহ্মণ্য-সমাজ, যা মূলত একটি সমন্বিত সমাজ, তার যাত্রা শুরু করেছিল শ্রীহট্ট কাছাড় অঞ্চলে। যাবা এই সমন্বয়ের বাইরে রয়ে গেল, তারাই সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি হিসাবে এখনও বিচরণ করছেন।

সাত

শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলের আদি-সাংস্কৃতিক অবয়বটি গড়ে তুলেছিলেন ভোটব্রহ্ম এবং অস্ট্রিকরা- একে আমরা অভিহিত করতে পারি আদি স্থানীয় সংস্কৃতি বলে। তার উপর আরোপিত হল আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যা আগন্তুক। বলা বাহুল্য এই নূতন সংস্কৃতির যাঁরা বাহক, জাতিগত অর্থে তাঁরা যে আর্য বা নর্ডিক হবেনই, এমন কোন কথা নেই। বস্তুত নিধনপুর লিপির ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষরা যখন এ-অঞ্চলে এসেছিলেন, তখন পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলেই আর্য-অনার্য জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে নূতন সমন্বিত মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁদের অনুসৃত মিশ্র-সংস্কৃতিকেই আমরা বলছি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। কথা হচ্ছে এই অঞ্চলে নূতন এই সংস্কৃতির বাহক হিসাবে যাঁরা এসেছিলেন, তারা কোন্ অঞ্চলের লোক ছিলেন?

নিধনপুর লিপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য অনেক প্রশ্নটাও জটিল। এ নিয়ে মতভেদ ও তৎপ্রসূত বিতর্কও হয়েছে প্রচুর। এই বিতর্কে এককালে অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের

খ্যাতিমান সব পণ্ডিতরা। ঐ লিপিটির পাঠোদ্ধারকালেই পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ লক্ষ্য করেন যে, ব্রাহ্মণ যাঁরা জমি পাচ্ছেন তাঁদের সকলেরই সাধারণ অন্ত্যপদবী স্বামী, কিন্তু অধিকাংশের একটি করে মধ্য-পদবী রয়েছে, তার হল বসু, ঘোষ, নন্দী, মিত্র, নাগ, সোম, পাল, পালিত, কুণ্ডু, দাম, দত্ত ইত্যাদি। ডি. আর. ভাণ্ডারকর বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন (Indian Antiquary, XI, P32; Vol, LXVIPP41-45, 61-77)। তিনি দেখালেন এই ব্রাহ্মণরা মূলতঃ গুজরাটো নাগরব্রাহ্মণ নামে পরিচিত একটি গোষ্ঠির মানুষ। এই নাগরব্রাহ্মণদের আদিবাস ছিল কাশ্মীর ও কাংরা উপত্যকার পূর্বে অবস্থিত নাগরীকরসুম নামক স্থানে, সেখান থেকে সরে এসে তাঁরা গুজরাটের নাগরকোটে (কাথিয়াবাড়) স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এঁদের পূজিত প্রধান দেবতা ছিলেন হাটকেশ্বর শিব। পশ্চিমভারতের অনেক তাম্রলিপিতেই সোম, ঘোষ, বসু, দাম ইত্যাদি পদবী সমন্বিত নাগরব্রাহ্মণদের উল্লেখ পাওয়া গেছে। ভাণ্ডারকার দাবী করলেন যে, এই নাগরব্রাহ্মণরাই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। এবং এঁদেরই একটি শাখা হচ্ছে নিধনপুর লিপির প্রাপক। জে. সি. ঘোষ। (Indian Historical Quarterly, Vol— Vi, P P 67-71) এই মতকে সমর্থন করলেন এবং রিজলি তাঁর (Tribes and Castes of Bengal) বইতেও এই তথ্যকে সর্তসাপেক্ষ স্বীকৃতি দিলেন। পরবর্তীকালে আসামের ঐতিহাসিক প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী অবশ্য এই মতকে নাকচ করে মত দিলেন যে, পূর্বভারতে ও পশ্চিমভারতে অ্যালপাইন ব্রাহ্মণদের যে প্রবাহ বৈদিক আর্যদের আগেই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, এই ব্রাহ্মণরা তাঁদেরই বংশধর, এদের মধ্যে পদবীর সাদৃশ্যের ব্যাখ্যার জন্য পশ্চিমভারত থেকে এরা পূর্বভারতে এসেছিলেন, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। চৌধুরীর বক্তব্য মূলত রমাপ্রসাদ চন্দের একটি তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত, যে তত্ত্বকে পরে গ্রীয়ারসন সাহেব ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় 'আউটার এরিয়ান' ও 'ইনার এরিয়ান' (Outer Aryan and Inner Aryan) নাম দিয়ে প্রয়োগ করেছেন।

প্রাথমিক বিবেচনায়ই দেখা যায় যে প্রতাপচন্দ্র চৌধুরীর মত, অর্থাৎ অ্যালপাইনদের সঙ্গে এই ব্রাহ্মণদের সম্পৃক্ত করার পক্ষে যুক্তি খুব জোরদার নয়। রমাপ্রসাদ চন্দের অ্যালপো-দিনারিয়ান মূল তত্ত্বটিই এর বিরুদ্ধে যায়। চন্দের বক্তব্য হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আর্যভাষীদের ভারতবর্ষে দুটো বলয়ে ভাগ করা যায়, একটি অন্তর্বলয়, এবং অপরটি বহির্বলয়। বহির্বলয়ের আর্যভাষীরা, যেমন গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা ভাষা, সংস্কৃতি ও গঠনের দিক দিয়ে অনেক কাছাকাছি। অন্তর্বলয়ের হিন্দীভাষীদের সঙ্গে তার পার্থক্য স্পষ্ট। চন্দ এই বৈষম্যের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে ভারতে আর্যভাষীদের দুটো প্রবাহ এসে ঢুকেছিল, তার একটি অ্যালপাইন বা অ্যালপো-দিনারিয়ান, অপরটি নর্ডিক। এই অ্যালপাইন ধারাটিই বহির্বলয়ের সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে। সবচাইতে বড় কথা যেটা চন্দ বলেছেন তা হল এই অ্যালপাইনরা ছিল অবৈদিক এবং সেইজন্যই এদের বলা হত ব্রাত্য। এই বক্তব্যটিই চৌধুরীর যুক্তির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। কারণ

যে ব্রাহ্মণদের নিধনপুর লিপির মাধ্যমে জমিদান করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন নিশ্চিতই বৈদিক এবং নিজেদের বৈদিকত্ব জাহির করার ব্যাপারে তাঁরা অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন বলেই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে বেদ-শাখার পরিচয় তাঁরা তাম্রলিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। ফলে এদের সঙ্গে অ্যালপাইনদের সম্পৃক্ত করা চলে না কোনমতেই।

ঘুরেফিরে তাই আমাদের ভাণ্ডারকারের মতটাই বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু গুজরাটের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক সাংকালিয়া (H. D. Sankalia) ভাণ্ডারকারের নাগরব্রাহ্মণ-সংক্রান্ত বক্তব্যটি মানছেন না। তিনি বলছেন ;

“The names of Brahmanas from the Valabhi plates point to a still larger variety of names, some even completely Kshatriya-like and followed by an equally rich variety of suffixed. Whereas their richness is indeed remarkable, they do not show in our present state of knowledge, that the bearers of the suffixes were Nager Brahmans, as Dr. D. R. Bhandarkar had postulated 20 years ago and that the endings are not indicative of families of Brahmanas, resemble as they do to the endings of Kayastha names of Bengal.” (Aspects of Indian History and Archaeology. P 15)। সাংকালিয়া এখানে বলভি তাম্রলিপির কথা বলছেন, গুজরাট অঞ্চলে দাম, বসু, মিত্র ইত্যাদি মধ্য-পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণের প্রাচীন আস্তিত্বের এটাই সবচাইতে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। ঐ অঞ্চলের নাগর-ব্রাহ্মণরা যদিও এখনও ঐ ধরনের পদবীই ব্যবহার করেন, তবুও সাংকালিয়া তাম্রলিপির ঐ মধ্যপদবীকে বংশানুক্রমিক বলে মানতে চাইছেন না, তিনি বলছেন ধ্রবমিত্র, সোমদত্ত ইত্যাদি তো ব্যক্তি নামও হতে পারে? খুবই সম্ভব, তবে এ-সম্পর্কে মতামত প্রকাশের আগে অন্য কিছু তথ্য আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার।

উল্লেখ্য যে এই ধরনের পদধারী ব্রাহ্মণদের কথা যে শুধুমাত্র নিধনপুর তাম্রলিপিতেই পূর্বাঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে তা নয়। সমসাময়িককালে বা তার পরেকার অনেক রাজকীয় ভূমিদানলিপিতে এই ধরনের ব্রাহ্মণদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ভাস্করবর্মারই নগাঁও জেলার দুবিতে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে পাওয়া যাচ্ছে প্রিয়ংকরঘোষ (স্বামী), দেবঘোষ, পরাশরঘোষ, বিষ্ণু ঘোষ, দক্ষ ঘোষ প্রভৃতি অনেকগুলি নাম। সামান্য পরবর্তী সময়ের তাম্রলিপি পাওয়া গেছে কুমিল্লায়, সামন্ত লোকনাথ এর মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছিলেন। সেখানে দাম, দত্ত, ঘোষ, মিত্র, নন্দী ইত্যাদি মধ্যপদবীধারীদের পর্যাপ্ত উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এ লোকনাথের এক বংশধর সামন্ত মরুণ্ডনাথ কিছু ভূমিদান করেছিলেন এক দেবমন্দিরে, সে লিপিটি পাওয়া গেছে মৌলবীবাজায় মহকুমার কালাপুরে। দশম শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধরাজা শ্রীচন্দ্র শ্রীহট্টের দক্ষিণ অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের বিস্তৃত বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন— সে-বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে মৌলবীবাজারের কাছে পশ্চিমভাগে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে। সেখানে আবার আমরা ঐ ধরনের পদবীধারী ব্রাহ্মণদের পাচ্ছি।

কামরূপে প্রাপ্ত মহারাজা ইন্দ্রপালের তাম্রলিপিতে রয়েছে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারেব উল্লেখ, যার প্রথমপুরুষ হরিপাল, দ্বিতীয় পুরুষ শবরপাল এবং তৃতীয় পুরুষ দেশপাল। এদের অভিহিত করা হয়েছে আর্যধর্মের প্রবক্তা হিসাবে। একই রাজার গুয়াহাটিতে প্রাপ্ত আবেকটি লিপিতে পাচ্ছি যজুর্বেদের কান্বশাখার অনুসারী ব্রাহ্মণ সোমদেব, তাঁর ছেলে বসুদেব, তাঁর ছেলে দেবাদেব। নবম শতকের বলবর্মণদেবের নাগাঁও জেলায় প্রাপ্ত আরেকটি তাম্রলিপিতে পাচ্ছি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মালাধরের ছেলে দেবাধরকে। উত্তরবঙ্গেও অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটাই সর্বপ্রাচীন। আনুমানিক ৪৩৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক গুপ্ত সামন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পঞ্চযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তিনজন ব্রাহ্মণকে জমি প্রদান করেছিলেন, তার মধ্যে দুজনের নাম হচ্ছে অমব দত্ত ও মহাসেন দত্ত' (Epigraphia Indica, XXXI, P 57)।

এতগুলি একই ধরনের দৃষ্টান্ত যে একান্তই পবস্পর বিচ্ছিন্ন কোনো প্রবাহের স্মারক, এমন তো মনে হয় না। আমরা যে দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে সাংকালিয়ার একটি মত প্রথমেই খণ্ডিত হয়। সাংকালিয়া বলছেন দত্ত, মিত্র প্রভৃতি পদবীগুলি আদৌ বংশানুক্রমিক পদবী নয়, ওগুলো ব্যক্তিনামেরই অংশমাত্র। বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত সঠিক হতে পারে, কিন্তু যূথবদ্ধ এতগুলি নাম অনেকক্ষেত্রেই একত্রে সন্নিবেশিত এবং সেখানে তা নিশ্চিতই কোনো সাধাবণ প্রবণতার স্বাক্ষরকে বহন করছে। তাছাড়া যেখানে দুই বা ততোধিক পুরুষের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে ঐ ধরনের মধ্যপদবী যে বংশানুক্রমে ব্যবহৃত হযেছে, তার প্রমাণও আমরা উদ্ধৃত করেছি।

এবারে দেখা যাক, অন্য কোনো সাধারণ লক্ষণ ঐ ব্রাহ্মণদের গুজরাটগত বলে ধরে নিতে সাহায্য করে কিনা। আগেকার আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে ঐ নিধনপুর লিপির ব্রাহ্মণ ভূমি-প্রাপকদের অনেকের নামই ছিল নক্ষত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বৈষ্ণব নামের পরই ঐধরনের নামের সংখ্যাধিক্য নিধনপুর লিপিতে রয়েছে। গুজরাটের লিপিমালায় প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ নামের তালিকা পরীক্ষা করে সাংকালিয়াই মন্তব্য করেছেন :

"Their study showed that most of the name of Brahmanas were Nakshatra names, but names of the personal deities like Vishnu and Shiva were also current, a practice enjoined by the Vishnupurana. Likewise besides the orthodox suffixes, Brahmanas had begun to append non-Brahmana suffixes to their names. Both these practices indicate almost complete non-observance of the rules laid down even in the latest Grihyasutas and literal interpreation of the vague rules prescribed by Manu. গৃহ্যসূত্র বা মনুসংহিতার নিয়ম ভেঙ্গে গুজরাটে ব্রাহ্মণদের একটি গোষ্ঠি ঐ সময়ের নক্ষত্র নাম ও অব্রাহ্মণ অভিধা ব্যবহার করেছেন, সেইসঙ্গে অবশ্য বিষ্ণু ও শিব বা সমজাতীয় ব্যক্তিগত আরাধ্য দেবতার নামও গ্রহণ করেছেন। নিধনপুর লিপির ব্রাহ্মণরা ঠিক ঐ সমস্ত ধারারই অনুসরণ করেছেন নিজেদের নামকরণে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সুদূর গুজরাট থেকে ভারতের পূর্ব্বতম প্রান্তে ব্রাহ্মণদের পরিক্রমণ কি সম্ভব ছিল সেই সুপ্রাচীন কালে? সম্ভব যে ছিল, অন্ততঃ উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত, তার কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে। মহাসামন্ত শ্রীনারায়ণ বর্মা বিষ্ণুমন্দিরের জন্য জমিদান করছেন ব্রাহ্মণদের এবং সে ব্রাহ্মণরা হচ্ছেন লাট দেশীয়। লাট দেশ বলতে যে গুজরাট বোঝায়, সে সম্পর্কে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। সাংকালিয়া লাটদেশের সীমা নির্ণয় করেছেন :

‘Lata in its narrower connotation, referred to the region between the river Mahi and the Narmada, that is parts of the modern districts of Bharuch and Kheda in the present state of Gujrat. In its widest expanse, it is said to extend as far as Ujjain in the north the Thana or Bombay in the south. Normally, however, as the epigraphical records of the 5th– 6th century A. D. show Lata comprised the Mahi in the north and the river Daman in the south or the districts of Kheda, Bharuch and Surat and parts of Thana district.

সোজা কথায়, পশ্চিম উপকূলের ভৃগুকচ্ছ, কাথিয়াবাড় অঞ্চল নিয়েই ছিল প্রাচীন লাটদেশ। সেখানকার ব্রাহ্মণপূজাবীই লাভ কবেছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনের বিষ্ণুমন্দিবেব দাযিত্ব। ঐ মন্দিবভিত্তিক গ্রামটিব নাম যে ছিল শুভস্থলী এবং পঞ্চখণ্ডের সন্নিহিত সুপাতলা নামক গ্রামের নামও যে শুভস্থলী থেকে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব, তার উল্লেখ আমবা আগেই করেছি। খালিমপুর লিপিব শুভস্থলী অন্য জায়গায় অবস্থিত ছিল, কিন্তু লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ পূজিত বিষ্ণুমন্দিব-কেন্দ্রিক গ্রামের সাধারণ অভিধা শুভস্থলী হওয়া সম্ভব সে ইঙ্গিতও আগে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে গুজরাট অঞ্চলেব ব্রাহ্মণদের দূরদূবান্ত পরিক্রমণের নিশ্ছিদ্র ঐতিহাসিক প্রমাণই রয়েছে। এমন হওয়া আবো বেশি সম্ভব যে ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণদের প্রাথমিক উপনিবেশ ছিল উত্তরবিহার-উত্তরবঙ্গে, সেখান থেকে ধীবে ধীরে তাঁদের আরো পূর্বদিকে স্থানবদল শুরু হয়। সামাজিক ইতিহাসে এ-অনুমানেব অনুকূলে তথ্য বয়েছে। মিথিলা (উত্তর বিহাব) ও উত্তববঙ্গেব আদি ব্রাহ্মণ সমাজ মূলতঃ একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। কোনো অজ্ঞাত কারণে শ্রীহট্টেব সঙ্গে মিথিলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগত সামাজিক সম্পর্ক বর্তমান। ষোড়শ শতক পর্যন্ত শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সন্তানরা মিথিলায়ই শাস্ত্রাধ্যয়ন করতেন। পরে তা নবদ্বীপে স্থানান্তবিত হয় বটে, কিন্তু মিথিলার সঙ্গে যোগাযোগও থেকে যায়। আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, শ্রীহট্টে যে স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে হিন্দু ক্রিয়াকার্য অনুষ্ঠানাদি চলে, তা বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে মেলে না। অন্য অধিকাংশ অঞ্চলে চলে রঘুনন্দন-স্মৃতি কিন্তু শ্রীহট্টে মৈথিলী--স্মৃতিই অনুমোদিত ও প্রচলিত। ৪৩৯ খৃষ্টাব্দের একটি তাম্রলিপির সাক্ষ্য থেকে আমরা আগে দেখিয়েছি যে অব্রাহ্মণ-পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণদেব আবাস যে ঐ সময়েই উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠেছিল, তার সুস্পষ্ট লিপি প্রমাণ রয়েছে।

সমকালীন গুজরাটের সাধারণ পটভূমি থেকেও ভাণ্ডারকারেব বক্তব্যের সমর্থনে উপাদান পাওযা যাচ্ছে। ঐতিহাসিক হরিপদ চক্রবর্তী বলছেন যে ঐ অঞ্চলের লিপিতে ‘ব্রহ্মদেয় স্থিত্যা’

বলে যে কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বোঝা যায় ব্রাহ্মণদের রাজস্বমুক্ত ভূমিদানের একটা রীতি সেখানে পাকাপাকি ভাবেই গড়ে উঠেছিল (India as reflected in the Inscriptions of Gupta Period–P 7)। তাছাড়া চাষের প্রয়োজনের জন্য রাজকীয় উদ্যোগে বিশাল বাঁধ নির্মাণ সেখানে মৌর্যযুগেই প্রচলিত ছিল, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই বাঁধ সংস্কার করা হচ্ছে তার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে জুনাগড়ের দুটো প্রস্তরলিপিতে যার একটি দ্বিতীয় শতাব্দীর, শকরাজা রুদ্রদমনের সময়কার, অপরটি স্কন্দগুপ্তের আমলের। এ-তথ্য দুটোর সাহায্যে আমরা দেখাতে চাইছি যে কৃষি উন্নয়ন ও ভূমিদানের সংস্কৃতি গুজরাটে গড়ে উঠেছিল, একটা পর্যায়ের পর সেখানকার ব্রাহ্মণরা সংখ্যাবৃদ্ধির দরুনই স্থানীয় ক্ষেত্রে তাতে লাভজনকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, এটাই স্বাভাবিক ছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতেই মানুষের যূথবদ্ধ স্থানান্তর গমন শুরু হয়, অভিযাত্রীরা নূতন উপনিবেশ গড়ে তোলে। সেখানে প্রযোগ করা হয় অর্জিত উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি এবং গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় আদি বাসভূমির সাংস্কৃতিক আবহ। গুজরাটের নাগরব্রাহ্মণরা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন, এমনটি ভাবার মধ্যে অযৌক্তিক কিছু নেই, বরঞ্চ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এটাই সবচাইতে সম্ভাব্য বলে মনে করা যায়।

নিধনপুর লিপির উল্লিখিত ঐ ব্রাহ্মণরা গুজরাট থেকে আগত নাগরব্রাহ্মণ ছিলেন এটুকু মেনে নেওয়ার পর আরেকটা প্রশ্নের মীমাংসা বাকি থেকে যায়। ভাণ্ডারকার থেকে শুরু করে অন্য অনেক পণ্ডিতই মত প্রকাশ করেছেন যে, লিপিতে যে-ব্রাহ্মণদের আমরা পাচ্ছি, তাঁরা পরবর্তীকালে নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখতে পারেন নি। তাঁরা যে মধ্যপদবী ব্যবহার করেছেন, তার প্রায় সবগুলোই অধুনা বাঙ্গালী কায়স্থরা ব্যবহার করেন, অতএব এমন অনুমান করা হয় যে, পরবর্তী কোন পর্যায়ে সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণচ্যুত এই ব্রাহ্মণরাই মূলত বঙ্গের কায়স্থ সমাজকে গড়ে তুলেছেন। বিংশ শতকের প্রথম দিকে নিধনপুর লিপি নিয়ে স্থানীয়ভাবে যাঁরা আলোচনা করেছেন (যেমন কিশোরীমোহন গুপ্ত) তারা প্রত্যেকেই প্রায় মনে করতেন যে অন্যত্র যাই ঘটে থাকুক, নিধনপুর লিপির দাম, দত্ত, মিত্র, ধর ইত্যাদি পদবীধারী ব্রাহ্মণরাই অন্ততপক্ষে শ্রীহট্টীয় কায়স্থসমাজের আদি পুরুষ। দীনেশচন্দ্র সরকার তো বেশ জোর দিয়ে গোটা বঙ্গদেশ সম্পর্কেই বলেছেন, "some Brahmana families, thus appear to have been merged in non–Brahman communities" (Select Inscriptions, P 353)। আবার নীহাররঞ্জন রায় এখানে অন্যমত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন :

"সাম্প্রতিক কালে কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংলার কায়স্থরা নাগরব্রাহ্মণদের বংশধর এবং এইসব নাগরব্রাহ্মণরা পাঞ্জাবের নাগরকোট, গুজরাট-কাথিয়াবাড়ের আনন্দপুর (অন্য নাম নগর) প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন। এই মত সকলে স্বীকার করেন না। এ-সম্বন্ধে একাধিক বিরুদ্ধ যুক্তি যে আছে সত্যই তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিদেশ হইতে নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন, তাহার প্রাচীন ঐতিহাসিক

প্রমাণ বিদ্যমান; কিন্তু পৃথক পৃথক বর্ণস্তর গড়িয়া তুলবার মতন এত অধিক সংখ্যায় তাঁহারা কখনো আসিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই।”

নীহাররঞ্জনের ঐ বক্তব্য লিপিবদ্ধ হওয়ার পর নূতন আরো কিছু তথ্য বেরিয়েছে, যাব মধ্যে একটা হচ্ছে মৌলবীবাজারের পশ্চিমভাগে প্রাপ্ত শ্রীচন্দের তাম্রলিপি, তাতে দেখা যাচ্ছে একটিমাত্র দানপত্রের মাধ্যমে শ্রীহট্টের দক্ষিণ অঞ্চলে ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে বসতি করানো হয়েছিল। এরা অধিকাংশই আবার অব্রাহ্মণ পদবীধারী। অতএব সংখ্যার বিচারে নূতন গড়িয়া তোলার মত সুযোগ কিন্তু ছিল।

তবু ঐ ব্রাহ্মণরাই জাতিচ্যুত হয়ে কায়স্থ হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কায়স্থসম্প্রদায়ের উদ্ভবের ব্যাপারটা ভারতবর্ষের সর্বত্রই বেশ গোলমেলে। প্রথমে করণ ও কায়স্থ অভিধা পেশা-পরিচিতি হিসাবেই ব্যবহৃত হত, জাতিগত অভিধা হিসাবে নয়। নিধনপুর লিপিতেই ন্যায়করণিক জনার্দন স্বামীকে পাচ্ছি, ইনি নিশ্চিতই ব্রাহ্মণ। তার সঙ্গে পাচ্ছি কায়স্থ দুন্দুনাথকে, এর জাতি পবিচয় নির্ণয় করা যাচ্ছে না। ব্রাহ্মণদের জাতিচ্যুতির ব্যাপারটা একান্ত সরল ব্যাপার নয়, পরবর্তী সামাজিক ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে নিম্নতম বর্ণেব যজমানী নেওয়ার জন্য সমাজে যারা পতিত হয়েছেন, তাঁরাও ব্রাহ্মণত্ব ছাড়েন নি, স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ সমাজ তারা তৈরী করেছেন, যাদের বলা হয় বর্ণব্রাহ্মণ। অতঃপর প্রশ্ন উঠবে এরা যদি তাঁদের পদবী নিয়ে বাঙ্গালী কায়স্থ সমাজে মিশে না গিয়ে থাকেন, তবে দাম, দত্ত-পদবীধারী ঐ ব্রাহ্মণরা গেলেন কোথায়? একটা সমাধান এই হতে পারে যে পরবর্তীকালে আগত অন্য ব্রাহ্মণদের চাপে তাঁরা ঐ ধরণের পদবী পরিত্যাগ করে শাস্ত্রসম্মত পদবী গ্রহণ করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিধনপুর ও পশ্চিমভাগ লিপিতে চন্দ্রপুর বিষয় হিসাবে যে এলাকার কথা রয়েছে, সেই অঞ্চলে ‘বৈদিক’ বা ‘সাম্প্রদায়িক’ বলে অভিহিত এক বিশেষ ব্রাহ্মণ সমাজের বাস, যাদের বিবাহ সম্পর্ক চলে কুচবিহার, গোয়ালপাড়া ও ভাটপাড়ার সঙ্গে। শ্রীহট্টের অন্য উচ্চ ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে এদের সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্র সংকুচিত। এই ‘বৈদিক’ বা সাম্প্রদায়িক বলে খ্যাত ব্রাহ্মণরাই ঐ লিপিগুলিতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণদের উত্তরপুরুষ হতে পারেন।

মোটের উপর শ্রীহট্টে আর্য ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে ওঠার প্রাথমিক বিবরণ আমরা নিধনপুর লিপিতে পাচ্ছি, কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজের বিবর্তন কোন পথে ঘটেছিল, তার রূপরেখা নির্মাণের পক্ষে তথ্য ও প্রমাণের অভাব রয়েছে।

আট

শ্রীহট্ট কাছাড় অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতেও নিধপুর লিপি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা স্বতন্ত্র বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বিষয়টি আমরা সামান্য উল্লেখ করে রাখছি এই কারণে যে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের উপব কামরূপের প্রাচীন রাজনৈতিক প্রভাব অনেক সময়েই

আজকের রাজনীতিতেও জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে। তাই কয়েকটি তথ্য সূত্রাকারে উল্লেখ করে রাখছি :

এক, নিধনপুর লিপি প্রমাণ করছে যে ভূতিবর্মা থেকে ভাস্করবর্মা পর্যন্ত অন্ততঃ শতবর্ষকাল শ্রীহট্ট-অঞ্চল কামরূপের রাজনৈতিক সীমার অন্তর্গত ছিল। তবে ঐ সময়কার কামরূপ রাজ্যকে আজকের আসাম রাজ্যের সঙ্গে এক করে দেখা ভুল হবে। বর্তমান পূর্ব আসাম সেই সময়কার কামরূপের সম্পূর্ণ বাইরে ছিল, সেই সময়কার কামরূপের কেন্দ্রভূমি ছিল পশ্চিম আসাম ও উত্তরবঙ্গ (রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চল) নিয়ে সংগঠিত। দক্ষিণবঙ্গের একাংশও প্রায়শঃ সেই রাজ্যের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ত। ভাস্করবর্মার পর থেকেই অতি সাময়িক বিরতি বাদ দিলে কামরূপের প্রভাবসীমা সংকুচিত হয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক বিচারে পশ্চিম আসাম, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সেই সময়ে তেমন কোনো লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল না।

দুই, ভাস্করবর্মার অনতিপরই, অর্থাৎ সপ্তম শতকের মধ্যভাগে শ্রীহট্ট যে সমতটের সামন্ত লোকনাথ ও তাঁর বংশধরদের নিয়ন্ত্রণে যায়, তার প্রমাণ মৌলবীবাজারের কসিপুরে প্রাপ্ত মরুণ্ডনাথের লিপিতে পাওয়া যায়। দশম শতকে পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজারা এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মৌলবীবাজারেব পশ্চিমভাগে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে। ওখানেই সর্বপ্রথম একটা রাজনৈতিক ইউনিট হিসাবে শ্রীহট্টমণ্ডল-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে, ঐ শ্রীহট্টমণ্ডল ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত। এর পববর্তীকালে কেশবদেব ও ঈশানদেব নামক দুজন রাজার নামে প্রদত্ত ভাটেরা (বরমচাল) গ্রামে প্রাপ্ত দুটি তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে শ্রীহট্ট একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পবিণত হয়েছে এবং এই দেববংশীয়রা ছিলেন ঐ রাজ্যের শাসক।

তিন, অনেক ঐতিহাসিকই প্রাচীন হরিকেল রাজ্য এবং শ্রীহট্টকে সমার্থক বলে ধরে নিয়েছেন। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি সহ পূর্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলই কোনো না কোনো সময়ে হরিকেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। হরিকেলের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নি, কিন্তু শ্রীহট্ট ও হরিকেলের সমীকরণ যদি প্রতিপন্ন হয়, তবে ধারাবাহিকভাবে শ্রীহট্টের রাজনৈতিক প্রভাব পূর্ববঙ্গের উপর কোনো একটা পর্যায়ে কার্যকর ছিল, এমনটি ধরে নেওয়া যায়।

চার, প্রাপ্ত তাম্রলিপি ও অন্যান্য বস্তুভিত্তিক উপাদান অনুসারে দেখা যায় যে ভাস্করবর্মার পর (সপ্তম শতকের মধ্যভাগ) শ্রীহট্টের উপর কামরূপের প্রভাব চিরতরে অন্তর্হিত হয় এবং তারপর থেকে ব্রিটিশ আগমন পর্যন্ত তার রাজনৈতিক যোগসূত্র ধারাবাহিকভাবে এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

[হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য' পত্রে শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমার যে ধারাবাহিক আলোচনাটি প্রকাশিত হচ্ছিল, এই রচনাটি তারই অংশ। স্বতন্ত্র নিবন্ধ হিসাবে পুনর্মুদ্রণের জন্য যে ব্যাপক সংস্কার ও সংযোজকের প্রয়োজন ছিল, তা করা সম্ভব হয় নি। ফলে কিছু অসঙ্গতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না— এ ব্যাপারে পাঠকদেব ক্ষমাসুন্দর প্রশ্রয় ভিক্ষা করছি।]

ভাটেরা তাম্রশাসন : প্রেক্ষাপট, বিতর্ক ও ব্যাখ্যাসূত্র

জন্মজিৎ রায়

॥ ১ ॥

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার ভাটেরা গ্রামে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে যে-দুটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়, সে-দুটিকেই 'ভাটেরা তাম্রশাসন' (Bhatera Copper-plates) বলে চিহ্নিত করা হয়। ভাটেরা গ্রামটি মাইজগাও ও বরমচাল রেল স্টেশনের মাঝখানে অবস্থিত। 'ইটের টিলা' বলে পরিচিত ভাটেরা গ্রামের একটি টিলার খননকার্যের সময় আট ফুট মাটির তলা থেকে উল্লিখিত তাম্রশাসন দুটি আবিষ্কৃত হয়। কৌতূহলী পাঠকের জন্য ভাটেরা গ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উমেশচন্দ্র চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ থেকে এখানে অংশত উদ্ধার করা যেতে পারে :

"The village lies at the eastern foot of a small hill, extending north and south from Maurapur on the southern bank of the Kusiara river to the northern bank of the Manu, and spreading over an area of about twenty miles in length and between three and five miles in breadth, interspersed with several small hills covered with dense jungle."[১]

যে টিলাটির খননকার্যের সময় ভাটেরা তাম্রশাসন দুটি আবিষ্কৃত হয়, সে টিলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে উমেশচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, "As we have stated above, the plates were discovered from the ruins of a fort on a hillock or tilā. The hillock is about 150 feet high, the highest level portion measuring about 400 feet from east to west and about 200 feet broad from north to south.

The eastern side of the hillock has even now distinct traces of extensive long and broad stairs made of bricks. These stairs, commencing from the upper portion of the hill-fort, go down to the bank of a tank which is about 600 feet long and 300 feet broad. The tank at present goes by the name of Sātpāḍī Pukur (i.e. 'tank with seven banks') whatever that may imply."[২]

ভাটেরা তাম্রশাসন প্রথম পাঠোদ্ধার করেন পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর অগ্রজ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী। পণ্ডিতা রমাবাই যখন কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে শ্রীহট্টে আসেন, তখন শ্রীনিবাস

শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এরপর শ্রীহট্টের তৎকালীন জেলাশাসক লাটম্যান জনসন (Luttman Johnson) কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিব সম্পাদক ভারততাত্ত্বিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে পাঠোদ্ধারের জন্য তাম্রশাসন দুটির প্রতিচিত্র পাঠিয়ে দেন। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে ১৮৮০ সালের আগস্ট সংখ্যায় বাজেন্দ্রলাল-কৃত তাম্রশাসন দুটির সঠিক ইংরাজি অনুবাদ প্রতিচিত্র-সহ প্রকাশিত হয়। এর প্রায় অর্ধশতক পব শ্রীহট্টের মুবারিচাঁদ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক কে. এম. গুপ্ত ভাটেরায় প্রাপ্ত প্রথম তাম্রশাসনটির ওপর নূতন আলোকপাতের চেষ্টা করেন। তৎকৃত তাম্রশাসনটির সানুবাদ পাঠ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার ঊনবিংশ বর্ষের ঊনপঞ্চাশতম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্রীহট্টে প্রাপ্ত তাম্রশাসনসমূহ নিয়ে কমলাকান্ত গুপ্ত ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থে আলোচনা কবেন। ভাটেবা তাম্রশাসন বিষয়ে গ্রন্থটিতে নূতন আলোকপাত করা হয়। অন্যান্য পণ্ডিতবর্গেব মধ্যে যাঁরা এই বিষয়ে মৌলিক আলোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি এবং রাজমোহন নাথ।

ভাটেবা তাম্রশাসন দুটির মধ্যে প্রথমটি শ্রীহট্ট বাজ্যেব রাজা কেশবদেব প্রদত্ত ভূমি-দানপত্র। দ্বিতীয়টি কেশবদেবেব তৃতীয পুত্র ঈশানদেবের ভূমি-দানপত্র। কেশবদেবের তাম্রশাসনকে 'তাম্রশাসন ১' এবং ঈশানদেবের তাম্রশাসনকে 'তাম্রশাসন ২' বলে অভিহিত করা হয়। কেশবদেবের তাম্রশাসনের প্রাবম্ভিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হতে পারে :

> "ওঁ নমঃ শিবায়। যঃ কর্তা ভুবনত্রয়স্য তনুভির্বিশ্বং পৃথিব্যাদিভির্যস্যেদং ধ্রিয়তে য ঈশ্বর ইতি খ্যাতো ভবন্নাপবঃ! যঃ সংজ্ঞাত্রয়মেক এব ভজতি ত্রৈগুণ্যভেদাশ্রিতো ব্রহ্মোপেন্দ্রমহেশ্বরেতি জগতামীশায় তস্মৈ নমঃ।। ত্রিপুরহরশিরঃকিরীটরত্নং স্মরযুবতেরভিষেক-রৌপ্যকুম্ভঃ কুসুমবিশিখবাণশাণচক্রং জয়তি নিশাতিলকস্তুষাররোচিঃ।। বংশেহস্য ভূমিপতয়ঃ কতিতে নিষ্পারপৌরুষা জাতাঃ। যেষাং যশঃ প্রশস্তির্ভুবি ভারতসংহিতৈবাস্তি।। অথ বিশ্রুতপ্রভাবঃ প্রভবঃ শ্রীহট্টরাজ্যকমলায়াঃ। সমজনি নবগীর্বাণঃ খরবাণঃ ক্ষ্মাভুজাং শ্রেষ্ঠঃ।। তস্যাত্মজো রাজপিতামহোভূৎ মহীপতির্গোক্ষুণদেবনামা। যস্য প্রতাপার্করুচোপি চিত্রং দিশন্ত্যরিক্ষ্মাপতি-জাড্যমুদ্রাম্।। তস্মাদমন্দভুজ-মন্দর-মথ্যমান-প্রত্যর্থি-পার্থিব-সমুদ্র-সমুদ্ধৃত শ্রীঃ। নারায়ণোহজনি মহীপতিরন্বকারি যেন স্ফুটঃ স ভগবান্নাশ্রিতনন্দকেন।। তস্মাদসীম-গুণ-গৌরব-গীতকীর্তির্ভূপাল-মৌলিমণিমণ্ডিতপাদপীঠঃ। শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্রতিলকোরিপুরাজগোপীগোবিন্দ ইত্যজনি কেশবদেব এষঃ।। যঃ সীমাদ্ভুতপৌরুষস্য যশসাং ধামঃ শ্রিয়ামাশ্রয়ো বিদ্যানাং বসতির্নয়স্য নিলয়ো ধাম্নাস্তদেশাস্পদম্। ত্যাগস্যায়তনং বিলাসভবনং বাচঃ কলানাং নিধিঃ।।"[৩]

কেশবদেবের তাম্রশাসন মহাদেবের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করে আরম্ভ হয়েছে। উদ্ধৃতাংশে বলা হয়েছে, ভারতসংহিতা বা মহাভারতে যে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কীর্তিকাহিনী বর্ণিত আছে, সেই চন্দ্রবংশেই শ্রীহট্টরাজ্যের লক্ষ্মীশ্রীর কারণ, তীরন্দাজ, খ্যাতকীর্তি নবগীর্বাণ জন্মগ্রহণ করেছেন।

নবগীর্বাণের পুত্র মহীপতি গোঙ্গুণদেব বর্তমান রাজার পিতামহ। গোঙ্গুণদেবের পুত্র নারায়ণদেব, যিনি তাঁর মন্দরতুল্য ভুজবলে সমুদ্রমন্থনোত্থিত লক্ষ্মীর মতো ভাগ্যলক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। নারায়ণদেবের পুত্র কেশবদেব রাজকুলের তিলকস্বরূপ। তিনি রিপুকুলে ও গোপাঙ্গনাদের মধ্যে গোবিন্দের মতো বিরাজমান।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কেশবদেবের তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠে কমলাকান্ত গুপ্তকে অনুসরণ করা হয়েছে। তাম্রশাসনটি কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। কিছু অক্ষর অস্পষ্ট ও দুষ্পাঠ্য হওয়ার ফলে পাঠভেদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, নবগীর্বাণের পুত্রের নাম নিয়ে পাঠভেদ প্রচলিত আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র নামটিকে 'গোকুলদেব' বলে পাঠ করেন। অধ্যাপক গুপ্তের মতে, নামটি হবে 'কোঙ্গণ'। কমলাকান্ত গুপ্ত এটিকে 'গোঙ্গুণ' বলে পাঠ করেছেন। রাজেন্দ্রলাল-নির্দেশিত পাঠটিকেই সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। অনেকেই কেশবদেবের তাম্রশাসনের লিপিকে খ্রিস্টোত্তর ১১শ-১২শ শতকের উত্তব ভাবতীয় নাগরী লিপির প্রকারভেদ বলে নির্দেশ করেছেন। কেশবদেবের তাম্রশাসনের বানানবীতি লক্ষ করলে দেখা যায়, 'শ্রীহট্ট' শব্দটিকে 'শৃহট্ট' রূপে লেখা হযেছে। বেফান্ত শব্দে সর্বত্রই ব্যঞ্জনদ্বিত্ব লক্ষিত হয়। কিছু লিপিকর-প্রমাদও দেখতে পাওয়া যায়। ১১ ইঞ্চি × ১২·৭৫ ইঞ্চি মাপের এই তাম্রশাসনের একদিকে ২৭ পঙ্ক্তি এবং অন্যদিকে ২৮ পঙ্ক্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। ভাষার বিচারে এটিকে ত্রিভাষিক তাম্রশাসন বলা যেতে পারে। কেননা, তাম্রশাসনটিতে সংস্কৃত ও বাংলা ব্যতীত একটি অজ্ঞাতমূল ভাষায় রচিত একটি পঙ্ক্তি লক্ষ করা যায়। ১-২৯ এবং ৫৩-৫৫ পঙক্তির ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। সংস্কৃতে রচিত অংশে শার্দূলবিক্রীড়িত, পুষ্পিতাগ্রা, আর্যা, উপজাতি, বসন্ততিলক, স্রগ্ধরা, অনুষ্টুভ প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় রচিত অংশে ক্রিয়াপদ বা সর্বনামের ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। সংখ্যাবাচক শব্দের পরিবর্তে সংখ্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে তাম্রশাসনে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা সম্পর্কে আমবা বিশদ ও স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারি, না। তবে এই অংশে আমরা কিছু স্থাননাম, নদীনাম ও ব্যক্তিনামের সঙ্গে পরিচিত হই। এদিক থেকে তাম্রশাসনটি আমাদের কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ্ করে। কেশবদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজার ভক্তিতে ভগবান ত্রিলোকনাথ বটেশ্বর মহাদেব কৈলাস পরিত্যাগ করে ভট্টপাটক অঞ্চলে অবতীর্ণ হয়েছেন। কেশবদেব শ্রীহট্টনাথ বটেশ্বর শিবের প্রীত্যর্থে বিভিন্ন গ্রামে ৩৭৫ ভূহল-পরিচিত ভূমি এবং ২৯৬টি বাটী বা গৃহভূমি ('পঞ্চসপ্তত্যা ভূহলানাং শতত্রয়ং শতদ্বয়ঞ্চ বাটীনাং ষন্নবত্যা সমন্বিতম্') দান করেন। উক্ত তাম্রশাসনে যে-সকল স্থাননাম উল্লিখিত হয়েছে, 'তার মধ্যে রয়েছে ভাটপাড়া, দেববন্ধ, বড়গাম, মহুবাপুর, ইটাখালা, দেগিগাম, বরপঞ্চাল, আমতলী, সিংহডর, ভাসনাটেঙ্গরী, গুড়াবয়ী, কাটাখাল, আখালিকুল, পরাকোণা, পিথায়িনগর, বেনূরগাম, কৈবাম, যোড়াত্তিথা, বান্দেসীগাম, নবহাটী, শুঘর, ভোথিলহাটা, কউড়িয়া, ফোস্ফানিযা, ভাস্করটেঙ্গরী, জগাপান্তর, নাটয়ান, মূলীকান্দি, আড়ালকান্ধি, শলাচাপড়া, নথোশাসন, বাসুদেবশাসন, হট্টবর, সাতকোণা,

বড়সো, চেঙ্গচ্চুড়ী, মাঙ্গনপাবী, মেঘাপরা, লঙ্গজোট্টি, দোহালিয়া, আখালিছড়া, জোগাবনিয়া, নড়কুটিগাম, করাগাম, বোবাছড়া, সিংহট্টর গ্রাম ইত্যাদি। উল্লিখিত নদীনামের মধ্যে রয়েছে বরুণা, সবশা নদী, কালিয়াণী নদী, খবসোন্তী, ধামায়ি, জুড়িগাঙ ইত্যাদি। ব্যক্তিনামের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাস্য গোবিন্দা, সদা গোপ, আরু, পানাক, নিকুঞ্জ, গট্টক, জোগা, নিধি, শৃপাত, দিবাকর মালা, নাপিত গোবিন্দ, রজক সিরুপা, দন্তকার বজরি, হড্ডিপ, দ্যোত্যো নাবিক প্রভৃতি।

উল্লিখিত স্থাননাম ও নদীনামগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অনেকগুলি শব্দই ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত নয়। আর্যেতর ভাষার স্বাক্ষরবাহী নামগুলি প্রাগার্যায়ণ-কালীন আঞ্চলিক ইতিহাসের অজ্ঞাত অধ্যায়ের দিকে আমাদেব আকর্ষণ কবে। কিছু কিছু স্থান ও নদীর নাম কালোচিত ধ্বনিপরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের কাছে একান্ত অচেনা নয়। যেমন, ‘মহুরাপুর’ ও ‘ববপঞ্চাল’ স্থাননাম দুটিকে ভাটেবা গ্রামের পার্শ্ববর্তী ‘মউরাপুব’ ও ‘বরমচাল’-এর মধ্যে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। ‘কাটাখাল’, ‘শলাচাপড়া’, ‘দোহালিয়া’ প্রভৃতি স্থাননামগুলিকে করিমগঞ্জ থেকে শিলচর কিংবা পাথাবকান্দি যাওয়ার পথে আবিষ্কার করা গেলেও ধ্বনিসাদৃশ্যের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ সঙ্গত নয়। ‘কালিয়াণী’ নদীকে কেউ কেউ বর্তমানে বদরপুরের অনতিদূরস্থ ‘কালাইন’ নামের মধ্যে খুঁজে পেতে চান। ‘মূলীকান্দি’ নামের দ্বিতীয়ার্ধ লক্ষণীয়। বর্তমান বরাক উপত্যকার বেশ কিছু স্থাননামের মধ্যে ‘কান্দি’ শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, বাঁশকান্দি, পাথারকান্দি, হাইলাকান্দি। ‘বড়গাম’, ‘বান্দেসীগাম’ ইত্যাদি নামের ‘গাম’ শব্দটি অবশ্যই ‘গ্রাম’ শব্দের অপভ্রংশ। ‘দেববন্ধ’ নামের ‘বন্ধ’ বা ‘বন্দ্’ শব্দটি ক্ষেত্র (field) অর্থে বর্তমানে বরাক উপত্যকার কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়। ‘উদারবন্দ’ শব্দটি সাদৃশ্যত মনে পড়ে। অনেকের মতে, ‘ভাটেরা’ নামটি ‘ভট্টপাটক’ শব্দটির অপভ্রংশ। প্রসঙ্গত, নীহাররঞ্জন রায়ের উক্তি স্মরণ করা যেতে পাবে। তিনি বলেছেন যে, ‘পাটক’ কথাটি ভূমি মাপের মান এবং গ্রাম বা গ্রামাংশ, উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হত। “বস্তুত বাঙলা পাড়া কথাটি পাটক হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয, অথবা দেশজ পাড়া হইতে পাটক। তলপাটক = তলপাড়া, ভট্টপাটক = ভাটপাড়া, মধ্যপাটক = মধ্যপাড়া, ইত্যাদি পাটকান্ত নাম তো এখনও বাঙলাদেশের সর্বত্র সুপরিচিত।”[৪]

কেশবদেবের তাম্রশাসনেব ব্যক্তিনামগুলি যথেষ্ট কৌতূহলজনক। জনৈক কাঁসারি এবং জনৈক নাপিতের নাম গোবিন্দ। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব যে সমাজেব নিম্নস্তরেও তখন ব্যাপ্তি লাভ করেছে, এটা তাব প্রমাণ। জনৈক রজকের নাম দেখা যায় সিরুপা। শব্দটি সম্ভবত ‘শ্রীরূপ’ অথবা ‘শ্রীপাদ’ শব্দের অপভ্রংশ। নিকুঞ্জ, দিবাকর, নিধি ইত্যাদি বিশুদ্ধ তৎসম শব্দও ব্যক্তিনামে লক্ষ করা যায়। ‘শৃপাত’ সম্ভবত ‘শ্রীপাদ’। জনৈক দন্তকারের উল্লেখ থেকে মনে হয়, সেকালে শ্রীহট্ট রাজ্যে হস্তীদন্ত-শিল্প প্রচলিত ছিল। কিছু ব্যক্তিনামের শেষে পদবীর পরিবর্তে গোপ, মালা, নাপিত, রজক ইত্যাদি বৃত্তিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ভাটেরায় প্রাপ্ত দ্বিতীয় তাম্রশাসনটি হচ্ছে কেশবদেবের পুত্র ঈশানদেবেব ভূমিদানপত্র। তাম্রশাসনটির সূচনাংশ এ-রকম :

> “ওঁ নমো নারায়ণায়। মহানীলমণিশ্যামঃ সুবর্ণরুচিরাম্বরঃ।
> পাতু বঃ কমলাকান্তঃ সবিদ্যুদিব বারিদঃ।। তুঙ্গাতুঙ্গতমঃ
> স্তোমনাগোযূথমৃগাধিপঃ। মৌলিরত্নং মহেশস্য জয়তামৃতদীধিতি।।[৫]

ঈশানদেবের তাম্রশাসনে নবগীর্বাণেব নামোল্লেখ নেই। পরিবর্তে প্রোজ্জ্বলকীর্তি গোকুলদেব থেকে বংশলতিকা আরম্ভ হয়েছে। তাঁর পুত্র নারায়ণদেব, যিনি মন্দরগিরিতুল্য শস্ত্রভৃৎ ও সুন্দব আকৃতিবিশিষ্ট। নারায়ণদেব শৌর্যবান, সুজন, উন্নতশ্রী, প্রখ্যাতকীর্তি ও কলাবিদ্যানিপুণ। নারায়ণদেবেব পুত্র কেশবদেব, যিনি ‘রিপুরাজ-গোপীগোবিন্দ-বীবদ্রুমনাথসংজ্ঞঃ।’ তাঁরই পুত্র হচ্ছেন ঈশানদেব, যিনি ‘শ্রীমানভূন্নির্মলকীর্তিরাশিরীশানদেবঃ ক্ষিতিপালছত্রঃ।’ উক্ত তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, ঈশানদেবের পিতা কেশবদেব কংসারি কৃষ্ণের জন্য এক গগনচুম্বী মন্দির নির্মাণ করেন এবং তুলাপুরুষ দান করেন।

> “স মন্দিরং কংসনিসূদনস্য শিলাভিরুচ্চৈর্বিদধে মহৌজাঃ
> যত্তুঙ্গশৃঙ্গস্থিতচক্রধারাক্ষতাঃ ক্ষরন্ত্যম্বুঘনাদিবস্থাঃ।। তুলাপুরুষদানেস্য
> সংপ্রাপ্য দ্রবিণং দ্বিজাঃ। কল্পবৃক্ষা ইবা ভূবনন্ হেমালঙ্কাবভূষিতাঃ।।”[৬]

বর্ণানুসারে, কংসনিসূদন কৃষ্ণকে কেশবদেব যে শিলানির্মিত উচ্চ মন্দিব উৎসর্গ কবেন, তাব উত্তুঙ্গ চূড়াস্থিত চক্রের দ্বারা আকাশের মেঘরাশি বিক্ষত হয়ে বারিবর্ষণ কবে। আব কেশবদেব যে তুলাপুরুষ দানযজ্ঞ সম্পন্ন করেন, তাতে ব্রাহ্মণেরা প্রভূত দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হয়ে স্বর্ণালঙ্কৃত কল্পবৃক্ষের শোভা ধারণ করেন।

কেশবদেবের মতো ঈশানদেবও মধুকৈটভারি বিষ্ণুর জন্য একটি অভ্রস্পর্শী মন্দিব নির্মাণ করেন। সে মন্দিরের তুঙ্গশৃঙ্গে উড্ডীন পতাকা নভোমণ্ডলের কুসুমেব মতো শোভা পায। এবপর তাম্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ঈশানদেবের আক্ষপটলিক বা তথ্যবিবরণাদির রক্ষক হচ্ছেন বৈদ্যবংশপ্রদীপ বনমালিকর। ঈশানদেব প্রদত্ত দেবোত্তর দুই হল-পরিমিত ভূমির এই দানপত্র পুত্রহীন স্থবির রাজপুত্র এবং মৃত রাজপুত্রের কুলপালিকা পত্নী তথা শিশুপুত্র কর্তৃক অনুমোদিত। সমব-প্রবীর পৃতনাধিনাথ বীরদত্ত এই রাজাদেশ প্রচার করেন। এর লিপিকর হচ্ছেন দাসকুলাবতংস বিবেকী মাধব। এব রচনাকাল হচ্ছে সং ১৭ বৈশাখদিন ১।

> “এতস্য পৃথিবীভর্তুবাক্ষপটলিকঃ কৃতী। বৈদ্যবংশপ্রদীপঃ
> শ্রীবনমালিকরোভবৎ।। অস্য বিজ্ঞাপনাদ্ভূপঃ শাসনং
> কৃতবানয়ম্। রাজপুত্রো যঃ স্থবিরঃ পুত্রশূন্য স্বহস্ততঃ।।
> পাল্যং ভূহলদ্বযং সবাস্তঃস্য সবিশ্চিতঃ মৃতস্য বাজপুত্রস্য

পত্নী যা কুলপালিকা। শিশুশ্চ তনয়স্ত্রিষ্যা পাল্যমেব তয়োরপি ॥
আদেশিশকোভৃৎ সমরপ্রবীরঃ। শ্রীবীরদত্তঃ পৃতনাধিনাথঃ
দিগন্তসঙ্গাঙ্গীতমশঃ প্রশস্তিঃ প্রতাপ-ভানূর্জিত পশ্যরাশিঃ ॥

...

এতাং প্রশস্তিং বিদাধদধে বিবেকী শ্রীমাধবো দাসকুলাবতংসঃ।

...

সং ১৭ বৈশাখদিনে ১ ॥ ”[৭]

তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে যে, বৃদ্ধ, অপুত্রক রাজপুত্র স্বহস্তে মধুকৈটভারির মন্দিরের জন্য গৃহ ও জলাধার-যুক্ত দুই হল-পরিমিত ভূমি দান করেন। এই দান মৃত রাজপুত্রের বিধবা পত্নী, অর্থাৎ বৃদ্ধ ও অপুত্রক রাজপুত্রের মৃত ভ্রাতার বিধবা পত্নী ও তাঁর শিশুপুত্রের দ্বারা স্বীকৃত হয়। এখানে এ-জাতীয় উল্লেখের জন্য আমাদের ভ্রূকুঞ্চন অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, যিনি দাতা, তাঁকে স্থবির ও অপুত্রক রাজপুত্র বলা হচ্ছে কেন? কী তাঁর পরিচয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, রাজপ্রদত্ত ভূমিদান মৃত রাজপুত্রের বিধবা পত্নী ও তাঁর শিশুতনয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হতে যাবে কেন? ঈশানদেবের তাম্রশাসনে এ-সব প্রশ্নের উত্তর নেই। ‘হট্টনাথের পাঁচালী’ নামক একটি অর্বাচীন পুথিতে উক্ত সমস্যার সমাধানসূত্র হিসাবে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, রাজা কেশবদেবের তিন পত্নী ছিলেন। প্রথমা স্ত্রী সুনন্দা যাদবকেশব নামে একটি শিশুপুত্র রেখে অকালে মারা যান। কেশবদেব-কৃত কংসনিসূদনের মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী কমলার একটি শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই পুত্রের নাম রাখা হয় কংসনারায়ণ। কেশবদেবের তৃতীয়া স্ত্রী চন্দনা ছিলেন কোচ রাজকন্যা। চন্দনার পুত্রের নাম ঈশানদেব। দীর্ঘকাল রাজ্যশাসনের পর কেশবদেব তপস্বীর জীবন বেছে নিলে দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র কংসনারায়ণ রাজা হন। জ্যেষ্ঠা মহিষীর পুত্র যাদবকেশব তখন একে অপুত্রক, তদুপরি বৃদ্ধ। তাই তিনি সিংহাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। কংসনারায়ণ অল্পকাল রাজত্বের পর হস্তী শিকারে গিয়ে বন্য হস্তীর দ্বারা নিহত হন। কংসনারায়ণ তাঁর স্বল্প পরিসর রাজত্বকালে একটি দীঘি খনন করিয়ে ‘কমলাদীঘি’ নাম রেখে স্বর্গতা জননীর নামে উৎসর্গ করেন। কংসনারায়ণের মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী ছিলেন অন্তঃস্বত্ত্বা। পুত্রসন্তান হলে সে-ই হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু যদি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়, তবে কংসনারায়ণের বিধবা পত্নী কলাবতী রাজ্যশাসন করবেন। এই অবস্থায় কলাবতীর অনুমতি নিয়ে রাজ্যশাসন করেন ঈশানদেব।[৮]

উল্লিখিত কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করা কঠিন। তবে সম্ভবত এই অতিরিক্ত ও অনতিপ্রামাণিক তথ্যসূত্রের ওপর নির্ভর করেই কমলাকান্ত গুপ্ত পূর্বোক্ত প্রশ্নের মীমাংসায় অগ্রসর হয়ে মন্তব্য করেছেন, “These lands were previously given by the sonless infirm Prince (prob. the first son of Raja Govinda-Kesava and eldest brother of Isanadeva). The minor king (i.e. the minor son of the late king and grandson of Raja Govinda-Kesava by his second son) and also the queen-mother consented to it as their own gift.

Thus it may be inferred that Raja Isana (prob. the third son of Raja Govinda-Kesava) was simply discharging the royal functions on behalf of the boy king (who was his brother's son) during his minority. This was the reason while formally confirming the gift of only two halas of land (with no boundaries) he had to take the consent of the boy king and the queen-mother."[৯]

ভাটেরায় প্রাপ্ত দুটি তাম্রশাসন পাঠ করলে দেখা যায়, এগুলি শ্রীহট্টরাজ্যের স্থানীয় রাজাদের প্রদত্ত ভূমিদানপত্র। শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত অন্যান্য তাম্রশাসনগুলিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তাম্রশাসন দুটিতে একটি স্থানীয় রাজবংশের পাঁচ পুরুষের নাম জানা যায়। এই রাজবংশ মহাভারত-খ্যাত চন্দ্রবংশীয় বলে তাম্রশাসনে বলা হয়েছে। তাম্রশাসনোক্ত রাজবংশের বংশলতিকাটি হচ্ছে এ-রকম :

নবগীর্বাণ
|
গোকুলদেব / গোঙ্গুণদেব
|
নারায়ণদেব
|
কেশবদেব
|
ঈশানদেব

শকাব্দ বা অন্য কোনো প্রচলিত অব্দ তাম্রশাসনে উল্লিখিত না হওয়ায় উক্ত রাজবংশের কালনির্ধারণে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এবার আমরা সে আলোচনায় যেতে পারি।

॥ ২ ॥

কেশবদেবের তাম্রশাসনের শেষে কালনির্দেশক 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' উল্লিখিত হয়েছে। এটা পণ্ডিতমহলে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করেছে। কেননা, 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' অর্থে যুধিষ্ঠিরাব্দ ধরে নিলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, আমাদের দেশে আবিষ্কৃত শিলালিপি বা তাম্রলিপিতে খুব কম ক্ষেত্রেই কালনির্দেশ-সূত্রে যুধিষ্ঠিরাব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। খ্রিস্টোত্তরকালীন তাম্রলেখ ইত্যাদিতে গুপ্তাব্দ, শকাব্দ বা বিক্রম সংবৎসর ব্যবহৃত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেউ কেউ এমন কল্পনাও করেছেন যে, নবগীর্বাণের পূর্বপুরুষ জনৈক 'পাণ্ডু' হয়তো এই বংশের আদি রাজা

ছিলেন। পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ বলতে সেই রাজার অভিষেককালে প্রচলিত অব্দ নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ-জাতীয় অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। কেননা, 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' শব্দের পর ৪১৫৯ সংখ্যাটি উল্লিখিত হয়েছে। পাঠবিভ্রাট সত্ত্বেও সংখ্যাটি যে চার অঙ্কের এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুটি কথা আমাদের মানতেই হয়। প্রথমত, নবগীর্বাণের জনৈক পূর্বপুরুষ অন্ততপক্ষে হাজার বছর আগে রাজত্ব করেছেন এবং তাঁর নামে অব্দ (era) প্রচলিত হয়েছে, এটা নিতান্তই কষ্টকল্পনা। দ্বিতীয়ত, নবগীর্বাণ থেকেই তাম্রশাসনে বংশলতিকা দেখানো হয়েছে। সেখানে তাঁর কোনো পূর্বপুরুষকে টেনে আনা অযৌক্তিক। সুতবাং 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' অর্থে যুধিষ্ঠিরাব্দই বুঝতে হবে। এ-বকম প্রশ্ন আমাদেরকে বিব্রত করতে পাবে যে, শ্রীহট্টরাজ্যের বাংলাভাষী দেশীয় রাজা ঐতিহাসিক কালে প্রচারিত তাম্রশাসনে যুধিষ্ঠিরাব্দের উল্লেখ করতে গেলেন কেন? বিশেষত, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শকাব্দ তো সুপ্রচলিত ছিল। এ প্রশ্নের উত্তরে এটা বলা যায় যে, ঈশানদেব ও কেশবদেবের পূবপুরুষ নবগীর্বাণ সম্ভবত শ্রীহট্ট রাজ্যে বহিরাগত ছিলেন। এ-জাতীয় অনুমান কতটা সঙ্গত ও যুক্তিসহ, এ নিয়ে তর্ক হতে পারে। তার আগে তাম্রশাসন দুটির কালনির্ণযের চেষ্টা করা আবশ্যক।

যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলনের কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতান্তর আছে। এখানে সংক্ষেপে এ বিষযে প্রধান প্রধান মতগুলি উল্লিখিত হতে পারে।[১০]

১. 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের মতে, যুধিষ্ঠিবাব্দ ২৪১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে গণিত হতে শুরু হয়।

২. বরাহমিহিরের মতে, শকাব্দের সঙ্গে ২৫২৬ যোগ করলে যুধিষ্ঠিবাব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ২৪৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ হচ্ছে যুধিষ্ঠিরাব্দের সূচনাকাল।

৩. মহামহোপাধ্যায হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অভিমত অনুসারে, যুধিষ্ঠির কলিযুগেব আরম্ভে সিংহাসন আরোহণ করেন। সুতরাং যুধিষ্ঠিবাব্দের সূচনা-বর্ষ হচ্ছে ৩১০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

৪. 'পুরাণপ্রবেশ' গ্রন্থে গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছেন, ১৪১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে যুধিষ্ঠিবাব্দের সূচনাকাল বলে গণ্য করতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক পি. সি. সেনগুপ্তের অভিমত বরাহমিহিরের মতের কাছাকাছি বলে সেটা পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

যুধিষ্ঠিরাব্দের সূচনাকাল নিয়ে যখন এত মতান্তর, তখন সঙ্গতকারণেই ভাটেরা তাম্রশাসনের কালনির্ণয় একাধিক জটিল সমস্যার অবতারণা করেছে। সমস্যার জটিলতা আরো বেড়ে যায় যখন আমরা দেখি, তাম্রশাসনটির শেষে 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' শব্দের পরবর্তী চার অঙ্কের সংখ্যাটির পাঠ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। উক্ত চার অঙ্কের সংখ্যার পাঠোদ্ধার বিষয়ে পণ্ডিতমহলে প্রচলিত চারটি পৃথক অভিমত এখানে সংক্ষেপে উল্লিখিত হতে পারে।

কেশবদেবের তাম্রশাসনে 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' শব্দটির পরবর্তী সংখ্যাগুলি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে পাঠোদ্ধার কঠিন হয়ে পড়ে। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সংখ্যাগুলিকে ২৯২৮ রূপে পাঠ করেন। কিন্তু রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাঠ হচ্ছে ৪৩২৮। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের মতে, সংখ্যাগুলি হচ্ছে ২৩২৮।[১১] আবার কমলাকান্ত গুপ্ত নির্দেশিত পাঠ হচ্ছে ৪১৫৯।[১২]

শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর পাঠ গ্রহণ করলে যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্পর্কে উল্লিখিত চারটি মত অনুসরণ করে কেশবদেবের তাম্রশাসনের চারটি বিভিন্ন তারিখ আমরা পেতে পারি। এগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ৫১৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪৮০ খ্রিস্টাব্দ, ১৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ও ১৫১২ খ্রিস্টাব্দ।[১৩] এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটিকে এই যুক্তিতে গ্রহণ করা যায় না যে, তাম্রশাসনের লিপি এতটা দূরবর্তী কালের নয়। তাছাড়া তাম্রশাসনটিতে বাংলা ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটা কিছুতেই চর্যাগীতি রচনার পূর্ববর্তী কালের হতে পারে না। আর এটাকে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করার প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এই সময় শ্রীহট্ট বিজিত হয়েছে। এইকালে শ্রীহট্টে স্বাধীন হিন্দু রাজার অস্তিত্ব একান্তই কষ্টকল্পনা।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের পাঠ গ্রহণ করলে অনুরূপভাবে কেশবদেবের তাম্রশাসনের চারটি বিভিন্ন তারিখ পাওয়া যায়। এগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, ১২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, ৭৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ও ৯১২ খ্রিস্টাব্দ।[১৪] ৯১২ খ্রিস্টাব্দকে অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরাব্দের সূচনাকাল সম্পর্কে গিরীন্দ্রশেখর বসুর অভিমত মেনে নিলেই কেবল এই তারিখটা আমরা পেতে পারি। গিরীন্দ্রশেখরের অভিমত মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ বা বরাহমিহিরের দ্বারা সমর্থিত নয়। গিরীন্দ্রশেখরের অভিমত কেশবদেবের কালে শ্রীহট্ট রাজ্যে প্রচলিত থাকার কথা নয়। সুতরাং পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের পাঠ এবং তাঁর পাঠের ভিত্তিতে গিরীন্দ্রশেখর বসুকে অনুসরণ করে প্রাপ্ত তারিখ বাদ দিতে হয়।

মধ্যযুগের দেবনাগরী লিপিতে লেখা একটি তাম্রশাসনকে অকারণে খ্রি-পূ প্রথম শতকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাজমোহন নাথ মন্তব্য করেছেন, "So we are left with 85 B.C. as the only probable date of the first plate, and in that we support the reading of Vidyavinode and follow Rajatarangini."[১৫]

অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাঠের সঙ্গে কমলাকান্ত গুপ্তের পাঠের সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ের পাঠে ১৬৯ বৎসরের পার্থক্য দাঁড়ায়। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাঠভেদের উল্লেখ করে কমলাকান্ত গুপ্ত লিখেছেন, "Both the readings are doubtful and demand little or no consideration."[১৬] রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাঠ মেনে নিলে যুধিষ্ঠিরাব্দের সূচনাকাল বিষয়ে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অভিমত স্বীকার করতে হয়। এই মতে, যুধিষ্ঠিরাব্দের সূচনাকাল হচ্ছে ৩১০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সুতরাং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, কেশবদেবের তাম্রশাসনের কাল হচ্ছে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ। এই মতের বিরোধিতা করেছেন রাজমোহন নাথ ও বি. ভি. বিদ্যাবিনোদ এই যুক্তি দেখিয়ে যে, "Ghyas-uddin invaded

Sylhet in 1212 A.D. and the country was then known as Gaud; moreover, Sambat and Śakābdā were the common eras used throughout India at that time. It is inconceivable to think that a king of Śylhet could use an obsolete era commonly unknown at the time to give a touch of antiquity."[১৭]

এরপর আমাদের হাতে রইল কমলাকান্ত গুপ্তের অভিমত। তিনি তাম্রশাসনের চার অঙ্কের সংখ্যাকে ৪১৫৯ রূপে পাঠ করে কেশবদেবের তাম্রশাসনের কাল নির্ধারণ করেছেন ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দ।[১৮] যুধিষ্ঠিরাব্দের সূচনাকাল বিষয়ে তিনি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অভিমতই গ্রহণ করেছেন। তবে এ বিষয়ে 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের উক্তিকেও তিনি প্রমাণরূপে মেনেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় কেশবদেবের তাম্রপট্টোলীকে খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের এবং ঈশানদেবের তাম্রপট্টোলীকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৯] প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাজমোহন নাথ ১৯৪৩ সালে লিখিত একটি নিবন্ধে তাঁর পূর্বতন মত সংশোধন করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-নির্দেশিত ১২২৭ খ্রিস্টাব্দকেই কেশবদেবের তাম্রশাসনের কালরূপে গ্রহণ করেন। উক্ত প্রবন্ধের শেষে তিনি সংশয়হীন কণ্ঠে বলেন, "The date of the first Bhatera plate is, therefore, 1227 A.D."[২০]

কেশবদেবের তাম্রশাসনের কাল নিরূপণের প্রশ্নে কয়েকটি বিষয় মনে রাখলে সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া সহজতর হবে। বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত হতে পারে।

প্রথমত, 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' শব্দের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা থেকে বিরত থাকাই যুক্তিযুক্ত। কেননা, শব্দটি 'যুধিষ্ঠিরাব্দ' অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকলেও কল্যব্দ কিংবা যুধিষ্ঠিরাব্দ বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে পরস্পর-বিরোধী উক্তি দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, কালবাচক চার অঙ্কের সংখ্যাটি নিয়ে যখন পাঠভেদ প্রচলিত আছে, তখন আমরা লিপিবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে পারি। তাম্রশাসনটিতে যদি ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হত, তবে সহজেই এটাকে খ্রিস্টপূর্ব যুগে স্থাপন করার চেষ্টা করে যেত। কিন্তু তাম্রশাসনে প্রযুক্ত লিপিকে সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় নাগরীলিপি বলে গ্রহণ করা হলেও মধ্যযুগীয় বঙ্গলিপির ছাঁদও অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্টত দৃশ্যমান। সুতরাং লিপির বিচারে ভাটেরা তাম্রশাসন যে মধ্যযুগীয়, এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি।

তৃতীয়ত, ভাটেরা তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্থাননাম ও ব্যক্তিনাম তর্কাতীতভাবে নির্দেশ করে যে, উক্ত তাম্রশাসন দুটি অবশ্যই মধ্যযুগীয়। 'আমতলী' স্থাননামটিকে কিছুতেই প্রাচীন বলা যাবে না। অন্যদিকে 'গোবিন্দ', 'নিকুঞ্জ' প্রভৃতি ব্যক্তিনাম অবশ্যই বৈষ্ণবীয় প্রভাব-নির্দেশক। পালযুগ অস্তমিত হলে বঙ্গদেশ থেকে বৌদ্ধ প্রভাবও চলে যায়। এরপর কর্নাটক থেকে সেন রাজারা নিয়ে আসেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মসংস্কার এবং বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই

লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব ‘গীতগোবিন্দ’ রচনা করেন। জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর মাধ্যমে কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণলীলাগীতি শিষ্ট জনসভায় প্রচার লাভ করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ রচনার পরবর্তীকালে কোনো সময় ভাটেরা তাম্রশাসন প্রচারিত হয়ে থাকবে।

চতুর্থত, শাহ্ জালালের শ্রীহট্টে পদার্পণের পর শ্রীহট্ট রাজ্য বিজিত হয়। এটা কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি হলেও একে অনৈতিহাসিক বলা যায় না। সুতরাং ভাটেরা তাম্রশাসনের কাল নিরূপণে শাহ্জালালের শ্রীহট্টে পদার্পণের কালকেই নিম্নতম কালসীমা বলে গ্রহণ করা যায়। কেননা, শ্রীহট্টের হিন্দুরাজশক্তি অস্তমিত হলে জনৈক কেশবদেব ও ঈশানদেব যথাক্রমে কংসনিসূদন কৃষ্ণের ও মধুকৈটভারি বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করতে সাহসী হবেন, এটা কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া, কেশবদেব স্বাধীন রাজা ছিলেন ও রিপুকুলকে পরাজিত করেছিলেন। এটা কেবল শাহ্জালালের আগমনের পূর্বেই সম্ভব হতে পারে।

উল্লিখিত সূত্রগুচ্ছ ভাটেরা তাম্রশাসনের কাল নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।

এবারে পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের প্রেক্ষাপটে ভাটেরা তাম্রশাসনের কাল নিরূপণের সমস্যাকে দেখা যেতে পারে। ১৯৫৮ সালে শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার পশ্চিমভাগ গ্রামে মহারাজ শ্রীচন্দ্রের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। এটাকে ‘পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন’ বলা হয়ে থাকে।[২১] মহারাজ শ্রীচন্দ্রদেব ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তিনি তাঁর তাম্রশাসনে তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত শ্রীহট্ট মণ্ডল এবং শ্রীহট্ট মণ্ডলের অন্তর্গত চন্দ্রপুর বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। পাল রাজশক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন মহারাজ শ্রীচন্দ্রদেবের পূর্বপুরুষ বিহারের কোনো অঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গে এসে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সে রাজ্যের নাম ছিল হরিকেল। শ্রীচন্দ্র প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। শ্রীচন্দ্রের সমসাময়িক পাল বংশীয় রাজা হচ্ছেন রাজ্যপাল এবং দ্বিতীয় গোপাল।[২২] প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পালরাজ বংশের রাজগণের মধ্যে গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল, ধর্মপালের পুত্র দেবপাল। গোপালদেব ৭৮৫-৭৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজা নির্বাচিত হয়ে প্রায় ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। দেবপাল ৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে অনুমিত হয়।[২৩] দেবপালের পুত্র বিগ্রহপাল, তৎপুত্র নারায়ণপাল, তৎপুত্র রাজ্যপাল। এরপর রাজা হন দ্বিতীয় গোপাল। দ্বিতীয় গোপালের সমকালীন রাজা শ্রীচন্দ্রদেবকে তাই খ্রিস্টীয় দশম শতকে স্থাপন করাই সঙ্গত। কমলাকান্ত গুপ্ত তাই করেছেন। আর কেশবদেবের তাম্রশাসনকে খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে স্থাপন করেছেন। এখানে আমরা অনিবার্যত কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হই। শ্রীচন্দ্রদেবের পর যথাক্রমে কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করেন। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্বকাল খ্রিস্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে শ্রীহট্টমণ্ডল স্বাধীন রাজ্য ছিল না, ছিল তাঁদেরই রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত। কমলাকান্ত গুপ্তের অভিমত মেনে নিলে বলতে হয়, চন্দ্রবংশীয় রাজাদের তিরোধান ও ভাটেরা তাম্রশাসনোক্ত কেশবদেবের পূর্বপুরুষ নবগীর্বাণের অভ্যুদয়ের মধ্যে কোনো বিরতিকাল (interregnum) কল্পনা

করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু চন্দ্ররাজবংশের বিলয় ও ভাটেরা বা ভট্টপাটক রাজবংশের উদয়ের অন্তর্বর্তীকালীন অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত অধ্যায়ের কথা স্বীকার করে কমলাকান্ত গুপ্তকেও বলতে হয়েছে, "After the disintegration of the Chandra kingdom of Vikrampura (Rāmpāl) it cannot be definitely said under whom the lands of Śrihaṭṭamaṇḍala (the division of Śrihaṭṭa or Sylhet) and more particularly the lands of Chandrapura vishayas area went

Most probably major portion of the Chandrapura area was annexed to the neighbouring kingdom of Gauḍa (North Sylhet) and a small portion of it annexed to the other neighbouring kingdom of Tripurā (Tipperah)."[২৪] সুতরাং একটা মধ্যান্তর (interregnum) স্বীকার করতে আমরা বাধ্য হই। দ্বিতীয়ত, কমলাকান্ত গুপ্তের অনুসরণে কেশবদেবের তাম্রশাসনকে ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দে নিয়ে গেলে ঈশানদেবের তাম্রশাসনকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট করতে হয়। এটা মেনে নিলে বলতে হয়, পাল রাজত্বকালে ভাটেরার রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পালরাজত্বকালের অন্তিম লগ্নে কেশবদেবের তাম্রশাসন প্রচারিত হয়। সেনরাজত্বের প্রতিষ্ঠাকালেই ভাটেরা রাজবংশের শেষ রাজা ঈশানদেব তাঁর তাম্রশাসন প্রচার করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, পালবংশীয় রাজা নয়পাল ২০ বৎসর রাজত্ব করে ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তারপর রাজা হন নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল। তাঁর সময় থেকে পালরাজবংশের অধঃপতন সূচিত হয়। তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল।[২৫] প্রসঙ্গত উল্লিখিত হতে পারে, সেনরাজবংশের বিজয়সেনের রাজ্যাভিষেককাল হচ্ছে আনুমানিক ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেককাল হচ্ছে আনুমানিক ১১৫৯ এবং ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দ।[২৬] কমলাকান্ত গুপ্তের অভিমত ও কালনির্দেশ গ্রহণ করলে আমরা মানতে বাধ্য হই যে, সেনরাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বেই পালযুগে শ্রীহট্টে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ভাটেরার রাজারা এবং কেশবদেব ও ঈশানদেব যথাক্রমে কংসনিসূদন ও মধুকৈটভারির অভ্রংলিহ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ সেন আমলের আগেই, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের বঙ্গদেশ শাসনকালে শ্রীহট্টে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় ও কংসারি কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত হয়। এটা যে একান্তই কষ্টকল্পিত, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বরং এই সম্ভাবনাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয়ের পর এবং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচনার পর শ্রীহট্টে বৈষ্ণবীয় প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ভাটেরা রাজবংশের রাজাদের নামগুলি বিশেষভাবেই রাজপরিবারের পরম্পরাগত বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। নবগীর্বাণ, গোকুলদেব, নারায়ণদেব, কেশবদেব প্রভৃতি নামগুলি তার প্রমাণ।

এটা সুবিদিত যে, শ্রীহট্টে শাহ্ জালালের আগমনের পরই শ্রীহট্টের হিন্দু রাজশক্তির পতন ঘটে। শাহ্ জালালের শ্রীহট্টে আগমনের কাল বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। আপাতত, শাহ্

জালালের শ্রীহট্টে আগমনকালকে ভাটেরা তাম্রশাসনের নিম্নতম কালসীমারূপে গ্রহণ করা যায়। আর এর ঊর্ধ্বতম কালসীমা হচ্ছে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবেব 'গীতগোবিন্দ' রচনাকাল তথা বখতিয়ার খিলজির বঙ্গদেশ আক্রমণকাল। এই আক্রমণে বিপর্যস্ত ও পরাজিত হিন্দু সামন্তশক্তি বঙ্গদেশের প্রান্তভাগে পালিয়ে গিয়ে নূতন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। এ কথা বলার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, ভাটেরা রাজবংশ শ্রীহট্ট অঞ্চলে বহিরাগত। কেশবদেবের ত্রিভাষিক তাম্রশাসন ও 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' উল্লেখের মাধ্যমে কাল উল্লেখের চেষ্টা থেকেও এই অনুমান দৃঢ়তব হয়। কিন্তু সে প্রশ্নে যাওয়ার আগে কালনির্দেশের আলোচনায় ছেদ টানতে হয়। শাহ্ জালালের শ্রীহট্টে আগমনকালে শ্রীহট্টেব হিন্দু রাজা ছিলেন গৌড়গোবিন্দ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভাটেরা তাম্রশাসনেব কেশবদেবকে গৌড়গোবিন্দের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে তাঁকে 'গোবিন্দ-কেশব' বলে নামাঙ্কিত করেন। রাজেন্দ্রলালের প্রভাবে নীহাবরঞ্জন রায় থেকে কমলাকান্ত গুপ্ত অবধি প্রভাবিত হন। কিন্তু এই মত যে ভ্রমাত্মক, তা প্রমাণিত হয়েছে। কেশবদেবকে গোবিন্দকেশব নামকরণেব কারণ হচ্ছে এই, ঈশানদেবের তাম্রশাসনে তাঁকে 'গোপীগোবিন্দ' ও 'বীরদ্রুমনাথসংজ্ঞ' বলা হযেছে। এগুলি তাঁর উপাধি হতে পারে। কিন্তু তা বলে তাঁকে 'গোবিন্দকেশব' নামকরণের কাবণ থাকতে পাবে না। তাই দেখতে পাই, উমেশচন্দ্র প্রসঙ্গটি উল্লেখ কবে লিখেছেন, "The whole question appears to us to hinge on a mistaken identification and also perhaps an unwarranted word-interpretation."[২৭]

সাধাবণত, 'সুহৈল-ই-য়মন' নামক গ্রন্থের বিবরণ অনুসরণ কবে পীর শাহ্ জালালেব শ্রীহট্ট বিজয়ের তারিখ ধরা হয় ৭৮৬ হিজবা বা ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দ।[২৮] এই মত যে অনৈতিহাসিক, তা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, ১৪৮০-৮২ খ্রিস্টাব্দেব মধ্যে সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের পুত্র সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে গৌড়গোবিন্দ (বা গৌরগোবিন্দ) পবাজিত হন এবং শ্রীহট্টের হিন্দু বাজশক্তির পতন হয়।[২৯] অন্য কারণেও এই মত সঙ্গত বলে মনে হয়। এর কাছাকাছি সময়ে জগন্নাথ মিশ্র সপরিবারে শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ ছেড়ে নবদ্বীপে চলে যান। সম্ভবত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবই এর কারণ। ১৪৮০-৮২ খ্রিস্টাব্দের কয়েক বছর পর, ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে চৈতন্যদেবেব জন্ম হয়।

১৪৮০-৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যদি শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা গৌড়গোবিন্দ পরাজিত হন এবং উক্ত গৌড়গোবিন্দ আর কেশবদেব যদি ভিন্ন ব্যক্তি হন, তবে এই সময়ের আগেই ভাটেরা তাম্রশাসনের কাল বলে ধারণা করা যায়। কমলাকান্তের কালনিরূপণ মেনে নিলে কী ধরনের অসঙ্গতি দেখা দেয়, তা দেখানো হয়েছে। বাজেন্দ্রলাল মিত্রের নির্ধারিত ১২২৭ খ্রিস্টাব্দকে সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, খ্রিস্টীয় ১২শ শতকের শেষার্ধে নবগীর্বাণ শ্রীহট্টরাজ্যের রাজা হন। কেশবদেব ১৩শ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর তাম্রশাসন প্রচার করেন।

ভাটেরা রাজবংশের রাজাদের জাতিগত বা বংশগত পরিচয় জানা যায় না। এ সম্পর্কে অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির মন্তব্য প্রণিধেয়। তিনি লিখেছেন, "যে কোন স্থানের যে কোন বংশীয় রাজগণ যথায় তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন, তৎস্থলেই তাম্রশাসনে তাঁহাদের নামে দেবোপাধি থাকা দৃষ্ট হয়, সে দেবোপাধি জাতিবাচক বোধ হয় না। এইরূপ গৌড়ের পালবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনেও দেবোপাধি গৃহীত হইয়াছে।"[৩০] ভাটেরা তাম্রশাসনে নবগীর্বাণের বংশধরগণ নিজেদের চন্দ্রবংশীয় বলে দাবি করেছেন। 'হট্টনাথের পাঁচালী' নামক অর্বাচীন পুথিতেও এ-জাতীয় দাবি করা হয়েছে। এ সকল দাবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজবংশের কৌলীন্য-খ্যাপক। 'হট্টনাথের পাঁচালী' পুথিতে বর্ণিত ভাটেরা রাজবংশের বিবরণ সম্ভবত জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই রচিত। তবে এর মধ্যে কম-বেশি ঐতিহাসিক সত্য থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। উক্ত পুথির বিবরণ অনুসারে, কামরূপে যখন শালস্তম্ভ বংশীয় শেষ রাজা ত্যাগ সিংহ রাজত্ব করেন, তখন জয়ন্তীয়া রাজ্য ঊর্মিরাণীর শাসনাধীন। জয়ন্তীয়ায় কামরূপ রাজ্যের প্রতিনিধি কৃষক ঊর্মিরাণীর কন্যা উর্বরাকে বিবাহ করে। ত্যাগ সিংহের রাজত্বকালেই কামরূপ রাজ্য ভেঙে পড়লে জয়ন্তীয়া স্বাধীনতা লাভ করে। জয়ন্তীয়ায় মাতৃশাসনতন্ত্র শেষ হয়। কৃষক হয় জয়ন্তীয়ার রাজা। পুথির মতে, কৃষক মহাভারতের পরীক্ষিতের বংশের অধস্তন পুরুষ। কৃষকের পর রাজা হন হাটক, তারপর গুহক। গুহকের তিন পুত্র গুড়ক, লড়ুক ও জয়ন্ত রাজা হলে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যের নাম হয় যথাক্রমে গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়া। গুহক তাঁর সন্ন্যাসিনী কন্যা শীলার নামে একটি গঞ্জ স্থাপন করে তার নাম রাখেন শীলা-হাট। এটাই সিলাট বা সিলেট (Sylhet) নামের উৎস। তাঁর অপর কন্যা চট্টলা নির্বাসিতা হন। গুড়কের পর রাজা হন তাঁর পুত্র শ্রীহস্ত, যিনি ত্রিপুরার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং প্রয়াগের অক্ষয়বট মন্দির থেকে বটেশ্বর শিবলিঙ্গ এনে শীলাহাটে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীহস্তের পুত্র কীর্তিপালের পর রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। এরপর কয়েক পুরুষের বংশ-বিবরণ পাওয়া যায় না। বিভ্রবন্তদেব রাজা হলে রাজ্যে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। তাঁর পুত্রের নাম অনন্তদেব, যার অপর নাম নবগীর্বাণ ও নবগীর্বান্তদেব।[৩১] কেশবদেবের তাম্রশাসনে নবগীর্বাণ থেকেই রাজবংশের আরম্ভ দেখানো হয়েছে।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে মনে হয়, হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবাধীন একটি ইন্দো-মোঙ্গোলীয় রাজবংশ মধ্যযুগে শ্রীহট্টে কিছুকাল রাজত্ব করে। এঁরা পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনোক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণের পরবর্তী হওয়াই সম্ভব। কীর্তিপাল সম্ভবত এই ইন্দো-মোঙ্গোলীয় রাজবংশের শেষ রাজা। এরপর বিভ্রবন্তদেব থেকেই ভাটেরা রাজবংশের শাসনকাল শুরু হয়। চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা শ্রীচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ছিলেন বিহার প্রদেশের রোহিতগিরি বা রোটাসগড় অঞ্চলের শাসক। পরবর্তী রাজবংশের আদিপুরুষ কৃষক সম্পর্কে 'হট্টনাথের পাঁচালী' পুথিতে বলা হয়েছে যে, কৃষকের পূর্বপুরুষ মহাভারতোক্ত পরীক্ষিত ও হিমালয় অঞ্চলের এক গন্ধর্বকুমারীর সন্তান।[৩২] সুতরাং শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই রাজবংশও বহিরাগত। শ্রীহট্টে বৌদ্ধ প্রভাবের সূচনা

হয় চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মাধ্যমে। ইন্দো-মোঙ্গোলীয় রাজবংশ নিয়ে আসে শৈব ধর্ম। আর বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যের সূত্রপাত হয় ভাটেরার রাজকুলের মাধ্যমে। ভাটেরার রাজবংশকেও বহিরাগত ভেবে নেওয়াই সঙ্গত। এটা অনুমান হলেও যুক্তি-শাসিত অনুমান। কেশবদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্থাননাম ও নদীনাম বিশ্লেষণ করে কমলাকান্ত গুপ্ত কেশবদেবের বাজ্যের সীমা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "Govinda Keśava's rule extended also over the southern part of the district of Śylhet, south of the river Kuśiyārā, portions of Cachar District (including Karimganj Sub-division) and possibly portions of Tripura also."[৩৩]

ভাটেরা তাম্রশাসনে 'শ্রীহট্টনাথ' শিবের উল্লেখ আছে। শ্রীহট্টে শৈব ধর্ম সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। এককালে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার এ কথা প্রমাণ কবার চেষ্টা কবেন যে, ভাস্কর বর্মাব নিধনপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত ব্রাহ্মণেরা সুদূব গুজরাত থেকে আগত নাগর ব্রাহ্মণ, যাঁদের আরাধ্য দেবতা ছিলেন হটকেশ্বব শিব। এই মত অযৌক্তিক নয়। ভাটেরা তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্থাননামের মধ্যে 'হট্ট' শব্দ লক্ষ কবে অমবনাথ রায় অনুমান করেছেন যে, ভাস্কব বর্মার আমলের নাগর ব্রাহ্মণেরা কেশবদেবের কালে শ্রীহট্টে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।[৩৪] কেশবদেবের তাম্রশাসনের অজ্ঞাত ও অদ্যাবধি অপঠিত ভাষার রচনাংশ ব্যাখ্যা করে কমলাকান্ত গুপ্ত বলেছেন যে, উক্ত পঙ্ক্তি ওড়িয়া ভাষা ও স্থানীয় উপভাষায় রচিত।[৩৫] খ্রিস্টীয় ১৩শ শতকে বাংলা উপভাষা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে বলে প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং শ্রীহট্টের আঞ্চলিক উপাভাষার উপস্থিতি এক্ষেত্রে একান্তই কষ্টকল্পনা। ওড়িয়া ভাষায় যদি কেশবদেবেব তাম্রশাসনেব অপঠিত পঙক্তিটি রচিত হয়ে থাকে, তবে সেকালে শ্রীহট্টবাজ্যে ওডিয়া ব্রাহ্মণের আগমন ও উপনিবেশ কল্পনা করা যেতে পারে। চৈতন্যদেবেব পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার মাজপুর থেকে শ্রীহট্টে এসে বসতি স্থাপন করেন বলে জানা যায়। শাসককুলের আমন্ত্রণে মধ্যযুগে গুজবাতের নাগর ব্রাহ্মণ, বিহারের মৈথিল ব্রাহ্মণ এবং উড়িষ্যার ব্রাহ্মণসমাজ শ্রীহট্টে এসে বসতি স্থাপন করেন, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য যে, মধ্যযুগের রাজনৈতিক পালাবদল ও অস্থিবতায় বিপর্যস্ত রাজন্যবর্গ তথা সামন্তগণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসে শ্রীহট্টে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। ঈশানদেব ও কেশবদেবের পূর্বপুরুষও হয়তো এমনি করে শ্রীহট্টে পদার্পণ করেছিলেন একদিন। কেশবদেবের ত্রিভাষিক তাম্রশাসনে বাংলা ভাষার আড়ষ্ট উপস্থিতি ভাটেরা রাজবংশের অঙ্কুরিত বাঙালি জাতিসত্তাকে যে তুলে ধরে, এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

সূত্রনির্দেশ

১. JRASB, Vol.-VI, 1940, p.-73

২. Ibid., p.-74

৩. Kamalakanta Gupta, Copper-plates of Sylhet, Sylhet, 1967, pp. 157-163

৪. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.-১৮৮

৫. Gupta, Op. cit., pp. 184-187

৬. Ibid.

৭. Ibid., pp. 186, 188

৮. R. M. Nath, Chronology of the Kings of the Bhatera Copper Plates, The Journal of the Assam Research Society, Gauhati, Vol. X., Jan-April, 1943, pp. 9-10 .

৯. Gupta, op. cit., p.-195

১০. R M. Nath and B. D. Vidyavinode, Dates of the Bhatera Plates, The Journal of the Assam Research Society, Gauhati, Vol. V., January, 1938, pp. 96-97.

১১. JARS., January, 1938, p.-94

১২. Gupta, op. cit., p.-194

১৩. JARS., January, 1938, p.-97

১৪. Ibid.

১৫. Ibid., p.-98

১৬. Gupta, op. cit., p.-193 n.2

১৭. JARS., January, 1938, p.-97

১৮. Gupta., op. cit., pp. 193-194

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩, ১৩৬, ২২৮

২০. JARS., Jan-April, 1943, p.-13

২১. Gupta., op. cit., p.-81

২২. Ibid., pp. 127-130

২৩. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড), নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১৪৯, ১৫০, ১৮৪

২৪. Gupta., op. cit., pp. 151-152

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫-২২৮

২৬. তদেব, পৃ. ২৮০ পাদটীকা

২৭. JRASB., Vol. VI, 1940, p. 77

২৮. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড), পৃ. ১৭০

২৯. JRASB., New Series, Vol XVI, 1920, pp. 86-87

৩০. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (উত্তরাংশ), ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, শিলচর, পৃ.- ৩৩৪

৩১. JARS., Jan April, 1943, pp. 6-8

৩২. Ibid., p. 6

৩৩. Gupta, op cit., p.-198

৩৪. Amarnath Ray, The Bhatera Copper Plates, Journal of the Assam Research Society, Vol. IV , July, 1938, pp 33-34

৩৫. Gupta, op cit., p. 202

ইতিহাসের আলোকে শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত বিষ্ণু (ত্রিবিক্রম) মূর্ত্তি

শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত

প্রাচীন শ্রীহট্ট বা গৌড় রাজধানীর অগ্নিকোণে (পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে) হিন্দুয়ানীরপার নামক মহল্লায় দেউলবাড়ী নামক অনুচ্চ টিলার লগ্ন পশ্চিমে হিন্দুরাজাদের আমলের একটী প্রাচীন দীঘি বর্ত্তমান। ঐ দীঘি 'রাজার দীঘি' নামে আখ্যায়িত। বাংলা 'দেউল' শব্দ সংস্কৃত 'দেবকুল' (মন্দির) শব্দ হইতে উদ্ভূত। সেভাবে 'দেউলবাড়ী' বলিতে মন্দিরবাড়ী বুঝায়। ঐ মহল্লার অংশবিশেষ 'তেররতন' নামে অদ্যাপি চিহ্নিত। খুব সম্ভব ত্রয়োদশ বা তেরটী রত্নবিশিষ্ট কোন মন্দিরের অবস্থানই ঐ নামের আদি কারণ। পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশরত্ন, সপ্তদশরত্ন, একবিংশতিরত্ন ইত্যাদি শ্রেণীর মন্দিরে যথাক্রমে মন্দিরের উপরের দিকে (শিখরাংশে) পঞ্চ বা পাঁচ (৪×১+১), নব বা নয় (৪×২+১), ত্রয়োদশ বা তের (৪×৩+১), সপ্তদশ বা সতর (৪×৪+১) ও একবিংশতি বা একুশটী (৪×৫+১) মন্দির চূড়ার (রত্নের) সমন্বয়ে গঠিত মন্দির বুঝায়। এই প্রকার মন্দিরের মধ্যস্থলের বা কেন্দ্রের সর্ব্বোচ্চ মন্দির চূড়ার চতুর্দ্দিকে চারিটী, আটটী, বারটী, ষোলটী বা বিশটী সমকেন্দ্রিক এক বা একাধিক তলে বিভিন্ন বেষ্টনীতে, সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতার মন্দির চূড়া সকল দৃষ্ট হয়। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ বিক্রমপুরের (বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলায়) রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ নির্মিত বিখ্যাত একবিংশতি রত্ন বা একুশরতন নামক ৺লক্ষ্মীনারায়ণমন্দিরের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ঐ একুশরতন মন্দির পরবর্ত্তীকালে প্রমত্তা পদ্মানদীর কবালগ্রাসে বিলীন হইলে সেখানে পদ্মা 'কীর্ত্তিনাশা' নাম ধারণ করে।

ইদানীং কালে শ্রীহট্ট সহরের উপকণ্ঠে পূর্ব্বদিকে, নির্ম্মাণাধীন 'শাহজালাল উপশহরে' মাটি ভরাটকার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকেরা পার্শ্ববর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মজা 'রাজার দীঘি' হইতে মাটি উঠাইতে গিয়া মাটি কাটিতে কাটিতে দীঘির পাড় হইতে অন্যূন ২৫/৩০ হাত গভীরে দীঘির গর্ভে পূর্ব্বপারের কাছাকাছি স্থানে চিত (সামনের দিক উপরে ও পিছন দিক নীচে) অবস্থায় বিগত ১৯৭৮ খ্রীঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিভিন্ন অলঙ্করণ যুক্ত নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি সমন্বিত একটী বিরাট প্রস্তরের কাঠাম আবিষ্কার করে। এই সময়ে দীঘির পূর্ব্বপাড়ে অবস্থিত পতিত দেউলবাড়ীতে প্রস্তর ও পুরাতন ইটের ধ্বংসাবশেষ হইতে অনেক পুরাতন ইট, প্রস্তর, প্রস্তরের জিনিষের অংশবিশেষ, পোড়ামাটীর প্রদীপ ও দীঘির উত্তরপাড়ে একটি প্রশস্ত পুরাতন ঘাটের ধ্বংসাবশেষ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় আবিষ্কার স্থল হইতে এই সুবৃহৎ কাঠামটী উদ্ধার করা হয় এবং সিলেটের জিলা প্রশাসকের সাবেক আপিসের উত্তবে খোলা প্রাঙ্গণে রাখা হয়। তথায় বেশ কিছুকাল থাকার পর স্থানীয় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকের চেষ্টায় আবশ্যকীয় সংস্কার (মেরামত) সাধনক্রমে অঙ্গরাগাদি করিয়া শ্রীহট্ট সহরের মীরাবাজার মহল্লায় শ্রীশ্রীবলরাম জিউর আখড়ায় বিগত ১৯৮১ খ্রীঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সযত্নে রক্ষিত আছেন।

পূর্ব্বোক্ত কাঠামোব মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রধান মূর্ত্তিটী শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধাবী চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তির দুইটী হস্ত ও আংশিকভাবে মাথার মুকুট কোদালেব আঘাতে কর্ত্তিত বা বিনষ্ট। বিষ্ণুমূর্ত্তির বাম পার্শ্বে অবস্থিত সরস্বতী মূর্ত্তির বক্ষস্থল আংশিকভাবে ও বীণা প্রায় সম্পূর্ণভাবে এবং বিষ্ণু মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত লক্ষ্মী মূর্ত্তিব দক্ষিণ হস্ত, কোদালের আঘাতে অল্প কর্ত্তিত। কাঠামের অন্যান্য স্থানে কোদালেব আঘাতে বা ঐ গুরুভাব বিবাট প্রস্তব কাঠামটী দীঘির গর্ভ হইতে উদ্ধার করার সময় যে সকল অল্প পবিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

সিদ্ধান্তসংহিতার সূত্র অনুসাবে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির পৃথক পৃথক হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এই চারিটী বস্তু পৃথক পৃথক ভাবে থাকে। তবে এই চারিটী বস্তু বিভিন্ন ব্যূহে বা বিন্যাসে (arrangement) থাকিতে পারে। ঐ চারিটী বস্তু বিভিন্ন হস্ত পবিবর্ত্তনে মোট চব্বিশটী ব্যূহ বা বিন্যাস হয়। এই প্রকার প্রত্যেক ব্যূহে বা বিন্যাসে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি এক একটী পৃথক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ ব্যূহ বা বিন্যাসের ক্রম বিষ্ণুমূর্ত্তিব দক্ষিণের নিম্নহস্ত, তৎপব দক্ষিণের ঊর্দ্ধহস্ত তৎপর বামের ঊর্দ্ধহস্ত তৎপর বামের নিম্নহস্ত অনুসারে কবিতে হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে দক্ষিণের নিম্নহস্ত হইতে আবম্ভ কবিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে (clockwise direction) বামের নিম্নহস্ত পর্য্যন্ত ঐ ক্রম গণনাব রীতি। নিম্নে কথিত চব্বিশটী বিন্যাস ও প্রত্যেক বিন্যাস অনুযায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেবতার নামের বর্ণনা দেওয়া গেল।

১। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম (শ্রীবামন),
২। শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদা (শ্রীহরি)
৩। শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম (শ্রীউপেন্দ্র),
৪। শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র (বিষ্ণু)
৫। শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা (পদ্মনাভ),
৬। শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্র (নাবায়ণ)
৭। চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম (প্রদ্যুম্ন),
৮। চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-গদা (মধুসূদন)
৯। চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্ম (অনিরুদ্ধ),
১০। চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ (শ্রীগোবিন্দ)
১১। চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদা (পুরুষোত্তম),
১২। চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খ (নরসিংহ)
১৩। গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্ম (বাসুদেব),
১৪। গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্র (সঙ্কর্ষণ)
১৫। গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্ম (শ্রীমাধব),
১৬। গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খ (হৃষীকেশ)
১৭। গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্র (শ্রীকৃষ্ণ),
১৮। গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খ (অচ্যুত)
১৯। পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা (শ্রীকেশব),
২০। পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র (দামোদর)

২১। পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদা (জনার্দ্দন),
২২। পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ (শ্রীধর)
২৩। পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্র (অধোক্ষজ)
২৪। পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খ (ত্রিবিক্রম)

বর্ণিত চব্বিশ প্রকার মূর্ত্তি সকল মধ্যে আলোচ্য মূর্ত্তিটীতে— "পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খ" ক্রমবিন্যাস থাকায় ইহা 'ত্রিবিক্রম' নামধেয় বিষ্ণু মূর্ত্তি। 'ত্রিবিক্রম' অর্থাৎ তিনটী পদ বিন্যাস (যাহা ৺বিষ্ণুর বামন অবতারে দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা কালে ঘটিয়াছিল)।

আলোচ্য ত্রিবিক্রম বিষ্ণু মূর্ত্তি ও অন্যান্য সহকারী মূর্ত্তিগুলি একটি বৃহদাকার স্থানীয় বেলে পাথর (Sandstone) খণ্ড কর্ত্তন ক্রমে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ঐ কাঠামের উচ্চতা প্রায় ৬' ছয় ফুট, প্রস্থ প্রায় ৩' ১০" তিন ফুট দশ ইঞ্চি, স্থূলতা বা বেধ (Thickness) উপরিভাগে ৩" তিন ইঞ্চি এবং সর্ব্বনিম্নভাগে প্রায় ১' ৬" এক ফুট ছয় ইঞ্চিব মত এবং মধ্যাংশে অর্থাৎ বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী মূর্ত্তির পশ্চাতে ইহাব অংশ প্রায় ৪" চারি ইঞ্চি বেধ বিশিষ্ট। কাঠামের ওজন আনুমানিক ৬০/৭০ মণ হইবে।

কাঠামেব মধ্যস্থলে অবস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তির মস্তকের মুকুটের উপরদিকে অর্থাৎ কাঠামের (Stele) শীর্ষে, মধ্যস্থলে "কীর্ত্তিমুখ।" ইহা একটী মুখব্যাদানরত কুপিত সিংহের মুখ। ঐ "কীর্ত্তিমুখ" অবয়ব অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তিব কাঠামের শীর্ষদেশে দেখা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ বাজাদেব অনেক তাম্রশাসনেও কীর্ত্তিমুখ দৃষ্ট হয়। ইহা সম্ভবত বিঘ্নবিনাশনের একটি প্রতীক। ঐ কীর্ত্তিমুখের দুই পার্শ্বে তির্য্যক্‌ভাবে উড়ন্ত অবস্থায় সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া দুইটী সুন্দব বিদ্যাধর মূর্ত্তি। বিদ্যাধরদ্বয়ের আকার, গঠনশৈলী, পবিমাপ, পরিধানবস্ত্র, অলঙ্কারাদি একই প্রকাবেব। মনে হয় তাঁহাবা বিষ্ণু বিগ্রহের উপর পুষ্পবর্ষণবত।

কাঠামের মধ্যস্থলে বিষ্ণু মূর্ত্তির পশ্চাৎপটে উর্ধ্বাংশে কারুকার্য খচিত প্রভাবলী। ঐ প্রভাবলীর উর্ধ্বাংশে মধ্যস্থলের আকার অনেকটা নিম্নমুখী অধিবৃত্তাংশের (Parabolical) মত এবং ইহার ঈষৎ নিম্নে উভয় পার্শ্বে দুইটী সমপরিমাপের নিম্নমুখী অধিবৃত্তাংশের আকারে রচিত। ঐ প্রভাবলীর উচ্চতা প্রায় ৪' ৯" চারি ফুট নয় ইঞ্চি। প্রভাবলীর সম্মুখে বিষ্ণু (ত্রিবিক্রম) মূর্ত্তি একটি বৃহৎ বিশ্বপদ্মের (কেবলমাত্র দুই সারি পাপড়ি সমন্বিত পদ্ম— যাহার উপরের সারির পাপড়িগুলি উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নের সাবির পাপড়িগুলি নিম্নমুখী) উপর সমপাদস্থানক ভঙ্গিতে সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া ঋজুভাবে দণ্ডায়মান। ঐ মূর্ত্তির উচ্চতা ৩' ১০" তিন ফুট দশ ইঞ্চি, মুকুটসহ ৪' ৭" চারি ফুট সাত ইঞ্চি।

বিষ্ণু মূর্ত্তির দক্ষিণের নিম্নহস্তে পদ্ম (ভগ্ন হওয়াব কাবণে নবনির্ম্মিত), দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্তে গদা (কৌমোদকী), বামের উর্ধ্বহস্তে চক্র (সুদর্শন), বামের নিম্নহস্তে শঙ্খ (পাঞ্চজন্য— ভগ্ন হওয়ার কারণে নবনির্ম্মিত)। বিষ্ণু মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট মুকুট (Conical crown), কর্ণদ্বয়ে কারুকার্য্য খচিত কুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর, বক্ষে মণিময়হার— মধ্যস্থলে কৌস্তুভমণি শোভিত। গলায় জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত বৈজয়ন্ত মালা (৺বিষ্ণুর নানাবর্ণের পুষ্পখচিত জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত

মালাকে 'বৈজয়ন্তমালা' বলে)। ঐ মনোহর বিগ্রহের হস্তে, পদে নানা অলঙ্কার, কটিদেশে চন্দ্রহার। পরিধানে বস্ত্র ও বাম স্কন্ধে স্থাপিত প্রলম্বিত যজ্ঞোপবীত।

বিষ্ণু মূর্ত্তির পদনিম্নস্থ পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ বিশ্বপদ্মের দুই পার্শ্বে একই সমতলে (level) অপর দুইটী সমপরিমাপের অপেক্ষাকৃত ছোট বিশ্বপদ্ম। দক্ষিণের বিশ্বপদ্মের উপরে কিঞ্চিৎ অগ্রগামী দক্ষিণপদ এবং দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ বক্র কটিদেশ, দ্বিভঙ্গ অবস্থায সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া দণ্ডায়মান সুন্দর লক্ষ্মী মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তির উচ্চতা প্রায় ২' দুই ফুট। মুকুটসহ ২' ৫" দুই ফুট পাঁচ ইঞ্চি। ঐ মূর্ত্তির পশ্চাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাপের প্রভাবলী।

লক্ষ্মী মূর্ত্তির দক্ষিণহস্ত নিজ দক্ষিণ স্তনেব উপর স্থাপিত অবস্থায় কোন কিছু (ক্ষয়জনিত কারণে অস্পষ্ট) ধারণরত। স্বাভাবিকভাবে ঝুলন্ত বামহস্তের বদ্ধ মুষ্টিতে নিম্ন হইতে উত্থিত পদ্মপত্র, পদ্মকলি ও প্রস্ফুটিত ঊর্ধ্বমুখী পদ্মের নালত্রয় বা তিনটী ডাঁটা একত্রে ধৃত।

ঐ লক্ষ্মীমূর্ত্তির দক্ষিণে মূল কাঠামেব কিছুটা বর্দ্ধিত অংশে একটী ছোট বিশ্বপদ্মের উপর দণ্ডায়মান সম্ভবত লক্ষ্মী দেবীব সহচবীর একটী চমৎকাব মূর্ত্তি। ঐ নাবী মূর্ত্তি উচ্চতায় ১' এক ফুট এবং মুকুটসহ ১' ২" এক ফুট দুই ইঞ্চি। ঐ মূর্ত্তিটী লক্ষ্মী মূর্ত্তির মতই দক্ষিণ পদেব অগ্রগামী পদবিন্যাসযুক্ত ও কটিদেশ দক্ষিণে ঈষৎ হেলান অবস্থায়। ঐ মূর্ত্তির দক্ষিণ বাহু কিছুটা উত্থিত এবং দক্ষিণ কনুই হইতে দক্ষিণহস্ত ঊর্ধ্বমুখী। ঐ ঊর্ধ্বমুখী হস্তে একটী পেটিকা বা ঝাঁপি। সম্ভবত ঐ পেটিকাটী লক্ষ্মীর পেটিকা। ঐ মূর্ত্তিব বাম হস্তে স্বাভাবিক ঝুলন্ত অবস্থায় একটী চামর ধৃত।

বিষ্ণু মূর্ত্তিব পদনিম্নস্থ পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ বিশ্বপদ্মের বামে একটী অপেক্ষাকৃত ছোট বিশ্বপদ্মের উপরে কিঞ্চিৎ অগ্রগামী বামপদ এবং বামদিকে কিঞ্চিৎ বক্র কটিদেশ, দ্বিভঙ্গ অবস্থায় সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া দণ্ডায়মান সুন্দর সরস্বতী মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তির উচ্চতা প্রায় ২' দুই ফুট। মুকুট সহ ২' ৫" দুই ফুট পাঁচ ইঞ্চি। ঐ মূর্ত্তির পশ্চাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাপেব প্রভাবলী।

সরস্বতী মূর্ত্তির বক্ষস্থলের উপব দিয়া কোণাকোণিভাবে একটী বীণা (কর্ত্তিত হওয়ায় নবনির্ম্মিত)। দেবী ঐ বীণাবাদনরত। পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষ্মী মূর্ত্তির বাম হস্তে একত্রে ধৃত পদ্মপত্র, পদ্মকলি ও প্রস্ফুটিত পদ্মের নালত্রয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরস্বতী মূর্ত্তির দক্ষিণ বাহুর পশ্চাৎ দিয়া উত্থিত পূর্ব্ববর্ণিতরূপ একত্রে সনাল পদ্মপত্র পদ্মকলি ও প্রস্ফুটিত পদ্ম।

ঐ সরস্বতী মূর্ত্তির বামে মূল কাঠামের কিছুটা বর্দ্ধিত অংশে একটী ছোট বিশ্বপদ্মের উপর দণ্ডায়মান সম্ভবত সরস্বতী দেবীর সহচরীর একটী চমৎকার মূর্ত্তি। ঐ নাবী মূর্ত্তি উচ্চতায় ১' এক ফুট এবং মুকুট সহ ১' ২" এক ফুট দুই ইঞ্চি। ঐ মূর্ত্তিটী সরস্বতী মূর্ত্তির মতই বাম পদের অগ্রগামী পদবিন্যাসযুক্ত ও কটিদেশ বামে ঈষৎ হেলান অবস্থায়। ঐ মূর্ত্তির নিজ বক্ষস্থলের উপর বিন্যস্থ দক্ষিণ হস্তেব ঊর্ধ্বমুখী করতলে একটী দোয়াতের মধ্যে স্থাপিত একটী কলম (মস্যাধাব—লেখনী) দৃষ্ট হয়। ঐ মূর্ত্তির বাম হস্তে স্বাভাবিক ঝুলন্ত অবস্থায় একটী চামর ধৃত।

নয়নাভিরাম লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তির পরিধান বস্ত্র, মুকুট ও কণ্ঠ, কর্ণ, বাহু, হস্ত ও পদের অলঙ্কার সকল এবং কটিদেশের মেখলা বা কাঞ্চীদাম অনুরূপ। অপর দিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তির পার্শ্বস্থিত পূর্ব্বোক্ত সহচরীদ্বয়ের উচ্চতা, গঠনশৈলী, অঙ্গভঙ্গিমা, বস্ত্র, মুকুট ও অলঙ্কারাদি অনুরূপ।

বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং সহচরী নারী মূর্ত্তি দুইটীর নিম্নস্থ বিশ্বপদ্ম সকলের নিম্নেই কাঠামের সর্ব্বনিম্নভাগ। ঐ ভাগের স্থূলতা বা বেধ প্রায় ১' ৬" এক ফুট ছয় ইঞ্চি। ঐ ভাগের ঠিক মধ্যস্থলে অর্থাৎ বিষ্ণু মূর্ত্তির পদনিম্নস্থ বিশ্বপদ্মের নীচেই নিজ আসনের উপর পতিত বামজানু এবং বামপদ পশ্চাৎমুখী আসনের উপর স্থাপিত অবস্থায়, দক্ষিণ পদ আসনে স্থাপন করতঃ উত্থিত দক্ষিণ জানু-উপবিষ্ট গরুড় মূর্ত্তি। উপবিষ্ট অবস্থায় ঐ মূর্ত্তির উচ্চতা ১১" এগার ইঞ্চি। মুকুটসহ ১' ২" এক ফুট দুই ইঞ্চি। বিষ্ণুর বাহন পক্ষিরাজ গরুড়ের দুইটী পক্ষ। দক্ষিণ কনুই, উত্থিত দক্ষিণ উরুর উপর ভর করিয়া উভয় হস্ত অঞ্জলীবদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ করজোড়ে স্তুতিরত। মহাবীর গরুড়ের উপবিষ্ট সুন্দর মূর্ত্তিটী বস্ত্র, মুকুট ও নানা অলঙ্কারে ভূষিত।

গরুড় মূর্ত্তির সংলগ্ন দক্ষিণে দীর্ঘমুখ, দীর্ঘকর্ণ সম্ভবতঃ একটী গন্ধর্ব্ব বা নাগের মুখ সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে একটী পুরুষ মূর্ত্তি, ইহার দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত ছোট একটী নারী মূর্ত্তি। মনে হয় তাহারা উভয়ে পূজার অর্ঘ্য নিবেদনে রত। গরুড় মূর্ত্তির সংলগ্ন বামে পূর্ব্ববর্ণিতরূপ একটী গন্ধর্ব বা নাগের মুখ। ইহার বামে ঐ মুখের মতই একটী মুখ উল্টাভাবে (মস্তকের উপরিভাগ নীচের দিকে ও মুখ উপর দিকে) উর্ধ্ব দৃষ্টিসম্পন্ন। ইহার বামে একটী অষ্টদল প্রস্ফুটিত পদ্ম।

বিষ্ণু মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তির মুকুটের উপর দিকে পর পর দুইটী ভাগ (Panel) দৃষ্ট হয়। উভয় পার্শ্বে নিম্নের ভাগদ্বয়ে কাঠামের বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া একটী করিয়া উপবিষ্ট হস্তীর দন্ত সমেত পূর্ব্বার্দ্ধেক। হস্তীর শুণ্ড তির্যকভাবে কিঞ্চিৎ নিম্নমুখী অবস্থায় এবং সম্মুখের পদ দুইটী ভূমিতে জোড়ভাবে প্রসারিত। ঐ প্রণত হস্তীর স্কন্ধে উপবিষ্ট সিংহ মূর্ত্তি নিজের পশ্চাতের একটী পদ হস্তীস্কন্ধের পার্শ্বদিয়া ঝুলন্ত ও অন্যপদ প্রসারিতক্রমে হস্তীর মস্তকে স্থাপন করতঃ সামনের দুই পদে ধৃত একটী বিষাণ মুখ দিয়া বাদনরত।

উভয় পার্শ্বের ঐ গজ-সিংহ ভাগের উপরের ভাগদ্বয়ে উভয় দিকেই কাঠামের বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় দন্ত সমেত একটী হস্তীর পূর্ব্বাংশ। হস্তীর শুণ্ড উর্ধ্বমুখী এবং ইহার মস্তকে দণ্ডায়মান দুইপক্ষ বিশিষ্ট মুকুট, অলঙ্কারাদি সজ্জিত ক্ষুদ্র পুরুষ মূর্ত্তি, দুই হস্তে ধৃত একটী বিষাণ মুখদ্বারা বাদনরত।

বিষ্ণু মূর্ত্তির কটিদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় বাহুমূল (armpit) পর্যন্ত উভয় পার্শ্বে মূল কাঠামপ্রস্তরের বেশ কিছু স্থান কর্ত্তিত অর্থাৎ দেহের ঐ অংশ কাঠাম প্রস্তর হইতে বিচ্ছিন্ন। সম্ভবতঃ কাঠামটীকে পশ্চাৎ দিকে কোন কৌশলে আটকাইয়া সোজা অবস্থায় স্থাপন করার

উদ্দেশ্যে ইহা করা হইয়াছিল। অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত গরুড় মূর্ত্তির নীচের দিকে প্রস্তর কাঠামে প্রায় গোলাকার কতক বর্দ্ধিত অংশ রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ গোলাকার বর্দ্ধিত প্রস্তরাংশ কোন প্রস্তর বা ইষ্টক বেদীর মধ্যস্থলে সমমাপের এক গর্তে প্রবেশ করাইয়া ঋজু অবস্থায় কাঠামটীকে স্থাপন করার জন্যই করা হইয়াছিল। ঐ প্রকারে অতি সহজেই উক্ত গুরুভার কাঠামটী ঋজুভাবে স্থাপিত হইয়া, স্থয়ীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে।

কলিকাতার বাংলা সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ৮ই কার্তিক ১৩৮৭ বাংলা (৪৭ বর্ষ ৫০ সংখ্যা) ৪৫ পৃষ্ঠায় "লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দীপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ ৪৫ পৃষ্ঠায় চণ্ডীগড় (পাঞ্জাবের রাজধানী) মিউজিয়ম ও আর্টগ্যালারীর সৌজন্যে প্রাপ্ত যে বিষ্ণু-লক্ষ্মী-সরস্বতী ইত্যাদি মূর্ত্তি সমন্বিত কাঠামের ফটোটী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আলোচ্য বিষ্ণুমূর্ত্তির কাঠামের সহিত আশ্চর্য্যজনকভাবে মিলিয়া যাইতেছে। ঐ ছবিতে কীর্ত্তিমুখ, বিদ্যাধরদ্বয়, উভয় পার্শ্বের বিষাণবাদনরত হস্তীর মস্তকে দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্ত্তিদ্বয়, উভয় পার্শ্বেব গজসিংহদ্বয় এবং বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সহচরীদ্বয়, গরুড়মূর্ত্তি প্রভৃতি আলোচ্য কাঠামের অনুরূপ এবং অবস্থিতি একই প্রকারের। বিশেষজ্ঞগণ চণ্ডীগড় মিউজিয়মেব পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুর কাঠাম খ্রীঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীকালের অনুমান করিয়াছেন। আলোচ্য কাঠামটী ঐ কালেব বলিয়া অনুমিত হয়।

বিগত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জিলার বর্তমান মাইজগাও এবং বরমচাল রেলষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী ভাটেবা — বরমচাল পাহাড়ের ভাটেরা নামক স্থানে হোমের টিলার নিকটস্থ ইটের টিলা বলিয়া কথিত একটী টিলা হইতে পুরাতন পরিত্যক্ত ইট সংগ্রহ কালে খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রীহট্টের রাজা (গোবিন্দ) কেশবদেব ও তাঁহার পুত্র ঈশানদেবের দুইখানি তাম্রশাসন একত্রে একসঙ্গে আবিষ্কৃত হয়। ঐ তাম্রশাসনদ্বয় ভাটেরার ১ম ও ২য় তাম্রশাসন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ঐ তাম্রশাসনদ্বয় পাঠে বুঝা যায় যে চন্দ্রবংশীয়[১] আর্য্যাচারী ঐ রাজবংশ শিব[২] ও বিষ্ণুর[৩] আরাধনা করিতেন। রাজা কেশবদেব কংস নিসূদন (সম্ভবতঃ কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণ-বলরাম) দেবতাব একটী অভ্রভেদী প্রস্তর মন্দির রাজধানীতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যথা—

> স মন্দিরং কংসনিসূদনস্য শিলাভিরুচ্চৈবিদধে মহৌজাঃ।
> যত্তুঙ্গশৃঙ্গস্থিতচক্রাধারাক্ষতাঃ ক্ষবন্ত্যম্বুঘনাদিবস্থাঃ ॥
> (২য় তাম্রশাসনের ১৫-১৬ ছত্র)

অর্থাৎ সেই ক্ষমতাশীল রাজা (কেশবদেব) কংসনিসূদনের একটী প্রস্তর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যাহার (মন্দিরের) সুউচ্চ শিখরে অবস্থিত (বিষ্ণু) চক্র (এত উচ্চে অবস্থিত যে মনে হইত) ইহার তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ সকল মেঘের আদি অবস্থায়ই (আদি অবস্থায় মেঘ প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক উর্ধ্ব আকাশে অবস্থান করে) ইহাকে কর্ত্তিত করিয়া বারি (বৃষ্টির জল) ক্ষরণ ঘটাইত।

রাজা ঈশানদেব মধুকৈটভারি (সম্ভবত অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণু) দেবতার একটী আকাশচুম্বী প্রাসাদ মন্দির রাজধানীতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যথা—

বিনির্ম্মমেসৌ মধুকৈটভারেঃ প্রাসাদমভ্রংলিহমূর্জ্জিতশ্রীঃ।
যত্তুঙ্গশৃঙ্গপ্রচলৎ পতাকা নভস্তরোমঞ্জরিকেব ভাতি॥
(২য় তাম্রশাসনের ২২-২৪ ছত্র)

অর্থাৎ এই বিশেষভাবে গৌরবান্বিত (রাজা ঈশানদেব) মধুকৈটভারির গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যাহার (মন্দিরের) তুঙ্গ (উন্নত) শিখরে (চূড়ায়) উড্ডীয়মান পতাকা (এত উচ্চে অবস্থিত থাকায়) একটী আকাশতরুর (সুউচ্চ মন্দিরকে আকাশতরু বা বায়বীয় বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইতেছে) মঞ্জরীর ন্যায় প্রতিভাত হইত।

বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পাল, দেব, খড়গ, চন্দ্র রাজাদেব বাজ্যাবসানের পব উত্তব-পশ্চিম ভারতে নবব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উত্থানের বহু পববর্ত্তীকালে অর্থাৎ খ্রীঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে সেন বংশীয় রাজাদের আমলে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গদেশে নবব্রাহ্মণ্যের বিশেষ প্রাধান্য ও বিস্তৃতি ঘটে। ঐ কালে সেনরাজাদের শাসিত বাংলাদেশের পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীহট্ট রাজ্যেও স্বাভাবিক নিয়মে নবব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেব প্রভাব প্রতিপত্তি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। তাম্রশাসনাদি পাঠে বুঝা যায় ঐ কালের শ্রীহট্ট অঞ্চলের আর্য্যাচারী নরপতিরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাবা নিজ রাজ্যে বহু বিষ্ণু মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন। নবভাবে বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান, তুলাপুরুষাদি[৭] দান, দেবোদ্দেশ্যে ও ব্রাহ্মণোদ্দেশ্যে ভূমিদান ইত্যাদি করিয়াছিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন দূববর্ত্তী স্থান হইতে আগত বহু বেদজ্ঞ, বিদ্বান ব্রাহ্মণ নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন[৮]। রাজতুল্য বা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজাদের অনুকরণে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। শ্রীহট্ট কদাপি সেন রাজত্বের অন্তর্গত ছিল না। সে জন্যই সেন রাজত্বের বহির্ভূত শ্রীহট্ট, পূর্ব্ব ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রামাদি অঞ্চলে রাজা বল্লালসেন প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাবসানের প্রায় একশত বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুরাজা গৌড়গোবিন্দের পতন ঘটে। বঙ্গে সেন রাজাদের পতনের পর ও শ্রীহট্টের শেষ রাজা গৌড়গোবিন্দের রাজ্যাবসানের পূর্ব্বপর্যন্ত প্রায় শত বর্ষকাল মধ্যে বঙ্গের ও পশ্চিমের অন্যান্য স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোক নানা পরিজন সহ, নানা কারণে শ্রীহট্ট অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হইয়া থাকিবেন। সুতরাং শ্রীহট্টের শেষ রাজা গৌড়গোবিন্দের পতনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত তিন চারিশত বৎসর শ্রীহট্ট অঞ্চলে নবব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিকাশ ও প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

ইহাও উল্লেখনীয় যে আলোচ্য বিষ্ণু মূর্ত্তির কাঠাম আবিষ্কারের কিছুকাল পর ঐ কাঠামের অনুরূপ স্থানীয় বেলে পাথরের একটী দেব মূর্ত্তির কিছুটা ক্ষুদ্র কাঠাম হিন্দুয়ানীপার মহল্লার প্রায় অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে শ্রীহট্ট সহরের জতরপুর মহল্লার দক্ষিণে ভরাট দুবড়ী হাওরে মাটি কাটিয়া নিবার সময় ৪/৫ হাত মাটির নীচে সোজা অবস্থায় বিগত ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে

ফেব্রুয়ারী তারিখে আবিষ্কৃত হয়। ঐ কাঠামটী অনেকাংশে ক্ষয়িত। তবে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী মূর্ত্তি ও পার্শ্বস্থিত সহচরীগণের পরিচয় মিলে। গরুড় মূর্ত্তিরও কিছুটা পরিচয় করা যায়। ঐ কাঠামেরও যথাসাধ্য সংস্কার সাধন ক্রমে শ্রীশ্রীবলরাম জিউর আখড়ায় সযত্নে রক্ষিত আছে। মনে হয় পঞ্চখণ্ডের (সুপাতলা গ্রামে) বাসুদেব মূর্ত্তি এবং বিগত ১৯৮৪ খ্রীঃ ২১শে মার্চ্চ তারিখে ঐ বাসুদেব বাড়ীর সামনেব দীঘির পঙ্কোদ্ধার কালে মাটির নীচে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কৃত একটী কষ্টিপাথরের অতি মনোরম বিষ্ণুব কাঠাম, শ্রীহট্ট সহবেব আম্বরখানার "রাজাবমাব" দীঘি হইতে আবিষ্কৃত কষ্টিপাথবেব বিষ্ণুব কাঠাম (যাহা পূর্ব্বে শ্রীহট্ট সহবের কালীঘাট মহল্লায় ৺নরসিংহ জিউব আখড়ায় এবং বর্তমানে নয়াসড়কস্থ ৺বিশ্বম্ভর জিউর আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত), জগন্নাথপুরের প্রাচীন বাসুদেব মূর্ত্তি এবং ভাটেরা অঞ্চলে জনৈক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত কালেই নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত।

উপবোক্ত আলোচনা হইতে অনুমিত হয় যে, বঙ্গদেশে সেনবাজাদেব আমল হইতে শ্রীহট্টের শেষ বাজা গৌড়গোবিন্দেব পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজা গৌড়গোবিন্দ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেব রাজত্বকালে বঙ্গের অন্যান্য স্থানেব ন্যায় শ্রীহট্ট অঞ্চলেও বহু বহু বিষ্ণু বিগ্রহ ও অন্যান্য দেবতা ও বিভিন্ন বিষ্ণু মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। আলোচ্য কাঠামটী সেন বাজাদের আমলে নির্ম্মিত অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি সকলের নির্ম্মাণ কৌশলের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্ত্তমান কাঠামটী পূর্ব্বোক্ত ৺কংসনিসূদন বা ৺মধুকৈটভারির মূর্ত্তি নহে। তবে ইহা খ্রীঃ একাদশ-দ্বাদশ, এমনকি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা গৌড়গোবিন্দের পূর্ব্বপুরুষদেব কিংবা তাঁহাব আমলে রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তি দ্বারা স্থাপিত একটী প্রাচীন দেবমূর্ত্তিব কাঠাম তাহা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

বর্ণিত বিষ্ণু মূর্ত্তির কাঠামের উপাদান স্থানীয় বেলে পাথব। ইহা বাজমহল পাহাড়েব বা পশ্চিমের অন্য কোন স্থানেব কষ্টিপাথর নহে। ঐ প্রকাব বেলে পাথর কর্ত্তনক্রমে ঐ কাঠামের শিল্পী যে প্রকার সূক্ষ্ম ও সুন্দর ভাস্কর্য্যেব পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই ভাস্কর্য্য শিল্পেব উৎকর্ষেব একটী উজ্জ্বল নিদর্শন। সেকালে এতদঞ্চলে ভাস্কর্য্য বিদ্যার উৎকর্ষ ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং বিদ্বন্মণ্ডলীববেণ্য পবমশ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় ৺হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃতজাতি" এই সুবিদিত খেদোক্তিব সত্যতাও কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

সূত্র

১। (ক) ত্রিপুরহরশিরঃকিবীটরত্নং স্মরযুবতেরভিষেকবৌপ্যকুম্ভঃ !
কুসুমবিশিখবাণশাণচক্রং জয়তি নিশাতিলকস্তুষাররোচিঃ ॥
বংশে-হস্য ভূমিপতয়ঃ কতিত্তে নিষ্পাব পৌরষা জাতাঃ।
তেষাং যশঃপ্রশস্তির্ভূবি ভারতসংহিতৈবাস্তি ॥

অথ বিশ্রুতপ্রভাবঃ প্রভবঃ শ্রীহট্টবাজ্যকমলায়াঃ।
সমজনি নবগীর্ব্বাণঃ খরবাণঃ ক্ষাভুজাং শ্রেষ্ঠঃ॥
(ভাটেরার ১ম তাম্রশাসন ৩-৬ ছত্র)

(খ) তুঙ্গাত্তুঙ্গতমঃ স্তোমনাগযুথমৃগাধিপঃ।
মৌলিরত্নং মহেশস্য জযত্যমৃতদীধিতিঃ॥
তদন্বযেভূদ্ভূবনাবতংসঃ
(ভাটেবার ২য তাম্রশাসন ২-৪ ছত্র)

২। (ক) ওঁ নমঃ শিবায়॥ যঃ কর্ত্তা ভুবনত্রয়স্য তনুভিবিশ্বং পৃথিব্যাদিভির্যস্যেদং ধ্রিয়তে য ঈশ্বব ইতি খ্যাতো ভবন্নাপরঃ। যঃ সংজ্ঞাত্রয়মেক এব ভজতি ব্রহ্মোপেন্দ্রমহেশ্বরেতি জগতামীশায তস্মৈ নমঃ।
(ভাটেরার ১ম তাম্রশাসন ১-৩ ছত্র)

(খ) প্রাদাৎ শ্রীহট্টনাথোয়ং শিবায় শিবকীর্ত্তনঃ॥
(ভাটেরার ১ম তাম্রশাসন ২৯ ছত্র)

৩। ওঁ নমো নারায়ণায॥ মহানীলমণিশ্যামঃ সুবর্ন্নকচিবাম্বরঃ।
পাতু বঃ কমলাকান্তঃ সবিদ্যুদিব বাবিদঃ॥
(ভাটেরার ২য তাম্রশাসন ১-২ ছত্র)

৪। তুলাপুরুষদানেস্য সংপ্রাপ্য দ্রবিণং দ্বিজাঃ।
কল্পবৃক্ষা ইবাভূবন্ হেমালঙ্কারভূষিতাঃ॥
(ভাটেরাব ২য় তাম্রশাসন ১৭-১৮ ছত্র)

৫। গুণৈর্যদীয়ৈঃ শ্রবণাভিব্যমৈরাকৃষ্যমানা গুণিনসসমন্তাৎ।
আগত্য সম্পূর্ন্ন মনোবথান্ন সম্মরুর্জম্মভূবং দ্বিজেন্দ্রাঃ॥
(ভাটেবাব ২য় তাম্রশাসন ১০-১১ ছত্র)

নিধনপুর তাম্রশাসনের পটভূমি—একটি সমীক্ষা

সুনির্মল দত্ত চৌধুরী

কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার (৫৯৪—৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ) নিধনপুর তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯১২ সালে বাংলাদেশের শ্রীহট্টে— কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী পঞ্চখণ্ড পরগণার নিধনপুর গ্রামে। তাম্রশাসনটি 'চন্দ্রপুরিবিষয়' এর (প্রাচীন রাষ্ট্রীয় বিভাগ অনুযায়ী 'বিষয়' হচ্ছে জেলা, 'মণ্ডল' হচ্ছে বিভাগ এবং 'ভুক্তি' প্রদেশ) 'ময়ূরশাল্মল অগ্রহারক্ষেত্রে' (অগ্রহারক্ষেত্র—রাজস্বমুক্ত দানকৃত ভূমি বা গ্রামাঞ্চল) 'ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়' (অনাবাদী নিষ্কর ভূমি নীতি) অনুসারে দুই শতের বেশী ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের একটি লিপি-দলিল। এই তাম্রশাসনের মোট সাতটি ফলকের মধ্যে আবিষ্কৃত ছয়টি ফলকে মোট ২০৫ জন ব্রাহ্মণের নাম আছে। অনাবিষ্কৃত ফলকটিতে আরো বেশ কিছু দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের নাম সম্ভবত উৎকীর্ণ ছিল। নিধনপুর তাম্রশাসনে মণ্ডল ও ভুক্তির কোনো উল্লেখ না থাকায় প্রদত্ত ভূমির অবস্থানটি ঠিক কোথায় ছিল তা ইতিহাসের একটি প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আছে। ১৯৫৮ সালে দক্ষিণ শ্রীহট্টের রাজনগর থানার পরগণা ইটার পশ্চিমভাগ গ্রামে বিক্রমপুরের (ঢাকা জেলা) চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের (দশম শতক) একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন সাক্ষ্য দেয় যে শ্রীহট্টে 'চন্দ্রপুরবিষয়' নামে একটি অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল যেখানে শ্রীচন্দ্র ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। তাম্রশাসনের বর্ণনানুযায়ী চন্দ্রপুরবিষয় ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির (উত্তরবঙ্গ) অন্তর্গত শ্রীহট্টমণ্ডলে। এই চন্দ্রপুরবিষয় হচ্ছে মূলত উত্তরে কুশিয়ারা নদী এবং দক্ষিণে মনু নদীর মধ্যবর্তী শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণাঞ্চল। 'শ্রীহট্টমণ্ডল'— শ্রীহট্ট নামের প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক উল্লেখ। এই মূল্যবান তথ্যটি আমরা পাই পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে।

শ্রীহট্ট ও পূর্ববঙ্গে যে জনসমৃদ্ধ বহু শতাব্দীর উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল তা সাহিত্য, লিপি ও অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য নিদর্শন থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' এ লিখেছেন, "শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে প্রাপ্ত নিধনপুর তাম্রপাট্টালী (সপ্তম শতক), ভাটেরায় (দক্ষিণ শ্রীহট্ট) প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের পাট্টালী (একাদশ শতক), বন্দরবাজারে (সিলেট শহর) প্রাপ্ত লোকনাথের মূর্তি (দশম একাদশ) এবং ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের পাট্টালী (অষ্টম শতক) এবং তৎপরবর্তী অগণিত লিপি ও মূর্তি, ফরিদপুরে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র ইত্যাদি পাট্টালী (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক), ঢাকা জেলায় প্রাপ্ত অসংখ্য লিপি ও মূর্তি এই সব ভূখণ্ডে প্রাচীন কাল হইতেই বহুদিনস্থিত সমৃদ্ধ সভ্যতা এবং জনাবাসের দ্যোতক। এই সব ভূখণ্ডের পুরাতন গঠন এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।"[১] এই উদ্ধৃতিতে পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের

উল্লেখ নেই। তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হয়েছিল 'বাঙালীর ইতিহাস' প্রকাশিত (১৩৫৬ বাংলা) হওয়ার পরে। পূর্ববাংলা বিশেষত শ্রীহট্টের ইতিহাসের ক্ষেত্রে নিধনপুর, পশ্চিমভাগ এবং ভাটেরার তাম্রশাসনগুলির মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম— শুধু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকেই নয়, সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকেও।

নিধনপুর তাম্রশাসনেব চন্দ্রপুরিবিষয় এবং পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনেব চন্দ্রপুরবিষয়-এর নামসাদৃশ্য ছাডাও এই দুটি তাম্রলিপিতে বর্ণিত দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের পদবী-পদ্ধতির একটা সাদৃশ্য আছে। বৈসাদৃশ্যের মধ্যে একমাত্র নিধনপুর তাম্রলিপিতে পদবীগুলির নামান্ত হিসেবে 'স্বামী' উপাধিটি দেখা যায়, যেমন রুদ্র ঘোষ স্বামী, ভাস্কর মিত্র স্বামী, বিষ্ণু দত্ত স্বামী, প্রজাপতি পালিত স্বামী, শুভ দাম স্বামী, ধ্রুব সোম স্বামী, নারায়ণ কুণ্ড স্বামী, মধু সেন স্বামী, ঈশ্বর ভট্ট স্বামী, মেধা ভট্টি স্বামী ইত্যাদি। আবার শুধু স্বামী উপাধিযুক্ত পদবীহীন নামও রযেছে, যেমন আনন্দ স্বামী, সুদর্শন স্বামী ইত্যাদি। স্বামী উপাধিটি হয়তো ভূস্বামী অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে (যেমন দশম শতকের পশ্চিমভাগ তাম্রলিপির নামগুলি— কমল নন্দী, গর্গ শর্মা, রবি কর ইত্যাদি) ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্বামী উপাধির ব্যবহাব দেখা যায় না। প্রসঙ্গত, শ্রীহট্টের লাতু অঞ্চলে স্বামী উপাধিধারী একটি কায়স্থ বংশের বসতি আছে। কিন্তু পদবীর ব্যাপারে সবচেয়ে আশ্চর্য কথাটি হচ্ছে এই যে দুটি তাম্রলিপিতেই ব্রাহ্মণদের পদবীগুলির মধ্যে ভট্ট, ভূতি, ভট্টি (এই তিনটি পদবী পশ্চিমভাগ লিপিতে নেই) ও শর্মা এই চারটি পদবী ছাড়া আর সবই আজকের বাঙালী কায়স্থদের (হয়তো বা কিছু বৈদ্যের) পদবী, যথা দাম, দাস, দেব, ধর, ঘোষ, দত্ত, মিত্র, গুপ্ত, কর, নন্দী, নাগ, পাল, বসু, সোম, সেন, পালিত, কুণ্ড ইত্যাদি।[২] সামন্ত লোকনাথের (সপ্তম বা অষ্টম শতক) ত্রিপুরা তাম্রলিপিতেও বারোটি ব্রাহ্মণ পদবীর মধ্যে ভট্ট ও ভূতি ছাড়া বাকি সবই অনুরূপ কায়স্থ পদবী। এই পদবী বিষয়টির তাৎপর্য পরে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে।

বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ লিপিতে বৌদ্ধমঠের সঙ্গে যুক্ত উপাধ্যায়, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, 'মহত্তর ব্রাহ্মণ', বৈদ্য, ছাত্র, জ্যোতিষী, কায়স্থ, মালাকাব, নর্তক, বাদক—ঢাকী, ঢুলী, কর্মকার, কুম্ভকার, স্থপতি, মিস্ত্রী, তেলী, চর্মকার, নাপিত, রজক, গণক ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তিধারী ব্যক্তিকেও ভূমিদানের উল্লেখ আছে। দানপত্রটি থেকে এক হাজাব বছর আগের শ্রীহট্টে কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সমাজে বিবিধ বৃত্তির বিকাশ এবং এক উন্নীত সমাজ ও সংস্কৃতির রূপকে আমরা আভাসিত হতে দেখি। তাছাড়া আরেকটি তথ্যও উল্লেখযোগ্য যে শ্রীহট্টে সেই সময় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়েছিল।

এবার নিধনপুর তাম্রশাসনের মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। এটা মান্য যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের তাৎপর্য প্রাপ্তিস্থানের অনুষঙ্গেই বিচার্য। কিন্তু নিধনপুর তাম্রশাসনের চন্দ্রপুরিবিষয় এবং এই বিষয়ের অন্তর্গত প্রদত্ত ভূমি ময়ূরশাল্মল অগ্রহারক্ষেত্র কোথায় ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কিশোরীমোহন গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র

সরকার, কমলাকান্ত গুপ্ত প্রমুখ প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্‌দের মতে চন্দ্রপুরিবিষয় ছিল শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে, যেখানে তাম্রশাসনটি পাওয়া গিয়েছিল। এই মতের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি হচ্ছে নিধনপুর লিপির চন্দ্রপুরিবিষয় ও পশ্চিমভাগ লিপির চন্দ্রপুরবিষয় এক ও অভিন্ন; শেষোক্ত লিপির 'কোসিয়ার' নদীই প্রথমোক্ত লিপির 'কৌশিকা' নদীর পরিবর্তিত নাম যা আজ কুশিয়ারা নামে খ্যাত এবং দুটো লিপির দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণরা ছিলেন একই সম্প্রদায়ভুক্ত। এই মতের মর্মার্থ হচ্ছে এই যে সপ্তম শতকে শ্রীহট্ট ছিল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত, অর্থাৎ ভাস্করবর্মার শাসনাধীন।

কিন্তু ইতিহাসের যুক্তিতেই আমরা উপনীত হই অন্য একটি সিদ্ধান্তে। প্রথমেই আসে নদীর কথা। কৌশিকা নদীকে শ্রীহট্টের কুশিয়ারা নদী বলে ধরে নিয়ে উপরোক্ত চন্দ্রপুরিবিষয় এবং চন্দ্রপুরবিষয়ের সাযুজ্য নির্ভুল কি না তা একান্তই প্রমাণসাপেক্ষ। পশ্চিমভাগ লিপিতে নদীর নাম কোসিয়ার। নিধনপুর লিপিতে শুধু কৌশিকা নয়, নদীটি আখ্যাত হয়েছে 'শুষ্ককৌশিকা' নামে। উপরন্তু, নিধনপুর লিপিতে চন্দ্রপুরিবিষয়ের ময়ূরশাল্মল অগ্রহারক্ষেত্রর যে সীমা নির্দেশ করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায় প্রদত্ত ভূমির সীমারেখায় পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি মরা নদী— একটি শুষ্ককৌশিকা এবং অপরটি গঙ্গিণিকা।[৩] শুষ্ককৌশিকা এই ভূমিকে ঘিরে আছে তিনদিকে— পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমায়। পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গিণিকা নামে আরেকটি নদীর মরা খাত। পঞ্চখণ্ডে এই মরা নদী গঙ্গিণিকার অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন নেই। গঙ্গিণিকা নামটি কেউ কেউ বলছেন শ্রীহট্টে কথিত গাঙের সংস্কৃত রূপ। কিন্তু যে কোনো বড় নদীকেই বাংলায় গাঙ বলা হয়। আবার গাঙ্গিনী বলতে গঙ্গার একটি শাখাকে বোঝায়। "গঙ্গিণিকা সম্বন্ধে গৌড়লেখমালায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন গঙ্গিণিকা শব্দ এখনও গাঙ্গিনা নামে বরেন্দ্রমণ্ডলে (উত্তরবঙ্গ) প্রচলিত, মরা নদীর পুরাতন খাত এই নামে কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং বরেন্দ্রমণ্ডলের কোনও স্থানেই গঙ্গিণিকার অসদ্ভাব নাই, পরন্তু খোদ কামরূপে মরা নদীর পুরাতন খাত বহু থাকিলেও 'গাঙ্গিনা' শব্দের ব্যবহার নাই — যদিও পূর্ববঙ্গে (ময়মনসিংহে-শ্রীহট্টে) গাঙ্গিনা শব্দটি প্রচলিত আছে।"[৪] এখন প্রশ্ন হচ্ছে কুশিয়ারার মতো এত বড় নদী কি তখন শুষ্ককৌশিকা হয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল? শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে বহতা আজকের যে স্রোতস্বিনী কুশিয়ারা যার মূল নাম বরাক সেই নদীটি প্রবাহিত হলো কোন পথে? কুশিয়ারা নদী পথ পরিবর্তন করায় স্থানীয়ভাবে একটি শুষ্ক বা মরা খাতের সৃষ্টি হয়েছিল যাকে শুষ্ককৌশিকা অথবা 'মরা কুশিয়ারা' বলা যেতে পারে — এ রকম কোনো ঘটনার নিশ্চিত প্রমাণ-চিহ্ন পঞ্চখণ্ডে সরজমিন অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নি। নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত পঞ্চখণ্ডের তথাকথিত 'মরা কুশিয়ারা'-র সঙ্গে শুষ্ককৌশিকা এবং 'লুলা গাঙে'-র সঙ্গে গঙ্গিণিকার সমীকরণ অবশ্যই ভুল।[৫] কৌশিকা সম্ভবত উত্তরবঙ্গের একটি ছোট নদী ছিল এবং শুষ্ককৌশিকা সেই শীর্ণ নদীর মরা খাত। কৌশিকা নদীর নাম সংক্ষেপে লোকমুখে কৌশি বা কুশী হওয়ার কথা, কুশিয়ারা যেন দূরকল্পিত। কৌশিকা এবং কোসিয়ার বা কুশিয়ারা দৃশ্যত এক নদী নয়।

সুপণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বলেছেন নিধনপুর তাম্রশাসনের কামরূপ রাজ্যভুক্ত চন্দ্রপুরিবিষয় ছিল কামরূপের পশ্চিম সীমান্ত করোতোয়া নদীর নিকটে। পরবর্তী প্রসঙ্গে আলোচিত কামরূপের রাজা বনমাল দেবের (নবম শতক) তেজপুর তাম্রশাসনের সাক্ষ্য থেকে তাঁর অনুমান যে ঐ করোতোয়া বিধৌত উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলায় (অধুনা বাংলাদেশভুক্ত) অবস্থিত ছিল চন্দ্রপুরিবিষয়— ময়ূরশাল্মল অগ্রহারক্ষেত্র ছিল যার অন্তর্গত। “শাসনে (নিধনপুর তাম্রশাসনে) প্রদত্ত ভূমি যে কামরূপের পশ্চিম সীমা ঘেঁষা ছিল তাহার প্রমাণ এই ভূমির সীমা নির্ধারণে ‘গাঙ্গিণিকা’ শব্দটি হইতেই কতকটা পাওয়া যায। প্রায় দুই শত বৎসর পরে প্রদত্ত গৌড়াধিপ ধর্মপাল দেবের তাম্রশাসনে (খালিমপুর তাম্রশাসন) ‘গাঙ্গিণিকার’ উল্লেখ আছে; ঐ শাসন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির গ্রাম বিশেষের সম্পর্কে ছিল। এবং আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ভাস্করের শাসনে যেমন ‘ময়ূরশাল্মল’ অগ্রহারের কথা আছে, ধর্মপালের শাসনেও ‘মাঢ়াশাল্মলী’ গ্রামের নাম আছে। . . . তখন (অর্থাৎ ভাস্করবর্মণের রাজত্বকালে) শ্রীহট্ট একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।”[৬] আসামের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মুকুন্দমাধব শর্মা এবং ঐতিহাসিক প্রতাপচন্দ্র চৌধুরীরও প্রত্যয় যে নিধনপুর তাম্রলিপির ময়ূরশাল্মল এবং খালিমপুর তাম্রলিপির মাঢ়াশাল্মলী এক ও অভিন্ন। কামরূপের রাজা মহাভূতিবর্মা (ভূতিবর্মা) পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির ময়ূরশাল্মল ক্ষেত্র অঞ্চলটি অধিকার করেছিলেন সম্ভবত গুপ্তরাজা বুধগুপ্তের (আ ৪৭৭-৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব অবসানের পরে। ভূতিবর্মার রাজত্বকাল মোটামুটি ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধ।

গৌড়রাজ ধর্মপাল নবম শতকের প্রারম্ভে খালিমপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে নারায়ণবর্মণ নামে একজন ‘মহাসামন্তাধিপতির’ অনুরোধে একটি বিষ্ণু মন্দির সংরক্ষণের জন্য পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির চারটি গ্রাম দান করেছিলেন। সীমানির্দেশিত এই গ্রামগুলির নাম যথাক্রমে ক্রঞ্চস্বভ্র, মাঢ়াশাল্মলী, পালিতকা এবং গোপিপ্পলী। ক্রঞ্চস্বভ্র গ্রামটি ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ব্যাঘ্রতটিমণ্ডলের মহন্তাপ্রকাশ বিষয়ে। তাম্রশাসনটির বিবৃতি থেকেই অনুমেয় যে মাঢ়াশাল্মলী ও পালিতকা গ্রাম দুটিও ছিল ঐ একই মণ্ডল ও বিষয়ে, কারণ মন্দিরকেন্দ্রিক এই চারটি গ্রামের অবস্থিতি কাছাকাছি হওয়াটাই স্বাভাবিক, দূরদূরান্তরে নিশ্চয়ই নয়। তাছাড়া চতুর্থ গ্রাম গোপিপ্পলী সম্বন্ধেই শুধু দেখা যায় মণ্ডল ও বিষয়ের অন্য নাম।[৭] গ্রামটি সম্ভবত ছিল নিকটে, পার্শ্ববর্তী মণ্ডলে। উল্লেখ্য যে মন্দিরের পূজারী ছিলেন একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসসম্মত ভাবেই আমরা একটা কথা বলতে পারি যে ভুক্তি-মণ্ডল-বিষয় ইত্যাদি প্রাচীন প্রশাসনিক বিভাগগুলি অপরিবর্তনীয় ছিল না। রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে বিভাগগুলিও যে নতুন নামে পুনর্গঠিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ময়ূরশাল্মল অগ্রহারক্ষেত্র— যে ক্ষেত্রে ভূমিদান করা হয়েছিল সেই স্থানটি কোথায়? নিধনপুর তাম্রশাসনের প্রদত্ত ভূমি ছিল শ্রীহট্টে — এই মতের যারা প্রবক্তা তাঁরা এই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে লঘুভাবে এড়িয়ে যান। অথচ ময়ূরশাল্মলের সঠিক অবস্থান নিরূপিত না হলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না যে প্রদত্ত ভূমিটি ছিল শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে।

আসলে ময়ূরশাল্মল নামে কোনো স্থান শ্রীহট্টে নেই, ছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে বর্ণিত চন্দ্রপুরবিষয়ের স্থাননামগুলির মধ্যে এই নাম অনুক্ত। রাজা গোবিন্দকেশবের ভাটেরার তাম্রশাসনে উল্লিখিত শ্রীহট্টের গ্রামগুলির মধ্যেও ময়ূরশাল্মলের নাম নেই। কিন্তু গৌড়ের (উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ) রাজা ধর্মপালের (৭৭০-৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ) খালিমপুর তাম্রশাসনে দেখা যাচ্ছে যে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির (উত্তরবঙ্গ) একটি গ্রামের নাম মাঢ়াশাল্মলী। নিধনপুর তাম্রশাসনের ময়ূরশাল্মল যেমন দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গিণিকাবেষ্টিত তেমনি খালিমপুর তাম্রশাসনের মাঢ়াশাল্মলীও উত্তর ও পশ্চিমে গঙ্গিণিকা দ্বারা চিহ্নিত। [৮] ময়ূরশাল্মল থেকে মাঢ়াশাল্মলী— সংস্কৃত থেকে দেশজ নামে এই রূপান্তর খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক। শাল্মল ও শাল্মলী এই দুটি সদৃশ শব্দের একই অর্থ— শিমুল গাছ। অসমীয়া ভাষায় ময়ূরকে বলা হয় মৌরা। প্রাচীন পালি (মাগধী) ভাষায় ময়ূরকে বলা হতো মরা। রাঢ় দেশের (প্রাচীন দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ) একটি গ্রামের নাম ছিল ময়ূরেশ্বর। ঐ গ্রাম আজ মোড়েশ্বব নামে আখ্যাত।[৯] দুধপাণি লিপিতে (অষ্টম শতক) আমরা দেখি দক্ষিণ বিহারের একটি গ্রামের নাম ভ্রমবশাল্মলী।[১০] উত্তরবঙ্গে ময়ূরশাল্মল বা মাঢ়াশাল্মলী এবং পার্শ্ববর্তী বিহাবে ভ্রমরশাল্মলী— সপ্তম-অষ্টম ও নবম শতকের পূর্ব ভারতে এই শাল্মলীযুক্ত অর্থবহ সুন্দর সংস্কৃতজ নামগুলি যেন একটা আঞ্চলিক স্থাননাম-বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। স্থাননামতত্ত্ব বা toponymy-এর দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমান করা চলে যে নামগুলির মধ্যে হয়তো একটা সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্র নিহিত ছিল। শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড টিলাবহুল একটি পাহাড়ী অঞ্চল। কিন্তু ময়ূরশাল্মল অগ্রহারক্ষেত্র নাম থেকে মনে হয় ক্ষেত্রটি ছিল একটি সমতল ভূমি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমভাগ লিপির 'শ্রীহট্টমণ্ডলেব চন্দ্রপুরবিষয়' ঐ লিপিতে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলেই বিবৃত, কিন্তু ধর্মপালেব সাম্রাজ্য শ্রীহট্ট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল না। সেই সময় অষ্টম-নবম শতকে শ্রীহট্টে হরিকেল নামে ছিল বিখ্যাত একটি স্বাধীন রাজ্য। কিন্তু দশম শতকে শ্রীচন্দ্রের রাজত্বকালে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি শ্রীহট্ট-সহ বাংলাদেশের এক বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। [১১]

ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধ ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙনের যুগ। ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। [১২] পরবর্তী গুপ্ত বাজবংশের আধিপত্য মগধেই (দক্ষিণ বিহার) সীমাবদ্ধ ছিল। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে গুপ্ত রাজাদের কর্তৃত্ব তখন নিশ্চয়ই শিথিল হয়ে এসেছিল এবং ছোট ও সামন্ত রাজ্যগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। রাজ-পরিবর্তনের সেই ভাঙাগড়ার সময় কামরূপের রাজা ভূতিবর্মার পক্ষে কামরূপ-সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে তিস্তা ও করোতোয়া নদী দুটির মধ্যবর্তী রংপুর অঞ্চলে ময়ূরশাল্মল অগ্রহারক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের নিষ্কর ভূমিদান করাটা অসম্ভব ছিল না যে ভূমি তাঁর চতুর্থ উত্তরপুরুষ ভাস্করবর্মা প্রায় এক শত বছর পরে কর্ণসুবর্ণের স্কন্ধাবার (শিবির) থেকে নিধনপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে পুনর্দান করেছিলেন। ভূতিবর্মার তাম্রশাসনটি অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় এই পুনর্দানের প্রয়োজন হয়েছিল। নিধনপুর তাম্রশাসনটি তারিখবিহীন। তবে সমকালীন ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে অনুমেয় যে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ৬৩৫

থেকে ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তবর্তী সময়ে শাসনটি প্রদত্ত হয়েছিল। দামোদরপুর তাম্রশাসনে দেখা যায় ৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এক গুপ্ত রাজা পৌণ্ড্রবর্ধন অধিকার করেছিলেন। কিন্তু সেই অধিকার সম্ভবত বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ভাস্করবর্মার সময় পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির ময়ূরশাল্মল অঞ্চল কামরূপ রাজ্যভুক্ত ছিল।

কামরূপের পরবর্তী এক রাজা বনমাল দেবের (নবম শতকের মধ্যভাগ) তেজপুর তাম্রশাসনে রংপুর অঞ্চলে ত্রিস্রোতা নদীর (তিস্তা) পশ্চিম তীরে প্রদত্ত ভূমির (অভিশূরবাটক নামে খ্যাত গ্রাম) সীমায় চন্দ্রপুরির উল্লেখ রয়েছে— "পূর্ব-দক্ষিণে চন্দ্রপুরিসহসীমা"।[১৩] প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে প্রায় ঐ একই অঞ্চলে ভূতিবর্মা ভূমিদান করেছিলেন। "By his Tezpur grant Vanamala donated to Indoka lands situated in the village of Abhisuravataka lying to the west of Trisrota and the north-east of Chandrapari (Chandrapuri) almost in the same area where Bhutivarman during the middle of the 6th century A.D. donated lands."[১৪] আমাদের প্রত্যয় রংপুরের এই চন্দ্রপুরি অঞ্চলেই ছিল ময়ূরশাল্মল। মনে রাখতে হবে যে চন্দ্রপুরিবিষয়ের ময়ূরশাল্মল অগ্রহারক্ষেত্রে ভূমিদানের তাম্রশাসনটি মূলত প্রদান করেছিলেন ভূতিবর্মা। ভাস্করবর্মা সেই ভূমি পুনর্দান করেছিলেন মাত্র, নবীকৃত দ্বিতীয় একটি তাম্রশাসনে এবং তা শ্রীহট্টের নিধনপুরে পাওয়া গিয়েছিল বলেই তার নাম নিধনপুর তাম্রশাসন। ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনে মণ্ডল ও ভুক্তি উল্লিখিত না হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে চন্দ্রপুরিবিষয় ছিল উত্তরবঙ্গে সম্প্রসারিত কামরূপমণ্ডলে, শ্রীহট্টে নয়। অনুল্লেখের অন্য আর কী কারণ হতে পারে? উত্তরবাংলার করোতোয়া নদী তখন ছিল কামরূপের পশ্চিম সীমা। নিধনপুর তাম্রশাসনে এমন কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই যে চন্দ্রপুরিবিষয়ের অবস্থিতি ছিল সেই সীমানা ছাড়িয়ে দূরবর্তী শ্রীহট্টে। ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ছাড়াও এই শাসনে 'বলি-চরু-সত্র'-এর জন্যে ভূমি সংরক্ষিত ছিল। পূজা বা উপাসনা গৃহের সত্র নাম আজও কামরূপ তথা আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেই বিশেষ প্রচলিত।

বনমালের তেজপুর তাম্রশাসনে ত্রিস্রোতার পশ্চিম তীরে ভূমিদান সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'ত্রিস্রোতা নদী নিঃসন্দেহে আজকের তিস্তা। অতএব স্বীকার্য যে উত্তরবঙ্গের একটা অংশ কামরূপ রাজ্যভুক্ত ছিল এবং করোতোয়া নদী যে ছিল প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপের পশ্চিম সীমা সেই ঐতিহ্য এ থেকে সমর্থিত হচ্ছে।'[১৫]

হিউয়েন সাঙ-এর পূর্ব ভারত ভ্রমণ (সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ) বৃত্তান্তের দুটি তথ্য এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। (১) সপ্তম শতকে সমতটের (পূর্ব ও নিম্ন পূর্ববঙ্গ) উত্তর-পূর্বদিকে সাগরের অদূরে এক উপত্যকাভূমিতে শিলিচটল নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। ". . . going from this (Sama-tata) north-east along the borders of the sea across mountains and valleys we come to the country of Shi-li-t'-sa-ta-lo"[১৬] 'সমতট থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে সাগরের তটরেখা ধরে এগিয়ে পাহাড় ও উপত্যকা পেরিয়ে আমরা শিলিটচটল

(শিলিচটল) দেশে এসে পৌঁছোলাম।' হিউয়েন সাঙ সমতটের উত্তর-পূর্বে শিলিচটল নামে যে দেশের কথা বলেছেন, ভিভিয়েন-দ্য-সেন্ট্-মার্টিন সেই নামটিকে গাঙ্গেয় বদ্বীপের উত্তর-পূর্বে শ্রীহাট বা শিলহাট বলে সনাক্ত করেছেন।[১৭] এই শিলিচটল দেশ যে দৃশ্যত প্রাচীন শ্রীহট্ট বা শ্রীহট্টের অংশ বাংলাদেশের মানচিত্রই তার আভাস দেয়। হিউয়েনসাঙ-এর বিবরণের ইঙ্গিত এ নয় যে শিলিচটল ছিল সমুদ্রতীরে। সাগরের নিকটে এবং সাগরের তীরে এক কথা নয়। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ও উপত্যকা অতিক্রম করে তিনি শিলিচটল দেশে পৌঁছেছিলেন। পাহাড় সম্ভবত ত্রিপুরার শৈলশ্রেণী এবং উপত্যকাগুলি হয়তো মেঘনা ও সুরমা। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, কমলাকান্ত গুপ্ত, কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে হিউয়েনসাঙ-বর্ণিত শিলিচটল দেশ হচ্ছে শ্রীহট্ট। (২) সপ্তম শতকে কামরূপের পশ্চিম সীমারেখা ছিল উত্তরবঙ্গের করোতোয়া নদী। করোতোয়া ছিল কামরূপ রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী পশ্চিম সীমা। হিউয়েনসাঙ-এর 'সি-যু-কি' গ্রন্থেই আছে 'পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে পূর্বদিকে প্রায় ৯০০ লি (মোটামুটি ১৫০ মাইল) এগিয়ে বৃহৎ কলোতু (করোতোয়া) নদী পেরিয়ে আমরা কামরূপ দেশে এসে পৌঁছোলাম।' এই বিবৃতির ইঙ্গিত স্পষ্ট এবং তা প্রমাণ করছে যে ভাস্করবর্মার রাজত্বকালে কামরূপ-সংলগ্ন কিছু অংশ ছাড়া উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ ছিল কামরূপ রাজ্যের বাইরে। হিউয়েন সাঙ-কৃত কামরূপের পশ্চিম সীমানির্দেশ এও সাক্ষ্য দেয় যে আসামের বর্মণ রাজত্বকালে সমতট এবং শ্রীহট্ট কামরূপ রাজ্যভুক্ত ছিল না। আরেকটি কথাও উল্লেখ্য। ভাস্করবর্মার আমন্ত্রণেই হিউয়েন সাঙ কামরূপে গিয়েছিলেন (আ ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে)। শ্রীহট্ট যদি ভাস্করবর্মার রাজ্যভুক্ত হতো তাহলে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে শিলিচটল প্রসঙ্গে প্রত্যাশিতভাবেই তার ইঙ্গিতটুকু অন্তত থাকতো। অতএব নিধনপুর তাম্রশাসনের চন্দ্রপুরিবিষয় যে শ্রীহট্টে ছিল না, হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে তা পরোক্ষভাবে সমর্থিত হচ্ছে।

প্রাচীন ভারতে রাজ্যগুলির গঠন ও বিস্তারে একটা ভৌগোলিক অবিচ্ছিন্নতা বা geographical contiguity দেখা যায়। এই ভূ-সংলগ্নতা কামরূপ ও শ্রীহট্টের মধ্যে নেই। দুই স্বতন্ত্র ভূভাগের দুই উপত্যকায় অবস্থিত এই দুটি দেশের মধ্যে গারো-খাসি-জৈন্তিয়া-মিকির শৈলশ্রেণী প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্টের কামরূপ রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া যায় যদি বর্তমান আসাম সন্নিহিত উত্তরবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং ময়মনসিংহ জেলাও কামরূপের অন্তর্গত ছিল বলে ইতিহাসের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে থাকে। নতুবা বিচ্ছিন্নভাবে শ্রীহট্ট এবং তাও শ্রীহট্টের মূলত পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের একটি খণ্ডাংশ কামরূপের মধ্যে এসে গেল কীভাবে? নদীপথে এই অধিকার বিস্তারের কথা বলা হতে পারে। কিন্তু নদীপথগুলি কী তীরবর্তী দেশের রাজ-কর্তৃত্বহীন ছিল? তাছাড়া সেই যুগে শুধু নদীপথের সংযোগে রাজ্যবিস্তারের ধারণা নিছক কাল্পনিক বলেই মনে হয়। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ লিপির চন্দ্রপুরবিষয়ের ক্ষেত্রে এরকম কোনো ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা নেই। এই লিপিতেই বলা হয়েছে যে চন্দ্রপুরবিষয় ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শ্রীহট্টমণ্ডলে, যে মণ্ডল বা বিভাগটি পূর্ববঙ্গেরই মেঘনা অববাহিকার অবাধ ভৌগোলিক বিস্তার এবং দশম শতকে যে বিভাগের একাংশ ছিল পূর্ববঙ্গের

রাজা শ্রীচন্দ্রের শাসনাধীন। প্রাচীন প্রশাসনিক বিভাগ সম্পর্কে এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যেতে পারে যে 'বিষয়' বা জেলা আয়তনে ইংরেজ আমলের জেলার মতো বড় ছিল না। চন্দ্রপুরবিষয় ছিল আয়তনে বিভাগপূর্ব শ্রীহট্ট জেলার এক চতুর্থাংশ।[১৮]

একটি বড় প্রশ্ন তবু থেকে যায়। ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনটি পাওয়া গেল শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে, তার কী ব্যাখ্যা? এই প্রাপ্তির একটি সূত্র অবশ্য পাওয়া যায় অন্য একটি প্রসঙ্গে। শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব এবং দক্ষিণাংশে বাচস্পতি মিশ্রের (নবম শতক) মৈথিল স্মৃতি প্রচলিত ছিল। এই স্মৃতি-প্রচলনের একটি পশ্চাদপট আছে যদিও তা কিংবদন্তীভিত্তিক। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি অন্তর্গামী (endogamous) গোষ্ঠী আদিতে মিথিলা (উত্তর বিহার) থেকে আগত বৈদিক বা সাম্প্রদায়িক বলে নিজেদের পরিচয় দেন। শ্রীহট্টের ইতিহাস-চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ কমলাকান্ত গুপ্ত বলছেন যে তাঁদের মৈথিল ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। মিথিলার সঙ্গে শ্রীহট্টের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ঐতিহ্যটি এই ব্রাহ্মণরাই গড়ে তুলেছিলেন এবং এই ঐতিহ্যের ফলেই শ্রীহট্টে মৈথিল স্মৃতি ও সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা। মিথিলার যোগসূত্রেই সপ্তম শতকে শ্রীহট্টে আর্য-সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করেছিল। শ্রীহট্টের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাই মৈথিল ঐতিহ্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীহট্টের মৈথিল ব্রাহ্মণরা দশ গোত্রে বিভক্ত, যথা ভরদ্বাজ, গৌতম, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, কৃষ্ণাত্রেয়, মৌদগল্য, পরাশর, স্বর্ণকৌশিক, বৎস এবং বাৎস্য। উল্লেখ্য যে শ্রীচৈতন্য শ্রীহট্টের এই মৈথিল সমাজের বৎস গোত্রীয় ছিলেন। (শ্রীহট্টের মৈথিল ব্রাহ্মণদের ইতিহাস ও পরিচিতি ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধে উপরোক্ত গোত্রনামগুলির প্রয়োজনীয়তা।) মিথিলা, উত্তরবঙ্গ ও কামরূপ একই সমতল ভূখণ্ডের বিস্তার। কামরূপ ও উত্তরবঙ্গেও মৈথিল ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল। মৈথিল ব্রাহ্মণরা যেমন নিজেদের বৈদিক বলে পরিচয় দেন তেমনি নিধনপুর এবং পশ্চিমভাগ দুটি তাম্রলিপিতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণদের পরিচিতিও বৈদিক। এখন কিংবদন্তীটি হচ্ছে এই যে এই শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত শ্রীহট্টের মৈথিল সম্প্রদায়ের 'বৈদিক সংবাদিনী' গ্রন্থের বৃত্তান্ত অনুযায়ী ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা আদি-ধর্মপা দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভানুগাছ্ পরগণার মঙ্গলপুর গ্রামে (ত্রিপুরার ধর্মনগর অঞ্চলের অদূরে) একটি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য আমন্ত্রিত পঞ্চগোত্রীয় (বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর) পাঁচজন মৈথিল ব্রাহ্মণকে রাজা পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে তাম্রপত্রে ভূমিদান করেন। পঞ্চখণ্ডের রাজপ্রদত্ত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এই পাঁচ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হচ্ছেন শ্রীহট্টের মৈথিল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাদ যে, পাঁচখণ্ডে পাঁচজনকে ভূমিদান করা হয়েছিল, তাই নাম পঞ্চখণ্ড। মতান্তরে পাঁচটি ছোট পরগণায় বিভক্ত বলেই পঞ্চখণ্ড নাম। আদি-ধর্মপা দানকুরুফা নামেও আখ্যাত। কিংবদন্তী অনুযায়ী পূর্বোক্ত মৈথিল দশ গোত্রের বাকি পাঁচগোত্রীয় ব্রাহ্মণ পূর্বগামীদের অনুসরণে পরে এসে শ্রীহট্টের মৈথিল সমাজ ও মৈথিল বেদাচারকে প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাম্রপত্রটি অনাবিষ্কৃত, তাই এই কিংবদন্তীর ঐতিহাসিকতা প্রশ্নাতীত নয়। আবার তের শত বছরের প্রাচীন

তাম্রপত্রটি পাওয়া যায়নি বলেই তা মিথ্যা তাও বলা যাবে না। বৈদিক সংবাদিনী বর্ণিত কাহিনীর সবটাই হয়তো অলীক নয়। এই কাহিনীর সমর্থনেই যেন ত্রিপুরার রাজমালায় মাণিক্য বংশীয়দের পূর্ববর্তী রাজাদের তালিকায় ধর্মফা নামে একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। কালীপ্রসন্ন সেনের 'শ্রীরাজমালা' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯২৭) গ্রন্থে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজাদের নাম-তালিকায় জুজহারু ফা'র পঞ্চম অধস্তন পুরুষ হচ্ছেন ধর্মফা। "Dharma Fa or Dhankuru Fa the fifth descendant of Jujharu Fa was a Buddhist king. He was converted to Hindu religion and performed a great sacrifice. In this great sacrifice he brought five Brahmins from Mithila and granted them lands in Sylhet District. These five Brahmins were known as Shrinanda, Ananda, Govinda, Shripati and Purushotham. It was believed that his sacrifice was performed in 51 Tripura era or 641 A.D. His contemporary king of Mithila was Balabhadra".[১৯] নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরীর Tripura through the Ages গ্রন্থের (যা থেকে উপরের অংশটি উদ্ধৃত) ৪-৬ পৃষ্ঠায় শ্রীরাজমালার রাজবংশ-তালিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের', সুখ্যাত গ্রন্থকার অচ্যুতচরণ চৌধুরী এই যজ্ঞ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ত্রৈপুর নৃপতি মিথিলা হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা ঠিক হইতে পারে, — এবং যখন যজ্ঞকুণ্ড অধুনাও বর্তমান আছে, তখন এই ব্যাপার অমূলক হইবার কথা নহে। তাম্রপত্র দ্বারা ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদানপূর্বক তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যমধ্যে স্থাপিত করাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। . . ." তিনি আরো বলেছেন, "আমাদের বিবেচনায় যজ্ঞ ও ভূদানাদি যথার্থ হইলেও দানপত্রগুলি বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিবরণটা প্রসিদ্ধ, অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাহাই অবলম্বনে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ বংশীয় এক ব্যক্তি (৺শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য) ইদানীং বৈদিক সংবাদিনী রচনা করিয়া যতটা কিংবদন্তীর সহায়তাতে পারেন, ততটা ইতিহাসরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাম্রফলক একটা কি দুইটা ত্রৈপুর নৃপতি দিয়াছিলেন, ইহা ঠিক হইতে পারে, যজ্ঞকুণ্ডের অস্তিত্বে যজ্ঞ ব্যাপারও অমূলক নহে, ইহাই সূচিত হয়। তবে তাম্রশাসনের প্রতিলিপি না পাইয়া বৈদিক সংবাদিনীকার নিজ ভাষায় উহার বিবরণ যতটা শুনিয়াছেন, ততটা স্বশক্তি অনুসারে পদ্যে রচনা করিয়াছেন।"[২০] কথিত যে শ্রীহট্টের এই যজ্ঞস্থানকে স্থানীয় ভাষায় 'হোমের গাত' (গর্ত) নামে চিহ্নিত করার একটা জনশ্রুতি ছিল।

কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী এ সম্পর্কে লিখেছেন, "ত্রৈপুর নৃপতির প্রদত্ত তাম্রশাসনের অভাবে এ-সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে না পারিলেও ইহা বলা যায় যে, স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ... উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিবার শক্তি তাহার ছিল।"[২১]

ত্রিপুরার প্রধান উপজাতি তিপরারা একটি বোড়ো জনগোষ্ঠী। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "আসাম থেকে ইন্দো-মঙ্গোলীয় বোড়োদের বসতি কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও পূর্ববঙ্গের অন্যত্র সম্প্রসারিত হয়েছিল।"[২২] শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে, 'বরাক

বা কুশিয়ারার দক্ষিণ তীর ত্রিপুরার রাজাদের অধিকারে ছিল।' "শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ — বরবক্র (বরাক) নদের সীমা পর্যন্ত দেশ বহুকাল ত্রৈপুর রাজবংশীয়দের শাসনাধীন ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। ... ত্রিপুরার ইতিহাস প্রণেতা বিশিষ্ট প্রমাণ সহকারে লিখিয়াছেন : 'শ্রীহট্ট জিলার পূর্বপ্রান্তস্থিত বিবিধস্থানে ইঁহাদের (ত্রৈপুর রাজগণের) রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে' — (কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ত্রিপুরার ইতিহাস, ২য় ভাঃ ১ম অঃ পৃ ১০)"।[২৩] শ্রীহট্টের "মনুতীরস্থ কিবাতনগর" ছিল এরকমেরই ত্রিপুরার একটি রাজধানী। বোড়ো-তিপরাদের বসতি থেকেই সম্ভবত এই কিরাতনগর নামের উৎপত্তি। নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে বোড়োরাই ছিল মহাভারত ও পুরাণ-বর্ণিত পূর্ব ভারতের কিরাত। কৃষ্ণবিহারী লিখেছেন, "করিমগঞ্জের প্রতাপগড়ের অনেকাংশ বলিতে গেলে অল্পদিন পূর্বেও ত্রিপুবা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ... দক্ষিণ শ্রীহট্টের শ্রীমঙ্গল বেল স্টেশন হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা অল্প দূরবর্তী হইলেও ইহার অনতিদূরেই ত্রিপুরার জমিদাবী সম্পত্তি রহিয়াছে। এ অবস্থায় পঞ্চখণ্ড ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না থাকিয়া কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ শ্রীহট্টের অন্য কোনও অংশে কামরূপের আধিপত্য থাকার কোনও নির্দেশ পাওয়া যায় না এবং জনশ্রুতিও নাই।"[২৪] পদ্মনাথও বলেছেন (কামরূপশাসনাবলী— পৃ ৭), 'পঞ্চখণ্ড সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে এই স্থানটি পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ছিল।' শ্রীহট্টের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের অধিকার নিয়ে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার শাসকদের মধ্যে একটা বিরোধ যে মধ্যযুগে ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

নিধনপুব লিপিতে দু'জন 'পট্টকপতি'-র (তাম্রফলকের স্বত্বাধিকাবী) নাম রয়েছে। এই দু'জন হচ্ছেন প্রাচেতস গোত্রীয় সাধারণ স্বামী এবং কাত্যায়ন গোত্রীয় মনোরথ স্বামী। বৈদিক সংবাদিনী বর্ণিত মৈথিল ব্রাহ্মণদের যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীহট্ট আগমনের যোগসূত্রে দ্বিতীয় পট্টকপতি মনোরথ স্বামী কিংবা তাঁর বংশধর কেউ সম্ভবত ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনটি পঞ্চখণ্ডে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন — পদ্মনাথ এরকম একটি সম্ভাবনার যে কথা বলেছেন তা একান্তই অমূলক নয়। মৈথিল ব্রাহ্মণবা নিশ্চয়ই উত্তরবঙ্গ থেকে বা হয়েই শ্রীহট্টে আগমন করেন তা সে যে কোনো ঘটনাসূত্রেই হোক না কেন। অনুমেয় যে মনোরথ স্বামী মৈথিল ছিলেন, এবং অনেকের ধারণা কাত্যায়ন গোত্রীয় পঞ্চখণ্ডের মৈথিল সাম্প্রদায়িক সমাজের যশস্বী নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি (পঞ্চদশ - ষোড়শ শতক) ছিলেন তাঁর বংশধর। [২৫] কমলাকান্ত গুপ্তের প্রতিবেদনেও আমরা দেখছি যে নিধনপুর লিপির দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের মধ্যে মৈথিল ব্রাহ্মণরা ছিলেন — Copper—Plates of Sylhet, pp. 62-63 দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা— তাম্রশাসনের মতো কোনো অস্থাবর ঐতিহাসিক দলিল স্থানান্তরে বাহিত হতে পারে। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন কামরূপমণ্ডলে ভূমিদানের একটি লিপি-দলিল। সেই শাসনটি পাওয়া যায় সুদূব বারাণসীর কাছে কমৌলিতে।

ভূতিবর্মা এবং ভাস্করবর্মার রাজত্বকালে অর্থাৎ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্ট কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল কি না— নিধনপুর লিপি-সংক্রান্ত ইতিহাস বিতর্কের মূল প্রশ্নটা এখানেই নিহিত।

কামরূপের কোনো ইতিহাসে প্রমাণিত হয়নি যে বর্মণ রাজাদের সময় শ্রীহট্ট ছিল কামরূপ রাজ্যের অংশ। গেইট স্পষ্টই লিখেছিলেন যে 'ঐতিহাসিক যুগে, ১৮৭৪ সালের আগে, সিলেট (শ্রীহট্ট) কখনই আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না'।[২৬] নিধনপুর তাম্রশাসনের চন্দ্রপুরিবিষয় ছিল উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলায় এবং শাসনটি মৈথিল ব্রাহ্মণদের শ্রীহট্টে আগমনের সূত্রে পঞ্চখণ্ডে এসেছিল— এই সিদ্ধান্তের একটি অনুমিতি (inference) এই যে সপ্তম শতকের মধ্যভাগে শ্রীহট্টের কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ তীরে পঞ্চখণ্ড অঞ্চল ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

নিধনপুর এবং পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন দুটির এক অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও জটিল বিষয় হচ্ছে— ভূমিদান করা হলো যে ব্রাহ্মণদের তাদের অনেকেরই পূর্বোক্ত কায়স্থ পদবী, যে কৌলিক পদবীগুলির ব্যবহার আজকের বাঙালী ব্রাহ্মণসমাজে নেই। একাধিক লিপিতে এতগুলি সুবিদিত, সুবিন্যস্ত এবং আজও সুপ্রচলিত কায়স্থ পদবী ব্রাহ্মণদের নামের অংশ মাত্র, মধ্যনাম বা উপনাম হতে পারে না। স্পষ্টতই লিপিবদ্ধ পদবীগুলি কায়স্থদের পদবী-পদ্ধতির সঙ্গে সংগতিসূচক। গুপ্তযুগের কলাইকুড়ি-সুলতানপুর তাম্রশাসন (৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দ—রাজশাহী জেলায় প্রাপ্ত) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন, "বর্তমান লেখে যে তিনজন ব্রাহ্মণের ('পুণ্ড্রবর্ধনবাসী দেবভট্ট, অমরদত্ত এবং মহাসেনদত্ত নামক তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ') উল্লেখ দেখা যায় তাদের নামের শেষাংশ 'ভট্ট' অথবা 'দত্ত'। আজকাল বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজে দত্ত পদ্ধতি দেখা যায় না। বাংলা অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাচীন লেখমালায় অনেক ব্রাহ্মণাখ্যার শেষাংশে আধুনিক বাঙালী কায়স্থগণের পদ্ধতি লক্ষ্য করে ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রাচীন যুগের অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার বর্তমান বাঙালী কায়স্থসমাজের অঙ্গে মিশে গিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য। কারণ কায়স্থ (লিপিকর) এবং বৈদ্য (চিকিৎসক) অবশ্যই বৃত্তি বা ব্যবসায়মূলক সম্প্রদায়। প্রথমে এই দুটি বৃত্তি কোনও নির্দিষ্ট বর্ণে সীমাবদ্ধ ছিল বলে প্রমাণিত হয়নি।"[২৭] বাংলাদেশে জাতি (caste) হিসেবে বৈদ্য ও কায়স্থের আবির্ভাব অপ্রাচীনকালে। চিকিৎসা যাদের বৃত্তি ছিল তাঁরা বৈদ্য বা বৈদ্যক নামে অভিহিত হতেন এবং এই বৃত্তিতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ দুইই যে ছিলেন তা ঐতিহাসিক। "পাল-সেন আমলের পূর্বে এদেশে বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নেই"।[২৮] কায়স্থের ছিল লেখকের বৃত্তি। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "কায়স্থ বলিতে কোনও বর্ণ বা উপবর্ণ বুঝাইত না। কোষকার বৈজয়ন্তী (একাদশ শতক) কায়স্থ অর্থে বলিতেছেন লেখক এবং কায়স্থ ও করণ সমার্থক ইহাও বলিতেছেন। ক্ষীরস্বামী কৃত অমরকোষের টীকায়ও করণ বলিতে কায়স্থদের মতই একশ্রেণীর রাজকর্মচারীকে বুঝান হইয়াছে"।[২৯] দীনেশচন্দ্র সরকার আরো বলছেন, "দলিলপত্রাদির লেখকদের 'কায়স্থ' বলা হত। এই অর্থে 'করণ' এবং 'করণিক' শব্দেরও ব্যবহার ছিল। 'কায়স্থ' সংজ্ঞক কর্মচারীর বহুল উল্লেখ বাংলা অঞ্চলের গুপ্তযুগের দলিলপত্রে দেখা যায়। এখন আমরা শক-কুষাণ আমলের খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীর দু'খানি অভিলেখে 'কায়স্থ'-এর উল্লেখ পেয়েছি"।[৩০] ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখছি যে বহু শতাব্দীর ব্যবধানে বাংলাদেশে বৃত্তিবাচক বৈদ্য ও কায়স্থ জাতিবাচক বৈদ্য ও কায়স্থে বিবর্তিত হয়েছিল দ্বাদশ শতকের পরে কোনো এক সময় থেকে।

নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক একটা আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা। রক্ত-সমীক্ষার একটা তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য এই যে জোটবদ্ধ জাতিগুলির (caste clusters) মধ্যে একটা নৃতাত্ত্বিক নৈকট্য ধরা পড়ে। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ এরকমই একটি জোট (cluster) এবং সামাজিকভাবেও তাঁরা ঘনিষ্ঠ। এই জোটবদ্ধতা জাতিগত ভিত্তির চেয়ে অঞ্চল ভিত্তিতেই বেশী লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ঢাকার কায়স্থদের সঙ্গে বরিশাল বা অন্যান্য জেলার কায়স্থদের চেয়ে ঢাকার ব্রাহ্মণদের নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক নিবিড়তর।[৩১] নৃবিজ্ঞানীদের মতে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বাঙালী সমাজের এই উপরের বর্ণস্তরটি প্রধানত একই আর্যভাষী অ্যালপাইন নরগোষ্ঠীর (race) রক্তপ্রবাহে গঠিত।

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে নিধনপুর লিপিতে উল্লিখিত কায়স্থ পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণরা ছিলেন গুজরাট থেকে আগত নাগরব্রাহ্মণ, যাদের আদি বাসস্থান ছিল পাঞ্জাবের নাগরকোট, গুজরাটের কাথিয়াবাড় প্রভৃতি অঞ্চলে। ভারতের পশ্চিম থেকে পূর্বে অ্যালপাইনদের গতিধারার সঙ্গে খুব সম্ভবত নাগরব্রাহ্মণদের পূর্ব ভারতে আগমন ও বসতির ইতিহাস সম্পৃক্ত।[৩২] উল্লেখ্য যে 'করোতোয়া মাহাত্ম্য' নামে একটি গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের করোতোয়া তীরে নাগরব্রাহ্মণদের এক উপনিবেশের কথা আছে। ভাণ্ডারকর এবং অন্য কোনো কোনো পণ্ডিতের প্রত্যয় যে মিত্র, নাগ, দত্ত, ঘোষ, বসু, গুপ্ত, নন্দী, দেব ইত্যাদি নিধনপুর লিপি-বর্ণিত পদবীগুলি নাগরব্রাহ্মণদের কৌলিক পরিচয় বহন করে এবং এই সব পদবীযুক্ত বাংলার কায়স্থরা ছিলেন নাগরব্রাহ্মণদের বংশধর। কেউ কেউ বলছেন যে, পরবর্তীকালে বর্ণচ্যুত এই ব্রাহ্মণরাই মূলত বাংলার কায়স্থ সমাজের স্রষ্টা। কিন্তু বর্ণচ্যুতির কারণটা কী অথবা একান্তই এটা বর্ণচ্যুতির ঘটনা কি না—এই প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড়াতেই হয়। সুজিৎ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন যে, "ঐ ব্রাহ্মণরাই জাতিচ্যুত হয়ে কায়স্থ হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।... ব্রাহ্মণদের জাতিচ্যুতির ব্যাপারটা একান্ত সরল ব্যাপার নয়..."।[৩৩] কিন্তু তাঁর পরবর্তী উক্তি "একটা সমাধান এই হতে পারে যে পরবর্তীকালে আগত অন্য ব্রাহ্মণদের চাপে তাঁরা ঐ-ধরনের পদবী পরিত্যাগ করে শাস্ত্রসম্মত পদবী গ্রহণ করেন" — এই সহজ সমাধানটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এই পদ্ধতির পদবীগুলি তো অবিকৃতভাবে প্রচলিত থেকেই যাচ্ছে আজও বাঙালী কায়স্থদের মধ্যে—শ্রীহট্টে ও অন্যত্র। এই সব কায়স্থ পদবীধারীদের পূর্ব পরিচয়টা তবে কী ? তাঁরা কোন বর্ণের ? একই বর্ণ আজ বিভিন্ন জাতিতে (caste) বিভক্ত, যেমন ব্রাহ্মণরা। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে বর্ণ ও জাতি এক নয়। বর্ণ অর্থে শ্রেণী বা class এবং জাত বা জাতি অর্থে caste — এই প্রভেদটি ছাড়া বর্ণ ও জাতি সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় এবং এই সমীকরণ একান্তই ভুল ও অনৈতিহাসিক।[৩৪] কায়স্থ আখ্যাটি বৃত্তিসূচক এবং কায়স্থ বৃত্তিধারীরা বাংলাদেশে সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের আগে জাতি (caste) হিসেবে সমাজবদ্ধ হয়ে ওঠেন নি— একথা আগেই বলা হয়েছে। হয়তো কায়স্থরা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-সহ বিভিন্ন বর্ণ থেকে এসেছিলেন। বস্তুত, 'বাঙালীর ইতিহাস'-এ বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুযায়ী বলা হয়েছে, বৈদ্য ও কায়স্থ দুটিই 'উত্তম সংকর বর্ণ'।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার বাঙালী কায়স্থ সমাজে মিশে গিয়েছিলেন — ভাণ্ডারকর, দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিতদের এই প্রতীতি মনে হয় ইতিহাসসম্মত। কমলাকান্ত গুপ্তও এরকম একটি বর্ণত্যাগ বা বর্ণ-পরিবর্তনের ইঙ্গিত করেছেন।[৩৫] এই বর্ণ-পরিবর্তনের কারণটা পাওয়া যাবে বৃত্তি থেকে জাতিতে রূপান্তর এবং সমাজ বিবর্তন ও সমাজবিন্যাসের ইতিহাসে। বৃত্তিগতভাবে কায়স্থরা মূলত ছিলেন লেখক রাজকর্মচারী এবং ব্রাহ্মণদের সব পরিবারে পৌরোহিত্যটা পেশা ছিল না। ব্রাহ্মণদের শিক্ষকতা ইত্যাদি অন্যান্য বৃত্তিও ছিল। বংশানুক্রমিক বৃত্তি ছিল জাতি গঠনের মৌল উপাদান। গুপ্তযুগের সময় থেকে উত্তর ভারতে এবং বৌদ্ধ প্রভাবিত পালযুগের পরে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু স্মৃতিশাসিত সমাজে বৃত্তিভিত্তিক জাতিভেদ কঠোরতর হচ্ছিল। এমনও হতে পারে যে নাগরব্রাহ্মণরা অধিকাংশই ছিলেন বৃত্তিতে কায়স্থ। নিধনপুর এবং অন্যান্য তাম্রলিপিতে কায়স্থ পদবীযুক্ত যে সব ব্রাহ্মণদের নামোল্লেখ আছে তাঁরা কালক্রমে বৃত্তি থেকে জাতিতে পবিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতিগতভাবে কায়স্থ হিসেবে পরিচিত ও সমাজবদ্ধ হয়েছিলেন—এদেশে সমাজ ইতিহাসের ধারা এরকম একটি পরিণতির ইঙ্গিত দেয়।

ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু সমাজে স্মৃতি-শাস্ত্রকাররা যদিও বৈদিক চাতুর্বর্ণ কাঠামোর মধ্যেই বিভিন্ন জাতিকে বিন্যস্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁদের এই প্রচেষ্টা সর্বত্র সফল হয়নি এবং সমাজবিন্যাস ভারতের সর্বত্র একই সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করেনি। বৈদিক-অবৈদিক আর্যানার্য সংমিশ্রণে অঞ্চলভেদে তা বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ নিয়েছিল। এই সংমিশ্রণ হয়েছিল সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক উভয় ক্ষেত্রেই, এবং তা প্রতিটি বর্ণকেই কমবেশী স্পর্শ করেছিল। বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণসমাজ গড়ে ওঠেনি। তাই বোধ হয় মধ্যযুগে বাংলাদেশে 'শুদ্ধিতত্ত্ব' প্রণেতা স্মার্ত রঘুনন্দন (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক) তাঁর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলিকে বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে শূদ্র আখ্যায় অবনত করেছিলেন এবং তা করেছিলেন সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে। ভারত ইতিহাসবিদ বাশাম এই শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে লিখেছেন, "The texts (Sastras and Smritis) were written by brāhmans and from the brāhmanic point of view, and represent conditions as the brāhmans would have liked them to be. Thus it is not surprising that they claim the utmost honour for the priestly class and exalt it above measure."[৩৬] বাংলাদেশের অনেকাংশে রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচলিত, কিন্তু শ্রীহট্ট জেলায় বাচস্পতি মিশ্রের মৈথিল স্মৃতির প্রচলন — বিশেষত জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে। এই মৈথিল স্মৃতির ইতিহাস আমরা আগেই আলোচনা করেছি, এবং দেখেছি যে এই ইতিহাস নিধনপুর তাম্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

নিধনপুর তাম্রশাসনের ২০৫ জন দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পদবীযুক্ত, (এই তাম্রশাসনে মোট আঠারটি পদবীর উল্লেখ আছে), বাকি ব্রাহ্মণদের নামগুলি পদবীহীন।[৩৭]

তাম্রশাসনের সাতটি ফলকের মধ্যে আবিষ্কৃত ছয়টি ফলকে যে সকল ব্রাহ্মণের নামোল্লেখ আছে তার অর্ধেক .অর্থাৎ এক শত বা ততোধিক ব্রাহ্মণই পদবীহীন। শুধু 'স্বামী' উপাধিযুক্ত এই পদবীহীন ব্রাহ্মণরা কী এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন? নাগরব্রাহ্মণ হলে তাঁদের নামের সঙ্গে কায়স্থ পদবী থাকার কথা ছিল। তবে ভট্ট ও ভূতি — এই দুটি পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছাড়াও মৈথিল ব্রাহ্মণদের গোত্রগুলি পদবীহীনদের গোত্রনামের মধ্যে পাওয়া যায়।[৩৮] তাছাড়া পদবীহীন ব্রাহ্মণদের অন্যান্য গোত্রনামও রয়েছে। তাই স্পষ্টতই আমরা দেখছি যে নিধনপুর লিপির ব্রাহ্মণরা এক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। নাগরব্রাহ্মণরা ছাড়াও ছিলেন মৈথিল সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। শ্রীহট্টের মৈথিল ব্রাহ্মণদের বংশ-ইতিহাস, কুলাচার, রক্ষণশীলতা ও অন্তর্গামিতা (endogamy) প্রমাণ করে যে তাঁরা একটি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। মৈথিল ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের শ্রেণীবিভাগ, বৃত্তিগত বৈষম্য, শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং জাতিভেদ-জনিত বিভেদ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই সম্ভবত নাগরব্রাহ্মণরা পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্ন এবং ক্রমশ কায়স্থ সমাজে সংগঠিত ও সমন্বিত হয়ে যান।

নিধনপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত ব্রাহ্মণদের একটি সম্প্রদায় শ্রীহট্টের কায়স্থ সমাজের নির্মাতা আদিপুরুষ -- এই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলে দানকৃত ভূমিটি যে শ্রীহট্টে ছিল এবং সেই দানপ্রাপ্ত ভূমিতেই ছিল ঐ ব্রাহ্মণদের বসতি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। প্রসঙ্গত, বংশ-ইতিহাস ও পারিবারিক কাহিনী থেকে জানা যায় যে, শ্রীহট্টের অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবার জেলার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। সুজিৎ চৌধুরী বলছেন, নিধনপুর লিপি- বর্ণিত ব্রাহ্মণদের আঠারটি পদবীর মধ্যে যে চৌদ্দটি কায়স্থ পদবী (যাঁরা নাগরব্রাহ্মণ ছিলেন বলে অনুমিত) সেই পদবীধারীরাই শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলের কায়স্থ সম্প্রদায়ের মূলধারা।[৩৯] পদবীর দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা ঠিক। কিন্তু নিধনপুর লিপির কায়স্থ পদবীগুলি শ্রীহট্ট-কাছাড়ে শুধু কেন, উত্তরবাংলায় এবং বাংলার অন্যত্রও কায়স্থ সমাজের সুপরিচিত পদবী পদ্ধতি। সামন্ত লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রলিপির পদবীগুলিও নিধনপুর লিপির অনুরূপ। আবার শুধু ব্রাহ্মণই নয়, কায়স্থ বৃত্তির ইতিহাস থেকে মনে হয় বিভিন্ন বর্ণ থেকে সমাজ বিবর্তনের ধারায় কায়স্থ জাতি-সমাজের উদ্ভব। তাছাড়া আরেকটি কথা, একই পদবীর ব্যবহার বিভিন্ন বংশেতো আছেই, এমন কি বিভিন্ন জাতিতেও (caste) দেখা যায়। সুতরাং নিধনপুর তাম্রশাসনে বর্ণিত ব্রাহ্মণদের কায়স্থ পদবীগুলি থেকে প্রমাণিত হয় না যে এই শাসনোক্ত কায়স্থ পদবীধারীরাই শ্রীহট্টের কায়স্থ সমাজকে গড়েছিলেন। নিধনপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত ভূমিটি কোথায় ছিল — আসলে এটাই হচ্ছে অন্বেষিত বিষয়। আমাদের এই সমীক্ষায় নিধনপুর শাসনোক্ত চন্দ্রপুরিবিষয়ের এই ভূমি —ময়ূরশাল্মল অগ্রহারক্ষেত্র — ছিল উত্তরবঙ্গের রংপুরে — তিস্তা ও করতোয়া নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

সমীক্ষা-লব্ধ তথ্যগুলি থেকে আমরা দেখেছি যে :

— নিধনপুর তাম্রশাসনের চন্দ্রপুরিবিষয় এবং পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের চন্দ্রপুরবিষয় এক নয়। উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলায় কামরূপ সন্নিহিত তিস্তা নদীর পশ্চিমতীরে চন্দ্রপুরি নামে একটি স্থান বা গ্রামাঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল, কামরূপের রাজা বনমাল দেবের তেজপুর তাম্রশাসন যার সাক্ষ্য দেয় এবং যেখানে ভূতিবর্মা ভূমিদান করেছিলেন।

— উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে অবস্থিত খালিমপুর তাম্রশাসনের মাঢ়াশাল্মলী গ্রামই নিধনপুর তাম্রশাসনের ময়ূরশাল্মল। শ্রীহট্টে ময়ূরশাল্মল বা মাঢাশাল্মলী নামে কোনো স্থান নেই, আগেও ছিল না।

— শ্রীহট্টের কুশিয়ারা নদী নিধনপুর তাম্রশাসনের 'শুষ্ককৌশিকা' নয়। তাছাড়া গঙ্গিণিকার কোনো আভাস পঞ্চখণ্ডে নেই।

— হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ অনুযায়ী সপ্তম শতকে ভাস্করবর্মণের সময়
(১) শিলিচটল বা শ্রীহট্ট একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, এবং
(২) উত্তরবঙ্গের করোতোয়া নদী ছিল কামরূপের পশ্চিম সীমা।

— রাজ্যগঠনের ক্ষেত্রে কামরূপ ও শ্রীহট্টের মধ্যে কোনো ভৌগোলিক অখণ্ডতা বা geographical contiguity নেই। দুটি দেশের মধ্যে কামরূপ রাজ্য-বহির্ভূত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ব্যবধান ছিল।

— আসামের কোনো ইতিহাসে প্রমাণিত হয়নি যে শ্রীহট্ট ছিল কামরূপের বর্মণ রাজাদের —ভূতিবর্মা বা ভাস্করবর্মার — শাসনাধীন।

— ইতিহাসের ইঙ্গিত এই যে সপ্তম শতকে শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড অঞ্চল ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

— নিধনপুর তাম্রশাসনটি মৈথিল ব্রাহ্মণদের শ্রীহট্টে আগমনের সূত্রে পঞ্চখণ্ডে এসেছিল।

— নিধনপুর এবং পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণরা এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। দুটি তাম্রশাসনের ব্রাহ্মণরাই ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের।

— নিধনপুর তাম্রশাসনের কায়স্থ পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণরা সম্ভবত ছিলেন নাগরব্রাহ্মণ, যারা বৃত্তি থেকে জাতিতে সামাজিক পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতিগতভাবে কায়স্থ হিসেবে সমাজবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু এই শাসনোক্ত কায়স্থ পদবীগুলি থেকে স্বতঃ-প্রমাণিত হয় না যে তাঁরাই শ্রীহট্টের কায়স্থ সমাজের স্রষ্টা।

এই প্রেক্ষিতে নিধনপুর তাম্রশাসনের আঁকাবাঁকা ইতিহাসের পথের শেষে আমরা চন্দ্রপুরি-ময়ূরশাল্মলের সন্ধান পাই শ্রীহট্টে নয়, উত্তরবঙ্গে।

নির্দেশিকা

১. নীহাররঞ্জন রায, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ১৩৫৬, পৃ ১২৮।

২ Kamalakanta Gupta, Copper-Plates of Sylhet, Vol I, Sylhet, 1967, pp 36-39, 49-50, 99, 107 দ্রষ্টব্য।

৩. Kamalakanta Gupta, ঐ, পৃ ৩০, ৩১, ৩৯ দ্রষ্টব্য।

৪ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, কামরূপশাসনাবলী, বারাণসী, ১৩৩৮, পৃ ৬ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫. (ক) উষারঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ ও পত্রিকা'র (১৪০০ বাংলা) সংকলিত কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ 'নিধনপুরের তাম্রফলক বা ভাস্করবর্মার তাম্রশাসন' (১৩৪৮) দ্রষ্টব্য।

(খ) Benoychandra Sen, Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, Calcutta, 1942 p 146 দ্রষ্টব্য।

(গ) P C Choudhury, The History of Civilisation of the People of Assam, Gauhati, 1959, pp 160, 162 দ্রষ্টব্য।

৬ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ, পৃ ৪-৬।

৭ R Mukherji and S K Maity, Corpus of Bengal Inscriptions, Calcutta, 1967 pp 107-108 দ্রষ্টব্য।

৮. (ক) Ichhimuddin Sarkar, Aspects of Historical Geography of Pragjyotisa - Kamarupa (Ancient Assam), Calcutta, 1992, p 149 দ্রষ্টব্য।

(খ) Kamalakanta Gupta Journal of the Varendra Research Museum, Vol 4 1975-76 p 9 দ্রষ্টব্য।

৯. উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, জাতিতত্ত্ববারিধি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১০. A L Basham, The Wonder that was India, Rupa Publication, 1982, pp 96-97 দ্রষ্টব্য।

১১. (ক) Debiprasad Chattopadhyaya (Ed), History and Society, Calcutta, 1978, pp 296-297 দ্রষ্টব্য।

(খ) Kamalakanta Gupta, Copper-Plates of Sylhet পৃ ১১৬ দ্রষ্টব্য।

১২. A L Basham, ঐ, পৃ ৬৮ দ্রষ্টব্য।

১৩. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ, পৃ ৫ পাদটীকা, ৫৭, ৭০ দ্রষ্টব্য।

১৪. P.C. Choudhury, ঐ, পৃ ২৩৮।

১৫. R.C. Majumdar (General Editor), The Age of Imperial Kanauj, Bombay, 1964, p. 61 দ্রষ্টব্য।

১৬. S. Beal (translated), Life of Heuen-Tsiang, London, 1911, p. 138।

১৭. A. Cunningham (ed), The Ancient Geography of India, Calcutta, 1924, p. 576 দ্রষ্টব্য।

১৮. Kamalakanta Gupta, ঐ, পৃ ১-এর পূর্ববর্তী মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

১৯. Nalini Ranjan Roychoudhury, Tripura through the Ages, New Delhi, 1983, p. 3

২০. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — পূর্বাংশ, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের টীকা, ১৯১১, পৃ ৬৭, ৬৯।

২১. ক্রমিক সংখ্যা ৫-এ উল্লিখিত কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ, পৃ ১৩৯।

২২. Suniti Kumar Chatterji, Kirata-Jana-Krti, Calcutta, 1951, p. 23f দ্রষ্টব্য।

২৩. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, ঐ, পূর্বাংশ, ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়, পৃ ৪৭, ৪৯-৫০।

২৪. ক্রমিক সংখ্যা ৫-এ উল্লিখিত কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ, পৃ ১৩৭-১৩৮।

২৫. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ, পৃ ৬-৭ দ্রষ্টব্য।

২৬. Edward Gait, A History of Assam, Calcutta, Reprinted 1967, p. 326 দ্রষ্টব্য।

২৭. দীনেশচন্দ্র সরকার, শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, ১৯৮২, পৃ ২২-২৩।

২৮. দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ ১৬৫-১৭০ দ্রষ্টব্য।

২৯. নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ ২৭৬।

৩০. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র গৌড়ের কথা (কলিকাতা, ১৩৯০) গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সরকারের ভূমিকা, পৃ (৩) ও (৪)।

৩১. T N Madan and Gopala Sarana (ed), Indian Anthropology, 1962, pp 143, 215-16 দ্রষ্টব্য।

৩২. (ক) Ramaprasad Chanda, The Indo-Aryan Races, New Delhi, Reprinted 1976, pp 188-91
  (খ) নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ ৪৩ দ্রষ্টব্য।
  (গ) Indian Antiquary, XI (1911), pp 32-33

৩৩. সুজিৎ চৌধুরী, শ্রীহট্ট - কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ ৭৫, ৭৬।

৩৪. (ক) A L Basham, ঐ, পৃ ১৪০, ১৪৯ ১৫১ দ্রষ্টব্য।
  (খ) J H Hutton, Caste in India, London, 1963 p 50 ff দ্রষ্টব্য।
  (গ) Nripendra Kumar Dutt, Origin and Growth of Caste in India, Vol I, Calcutta, 1968, p 31 দ্রষ্টব্য।
  (ঘ) A M Hocart, Caste, London, 1950, pp 23, 27-29, 45 দ্রষ্টব্য।

৩৫. Kamalakanta Gupta, ঐ, পৃ ৬৩ দ্রষ্টব্য।

৩৬ A L Basham, ঐ, পৃ ১৩৯।

৩৭ Kamalakanta Gupta, ঐ, পৃ ৪৯।

৩৮. Kamalakanta Gupta, ঐ, পৃ ৩৬ ৩৯, ৪৯, ৬২ দ্রষ্টব্য।

৩৯. সুজিৎ চৌধুরী, প্রসঙ্গ : নিধনপুর তাম্রশাসন — পত্রের জবাব, 'সাহিত্য' পত্রিকা, হাইলাকান্দি, ১লা বৈশাখ ১৪০০ সংখ্যা, পৃ ৯৯ দ্রষ্টব্য।

নিধনপুর তাম্রলিপি প্রসঙ্গে
তাম্রপত্রে গঙ্গিনিকা কূলবসতি।।

মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য

আমাদের আলোচনার কেন্দ্রস্থ বিষয় ভাস্কর বর্মণের নিধনপুর তাম্রপত্রে উল্লিখিত কিছু শব্দার্থের পুনর্মূল্যায়ন। এই তাম্রপত্র ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

তাম্রপত্রে উল্লিখিত স্থাননামগুলির অস্পষ্ট অর্থাদি পণ্ডিত মহলে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করে চলেছে। বিতর্কের অন্যতম কারণ এই দানভূমির প্রকৃত অবস্থান। পণ্ডিতগণ এই দানভূমি বর্তমান শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড, উত্তরবঙ্গ এবং বিহারের পূর্ণিয়া পর্যন্ত অনুসন্ধানে রত। এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু হয়তো স্থান সম্পর্কীয় প্রশ্নের সমাধানের দিকে সামান্য ইংগিত দিতে পারে। সঠিক সমাধানের জন্য আরো বিস্তারিত অনুসন্ধান এবং আলোচনার প্রয়োজন।

ভাস্কর বর্মণের নিধনপুর লিপির (১) ষষ্ঠ এবং সপ্তম ফলকে প্রদত্ত ভূমি সীমা—পূর্বে শুষ্ক কৌশিকা, পূর্ব - দক্ষিণে— সেই শুষ্ক কৌশিকা ডুম্বরীচ্ছেদ সংবেদ্যা, দক্ষিণে ডুম্বরীচ্ছেদ, দক্ষিণ পশ্চিমে-গঙ্গিনিকা ডুম্বরীচ্ছেদ সংবেদ্যা, পশ্চিমে — অধুনা সীমগঙ্গিনিকা, পশ্চিম উত্তরে — কুম্ভকারের গর্ত্ত এই সাথে পূর্ব মুখে বাঁক ফেরা গঙ্গিনিকা, উত্তরে — বৃহজ্জাটলী, উত্তর পূর্বে ব্যবহারী খাসোকের পুষ্কিরিণী এই সাথে শুষ্ক কৌশিকা।

এই সীমারেখায় নাম পাওয়া যায় শুষ্ক কৌশিকা, ডুম্বরীচ্ছেদ, কুম্ভকারের গর্ত্ত, গঙ্গিনিকা, বৃহজ্জাটলী, ব্যবহারি খাসোকের পুষ্কিরিণী। নিধনপুর তাম্রপত্রের প্রথম পাঠোদ্ধার করেন পদ্মনাথ ভট্টাচার্য। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য যে অর্থ নির্দেশ করেছিলেন, বিশেষ করে সীমানা সম্পর্কীয়তা অনুসরণ করেন মুকুন্দ মাধব শর্মা। (২) এবং কমলাকান্ত গুপ্ত। (৩) এই অনুবাদে দেখা যায় উত্তর সীমার বৃহজ্জাটলীর অর্থ বৃহজ্জাটলী গাছ।

প্রশ্ন উঠে এই রাজকীয় ঐতিহাসিক তাম্রপত্র দলিলে দানভূমির সীমা হিসাবে বৃক্ষের মত অস্থায়ী একটি মাত্র বস্তুকে কেন নেওয়া হল। অন্যত্র এই বৃহজ্জাটলীর অর্থ করা হয়েছে ফরেষ্ট বিশেষ অর্থে ঝোপ-ঝাড়। উদ্ধৃতি — A Forest is perishable and shifting, (৪) একটি বৃহৎ অঞ্চলের সীমা হিসাবে এই অর্থটি উপযোগী। গবেষণায় দেখা যাবে উত্তরাঞ্চলের এই সীমানা নিম্ন এবং জলাভূমি আকীর্ণ।

সীমারেখায় আর একটি শব্দ 'ডুম্বরীচ্ছেদ"। এ যাবৎ যে সব অনুবাদে হয়েছে— A piece of hewn fig tree এবং A cut down fig tree, অর্থাৎ কাটা ডুমুর গাছ। এই কাটা

ডুমুর গাছ্ ময়ূর-শাল্মল অগ্রহারের অন্তর্গত দান করা সুবিশাল গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শুষ্ক কৌশিকা বা গঙ্গিনিকা সহ মাথা গুঁজে সদর্পে অবস্থান ঘোষণা করছে। ভাস্কর বর্মণের রাজকীয় বিশিষ্ট কর্মচারী ভূমিসীমা প্রদাতা চন্দ্রপুরি নায়ক শ্রীক্ষিকুণ্ড মহাশয় কাটা এক-একটা ডুমুর গাছকে সুবিশাল দান করা অঞ্চলসীমা হিসাবে কেন চিহ্নিত করবেন এটি সাধারণ প্রশ্ন। এই দান করা ভূমির আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে ৫ মাইল এবং প্রস্থে ২$\frac{৩}{৪}$ মাইল। (৫) এই সুবিশাল ভূমির সীমা চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তাম্রপত্র দলিলে কাটা ডুমুরগাছ, যা কিনা সীমানা চিহ্নিত করার কালেই ধ্বংসপ্রাপ্ত, তার উল্লেখ অসঙ্গত ব্যাপার। শুধু তাই নয় তিন সীমান্ত জুড়ে ডুমুর গাছ, তাও আবার একই রকম কাটা ডুমুর গাছ। এ ধরনের সীমানা চিহ্নিতকরণে কাটা ডুমুর গাছকে রাজকীয় গুরুত্ব দেওয়া একান্ত অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

স্বাভাবিকভাবে এই ডুম্বরীচ্ছেদ শব্দ সম্পর্কে অন্য ভাবনা-চিন্তার উদয় হয়। ডুম্বরী নামক কোন ভূমি অঞ্চল আছে কিনা এ সম্পর্কে চিন্তা করা যায়। পুরানো ইতিহাস ঘেঁটে 'উডুম্বরী' নামক একটি স্থানের সংবাদ পাওয়া যায়। উডুম্বরী নামক অঞ্চল ভাস্করের কাছাকাছি সময়ে জয়নাগের বপ্পঘোষবাট তাম্রপত্রে দেখা যায়। (৬) উডুম্বরী বিষয় কর্ণ-সুবর্ণের অর্ন্তগত। কর্ণসুবর্ণ থেকে রাজা জয়নাগ উডুম্বরী বিষয়ের অন্তর্গত বপ্পঘোষবাট নামক গ্রাম, ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামীকে দান করেছেন।

রাজা জয়নাগের বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায় না। সাধারণভাবে জয়নাগের কাল ভাস্কর বর্মনের কাছাকাছি। জয়নাগের এই তাম্রপত্র নিধনপুর তাম্রপত্রের পূর্ববর্তী। ডঃ বসাক মনে কবেন, জয়নাগ-শশাঙ্কের পূর্ববর্তী (৭) ডঃ পি, সি, চৌধুরী বলেন, — সম্ভবতঃ জয়নাগের সাথে ভাস্করেব যুদ্ধ হয়েছিল — অন্যদিকে জয়নাগের সাথে শশাঙ্কেরও যুদ্ধ হয়ে থাকতে পাবে (৮) ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের অভিমত, জয়নাগের সময়কাল ৫৫০ থেকে ৬৫০ খৃষ্টাব্দেব মধ্যে অবস্থিত। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর — শশাঙ্কেব পুত্রের শাসন কালের অস্থির সময়ে এবং ভাস্কর বর্মনের প্রাধান্যকালে শশাঙ্কের রাজ্য জয়নাগের হাতে চলে যায় (৯)।

বপ্পঘোষবাট তাম্রপত্রে দেখা যায় জয়নাগ বৈষ্ণব (পরমভাগবত)। সামন্ত নারায়ন ভদ্র উডুম্ববীক বিষয়ের শাসনকর্তা। নারায়ন ভদ্রের অধীনে মহাপ্রতিহার সূর্যসেন ব্যবহারি পদধারী (তদ্ ব্যবহারি)। সীলে অবক্ষয়িত গজলক্ষ্মীর দণ্ডায়মান মূর্তি। দুটি অথবা একটি হাতীর কুম্ভাভিষেক চিত্ররূপ। বর্তমান আলোচনা অংশে জয়নাগের এবং ভাস্করের তাম্রপত্র দুটিব মধ্যে বিষয়গত, স্থান, নাম ইত্যাদি বিষয়ক কোন যোগসূত্র পাওয়া যায় কিনা এ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা যায়।

বপ্পঘোষবাট তাম্রপত্রে প্রদত্ত ভূমির উত্তর এবং পূর্ব সীমায় গঙ্গিনিকা (উত্তর স্যাং গঙ্গিনিকা পূর্ব স্যামিয়ম এবম্ গঙ্গিনিকা) ভাস্করের তাম্রপত্রে গঙ্গিনিকা, ভূমি সীমার দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম এবং পশ্চিম-উত্তরে দেখা যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাম্রপত্র দুটিতে উল্লিখিত গঙ্গিনিকা কি একই জলধারা? অথবা ভিন্ন? উত্তরে বলা যায়, কোন একটি বিশিষ্ট ধারার নাম গঙ্গিনিকা। যে কোন মৃত নদীর শুষ্কখাত হিসাবে এই ঐতিহাসিক তাম্রপত্র দুটিতে 'গঙ্গিনিকা' অন্তত সেই সময়কালে সাধাবণভাবে উদ্ধৃত হয়নি।

পরবর্তী প্রশ্ন — জলধারা সাধাবণত দূর-দূরান্ত ব্যাপী প্রবাহিত হয়, সুতরাং তাম্রপত্র দুটির অবস্থান নিকটবর্তী বা দূরবর্তী এব নিরূপণ সমস্যাজনক।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, বপ্পঘোষবাট গ্রাম উডুম্বরী বিষয়েব অন্তর্গত। অন্যদিকে নিধনপুব লিপির ভূমি সীমাব তিন দিক ব্যাপী যে ডুম্বরী অবস্থিত তা মূলতঃ উডুম্বরী বিষয়ের ভূমি সীমা স্পর্শ করে আছে, অর্থাৎ উডুম্বরী বিষয়েব ভূমি সীমায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। উডুম্বরী বিষয়ের ভূমি সীমায পৌঁছে ছিন্ন হযেছে বলে-ডুম্বরীচ্ছেদ শব্দের উদ্ভব। উডুম্বরী শব্দেব "উ" ধ্বনী কেন ভাস্করের তাম্রপত্রে উহ্য হয়েছে ইহা পববর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

গঙ্গিনিকার ধারা উডুম্ববী বিষয়েব বপ্পঘোষবাট গ্রাম স্পর্শ করেছে। গঙ্গিনিকা চন্দ্রপুর বিষয়ের ময়ূবশাল্মল অগ্রহার স্পর্শ করেছে। ময়ূরশাল্মল অগ্রহাব উডুম্বরী বিষয় স্পর্শ কবেছে। এই সমীকরণে দেখা যায— উডুম্বরী বিষয় এবং চন্দ্রপুর বিষয় একান্ত পাশাপাশি দুটি বিষয়।

ময়ূরশাল্মল অগ্রহারের পশ্চিমোত্তরে গঙ্গিনিকা এবং এই গঙ্গিনিকা পূর্বমুখী হয়ে বাঁক নিয়েছে। বপ্পঘোষবাটের উত্তর সীমায় গঙ্গিনিকা। স্বাভাবিক ভাবেই এই বপ্পঘোষবাট গ্রামেব উত্তর সীমার গঙ্গিনিকা, ময়ূরশাল্মলেব পশ্চিম-উত্তর সীমার গঙ্গিনিকা যা পূর্বমুখী হয়েছে তার সাথে মিলে যেতে পারে।

এখন এ দুটি তাম্রপত্রে উল্লিখিত গঙ্গিনিকার প্রবাহ ধারা সম্পর্কে আলোচনা কবা যাক। এখানে উল্লেখ্য, বপ্পঘোষবাট গ্রাম ময়ূরশাল্মলের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই পূর্বদিকে অবস্থান সম্পর্কে তাম্রপত্রে ইঙ্গিত আছে। গঙ্গিনিকা প্রথমে বপ্পঘোষবাট গ্রামের পূর্বসীমা চিহ্নিত কবে বাঁক নিযে আবার উত্তর সীমা নির্দেশ করেছে। তারপর এই ধারা ময়ূরশাল্মলীর উত্তর সীমা নির্দ্ধারণ করে আবার বাঁক নিয়ে ময়ূরশাল্মলের পশ্চিম সীমা নির্দ্ধাবণ করেছে। অর্থাৎ এ দুটি তাম্রপত্রোক্ত অঞ্চলকে গঙ্গিনিকা ডিম্বাকাবে বেষ্টন করে আছে।

এখন দেখা যাক্ ময়ূরশাল্মলে ভাস্করের দান করা ভূমি কি ভাবে জয়নাগেব দানকরা বপ্পঘোষবাট গ্রামের পশ্চিমদিকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

জয়নাগের এই তাম্রপত্রে দানকরা ভূমির পশ্চিম সীমানার নির্দেশ — "পশ্চিম স্যান দিশি কুতকুট গ্রামীন ব্রাহ্মন্যাম সক্ত তাম্রপট্ট সীমা।" অর্থাৎ পশ্চিম সীমানা তাম্রপত্রে প্রদত্ত ব্রাহ্মণদের কুতকুট গ্রাম স্পর্শ করে আছে। লিপিতে কুতকুট এবং কুটকুট্ট এই দুটি নামই দেখা যায়। এখানে দেখা যায় ময়ূরশাল্মল অগ্রহার অথবা চন্দ্রপুর বিষয়ের নাম উল্লেখ হয়নি। অন্যদিকে

ভাস্করের তাম্রপত্রে দেবসত্রেব নাম উল্লেখ করা হয়নি। সচেতনভাবে দেবসত্রের নাম বর্জন করা হয়েছে। ভূমিদান সূচক তাম্রপত্রে দেবতার নাম উল্লেখ করা একটি প্রাচীন রীতি। এখানে যে উল্লেখ করা হয়নি, তার অন্যতম কারণ হতে পারে দেবসত্রের নামটি তাম্রপত্রের মূল খসড়া লেখক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব পছন্দ হয়নি। এই তাম্রপত্রের লিপির মধ্যে সপ্তম শতকের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি বাণভট্টের ভাব ও ভাষা শৈলীব সাক্ষাৎ পাওয়া যায় (১০) খৃঃ সপ্তম শতকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেব মধ্যে কুটকুট্ট সাধাবণভাবে মোবগ অর্থে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। এই শব্দটি যে সুমহান অর্থ নিয়ে সৃষ্ট হযেছিল, তা-কালক্রমে-অর্থভ্রষ্ট হয়ে কাছাকাছি ধ্বনি যুক্ত অন্য পরিচিত শব্দে পবিবর্ত্তিত হয়ে মোবগ হয়ে গেছে। কিন্তু দেবী শক্তির সাথে সম্পর্কিত এই কুটকুট্টকে অস্বীকার কবা সম্ভব হয়নি। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর রূপ চিত্রে দেখা যায় "ময়ূর কুক্কুটবৃতে মহাশক্তি ধরেহনঘে (১১) অর্থাৎ দেবী ময়ূর এবং কুক্কুট কর্তৃক পরিবৃতা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবীর অন্যতম নাম "মহা-মায়ূরী" (১২) সুতরাং অনুমান করা যায় ভূতি বর্মনের এই দেবসত্রের নাম ছিল— 'কুটকুট্ট সত্র'। ভাস্করেব তাম্রপত্রে কুটকুট্ট নামের বদলে সম্ভবতঃ ময়ূব শব্দ সৃষ্ট হয়েছে। তাম্রপত্রে ময়ূর শব্দ লেখা হলেও জনমানসে সম্ভবতঃ দীর্ঘদিন এই কুটকুট্ট বা কুক্কুট শব্দ থেকে গিয়েছিল।

এমনি ধরনের নাম খৃঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথমাংশের বিজয় সেনের মল্ল-সারল তাম্রপত্রে দেখা যায়। (১৩)। এই তাম্রপত্রের বিষয়াদি কিছু রাজকর্মচাবী এবং আটটি গ্রামের কিছু মুখ্য স্থানীয় ব্যক্তিদের জ্ঞাপন করা হয়। এই গ্রামগুলিব মধ্যে দুটির নাম উল্লেখ্য। শাল্মলি বাটকের জীবস্বামী এবং কুট্টবীব অগ্রহারের ভট্টবামন স্বামী। যদিও শুধুমাত্র নাম নিয়ে একটির সাথে অন্যটিকে যুক্ত করা যায় না তবুও কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে। শাল্মলি বাটকের সাথে ময়ূব-শাল্মল এবং কুট্টবীর নামের সাথে কুটকুট্ট গ্রামেব 'কুট্ট শব্দ, বপ্পঘোষবাট গ্রামের দানগ্রহীতা ভট্টব্রহ্মবীর স্বামীর 'বীর' শব্দযুক্ত হয়ে দুটি গ্রাম একত্রে কুট্টবীর হতে পাবে।

আর একটি উল্লেখ্য বিষয়—– এদুটি গ্রামের ব্রাহ্মণদের উপাধি স্বামী।

খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে-আবার একটি ককুদচ্ছত্রের সাক্ষাৎ পাওযা যায। ককুদচ্ছত্র শব্দটি শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রপত্রে দেখা যায় (১৪)। বাক্যাংশ হচ্ছে — "আধারো হরিকেল রাজ ককুদচ্ছত্র স্মিতাং শ্রিরাং"। ডঃ আর জি-বসাক এবং এন. জি. মজুমদার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ করেছেন :— Dr. R.G. Basak— "The support of the royal majesty smiling in the royal umbrella of the King of Harikela." — N.G. Mazumdar— "The support of the Goddess of fortune (of other King) smiling at (i.e. joyful on account of) the umbrella which was the royal insignia of the King of Harikela." ১৫)

এই অনুবাদে দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই ককুদচ্ছত্র শব্দে "ছত্র" কে ছাতা অর্থাৎ umbrella করা হয়েছে। এই ছাতা শব্দটিই সঠিক অর্থ প্রকাশে বাধার কারণ হয়ে উঠেছে। ককুদচ্ছত্র

শব্দকে ককুদসত্র কবা অধিক যুক্তিযুক্ত। শ্রীচন্দ্রেব তাম্রপত্র গুলিতে ছাতা অর্থে "চ্ছত্র" ব্যবহৃত হয়নি। ছাতা অর্থাৎ umbrella অর্থে 'আতপত্র' শব্দ ব্যবহৃত। শ্রীচন্দ্রেব আলোচ্য বামপাল-তাম্রপত্রেব অষ্টম স্তবকে; শ্রীচন্দ্রেব পশ্চিম ভাগ তাম্রপত্রেব দ্বিতীয় স্তবকে (১৬); শ্রীচন্দ্রেব কেদাবপুব (খসডা) তাম্রপত্রেব দ্বিতীয় স্তবকে (১৭) পবিচ্ছন্নভাবে— "আতপত্র" শব্দ লেখা বযেছে। এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী বাধাগোবিন্দ বসাক প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই আতপত্রকে ছাতা অর্থাৎ Umbrella রূপে অনুবাদ কবেছেন। শ্রীচন্দ্রেব একমাত্র বামপাল তাম্রপত্রেই এই "ককুদচ্ছত্র" শব্দ দেখা গেছে। এই "চ্ছত্র" শব্দকে উপবে উদ্ধৃত পণ্ডিতগণ ছাতা অর্থাৎ Umbrella রূপে ব্যাখ্যা কবেছেন।

ককুদ শব্দকে এন-জি মজুমদাব "goddess of fortune" রূপে ব্যাখ্যা কবেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে দেবীকে "মযূব কুক্কুট বৃতা" রূপে দেখা গেছে। এই কুক্কুট, ককৃদ এবং কুটকুট্ট মূলতঃ একই শব্দেব বকম ফেব। এই শব্দটিব জেব টেনে আবো আগে এগিযে গেলে দেখা যাবে "কোকামুখ" দেবতাকে। খৃষ্টীয পঞ্চম শতকেব শেষার্দ্ধে বুধগুপ্তেব দামোদব তাম্রপত্রে (১৮) কোকামুখ স্বামী এবং ববাহ স্বামী দেবতাব জন্য যথাক্রমে চাব এবং সাত কূল্যভাগ ভূমি দান কবতে দেখা যায। ডঃ আব, জি, বসাক মহাভাবতেব দুর্গাস্তোত্র অনুসাবে এই কোকামুখ শব্দকে দেবী দুর্গাব অন্যতম নাম বলে মন্তব্য কবেছেন এবং ডঃ ডি. সি. সবকাব বিষ্ণুব ববাহরূপেব সাথে সংযুক্ত কবেছেন (১৯)।

কোকামুখ বঙ্গদেশেব অন্যতম প্রাচিন দেবতা। প্রাচীনকালে পূর্ব এবং উত্তব ভাবতে মন-খেমেব সভ্যতা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই মনখেমেবগণ বৈদিক আর্যপূর্ব ভাবতে প্রবেশ কবেন। এই মন-খেমেব ধ্যান-ধাবণা ভাবতেব হিন্দুধর্মীয ধ্যান ধাবণাব অন্যতম প্রধান উৎস (২০) মনখেমেবগণ একটি মিশ্রজাতি, খানিকটা কাস্পিযান, খানিকটা অষ্ট্রলোইড কিছুটা আলপাইন (২১)। মেঘালযেব খাসিভাষা মনখেমেব গোষ্ঠীব অষ্ট্রিক ভাষা হিসাবে সাধাবণভাবে পবিচিত। এই ভাষায নানা কাবণে প্রাচীনত্ব সুবক্ষিত। মনখেমেব গোষ্ঠীব খাসি ভাষাব আলোকে কোকামুখ শব্দেব অর্থ great mother বা বহু সন্তানেব জননী হতে পাবে।

কোকামুখ শব্দেব কাছাকাছি 'কি-কামাই-খা'। এই 'কিকামাইখ' শব্দেব বিশ্লেষণ— কি+কামাই+খা; 'কি' খাসি ভাষায বহুবচন ভাব প্রকাশক উপসর্গ (Pre-fix) কামাই— জননী; খা — সন্তান। অথ দাডায বহু সন্তানেব জননী। এই 'কিকামাইখ্য' শব্দেব উপসর্গ "কি" ছেটে দিলে শব্দটি দাডায "কামাইখা"। এই কামাইখা শব্দটি সম্ভবত কামাক্ষ্যা দেবিব নাম সৃষ্টি কবেছে। উল্লেখ্য কামাক্ষ্যা কাহিনীব সাথে মোবগেব ভূমিকা আছে। মহামাতৃকা (great mother) অর্চ্চনা সু-প্রাচীন কালে এশিযা মাইনব, ভূমধ্য সাগবীয অঞ্চল, ব্যবিলন প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। (২১) খাসি ভাষাব আলোকে কোকামুখ বিশ্লেষণ একটি ব্যাতিক্রম ঘটনা নয। এই ভাষাব আলোকে ভাবতেব সুপ্রাচিন অনেক শব্দাবলীব যুক্তিসংগত বিশ্লেষণ হতে পাবে। যেমন গ্রীক সূত্রে প্রাপ্ত পূর্ব ভাবতেব একটি জাতিব নাম 'গঙ্গা বেইড'। এই

'গঙ্গা বেইড' শব্দের "বেইড" খাসি ভাষায় 'জনতা'। গঙ্গাবেইড শব্দের অর্থ দাড়ায় গঙ্গা অঞ্চলের জন সাধারণ। তেমনি 'কিবাড়ে' (কিবাত) শব্দের ব্যাখ্যায় দাঁড়ায় কি+বাড়ে। কি— বহুবচন ভাব প্রকাশক উপসর্গ এবং বাড়ে বা বেইড অর্থ জনসাধারণ। 'কিবাড়ে' শব্দের অর্থ — 'জনতা'। উড়ুম্বরীক শব্দের মধ্যে নানা ভাষার মিশ্রণ থাকলেও মনখেমের ভাষার প্রভাব অধিক। উড়ুম্বরিক = উ+ডি+উম+বারি। উ— খাসি ভাষায় পুরুষ বা বৃহৎবাচক উপসর্গ। ডি— পান করা; উম— জল; বারি শব্দটি সম্ভবত একটি মিশ্রণশব্দ। বারি— সংস্কৃতে জল। 'আর — উ' — সেমেটিক ভাষায় নদী। 'এর — উ' — 'অর — উ' দ্রাবিড় ভাষায়— নদী— (২২)। ক — ক্ষুদ্র বা স্থিরকৃত ভাব জ্ঞাপক অনুসর্গ। এই উড়ুম্বরীক শব্দ সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করত। পরবর্তীকালে এই শব্দ থেকে অন্যান্য স্থান বা অঞ্চলবাচক নাম সৃষ্ট হতে পারে। যেমন বরাক; বারক (মণ্ডল) — ২৩।

উড়ুম্বরী নাম দীর্ঘদিন টিকে ছিল। এই নাম আকবরের কালেও ছিল। বিহার-বঙ্গ অঞ্চলে পুর্ণিয়া এবং ঔদম্বর (অন্য নাম তাণ্ডা) নামক দুটি সরকারের নাম আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখা যায় (২৪)

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে নিধনপুর লিপির ডুম্বরী শব্দ উড়ুম্বরী বিষয়কে চিহ্নিত করেছে। এখানে 'উ' লুপ্ত। এর কারণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে পণ্ডিতগণ স্থানীয় প্রাচীন নামগুলির প্রকৃত অর্থ ভ্রষ্ট হয়ে অনেক ক্ষেত্রে সচেতনভাবে পরিচিত অর্থের ছায়ায় নামগুলির আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করেন। ইতিপূর্বে – কুটকুট্ট যে ভাবে ময়ূর হয়ে গেল তেমনি উড়ুম্বরী — ডুম্বরী হলো। সংস্কৃত ভাষায় ডুম্বরী এক ধরনের নিকৃষ্ট ফল। শব্দের এই ধরনের পরিবর্ত্তনকে ভাষাশাস্ত্রে 'লোক-নিরুক্তি' (Folk-etomology) বলা হয়। এমনি ভাবে ইংরেজী আর্ম চেয়ার থেকে সৃষ্ট হয়েছে — আরাম কেদারা।

এখন দেখা যেতে পারে আরো কোন সূত্রে দুটি তাম্রপত্রের ভূমিদ্বয়ের সংযোগ করা সম্ভব কিনা? এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা বপ্পঘোষবাট গ্রামের অন্যদিকের সীমানা-সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করব। এই গ্রামের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে— উত্তরমুখে এগিয়ে যাওয়া— সীমারেখা কি ভাবে গ্রামের সম্পূর্ণ পশ্চিম দিকের সীমানা চিহ্নিত করেছে তার বিবরণ তাম্রপত্রে লেখা হয়েছে— মূল অংশ উদ্ধৃত করা হল—

"পশ্চিমস্যান দিশি কুতকুট গ্রামীণ
ব্রাহ্মণ্যাম্ সক্ত তাম্রপট্ট সীমা।।
উত্তরসাং গঙ্গিনিকা
পূর্বস্যামিয়ম এবং গঙ্গিনিকা
তত মিসসৃতো অমল পৌতিক গ্রাম
পশ্চিম সীমন অনুগতস সর্ষপ যানকঃ
তেন এব সীমানা সমপরিবচ্ছিন্নে যাবদ্

ভট্ট উন্মীলন স্বামি তাম্রপট্ট ইতি।
তস্মাচ্চ - দক্ষিণে দিগু
ভাগাদ ভূরস তেন এ'ব সীমন্
উত্তরণ দিশামনু বলমানস তাবয়া আগতে।
যাবদ ভরনী স্বামি তাম্রপট্ট সীমৈতি
ততোহপি প্রগুণেন ভট্ট উন্মীলন
স্বামি তাম্রপট্ট সীমনি বখট সুমালিকা দেব
খাতম প্রবিশ্য তাবদ গতো যাবৎ
স এব কূটকূট্ট গ্রামীণ ব্রাহ্মণ সীমৈতি।"

এই সীমারেখায় লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, গ্রামের দক্ষিণ সীমার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কিছু অংশে সর্ষপ নামক যান। তারপর এই দক্ষিণ সীমায় যানের চিহ্ন নেই। যানের বদলে কিছু ব্যক্তির ভূমিসীমা। তারপর এই সীমারেখা বাঁক ফিরে উত্তরমুখী হয়ে গ্রামের পশ্চিম সীমারেখা নির্দেশ করে এগিয়ে চলছে। এখানেও সর্ষপ যানের নাম নেই। এই অংশ আমাদের বিচার অনুসারে শুষ্ক কৌশিকা ধারা যা ভাস্করের প্রদত্ত ব্রাহ্মণ বসতির পূর্ব সীমান্ত। এই সম্পর্কে বলা যায় শুষ্ক কৌশিকার পূর্ব তীরে জয়নাগের কালেই তাম্রপত্রে প্রাপ্ত ভূমিতে ব্রাহ্মণ বসতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। জয়নাগের প্রদত্ত ভূমি সীমায় শুষ্ক কৌশিকার ধারা লিপিবদ্ধ হয়নি। বপ্পঘোষবাট গ্রাম সীমারেখা শুষ্ক কৌশিকা ধারায় পৌঁছায় নি।

বিশেষ উল্লেখ্য, বপ্পঘোষবাট গ্রামের পশ্চিম সীমান্তরেখা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে ক্রমশঃ উত্তরদিকে এগিয়ে এসে একটি খাতে (খাতম) প্রবেশ করেছে। খাতের অধিকারী বখট সুমালিকা দেব। ইতিপূর্বে ভাস্করের নিধনপুর তাম্রপত্রে দেখা গেছে, ব্রাহ্মণ বসতির উত্তর-পূর্ব সীমায় আছে ব্যবহারী খাসোকের পুষ্করিনীসহ শুষ্ক কৌশিকা। এখানে দুটি তাম্রপত্রে প্রদত্ত অঞ্চলদ্বয়ের সাধারণ সম্মিলন স্থান লক্ষ্য করা যায়। 'খাতম' এবং 'পুষ্কিরিণী' জলাঞ্চল সম্পর্কীয় শব্দ। 'খাসোক' এবং 'বখট' এই নাম দুটি একই ধরনের শব্দ। 'বখট — বখস্ শব্দের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

বখস্ — অর্থ হতে পারে 'খস' জাতীয় জনগোষ্ঠী। 'বা' খাসি ভাষায় শ্রী/ শ্রদ্ধেয় অর্থে নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। বখট সুমালিকা দেব — খাসোকের পূর্ব-পুরুষ হতে পারেন— এবং সুমালিকা দেবের খাতমই খাসোকের পুষ্করিণী। খাতম সাধারণ প্রাকৃতিক জলাশয় সংস্কৃত হয়ে পুষ্কিরিণী নাম নিতে পারে। এই খাতম বা পুষ্করিণীতে দক্ষিণ থেকে আগত শুষ্ক কৌশিকার ধারা, ময়ূর-শাল্মল অঞ্চলের পূর্ব সীমা চিহ্নিত করেছে। বপ্পঘোষবাট অঞ্চলের পূর্বসীমা চিহ্নিতকারী সর্ষপ যান (পথ) পূর্বদিক থেকে এসে, ময়ূর শাল্মল অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের এই শুষ্ক কৌশিকার কূলে উপস্থিত হয়েছে।

অতীত ইতিহাসের জের টানলে হয়তো আরো দূরে যাওয়া যায়। এই কুটকুট্র সত্র ভূতিবর্মণের পূর্ববর্তী কোকামুখ দেব অঞ্চলের স্পর্শ পেতে পারে। এন, এন দাশগুপ্তের অভিমত— ময়ূর-শাল্মল অঞ্চল বুধগুপ্তের হাত থেকে সাময়িকভাবে ভূতিবর্মণের হাতে গিয়েছিল। (২৫) ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, বুধগুপ্ত কোকামুখস্বামী এবং বরাহ স্বামী দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে এগারো কুলাবপ ভূমি দান করেছিলেন।

নিধনপুর লিপিতে শুধুমাত্র ময়ূর শাল্মল অঞ্চলের সংবাদ পাওয়া যায়। বপ্পঘোষবাট অঞ্চলের কোন খবর জানা নেই। তবে ভাস্কর বর্মণের 'ধোবি' তাম্রপত্র (২৬) যদি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যেত, তা হলে হয়তো বা কোন সংবাদ আমরা পেতে পারতাম। ধোবি তাম্রপত্রে নিধনপুর লিপির মত লেখা আছে, ভূতি বর্মণের তাম্রপত্র বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় নূতন করে এই তাম্রপত্র রচনা করা হল। দানগ্রহীতার নামগুলি বিশেষ উল্লেখ্য, যেমন— ভট্ট প্রিয়ঙ্কর ঘোষ স্বামী প্রমুখ। অক্ষত প্রায় দশ বারোটি নামের মধ্যে দশজনের উপাধি 'ঘোষস্বামী' এবং আটটি নামের পূর্বে 'ভট্ট' যুক্ত। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, গ্রামের নাম বপ্পঘোষবাট এবং দান গ্রহীতার নাম ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী। এই গ্রাম সীমায় জনৈক ভট্ট উন্মীলন স্বামীর নামও দেখা গেছে। উল্লেখ্য, নিধনপুর তাম্রপত্রের নাম তালিকায় নামের শেষে 'ভট্ট' যুক্ত অনেকেই আছেন, কিন্তু নামের পূর্বে 'ভট্ট' যুক্ত একজনও নেই।

কুটকুট্র এবং ময়ূর শব্দদ্বয়ের সম্পর্ক উড়ুম্বরী বিষয় এবং চন্দ্রপুরী বিষয়ের পাশাপাশি অবস্থান, রখট সুমালিকা দেবের খাতম এবং ব্যবহারী খাসোকের পুষ্করিণী সাম্যরূপ, রখট এবং খাসোক শব্দ সামঞ্জস্য, উভয় অঞ্চলের স্বামী উপাধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ, একই স্থান কর্ণসুবর্ণ থেকে জয়নাগ এবং ভাস্করের তাম্রপত্রদ্বয় প্রদান, জয়নাগ এবং ভাস্করের শাসন কালের কালগত নৈকট্য, দুটি অঞ্চল ছুঁয়ে গঙ্গিনিকার অবস্থিতি, এই সব কারণে বলা যায়— গঙ্গিনিকার অবিচ্ছিন্ন ধারায় আবদ্ধ দুটি সন্তানের মত একান্ত পাশাপাশি অবস্থিত ছিল ময়ূর শাল্মল এবং বপ্পঘোষবাট। এই পাশাপাশি সন্তানদ্বয়ের মধ্যে নবীনা— বপ্পঘোষবাট। গঙ্গিনিকা আর কৌশিকার পলি জমে জমে গড়ে উঠেছে এই নবীনা। এই কুমারী ভূমিকে 'অক্ষয়নীবি ধর্ম্ম' রীতি অনুসারে সম্প্রদান করলেন ভট্টব্রহ্ম বীর স্বামীর হাতে। 'অক্ষয়নীবিধর্ম্ম' হচ্ছে, যে কুমারী ভূমি (undistributed wastes) ইতিপূর্বে দান করা হয়নি — সেই ভূমিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রদান করা। (২৭)

১. Epigraphia Indica, XII, No 13, XIX, p 116

২. M M Sharma, Inscriptions of Ancient Assam, 1976

৩. K K Gupta, Copper Plates of Sylhet,—

৪. B C Sen, Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, P 147

৫. Ibid., P. 145
৬. Epigraphia Indica, Vol. XVIII, P-60
৭. P. R. Mukherjee & S. K. Maiti., Corpus of Bengal Inscriptions, P. 6
৮. P. C. Choudhury, A History of the Civilization of the people of Assam to the 12th Century
৯. R. C. Mazumdar, History of Ancient Bengal, P—73
১০. Sharma, op cit
১১. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীশ্রীচণ্ডী, উত্তর চরিত, একাদশ অধ্যায়।
১২. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতে শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ; পৃঃ ১২৯
১৩. Epigraphia Indica, Vol XXIII. P, 159
১৪. Ibid, Vol. XII, PP 136—142
১৫. P. R. Mukherjee, op, cit, P, 24
১৬. K. K. Gupta, op. cit. PP. 81—152
১৭. Epigraphia Indica, XVII PP, 188—192
১৮. Ibid, p, 137-also D.C. Sarkar, Select Inscriptions, P-32
১৯. Mazumdar, op cit P-512
২০: J. F. Cady, South-East Asia. Its Historical Development P-16
২১. দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৪
২২. R. T. Rev. Robert Cold Well, Comparative Grammer of the Dravidian or South Indian Family of Languages P-607
২৩. Faridpur Copperplates of Dharmaditya's Times (6th Century AD)
২৪. Sen op cit P 56 ২৫. Choudhury, op cit P-147
২৬. Journal of the Assam Research Society XI, Nos 3 - 4 PP 33—38 Sarma, op cit PP 10 — 32
২৭ Sen, op cit, P-571

বরাক উপত্যকার ইতিহাসের রূপরেখা

জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য

কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ— দক্ষিণ আসামের এই তিনটি জেলা, অর্থাৎ বরাক উপত্যকা। আয়তন সাত হাজার বর্গ কিলোমিটাব, লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। হাইলাকান্দি অতি সম্প্রতিও কাছাড় জেলাব এক মহকুমা ছিল, আব করিমগঞ্জ ছিল ১৯৪৭ সাল অবধি শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত। দেশ বিভাগের সময় গণভোটেব মাধ্যমে শ্রীহট্টেব বাকীটুকু পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় করিমগঞ্জ আসামেই থেকে যায়। কিন্তু ভৌগোলিক কাঠামোয় অবিভক্ত কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলা এবং প্রতিবেশী ত্রিপুবা রাজ্যের কৈলাসহর-ধর্ম্মনগর অঞ্চল নিয়ে বরাক উপত্যকা। কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলা দু'টি ১৮৭৪ সালে তদানিন্তন বৃটিশ সরকাব বঙ্গদেশ থেকে আসামে সরিয়ে দেন এবং বৃটিশ রাজত্বে এই দুটি জেলাকে বলা হত সুবমা উপত্যকা। কারণ, উপত্যকার মূল নদী ববাক কবিমগঞ্জেব কাছে সুরমা ও কুশিয়ারা এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে শ্রীহট্টে প্রবেশ করেছে। সুরমাব তীবে অবস্থিত শ্রীহট্ট শহর তখন ছিল সমগ্র উপত্যকাব প্রাণকেন্দ্র। স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশ সাহেবেরা এর প্রাশাসনিক নাম দিয়েছিলেন সুরমা উপত্যকা। স্বাধীনতার পব শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ ও হাফলং (উত্তর কাছাড়) এই চারটে মহকুমা নিয়ে ছিল কাছাড় জেলা। ১৯৫৩ সালে হাফলং মহকুমাকে কাছাড় থেকে সরিয়ে নিয়ে জুড়ে দেয়া হলো মিকিব (কার্বি অংলং) পাহাড়ের সাথে। তখন থেকে অবিভক্ত সুরমা উপত্যকাব যে সমতল অংশ ভাবতবর্ষে থেকে গিয়েছিল তা কাছাড় জেলা নামেই প্রাশাসনিক পরিচিতি লাভ করলো। কিন্তু ১৯৮৪ সালে কবিমগঞ্জ ও ১৯৮৯ সালে হাইলাকান্দি জেলা স্তরে উন্নীত হবার ফলে এই অঞ্চল আবার বরাক উপত্যকা নামে আত্মপ্রকাশ করেছে, যদিও ভৌগোলিক কাঠামোয় বৃহৎ বঙ্গের ঈশান কোণে অবস্থিত বঙ্গভাষী এই অঞ্চল এক সময়ে স্থানীয় লোক পরম্পরায় 'ঈশান বঙ্গ' নামে চিহ্নিত ছিল।[১]

বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক রূপরেখা টানতে গিয়ে ভূগোল, জনবিন্যাস ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই তিনটি সূত্রকে আমাদের ঘাটাতে হবে। জয়ন্তীয়া পাহাড়, উত্তরকাছাড় বা বড়াইল পাহাড় এবং মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরার পাহাড় উপত্যকার তিন দিক দিয়ে উঁচু দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে আর শুধু পশ্চিম দিকে বয়েছে গাঙ্গেয় বঙ্গদেশের সমতল অঞ্চল। উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান বা এর প্রাকৃতিক চরিত্র, আবহাওয়া বা জলবায়ু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই অঞ্চল বঙ্গভূমির স্বাভাবিক বিস্তাব মাত্র। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের প্রতিবেশী অঞ্চলের সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই। উত্তর ভাবত বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গ হয়ে কাছাড়ে আসাব পথে

প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি কখনো প্রতিহত হচ্ছে না। সেই জন্যেই অতি প্রাচীনকালে ভাবত-আর্য গোষ্ঠীব মানুষেরা ওদের পূর্বমুখী অবাধ গতি অব্যাহত রেখে ছড়িয়ে পড়েছিলেন বরাক-সুরমা উপত্যকায়। কিন্তু এখানে এসে সেই যাত্রা থেমে গিয়েছিল প্রতিবেশী পর্বতমালাব পাদদেশে। কারণ, লাঙ্গল প্রথার উত্তরাধিকারীদের কাছে পাহাড়ের পবিবেশ ছিল সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সম্ভবত পর্বতশ্রেণী তখনো ছিল ভারত-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। অতএব আর এগিয়ে যাওযা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে পর্বতবাসীদেরও সমতলে নেমে আসার প্রতি স্বভাবজাত অনীহা ছিল, কারণ বন্যা বিধ্বস্ত এই অঞ্চল ছিল জুমচাষের জন্য নিতান্ত অনুপযোগী। জলবিহীন সমতলভূমি তাই ছিল আগন্তুক ভারত-আর্য গোষ্ঠীর লোকেদের বসবাসের জন্য খুবই অনুকূল। সেইজন্য এখানেই তারা বসতি স্থাপন করেন। উপত্যকার এই আগন্তুকেরা তাদেব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন লাঙ্গল প্রথার অভিজ্ঞতা। নদী-নালা, খাল-বিলের দেশ বরাক-সুরমা উপত্যকার অনাবাদি উর্বর জমিতে কৃষিকার্য রয়ে গেল তাদেব মুখ্য জীবিকা হয়ে। উপত্যকার প্রত্যন্ত অঞ্চল কাছাড় ও হাইলাকান্দিতেও জনবসতি গড়ে উঠল। সুরক্ষার জন্য কোন রাজশক্তি ছিল না, অথচ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এবং হিংস্র জন্তু ও প্রতিবেশী পর্বতবাসীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। প্রতিটি বসতিব যৌথ নিরাপত্তার জন্য তাই খেল প্রথার প্রচলন হলো। উর্বর পতিত জমি পববর্তীকালে পশ্চিম থেকে আরও দলে দলে নবাগতদের উৎসাহিত করল বসতি স্থাপনের সপক্ষে। খেলের সংখ্যা বেড়ে চললো। তাই আগন্তুকেবা উপত্যকায় সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারত-আর্য ধাচে এখানকার গ্রাম, পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিলের নামাকরণ হলো। অপেক্ষাকৃত উঁচু টিলা অঞ্চলে হয়ত অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীব কিছু কিছু আদিবাসী ছিলেন অথবা প্রতিবেশী পাহাড় অঞ্চল থেকে কেউ কেউ পরবর্তীকালেও উপত্যকায় নেমে এসেছিলেন। কিন্তু তারা সকলেই উপত্যকাবাসীর মূল ধারায় মিশে গিয়েছিলেন অতি প্রাচীনকালে।[২] অর্থাৎ, অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও আর্য গোষ্ঠীর সমন্বয়ে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে যে বাঙ্গালী জাতির বিবর্তন হয়েছিল বরাক উপত্যকাও ছিল সেই প্রক্রিয়াব মূলস্রোতের স্বতঃস্ফূর্ত অংশীদার। তবে বরাক-সুরমা উপত্যকার বঙ্গভাষীদের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছুটা আঞ্চলিক স্বতন্ত্র ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল। উপত্যকার সংগে বঙ্গভাষী মূল ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সংযোগ ও অবাধ বিনিময় আবার সেই ভূখণ্ডেব পূর্বপ্রত্যন্তে জনজাতি অধ্যুষিত পাহাড়াঞ্চল পরিবেষ্টিত অবস্থানই এই উপত্যকাবাসীদের বাস্তবজীবনে মূল ও আঞ্চলিক দুই স্রোতের সহাবস্থানেব মূল উৎস।

বরাক উপত্যকার জনবিন্যাস ও প্রাকৃতিক অবস্থান পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করছে অবিভক্ত বাংলার প্রতিবেশী জেলাগুলোর সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক কাঠামোয়। ১৯৭১ সালের লোক গণনায় তদানিন্তন কাছাড় জিলার (বর্তমান কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ) মোট লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় আশি ভাগ ছিলেন বাংলাভাষী। কাছাড়ের মোট জনসংখ্যা তখন ছিল ১৭,৪৩,৪০০। এরমধ্যে বাংলাভাষী ছিলেন ১৩,৩২,২০০ জন। অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীব

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হিন্দিভাষী (১,৯৩,২০০ জন), মেইতেই মণিপুবী (৬৮, ৪০০), বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (৩৩,০০০), ডিমাছা (৯,২০০) এবং অসমীয়া (৬,৮০০)[৩]। অসমীয়াদেব অনেকেই বরাক উপত্যকায় এসেছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে অস্থায়ীভাবে বদলির চাকবির সূত্রে। অপর একটি অংশ বরাক উপত্যকাবই বাসিন্দা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে আগত এই বাসিন্দাবা দেহান নামে পরিচিত। এই দেহানবা এসেছিলেন ষোড়শ শতাব্দিতে কোচ সেনাপতি চিলা বায়েব আক্রমণের সময়। দেয়ান কমলনাবায়ণেব নেতৃত্বে তখন স্বাধীন খাসপুর রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।[৪] উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়ায় আসামে মোয়ামারিয়া বিদ্রোহেব সময় ঐ জনগোষ্ঠীর আরও কিছু লোক এসেছেন বরাক উপত্যকায়। কাছাড়ের ডিমাছা বাজা কৃষ্ণচন্দ্র মোয়ামাবিয়াদের অহম সরকাবেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব ব্যাপাবে ও কাছাড়ে আশ্রয় নিতে উৎসাহিত করেছিলেন সেই উল্লেখ বুবঞ্জীতে রযেছে।[৫] জনশ্রুতি অনুসাবে আসামে মাণেব (ব্রহ্মদেশীয) আক্রমণেব সময় অসমীয়াদের কয়েকটি পরিবার কাছাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তখন থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ঠিক তেমনি, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডিমাছা (হেডম্ব) রাজ্যেব বাজধানী যখন মাইবং থেকে খাসপুর স্থানান্তরিত হয়, তখন বাজপরিবার সহ বাজ্যশাসন কার্যে জড়িত প্রায় পঞ্চাশটি ডিমাছা পরিবার সমতল কাছাড়ে নেমে আসেন।[৬] মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে উত্তর-কাছাড় পাহাড়ে তুলাবামেব নেতৃত্বে বিদ্রোহেব সময় আরও কিছু ডিমাছা পরিবার সমতলে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেন।[৭] এবাই ববাক উপত্যকাব বর্তমান বর্ম্মন সম্প্রদায়েব পূর্বপুরুষ। মণিপুরীরা (মেইতেই ও বিষ্ণুপ্রিযা) কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুবায় বিপুল সংখ্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ কর্তৃক মণিপুব অধিকাবের সময়। ব্রহ্মযুদ্ধের (১৮২৪-২৬) পব শবণার্থীদের অধিকাংশ মণিপুবে ফিরে গেলেও অনেকেই ববাক উপত্যকায় স্থায়ীভাবে থেকে যান। মণিপুরে দীর্ঘকাল গৃহযুদ্ধেব পাবিপ্রেক্ষিতে পববর্তীকালেও মণিপুরীদের কাছাড়ে চলে আসার গতি অব্যাহত ছিল। বৃটিশ সরকার এদেব কাছাড়ে স্থায়ী বসতি স্থাপন কবতে উৎসাহিত করেছিলেন।[৮] মিজো পাহাড় ও মণিপুবের নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলেও তখন অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ফলে কিছু কিছু নাগা ও কুকি (মিজো) জাতির লোকেরাও ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সমতল কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। কাছাড়ের বৃটিশ শাসক টোমাস ফিসার সাহেব এই নবাগতদেব সীমান্ত অঞ্চলে বসতিযোগ্য জমি ও অর্থ সাহায্য দান করেন।[৯] ব্রহ্মযুদ্ধের সময় সমতল কাছাড়েব অধিবাসীদের অধিকাংশ ঘরবাড়ী ত্যাগ করে শ্রীহট্টে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ শাসন প্রবর্তন হবার পর তারাও ধীরে ধীরে ফিরে আসতে শুরু করেন।[১০]

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়ের বৃটিশ শাসক জি. জি বার্নস-এব এক প্রতিবেদন অনুসারে তখন সমতল কাছাড়ের (কাছাড় ও হাইলাকান্দি) বাসিন্দা ছিলেন মাত্র পঞ্চাশ হাজার। এব মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক ছিলেন ডিমাছা (কাছাড়ী), কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান। এ ছাড়াও ছিলেন কিছু সংখ্যক মণিপুরী আগন্তুক এবং সীমান্ত অঞ্চলে কুকি ও নাগা উপজাতীয় লোকেরা।[১১] ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের এক সরকারী জনগণনা অনুসারে

সমতল কাছাড়ের মোট লোকসংখ্যা ছিল ৮৫,৫২২ জন। এর মধ্যে ৬০,২৮১ জন ছিলেন বাঙালি (হিন্দু ও মুসলমান), ১০,৭২৩ জন মণিপুরী, ২৭৬ জন অসমীয়া (সম্ভবতঃ দেহান, বা কোচ রাজবংশী) ৬২ জন ইউরোপীয়ান, ৬,৩২০ জন কুকী, ৫,৬৪৫ জন নাগা এবং ২,২১৫ জন ডিমাছা।[১২]

সমতল কাছাড়ের জনবিন্যাসে এক বড় পরিবর্তন আসে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চা-শিল্পের প্রবর্তনের সংগে সংগে। উত্তর ভারত থেকে হিন্দিভাষী চা-শ্রমিকেরা তখন কাছাড়ে প্রথম আসেন। শিল্পের প্রসারের সংগে সংগতি রেখে শতাব্দীর শেষ অবধি শ্রমিকদের আগমনও অব্যাহত থাকে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় কাছাড়ের মোট লোকসংখ্যার ৬১ শতাংশ ছিলেন বাংলাভাষী, ২১ শতাংশ হিন্দি ভাষী, ১১ শতাংশ মণিপুরী ও অন্যান্যরা ৭ শতাংশ।[১৩]

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পেম্বার্টন সাহেব তাঁর প্রতিবেদনে বরাক-সুরমা উপত্যকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, দেহসৌধ, সংস্কৃতি ও ভাষা সব দিক দিয়েই কাছাড় ও শ্রীহট্টের মানুষ অভিন্ন।[১৪] সমতল কাছাড়ের (বর্তমান কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলা) জনবিন্যাসের কথা মনে রেখেই কাছাড়ের প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট ফিসার সাহেব ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বলেছিলেন যে এই জেলায় বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।[১৫] প্রসিদ্ধ জার্মান ধর্ম্মযাজক বেকারও লক্ষ্য করেছিলেন সুরমা উপত্যকার (কাছাড়-শ্রীহট্ট) মূল ভাষা হলো বাংলা। কিন্তু সুরমা উপত্যকার কথ্য ভাষা বঙ্গদেশ থেকে একটু আলাদা, সেই জন্য এই ভাষা 'সিলেটি-বাংলা' নামে খ্যাত।[১৬] এখানকার কথ্যভাষা কেন একটু আলাদা সে সম্পর্কে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'এটা শিলচর বা কাছাড় ডায়লেক্টের কোনো সমস্যা নয়— তারা এই সব শব্দ পেয়েছেন পূর্ব বাংলার সূত্রে,— সিলেট ও ময়মনসিং-এ যা চলতি এবং যেখান থেকে তা কাছাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।'[১৭] সমতল কাছাড়ের মানুষ যে শ্রীহট্টের মানুষ থেকে অভিন্ন সে কথা কাছাড়ের স্থানীয় মানুষ চিরদিনই জানতেন। ১৯২৬ সালের ৭ই জানুয়ারি আসাম আইনসভায় কাছাড়ের প্রতিনিধি মৌলানা রসিদ আলি লস্কর বলেছিলেন, কাছাড়ের মানুষ আসাম উপত্যকা থেকে আসেন নি, তারা পাহাড় থেকেও আসেন নি বা স্বর্গ থেকেও খসে পড়েন নি। কাছাড়ের মানুষ হচ্ছেন শ্রীহট্ট-বংশোদ্ভূত।[১৮] অর্থাৎ শ্রীহট্ট কাছাড় ভূখণ্ডের মূল জনস্রোত ছিল বাংলাভাষী। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দি ভাষী চা-শ্রমিক ও মণিপুরী বসতি স্থাপন সত্ত্বেও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এলেন সাহেব মন্তব্য করেছিলেন যে তখনও সমতল কাছাড়ে বাংলা ছিল সর্বসাধারণের ভাষা।[১৯] অর্থাৎ আগন্তুকেরা নিজ নিজ ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার সংগে সংগে বাংলাভাষী এই উপত্যকার স্থানীয় ভাষাকেও গ্রহণ করেছেন।

বরাক উপত্যকার এই আঞ্চলিক ঐতিহ্যকে অনুধাবন করতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে অতীত ইতিহাসে। কিন্তু পরিতাপের কথা, এই উপত্যকার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন খুবই সীমিত। বরাক নদীর সাংবাৎসরিক বন্যায় বিধ্বস্ত বলেই বোধ হয় এই উপত্যকার

অতীত সভ্যতার অনেক স্বাক্ষর মুছে গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে বেঁচে আছে শুধু দুই বিখ্যাত তীর্থ— সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম ও ভুবন পাহাড়ের গুহামন্দির। হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলাব সংযোগস্থলে বরাক নদীব তীরে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম এই উপত্যকার অন্যতম প্রাচীন তীর্থ। কালো পাথর নির্মিত একটি শিবলিঙ্গ এখানে পূজিত হয়ে আসছেন। লিঙ্গের পাশে শ্মশ্রুধারী কপিল মুনির মূর্তি। লোকশ্রুতি অনুসাবে সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা কপিল মুনি এই শিবের আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ কবেছিলেন।[২০] আর সমতল কাছাড়, মণিপুর ও মিজোরামের ত্রিকোণ সীমান্তে তিন হাজার ফুট উঁচু খাড়া পাহাড়ের উপর রয়েছে শিবতীর্থ ভুবন। ভুবনেশ্বর, ভুবনেশ্ববী ছাড়াও অনেক দেবদেবী ও ভক্তজনেব পাথরের মূর্তি রয়েছে এই গুহাতীর্থে। মূর্তিগুলোর কয়েকটি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতিকাব এবং অনেকগুলোর উপব বাংলাব পাল যুগেব ভাস্কর্যের প্রভাব লক্ষণীয়।[২১]

বন্যার তাণ্ডবলীলা ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অভাব হয়ত এই কারণে যে, প্রাচীনকালে স্থানীয় পর্যায়ে এই অঞ্চলে কোনো রাজ্য গঠন হয় নি। তবে এটাও ঠিক যে রাজশক্তিব আনুকূল্য ছাড়া ভুবন তীর্থের মতো একটি ভাস্কর্যকেন্দ্র গড়ে উঠত না। আসলে সমতল কাছাড় বা আজকের বরাক উপত্যকা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশে ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠা কয়েকটি বাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল। এই অঞ্চল যে বিভিন্ন সময়ে সমতট, হরিকেল, বঙ্গ ও শ্রীহট্ট বাজ্যের অন্তর্গত ছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ রয়েছে। শ্রীহট্টেব নিধনপুব গ্রামে কামরূপেব রাজা ভাস্করবর্ম্মার সপ্তম শতাব্দীর এক তাম্রশাসন অনুসারে ভাস্করবর্ম্মাব বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহারাজ ভূতিবর্ম্মা চন্দ্রপুরী বিষয়ার অন্তত ২০২ জন ব্রাহ্মণকে বসতি করিয়েছিলেন। অন্তত বলছি কারণ, এই লিপির একখানা ফলক পাওয়া যায় নি। সেই ফলকে নিশ্চয়ই আরও কিছু নাম ছিল।[২২] লিপির প্রাপ্তিস্থান করিমগঞ্জের সন্নিকটে পঞ্চখণ্ড গ্রামে সেই বসতি হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধাবণা।[২৩] ভূতিবর্ম্মাব রাজত্বকাল ছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে। নিধনপুরে প্রাপ্ত মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে ভূতিবর্ম্মার প্রদত্ত জমির নতুন করে অনুমোদন দেয়া হয়েছে মাত্র। কিন্তু এই তাম্রশাসন থেকে বরাক উপত্যকার ইতিহাসের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে একমাত্র চন্দ্রপুরী বিষয়াতে দুই শতাধিক ব্রাহ্মণ পরিবাব ছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, অবিভক্ত বরাক উপত্যকা বা তার অংশবিশেষ পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী অবধি কামরূপের অন্তর্গত ছিল। এই প্রসঙ্গে অবশ্য আরও দু'টো বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। একটি হলো পঞ্চম শতাব্দীতে দুই শতাধিক ব্রাহ্মণেব বসতি হয়েছিল বলে মনে করার কোন কারণ নেই যে তার আগে এই অঞ্চলে কোন ব্রাহ্মণ বা ভাবত-আর্য গোষ্ঠীর লোকেরা ছিলেন না। এর আগে এখানকার অধিবাসী কারা ছিলেন তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। অন্যটি হলো, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার-জলপাইগুড়ি অঞ্চল এবং পূর্ববঙ্গের রঙ্গপুব দিনাজপুব-ময়মনসিংহ অঞ্চল তখন কামরূপের অন্তর্গত ছিল আর এই সুবাদেই কামরূপের বিস্তার ময়মনসিংহেব প্রতিবেশী ববাক-সুরমা উপত্যকায়ও ছড়িয়ে পড়েছিল। নিধনপুব তাম্রশাসন জারি করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের

কর্ণসুবর্ণ থেকে। ভাষা ও ভঙ্গিমায় বিশেষজ্ঞরা অন্যান্য কামরূপী তাম্রশাসনের সঙ্গে এর ভিন্নতা ও বঙ্গদেশের তাম্রশাসনের সঙ্গে মিল লক্ষ্য করেছেন।[২৪] এই তাম্রশাসনে ও সমসাময়িক ও পরবর্তী কয়েক খানা তাম্রশাসনে উল্লেখিত মানুষের নাম ও পদবী আজও বরাক-সুরমা উপত্যকা সহ অবিভক্ত বঙ্গদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ধর, কর, দেব, দত্ত, নাগ, দাস, পালিত, সোম, ঘোষ, গুপ্ত, মিত্র, পাল, ভট্ট, শর্ম্মা এদেব অন্যতম। কৌশিকি বা কুশিয়ারার তীবে অবস্থিত চন্দ্রপুরী বিষয়ার উল্লেখ পরবর্তী তাম্রশাসনেও রয়েছে। নিধনপুর ও অন্যান্য তাম্রশাসনের বর্ণনার সূত্রে কোনো কোনো ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন যে, এই চন্দ্রপুবী বিষযা হবিগঞ্জ, মৌলবীরাজার ও কারিমগঞ্জ নিয়ে বিস্তৃত ছিল।[২৫] অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী বা তাবও আগে বরাক উপত্যকাব সামাজিক রূপরেখার সোপান তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ববাক-সুরমা উপত্যকার চন্দ্রপুবী বিষয়া পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপের অন্তর্গত ছিল সে ব্যাপারে নিধনপুর তাম্রশাসন একটি অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু পুরো উপত্যকা যে কামরূপে ছিল না তারও কিছু প্রমাণ রয়েছে। ভাস্করবর্মার রাজত্বকালেই চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সি-য়ু-কি গ্রন্থে শি-লি-চ ট-ল বা শ্রীহট্টকে একটি স্বতন্ত্র বাজ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই শিলিচটল সমতটের (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।[২৬] সেই যুগে সমতট গুপ্ত সম্রাটদের অধীনস্থ ছিল এমন প্রমাণও রয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বঙ্গ ও সমতটের উল্লেখ রয়েছে। কামরূপ ও দবাকেব কথাও এই প্রশস্তিতে রয়েছে। বরাক-সুরমা অঞ্চলে কোন স্বতন্ত্র রাজ্যের পক্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাবমুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না। আর গুপ্তদের অধীনস্থ সীমান্ত রাজ্য হলে তার কথা অবশ্যই এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখিত হতো। সমতট, দবাক, কামরূপ ইত্যাদি রাজ্যের রাজাদেব 'প্রত্যন্ত নৃপতি' হিসাবে প্রশস্তিতে চিহ্নিত কবা হয়েছে। শুধু এই 'প্রত্যন্ত' আক্ষবিক অর্থে দূব-সীমান্ত না হয়ে কোনো রাজ্যের নাম হতে পাবে কি না সে ব্যাপারেই বোধ হয় কিছুটা তর্জমার সুযোগ বয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট সহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশে বিপুল সংখ্যক 'পববর্তী গুপ্ত মুদ্রাব' আবিষ্কার এই অঞ্চলে গুপ্ত রাজত্বের সত্যতাকে দৃঢ়তর করছে।[২৭] কুমিল্লা জেলার গুনাইগড়ে প্রাপ্ত ৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের এক তাম্রশাসন অনুসারে ঐ সময় বন্যগুপ্ত সমতটের সামন্ত রাজা ছিলেন।[২৮] বন্যগুপ্তের অধিকার বরাক-সুরমা উপত্যকা অবধি বিস্তৃত ছিল কি না তার কোন প্রমাণ নেই, তবে সমতটের পববর্তী সামন্তরাজাদেব এই উপত্যকায় বাজত্বের কিছু অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।

সমতটেব সামন্তরাজা লোকনাথের ৪৪ হর্ষাব্দ বা ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের কুমিল্লায় প্রাপ্ত ত্রিপুরা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে প্রদোষ শর্ম্মা নামে রাজ্যেব একজন মহাসামন্ত রাজা লোকনাথেব পুত্রের মাধ্যমে লোকনাথের কাছে জয়তুঙ্গবর্ষের অধীন সুবঙ্গ বিষয়ার জঙ্গলাকীর্ণ অটোবিভূখণ্ডে অনন্তনারায়ণের মন্দির নির্মাণ ও একশত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপনের জন্য একখণ্ড জমির জন্য আবেদন করেন। রাজা লোকনাথ এই আবেদন মঞ্জুর করেন এবং ঐ ব্রাহ্মণদেব ব্যক্তিগত

ও সমষ্টিগতভাবে ভূমিদান করেন। এই দান যারা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ভোগিন বা গ্রাম প্রধান, পাচক এবং ভাচকও ছিলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা উত্তর কাছাড়ের জাটিঙ্গা উপত্যকার প্রাচীন নাম ছিল জয়তুঙ্গবর্ষ এবং সুবঙ্গ বিষয়া বলতে জাটিঙ্গা সংলগ্ন সমতল কাছাড়ের বর্তমান সুবঙ্গ অঞ্চলকে বোঝাচ্ছে।[২৯] অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে কাছাড়ের সুবঙ্গ অঞ্চল সমতটের অন্তর্গত ছিল। সমতট যেহেতু জাটিঙ্গা উপত্যকা অবধি বিস্তৃত ছিল, ভৌগলিক অবস্থানের কথা চিন্তা করে ধরে নিতে হবে যে ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী হাইলাকান্দি ও কাছাড়ের সবটুকুই তখন সমতটের অন্তর্গত ছিল। এই সুবঙ্গ অঞ্চলে প্রদোষ শর্ম্মা নামে একজন ব্রাহ্মণ অনন্তনারায়ণ বিষ্ণুর মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সুবঙ্গ তখনো জঙ্গভূমি ছিল। সেই ভূমিতে একশত ব্রাহ্মণের বসতিকে কেন্দ্র করে একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। একশত ব্রাহ্মণ ছাড়াও সেই গ্রামের ভোগিন বা প্রধান, পাচক (সম্ভবত মন্দিরের) ও ভাচক (পাঠক) লোকনাথের কাছ থেকে ভূমি গ্রহণ করেছিলেন।

ত্রিপুরা তাম্রশাসনের পর আমরা আসছি কালাপুর তাম্রশাসনে। শ্রীহট্টের মৌলবিবাজার মহকুমার (বর্তমানে জেলা) চৌতালী পরগনার কালাপুর গ্রামে প্রাপ্ত সমতটের সামন্তরাজা মারুন্ডনাথের সপ্তম শতাব্দীর এই তাম্রশাসনেও জঙ্গলাকীর্ণ বা অটোবিভূখণ্ডে অনন্তনারায়ণের মন্দির ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বসতির জন্য এক পাটক ও দুই দ্রোন (অর্থাৎ মোট ২১০ একর) ভূমিদানের কথা রয়েছে। তাম্রশাসনের সংগে একই জায়গায় কিছু মাটির বাসন, ইষ্টক নির্মিত দেয়াল ও জলকূপ এবং একটি বিষ্ণুর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেইজন্য ঐতিহাসিকদের ধারণা মারুন্ডনাথের প্রদত্তভূমি কালাপুর অঞ্চলেই ছিল।[৩০]

মৌলবি বাজারের রাজনগর থানার অন্তর্গত পশ্চিমভাগ গ্রামে প্রাপ্ত বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজা মহারাজ শ্রীচন্দ্রের দশম শতাব্দীর একখানা তাম্রশাসন বরাক সুরমা উপত্যকার ইতিহাসের এক মহত্ত্বপূর্ণ দলিল। এই তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির শ্রীহট্ট মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত চন্দ্রপুর, গরলা ও পোগার এই তিন বিষয়ায় আট খানা মঠ এবং ছয় সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের বসতির জন্য মহারাজ শ্রীচন্দ্র প্রায় বাইশ হাজার ছয়শত একর ভূমি দান করেছিলেন। শ্রীহট্ট মণ্ডল তখন সমগ্র বরাক-সুরমা উপত্যকা ও প্রতিবেশী অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল। তাম্রশাসনের বর্ণনা অনুসারে চন্দ্রপুর নিঃসন্দেহে নিধনপুর লিপির চন্দ্রপুরী। গরলা ও পোগার এই দুই বিষয়ার প্রকৃত অবস্থান এখনো নির্দ্ধারণ হয় নি। তবে এই বিষয় দু'টিও বরাক-সুরমা উপত্যকায়ই অবস্থিত ছিল। আলোচ্য বিষয় তিনটির সীমানা তাম্রশাসনে দেয়া আছে। মনু ও কুশিয়ারা নদীর উল্লেখ রয়েছে। বৃহৎ কট্টানীর বলতে হয়ত করিমগঞ্জ জেলার পাথারিয়া পাহাড় বা আদম টিলাকে বোঝাচ্ছে। ব্রহ্মপুরের কথা রয়েছে। যেহেতু কাছাড়ের খাসপুরের প্রাচীন নাম ছিল ব্রহ্মপুর এখানে হয়ত খাসপুরকেই বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ ত্রিপুরার কৈলাসহর ধর্ম্মনগর অঞ্চলসহ কাছাড় শ্রীহট্ট নিয়ে ছড়িয়ে ছিল এই তিন বিষয়া। ভূমি দান করা হয়েছিল তিন ভাগে। প্রথম ভাগে চন্দ্রপুর মঠের সঙ্গে জড়িত অধ্যাপক, ছাত্র, জ্যোতিষ, নর্তক, মালি, ঢোলি, কুমার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, সূত্রধর, শিঙ্গাবাদক, কেরানি ইত্যাদির জন্য একশত কুড়ি পাটক ভূমি বরাদ্দ

হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাগে দুইশত আশি পাটক ভূমি দেয়া হয়েছিল চারখানা মঠের অধ্যাপক, ছাত্র, জ্যোতিষ, নাপিত, ধোপা, মুচি, মালি, কেরানি, কর্ম্মকার, তেলি, চিকিৎসক ও অন্যান্যদের। তৃতীয় ভাগে গার্গ শর্ম্মা ও অন্য ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে করমুক্ত ভূমি দান করা হয়েছিল। ইন্দ্রেশ্বর নৌবন্দরের জন্য বাহান্ন পাটক, চন্দ্রপুর মঠের জন্য সাতচল্লিশ পাটক ও অন্যান্য আটটি মঠের জন্য দশ পাটক করে মোট আশি পাটক ভূমি বরাদ্দ ছিল। যাদের ব্যক্তিগতভাবে ভূমি দান করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই নাম ও পদবি তাম্রশাসনে উল্লেখিত হয়েছে। পদবির মধ্যে শর্ম্মা, গুপ্ত, দত্ত, দাম, পাল, কর, ধর, নন্দী, সোম, নাগ ইত্যাদিও রয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে মালাকার, তৈলিকা, নাপিত, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, গোপ, তন্তুবায়, বারুজীবি, মোদক, রজক, গণক, বারিক, বৈদ্য, চর্ম্মকার প্রভৃতি চতুর্দশ শাখা ও কায়স্থের উল্লেখ। তাম্রশাসনে প্রদত্ত অঞ্চলে কৃষক, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বাসিন্দাদের নতুন ভূপতিদের কর দিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রদত্ত ভূমি অনাবাদি বা অটোবিভূখণ্ড ছিল না এবং সেখানে ইতিপূর্বেও ভারত-আর্য-গোষ্ঠীর বর্ণ-হিন্দুরা বসবাস করতেন।[৩১]

ভাটেরায় প্রাপ্ত ঈশানদেব ও গোবিন্দ কেশবদেবের একাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসন এই উপত্যকার ইতিহাসের আরও দু'খানি অমূল্য সম্পদ। গোবিন্দ কেশবদেব ও তাঁর পুত্র ঈশানদেব উভয়েই শ্রীহট্ট রাজ্যের রাজা ছিলেন। গোবিন্দ কেশবদেব ভাটেশ্বর শিবের উদ্দেশ্যে ৩৪৯ ভূহাল, ৫১ হাল ও ২০ ভূকেদার ভূমি এবং ৩৬৫ খানা ভাটি ও ৭২ খানা গৃহ দান করেছিলেন। ঘরগুলো ছিল গোপ, কাস্য, ঘটক, নাপিত, রজক, বণিক, নাবিক, দন্তকার ও মল্লদের। প্রদত্তভূমি ৬৪ খানা গ্রামে ছড়িয়ে ছিল। গ্রামগুলোর অধিকাংশই বর্তমান শ্রীহট্ট জেলায় হলেও কাছাড়ের কালাইনছড়া, কালাইন নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরের বিস্তৃত অঞ্চল ও শালচাপরা, হাইলাকান্দির কাটাখাল ও করিমগঞ্জের লংগাই অঞ্চলও প্রদত্ত ভূমির অন্তর্গত ছিল।[৩২] ভাটেরার দ্বিতীয় তাম্রশাসনে মহারাজ ঈশানদেব রাজ্যের আশাপাটলিক বনমালি করকে তার ভরণ পোষণের জন্য বসতবাড়ী ও একটি জলপ্রপাত সহ দুইহাল ভূমি দান করেছিলেন। বনমালি কর ছিলেন জাতিতে বৈদ্য, ভূমিদানের আদেশ ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের সেনাপ্রধান বীর দত্ত এবং দানপত্রের বয়ান রচনা করেছিলেন মাধব দাস। তাম্রশাসনে বলা হয়েছে ঈশানদেবের পিতা কেশবদেব কংশনিশুদনের আকাশচুম্বি পাথরের মন্দির তৈরি করেছিলেন, তুলাপুরুষ দান করেছিলেন, তিনি সার্বভৌম মহারাজ হিসেবে রাজত্ব করেন এবং তার অনেক রণতরী, পদাতিক, অশ্বারোহী ও হাতি সৈন্য ছিল। ঈশানদেবেরও পদাতিক, অশ্বারোহী ও হাতি সৈন্য ছিল এবং তিনি মধুকৈটবের এক মেঘচুম্বি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।[৩৩] শ্রীহট্ট নামে সার্বভৌম স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ ভাটেরার তাম্রশাসনের সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

উল্লেখিত তাম্রশাসন ক'খানা বরাক-সুরমা উপত্যকার ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠার মতো হলেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এদের মূল্য অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে সময়ে সময়ে বরাক-সুরমা

উপত্যকা দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীব ময়নামতী তাম্রশাসনে হরিকেলদেবের উল্লেখ রয়েছে আর ত্রিপুরা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট অঞ্চলে অসংখ্য হরিকেল মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩৪] রূপচিন্তামণি ও কৃত্যসার নামক দু'খানি প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীহট্ট অঞ্চলকেই হরিকেল নামে চিহ্নিত কবা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন শ্রীহট্ট সহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ জুড়ে ছিল হরিকেল রাজ্য, যদিও এই বাজ্যের সীমানা সময়ে সময়ে পবিবর্তিত হয়েছে।[৩৫] হরিকেলের মুদ্রার মধ্যে অনেকগুলো আঞ্চলিক মুদ্রাও রয়েছে যে গুলোতে 'বরাকো', 'বেরাকো', 'পিরাকো', 'শিবগিরি', 'জয়গিবি' ইত্যাদি লিখিত বয়েছে।[৩৬] এই 'বরাকো' বা 'বেরাকো' বরাকের অঞ্চল হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাচীন শ্রীহট্টের অংশ হিসেবে এবং হরিকেলেব আঞ্চলিক মুদ্রায় 'বেরাকো'ব উল্লেখ থেকে ধরে নিতে হচ্ছে বর্তমান বরাক উপত্যকাও কোন না কোন সময়ে হরিকেলের অন্তর্গত ছিল। চীনা পরিব্রাজক ই-সিঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলেছেন হরিকেল পূর্ব-ভারতেব শেষ সীমান্ত অবধি বিস্তৃত ছিল।[৩৭] অতএব মনে হচ্ছে শ্রীহট্ট, সমতল কাছাড়, সমতল ত্রিপুবা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ইত্যাদি নিয়ে ছিল হরিকেল রাজ্য। হরিকেল মুদ্রায় উল্লেখিত 'পিরাকো' বা 'পিরাক' ত্রিপুরাব পিলাক অঞ্চল হওয়াই স্বাভাবিক। পিলাক থেকেও অনেকগুলো হবিকেল মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩৮]

বলা বাহুল্য, বরাক উপত্যকার ইতিহাসেব মূল কাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছিল সুদূর প্রাচীনযুগে আর এই কাঠামোর সবচেয়ে শক্তিশালী যে প্রভাবটি লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এই উপত্যকাব ভৌগোলিক অবস্থান। সেই যুগেব তাম্রশাসনে আমরা যে শর্ম্মা, ভট্ট, দত্ত, দাস, ঘোষ, ধর, কর, পাল, দাম, দাস, নাগ, নন্দী, সোমদেব পেয়েছি তাবাই এই উপত্যকার আজকেব বাংলাভাষীদের পূর্বপুরুষ। ভৌগোলিক ও সামাজিক কারণেই এই উপত্যকা পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গেব সমতট, বঙ্গ, হবিকেল ইত্যাদি রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ইতিহাসের বুকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। উত্তব কাছাড় পর্বতমালার অবস্থানের জন্য সে যুগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাব সংগে এই অঞ্চলের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব ছিল না। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে এই উপত্যকার পশ্চিমাংশ কামরূপেব অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সুবাদে। একাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট কাছাড় নিয়ে স্বাধীন শ্রীহট্ট রাজ্যের আবির্ভাবেব অনেক আগেই এই উপত্যকা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক বৈশিষ্ট্যে বঙ্গভূমি থেকে অভিন্ন হয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগে অনেক রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়া সত্ত্বেও বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক সত্ত্বায় কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। বরং ত্রিপুবী, কোচ (দেহান) ও ডিমাছা উপজাতিরা এই উপত্যকায় রাজ্য গঠন করেছেন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে।

শ্রীহট্ট রাজ্যের অবসানের পর বরাক-সুরমা উপত্যকার ইতিহাসে প্রথমবারের মত একাধিক রাজ্য পাশাপাশি গড়ে উঠল। উপত্যকার পশ্চিমাংশে (করিমগঞ্জ সহ বৃটিশ শাসনাধীন শ্রীহট্ট জেলায়) গৌড়, লৌড় ও জয়ন্তীয়া রাজ্য গঠিত হলো।[৩৯] সমতল কাছাড়ে (বর্তমান কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলা) একই সময়ে সূচনা হলো ত্রিপুরী রাজ্যগঠন প্রক্রিয়ার। ত্রিপুরীরা কাছাড়ে

এসেছিলেন আসামের কপিলি উপত্যকা থেকে। কাছাড় জেলার সোনাই অঞ্চলে রুখনী নদীর তীরে ত্রিপুরীদের প্রথম রাজধানী ছিল। সেই রাজ্য ধীরে ধীরে শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ ও মৌলবিবাজার এবং কুমিল্লা হয়ে পার্বত্য ত্রিপুরা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। রাজধানীও একাধিক স্থান পরিবর্তন করে রাজ্যস্থাপনের চূড়ান্ত পর্যায়ে আগরতলায় স্থাপিত হয়। সমতল কাছাড় ও শ্রীহট্টের কিছু অংশ ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজাদের অধিকারে ছিল।[৪০] কিন্তু কাছাড় থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হবার সংগে সংগেই ত্রিপুরীরা প্রায় সকলেই বরাক উপত্যকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কেবল বালাধন ও বড়খলা অঞ্চলে সামান্য কয়েকটি পরিবার থেকে গিয়েছিলেন।[৪১] পরবর্তীকালের কোনো নথিপত্রে ত্রিপুরীদের এখানকার বাসিন্দা হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে ঐ সময়ে কয়েকজন স্থানীয় রাজাদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এদের মধ্যে রুখনীপারের মদন রাজা ও বদরপুর ঘাটের পোড়া রাজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪২] মদন রাজা সম্পর্কে জনশ্রুতি ও বাংলা গান এখনো কাছাড়ের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে।[৪৩] হাইলাকান্দি জেলার লালাবাজারের কাছে শকলা দীঘি নামে পুরনো দীঘি এখনো বর্তমান আছে। দীঘির ঘাট ইট দিয়ে বাঁধানো। অনেকগুলো ইটে ‘শুভমস্তু শকাব্দ ১৪৯ X” (অর্থাৎ ১৪৯০) ও “শ্রীমৎ হরিশচন্দ্র মহারাজ” লেখা আছে। জনশ্রুতি অনুসারে হরিশচন্দ্র নামে ঐ অঞ্চলের এক রাজা এই দীঘি নির্মাণ করেছিলেন।[৪৪] তুলসীধ্বজ নামে কাছাড়ের এক রাজার প্রতাপগড় রাজ্যের সংগে যুদ্ধের কাহিনী এবং রাণী কমলা নামে ঐ রাজ্যের বিদূষী মহিলার কাহিনীও প্রচলিত আছে।[৪৫] সম্ভবত এই আঞ্চলিক রাজারা ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত পর্যায়ের রাজা বা আঞ্চলিক প্রশাসক ছিলেন।

সমতল কাছাড়ে ত্রিপুরী রাজত্বের অবসান ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। এই সময়ে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি চিলা রায় আসাম, খাইরেম, ডিমারুয়া ও মাইবং (উত্তর কাছাড়ে বা ডিমাছা রাজ্য) রাজ্যের রাজাদের পরাজিত করে সমতল কাছাড়ে এসে উপস্থিত হন। ত্রিপুরী সৈন্য কোচ সৈন্যদের হাতে পরাজিত হয় এবং ত্রিপুরার মহারাজা (সম্ভবত অনন্ত মাণিক্য) চিলা রায়ের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সমতল কাছাড়ে (বর্তমান কাছাড় জেলা) কোচবিহারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চিলা রায় শ্রীহট্ট (সম্ভবত গৌড়), জয়ন্তীয়া ও মণিপুরের রাজাদেরও পরাজিত করেন। পরাজিত রাজারা কোচবিহারের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বার্ষিক কর দিতে রাজী হন। অধীনস্থ এই রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ও কর আদায়ের সুবিধার জন্য চিলা রায় সমতল কাছাড়ের ব্রহ্মপুরে একদল কোচসৈন্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নরনারায়ণের অপর এক ভ্রাতা কমলনারায়ণকে সমতল কাছাড়ের দেওয়ান বা উপরাজ হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে চিলা রায়ের মৃত্যুর পর আসাম, মাইবংসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কোচবিহারের অধীনস্থ সকল রাজ্যের রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সুযোগে কমলনারায়ণ সমতল কাছাড়ে স্বাধীন খাসপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ব্রহ্মপুর প্রথমে কোচপুর এবং তারপর খাসপুর নামে খ্যাত হয়। আগন্তুক কোচেরা কাছাড়ে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন এবং দেওয়ান কমল নারায়ণের অনুগামী হিসেবে দেহান (দেওয়ান / দেহান) নামে পরিচিতি লাভ

করেন। খালিগ্রামের শ্যামা মন্দির ও উধারবন্দের কাঁচাকান্তি মন্দির আজও দেহান রাজত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। দেহান রাজারা মন্দিরের জন্য দেবত্র এবং শ্রীহট্ট থেকে আগন্তুক কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মত্র ভূমি দান করেন। ঐ সময়ে কোন এক অজ্ঞাত কবি 'শিব পদ্ধতি' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৬]

ইতিমধ্যে মাইবং-এর ডিমাছা (হেড়ম্ব) রাজারা উত্তর কাছাড় সংলগ্ন কাছাড়ের সমতল অঞ্চলে তাদের রাজ্যসীমা বিস্তার করতে শুরু করেন। বাংলাভাষী এই অঞ্চলের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় মহারাজ সুরদর্প নারায়ণের রাজত্বকালে 'কাছাড়ীর নিয়ম' নামে বাংলা ভাষায় আইন পুস্তক প্রণয়ন করা হয়।[৪৭] মাইবং-এর রাজদরবারে বাঙ্গালীদের প্রভাব বাড়তে থাকে। রাজধানী মাইবং-এ ব্রাহ্মণব্রা, কুমারপাড়া, কামারপাড়া ইত্যাদি বসতির পত্তন হয়। বাংলাভাষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সভাসদের সম্মান অর্জন করেন। রাজপণ্ডিত বা ধর্ম্মাধ্যক্ষের মহত্বপূর্ণ পদের সৃষ্টি করা হয়। রাজা সুরদর্প নারায়ণের রাজত্বকালে শ্রীহট্টের বিশিষ্ট পণ্ডিত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য বাচস্পতি 'ব্রহ্মপুরাণ' ও 'নারদীয় পুরাণ'-এর বাংলা অনুবাদ করেন।[৪৮] রাজারা সমতলের 'খেল' ভিত্তিক শাসন প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। খেল-মুক্তার ও রাজ-মুক্তাররাই ছিলেন আঞ্চলিক শাসনকর্তা। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ কীর্তিচন্দ্র নারায়ণ বড়খলা গ্রামের মণিরাম লস্কর নামে জনৈক বাঙ্গালী রাজস্ব বিশেষজ্ঞকে সমতল অঞ্চলে উজির হিসাবে মনোনীত করে বাংলা ভাষায় এক সনন্দ প্রদান করেন।[৪৯]

খাসপুর রাজ্যের শেষ রাজা ভীম সিংহ অপুত্রক ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা কাঞ্চনীর বিবাহ হয়েছিল মাইবং রাজ পরিবারের লক্ষ্মীচন্দ্রের সংগে। এই বিয়ের সূত্রে ভীম সিংহের মৃত্যুর পর মাইবং ও খাসপুরের একত্রিকরণ ঘটে এবং ডিমাছা রাজ্যের রাজধানী খাসপুরে স্থানান্তরিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে হাইলাকান্দি অঞ্চলও ডিমাছা রাজাদের অধিকারে আসে। খাসপুরে এখনো ডিমাছা রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। সেখানে মহারাজা হরিশচন্দ্রের একখানা শিলালিপিও রয়েছে। এই শিলালিপি বাংলা ভাষায় লিখিত। রাজকার্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত হতো। মহারাজ লক্ষ্মীচন্দ্র এবং শেষ দুই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালের কয়েকখানা দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ভূমি দান, কৃষকদের সংগে জমির বন্দোবস্ত, রাজ কর্ম্মচারীদের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ক দলিল আবিষ্কৃত হয়েছে। সব ক'খানা দলিলের ভাষা বাংলা।[৫০] কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে 'ঋণদান বিধি' নামে আইন পুস্তক প্রণয়ন করা হয়।[৫১] গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে 'দণ্ডবিধি' সংশোধন ও পরিবর্তন করে পুনর্প্রচার করা হয়।[৫২] রাজ্যের সর্বস্তরে একমাত্র বাংলা ভাষারই ব্যবহার ছিল। আসামের আহোম সরকার[৫৩] ও বঙ্গদেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকারের[৫৪] সংগে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ছিল বাংলা ভাষায়। শেষ দুই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র বাংলাভাষায় গান ও কবিতা রচনা করেছেন।[৫৫] ডিমাছা (বর্ম্মন) কবি চন্দ্রমোহন বর্ম্মনের বাংলা কবিতা আজো বরাক উপত্যকায় লোকপ্রিয়।[৫৬] যাত্রাপুর গ্রামের কবি কৃষ্ণমোহনের "গোপীচন্দ্রের পাঁচালী" ও "কালীচরণ উপাখ্যান" অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ।[৫৭]

হেড়ম্ব রাজ্যের পতন সুরু হয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে। আগা মহম্মদ রেজা ও কল্যাণ সিংহ নামে দুই ব্যক্তি সমতল কাছাড়ে প্রবেশ করে রাজ্যে অরাজকতার সৃষ্টি করে। রাজা স্বয়ং জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজার অনুরোধে শ্রীহট্টের জেলাশাসক বৃটিশ সৈন্যের সাহায্যে আক্রমণকারীদের দমন করেন। কৃষ্ণচন্দ্র বার বার তীর্থযাত্রা করেন। অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র উভয়েই নিঃসন্তান ছিলেন।[৫৮]

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকাল কাছাড়ের ইতিহাসে এক দুর্যোগময় অধ্যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করে তিনি প্রজাদের বিরাগভাজন হন। তুলারামের নেতৃত্বে উত্তর কাছাড়ের ডিমাছারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অনেক চেষ্টা করেও মহারাজ এই বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হন। প্রায় একই সময়ে ব্রহ্মদেশীয়রা মণিপুর আক্রমণ করে। মণিপুরের তিন রাজকুমার— গম্ভীর সিংহ, সারজিৎ সিংহ ও চৌরজিৎ সিংহ— একে একে কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তর কাছাড়ের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি সংহত হবে এই আশায় তিনি গম্ভীর সিংহকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মণিপুরের এই রাজকুমারেরা রাজ্য আত্মসাৎ-এর অভিপ্রায়ে পারস্পরিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। গোবিন্দচন্দ্র বৃটিশ অধিকৃত বঙ্গদেশের শ্রীহট্ট জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশীয়রা মণিপুর ও আসাম অধিকারের পর কাছাড় আক্রমণ করে। মণিপুরী রাজকুমারেরাও তখন শ্রীহট্টে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাছাড়, আসাম, মণিপুর ও জয়ন্তীয়ার রাজাদের অনুরোধে বৃটিশ সরকার ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন গোবিন্দচন্দ্র ও বৃটিশ সরকারের পক্ষে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ভারপ্রাপ্ত এজেন্ট ডেভিড্ স্কটের মধ্যে বদরপুরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে বৃটিশ সরকার কাছাড়ের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং গোবিন্দচন্দ্র বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হন। যুদ্ধে ব্রহ্মদেশীয়রা পরাজিত হন এবং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ান্দাবুর সন্ধি অনুসারে যুদ্ধ শেষ হয়। গোবিন্দচন্দ্র করদ রাজ্যের রাজা হিসাবে কাছাড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু সমতল কাছাড়ের অধিকাংশ বাঙালি প্রজা ইতিমধ্যে শ্রীহট্টে আশ্রয় নিয়েছেন। সামান্য রাজস্ব দিয়ে বৃটিশ সরকারের বার্ষিক কর ও রাজ্যের শাসন কার্যের ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। উত্তর কাছাড় থেকে তুলারাম ও মণিপুরে বৃটিশের মিত্ররাজা গম্ভীর সিংহ সমতল কাছাড় দখলের চেষ্টা চালাতে থাকেন। ডেভিড্ স্কটের হস্তক্ষেপে তুলারাম ও গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধি অনুসারে উত্তর কাছাড়ে তুলারামের স্বায়ত্বশাসন নীতিগতভাবে স্বীকৃত হলেও পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা সম্ভব হয় নি। গোবিন্দচন্দ্র তখন বার্দ্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। অপুত্রক বৃদ্ধ রাজার রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে বৃটিশ শাসক মহলে সংশয় দেখা দিল। সীমান্তে নিয়োজিত বৃটিশ অফিসারেরা গভর্ণর জেনারেলের কাছে সমতল কাছাড় অধিগ্রহণের প্রস্তাব রাখলেন। এই প্রস্তাব যখন উচ্চ মহলে বিচারাধীন তখন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গোবিন্দচন্দ্র আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন।[৫৯]

গোবিন্দচন্দ্রের হত্যার সংগে সংগে হেড়ম্ব রাজ্যের ইতিহাসে যবনিকা নেমে এলো। বৃটিশ সরকার টোমাস ফিসারকে ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হিসাবে কাছাড়ে পাঠালেন। প্রয়াত রাজার কোন উত্তরাধিকারী নেই এই অজুহাতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট ভারতের গভর্ণর জেনারেলের এক ঘোষণার মাধ্যমে সমতল কাছাড় বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হলো। টোমাস ফিশার কাছাড়ের প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হলেন। শ্রীহট্টের প্রতিবেশী বাংলাভাষী অঞ্চল হিসেবে কাছাড় ঢাকা কমিশনের অঙ্গীভূত হলো। গোবিন্দচন্দ্রের হত্যার পেছনে গম্ভীর সিংহের ভূমিকা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার মিত্ররাজের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। উপরন্তু ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়ের বিস্তৃত জিরিবাম অঞ্চল মণিপুরকে দিয়ে দেয়া হলো। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তুলারামের রাজ্যও বৃটিশ অধিকারে চলে যায় এবং হাফলং মহকুমা হিসেবে কাছাড় জেলার অঙ্গীভূত হয়।[৬০]

বরাক উপত্যকার বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত তৈরি হলো ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের প্রথম ঐতিহাসিক বিভাজনের মধ্য দিয়ে। ঐ বছর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও প্রতিবেশী পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে আসাম প্রদেশ গঠিত হলো আর নবগঠিত এই প্রদেশের সংগে উত্তরবঙ্গের গোয়ালপাড়া অঞ্চল ও পূর্ববঙ্গের কাছাড়-শ্রীহট্ট অঞ্চলকে জুড়ে দেয়া হলো। শ্রীহট্ট কাছাড়ের মানুষ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানালেন। বিভিন্ন সংস্থার পক্ষে সরকারের কাছে 'স্মারকপত্র দেয়া হলো এই উপত্যকার বঙ্গদেশের সংগে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভাষিক অভিন্নতার ভিত্তিতে বিভাজনের সিদ্ধান্তের পুনর্বিচারের দাবী জানিয়ে। কিন্তু উপনিবেশবাদের স্বার্থে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর শক্তিশালী সীমান্ত প্রদেশের প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে শ্রীহট্ট কাছাড়ের মানুষের দাবি বাতিল হয়ে গেলো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ বঙ্গদেশ সহ আসামের তিন বঙ্গভাষী জেলায় জোরদার স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠলো। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হলো সত্য কিন্তু 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের বঙ্গভাষী তিন জেলা— শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া - আবার আসামে জুড়ে দেয়া হলো।[৬১] বঙ্গদেশের সংগে পুনর্যুক্তির দাবিতে ঐ তিন জেলায় আন্দোলন অব্যাহত থাকলো। আসাম বিধান পরিষদে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়ার প্রশ্ন বার বার আলোচিত হলো। ভারতীয় কংগ্রেসের ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের নীতির সংগে সংগতি রেখে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের অধীন জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হলো। বৃটিশ সরকারও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এবং আঞ্চলিক প্রশাসনের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার ব্যবহার অব্যাহত রাখলেন। কিন্তু আসামের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও চা শিল্পে বৃটিশ পুঁজিবাদীদের স্বার্থের প্রয়োজনে বঙ্গদেশের সঙ্গে পুনর্মিলনের দাবি অগ্রাহ্য করলেন। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের যৌথ ঘন্টা বেজে উঠলো। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শুধু করিমগঞ্জকে বাদ দিয়ে এক গণভোটের মাধ্যমে শ্রীহট্টের বাকি অংশ পূর্ব পাকিস্তানে হস্তান্তরিত হলো।[৬২] করিমগঞ্জ সহ সমতল কাছাড় আসামে থেকে গেলো। আজও আছে।

নির্দেশপঞ্জি ও টীকা

১. বর্তমান লেখক এই লোক পরম্পরার কথা শুনেছিলেন মরহুম হুরমত আলি বড়লস্কর, ৺যতীন্দ্রমোহন বড়ভূঁইয়া ও ৺রাজকুমার জন্মেজয় বর্ম্মনের কাছে।

ডঃ সুজিৎ চৌধুরী শ্রীহট্ট-কাছাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে অস্ট্রিক ও ইন্দো-মঙ্গোলোয়েড জনগোষ্ঠীর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিতদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে ঐসব জনগোষ্ঠীর প্রভাব বঙ্গদেশের যেকোন অঞ্চলের বাঙালিদের মধ্যেই লক্ষণীয়। তাঁর মতে, "পূর্বাঞ্চলের সমগ্র বঙ্গভাষী এলাকা জুড়ে যারা বসবাস করেন, তাঁদের সঙ্গে এ অঞ্চলের (শ্রীহট্ট-কাছাড়ের) মানুষের দৈহিক গঠনে কোন পার্থক্য নেই, অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সাধারণ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে সমস্ত জনগোষ্ঠীর প্রভাব বর্তমান, এ অঞ্চলেও সে প্রভাবই কার্যকর ছিল।" সুজিৎ চৌধুরী, "শ্রীহট্ট-কাছাড়ের ইতিহাস (আদিপর্ব)," প্রথম অধ্যায়, সাহিত্য, নবপর্যায়, দশ, মাঘ ১৩৯৬, পৃঃ ৯।

২. Census Report 1971

৩. *Statistical Hand Book, Assam*, Directorate of Economics and Statistics, Govt. of Assam, 1978.

৪. খাঁ সাহেব আমানতউল্লা চৌধুরী, কোচবিহারের ইতিহাস, কোচবিহার, ১৯৩৬, পৃঃ ২৩৭

৫. শ্রী সূর্য্যকুমার ভুঞা সম্পাদিত, তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী, গুয়াহাটী, ১৯৩২, পৃঃ ১৩৭

৬. C. A. Soppit, *A Historical and Descriptive Account of the Kachari Tribes in the North Cachar Hills*, Shillong, 1885, p.5.

৭. Foreign Political Proceedings (FPP), 14 May 1832, No. 106.

৮. ঐ, No. 109.

৯. ঐ, Nos. 94–104

১০. ঐ, No. 109

১১. Cachar District Records (C.R.), No. 91 of 1837.

১২. ঐ, No 69 of 1851.

১৩. B. C. Allen, *Assam District Gazetteers*, Vol. I (Cachar), Allahabad, 1905, p 44.

১৪. FPP, 14 May 1832, No. 109. পেম্বার্টন সাহেবের ভাষায়, "…..the people in Sylhet and Cachar are indentical in every respect— appearance, customs and language.".

১৫. D. Datta (ed.) *Cachar District Records*, Silchar, 1969, p.2. ফিসার সাহেবের ভাষায়, "The entire instruction in this district is to be conveyed in the Bengali language."

১৬. C. Becker, *History of the Catholic Missions in North-East India* (first German edition, 1923), tr. & ed. G. Stadler & S. Karotemprel, Shillong, 1980, pp. 94–95. বেকার সাহেবের ভাষায়, "The principal language of the Surma Valley is Bengali. Bengali as spoken in the Surma Valley differs to some extent from that of the province of Bengal and it is called therefore, Sylhet-Bengali."

১৭. সুজিৎ চৌধুরী, "বরাক উপত্যকার দুঃখিনী বর্ণমালা", স্মরণিকা, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, একাদশ বার্ষিক অধিবেশন, শিলচর, প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

১৮. Assam Legislative Council proceedings (ACLP), Vol. 6, 1926, p. 85, মৌলানা রসিদ আলি লস্করের বক্তব্য, "As for the Cachar people, these people have not migrated from the Assam Valley, they have not migrated from the hills, they have not dropped from heaven. The Cachar people are descendants of Sylhet."

১৯. B. C. Allen, ঐ। এলেন সাহেবের ভাষায়, "Bengali is the common language."

২০. সুজিৎ চৌধুরী, "শ্রীহট্ট-কাছাড়ের ইতিহাস (আদিপর্ব)", সাহিত্য, একাদশ শ্রাবণ ১৩৯৭, পৃঃ ৯।

২১. ঐ, দ্বাদশ, কার্তিক, ১৩৯৭, পৃঃ ৯৮-১১৩

২২. Kamalakanta Gupta, *Copper-plates of Sylhet* (CPS), Sylhet, 1967, p. 3

২৩. ঐ, সুজিৎ চৌধুরী, ঐ, একাদশ, শ্রাবণ, ১৩৯৭, পৃঃ ১০।

২৪. CPS, p. 187.

২৫. ঐ, pp. 133-135.

২৬. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, "সমতটের পূর্বে", সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৬শ সংখ্যা ১নং, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১১

২৭. J. P. Singh & N. Ahmad (ed.) *Coinage and Economy of the North-Eastern States*, Varanasi, 1977, pp. 2–3.

২৮. Ramanimohan Sharma, "Tripura in the Pre-Manikya Period", *Proceedings of the North-East India History Association*, Sixth Session, Agartala, 1985, pp. 59–68.

২৯. R. G. Basak, "Tipperah Copper-plate", *Epigraphia India,* Vol. XV, No. 19, pp. 301–335 ; R.M. Nath, "Background of Assamese Culture", Shillong, 1949, p. 56 ; সুজিৎ চৌধুরী, "বরাক উপত্যকার দুঃখিনী বর্ণমালা", **স্মরণিকা**, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, একাদশ বার্ষিক অধিবেশন, শিলচর, পৃঃ ৭

৩০. CPS, pp. 123–142.

৩১. ঐ, pp. 83–86.

৩২. ঐ, pp. 180–182.

৩৩ ঐ, pp. 183–187.; Rajendralal Mitra, "Copperplate Inscriptions from Sylhet," *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,* No. VIII, 1880, pp. 141–143.

৩৪. Ramanimohan Sharma, "Tripura in the Pre-Manikya Period," *Proceedings of the North-East India History Association,* Sixth Session, Agartala, 1985, pp. 59–68.

৩৫. R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal* (HAB) Calcutta, 1971, p. 9.

৩৬. B. N. Mukherjee, "Bengal Coins", paper presented in the seminar on Archaeology of West Bengal, Organised by the Directorate of Archaeology, Govt. of West Bengal, Calcutta, 1986.

৩৭. HAB, p. 9.

৩৮. B. N. Mukherjee, "A Survey of the Coinage of Harikela", in J.P. Singh and Nishar Ahmad (ed.), *Coinage and Economy of the North Eastern States of India,* Varanasi, 1977, pp. 17–24.

৩৯. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী প্রণীত **শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত** (শ্রীহট্ট, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ) দেখুন।

৪০. উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ প্রণীত **কাছাড়ের ইতিবৃত্ত** (ঢাকা, ১৯২১) এবং কৈলাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত **রাজমালা** বা **ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত** (কলিকাতা, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ) দেখুন।

৪১. কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২৬

৪২. ঐ, পৃঃ ৩৯

৪৩. ঐ, পৃঃ ৩৯-৪০

৪৪. Raj Mohan Nath, *Antiquities of Cachar*, Silchar, 1981, p. 29; **কাছাড়ের ইতিবৃত্ত**, পৃঃ ২৫

৪৫. **শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত**, পৃঃ ২০৪

৪৬. ঐ, পৃঃ ৩১-৪১ ; **কোচবিহারের ইতিহাস**, পৃঃ ২৩৭

৪৭. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত **হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি** (গৌহাটি, ১৯২১), 'খ' পুঁথি দেখুন।

৪৮. কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৬৪-৮৮

৪৯. সনন্দের পূর্ণ বয়ানের জন্য দেখুন, **শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত**, পৃঃ ১০২-১০৪

৫০. পূর্ণ বয়ানের জন্য দেখুন **কাছাড়ের ইতিবৃত্ত**, পৃঃ ৯৫-৯৮, ১১৫-১৩৪

৫১. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত **হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণদান বিধি** (বিহাড়া, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) দেখুন।

৫২. **হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি**, 'ক' পুঁথি।

৫৩. তুংখঙ্গীয়া বুরঞ্জী, পৃঃ ১৩৭, ১৩৮-১৩৯, ১৬৪-১৬৬

৫৪. সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত **প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন** (কলিকাতা, ১৯৪২) দেখুন।

৫৫. **কাছাড়ের ইতিবৃত্ত**, পৃঃ ১১৩-১১৪

৫৬. ঐ, পৃঃ ১২৪-১২৮

৫৭. "অষ্টাদশ শতাব্দীর অজ্ঞাত কবির অখ্যাত দু'খানি রচনা", স্মরণিকা, কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ৫ম বার্ষিক অধিবেশন, শিলচর, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

৫৮. R. M. Lahiri, *Annexation of Assam*, Calcutta, 1954, pp. 45–47.

৫৯. H. K Barpujari, *Assam: In the Days of the Company*, Gauhati, 1963, pp. 74–106.

৬০. ঐ

৬১. Ajit K. Neogy, *Partitions of Bengal*, Calcutta, 1987, pp. 105–328.

৬২. *Assam Legislative Council Proceedings*, 1912–1947.

প্রাচীন শ্রীহট্টের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ভিষগাচার্য চক্রপাণি দত্ত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী

পশ্চাৎপট :

প্রথমেই একটি প্রশ্ন : শ্রীহট্টের ইতিহাস কত প্রাচীন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজসাধ্য নয়। এর প্রধান কারণ ঐতিহাসিকরা যে প্রত্নতাত্ত্বিক বা পাথুরে প্রমাণ-এর উল্লেখ করে থাকেন, শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে তেমন প্রমাণ আদৌ প্রকট নয়। লিখিত প্রমাণ বা সাহিত্যিক প্রমাণও (Literary evidence) যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত নয়। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি অতি প্রাচীনকালে আধুনিক শ্রীহট্টের বৃহৎ অংশ সমুদ্রগর্ভে লীন ছিল, এবং বহু শতাব্দী ধরে ক্রমশ সমুদ্রসীমার অপসরণ এবং চর-ভূমির উত্থান প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলের অসংখ্য জল-বিস্তার, আঞ্চলিক ভাষায় যাদের বলা হয় 'হাওর', সেই বিস্মৃত স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে। 'হাওর' (সায়র!) সম্ভবত সাগরেরই অপভ্রংশ। শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষায় 'স' প্রায়শই 'হ'-তে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। বর্ষার আগমনে এই সব জল-বিস্তার কূল-কিনারা-বিহীন সাগরেরই রূপ ধারণ করে থাকে। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ যখন সাগরপারে 'শীলি-চটল' দেশের উল্লেখ করেছিলেন, তখন তাঁর পক্ষে 'হাওর'-কে সাগর ভেবে বিভ্রান্ত হওয়া হয়ত কিছু বিচিত্র ছিল না।

প্রাচীন শ্রীহট্টের ভৌগোলিক চিত্র ঐতিহাসিক কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয় এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

> প্রাচীনকালে (অবশ্য) শ্রীহট্ট বর্তমানের ন্যায় বিস্তৃত কলেবর ছিল না, তৎকালে সমুন্নত উচ্চতর ভূমিসকল ছাড়া শ্রীহট্ট জিলার বিস্তৃত সমতল ও নিম্নভূমি সকল (সদর মহকুমার দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার উত্তর-পশ্চিমাংশ, করিমগঞ্জ মহকুমার হাকালুকি প্রভৃতি অংশবিশেষ, হবিগঞ্জ মহকুমার উত্তরাংশ ও প্রায় সমুদয় সুনামগঞ্জ মহকুমা).... বঙ্গোপসাগরের একটি শাখাসাগরের (অথবা বৃহৎ হ্রদের) অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১]

W. W. Hunter সাহেবের 'A Statistical Account of Assam' গ্রন্থেও কমলাকান্ত গুপ্তের উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় :

> 'The comformation of some of the sandy hillocks and the presence of marine shells at the foot of hills along the northern boundary, indicates that sea flowed at the base of the hills at a comparatively recent period.'[২]

হান্টার সাহেবেরও আগে Sir Joseph Dalton Hooker শ্রীহট্ট দেশের উত্তরসীমান্তে অবস্থিত খাসিয়া পাহাড়ের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন:

'The broad flat marshy head of all the streams in the central and northern part of the chain, and the rounded hills that separate them, indicate the levelling action of a tidal sea acting on a flat shore, *While the steep flat floored valleys of the southern watershed may be attributed to the scouring action of higher tides on a boistrous rocky coast*[৩]

এখানে একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করা যেতে পারে, যদিও এর সপক্ষে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির কথা বলা যাবে না। এই কিংবদন্তীর একমাত্র সাক্ষ্য আছে 'হট্টনাথের পাঁচালী' নামক এক প্রাচীন পুঁথিতে। কিংবদন্তী অনুসারে শ্রীহট্টের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের (এই রাজবংশকে 'কৃষক বংশীয়' বলেও অভিহিত করা হয়) ৬ষ্ঠ পুরুষ শ্রীহস্ত নঙ্গোপ শাখাসাগরে একটি বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। এই বাঁধের স্থান আজও উচাইল (উচা আইল) নামে পরিচিত। এই বাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল শ্রীচত্বল বা শ্রীহস্তের চত্বল নামে লোক মানসে স্থান পেয়েছে। অনুমান করা হয় এই বাঁধ নির্মাণ শাখাসাগরের পশ্চাৎ অপসরণে সহায়ক হয়েছিল। আরও কিংবদন্তী হল যে রাজা শ্রীহস্ত প্রয়াগের অশ্বত্থবটের মূল থেকে বটেশ্বর শিব এনে রাজধানী 'শীলাহট্টের' (শ্রীহট্টের প্রাচীন নাম) দক্ষিণাংশে 'হট্টনাথ' এই নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

প্রাচীন শ্রীহট্টের ইতিহাসের পক্ষে প্রমাণ বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অভাব হলেও শ্রীহট্টের নামের উল্লেখ নানা সূত্রে পাওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত ৫১টি শাক্ত পীঠের দুটি শ্রীহট্ট অঞ্চলে অবস্থিত: প্রথমটি কলাগুল অঞ্চলে গ্রীবাপীঠ এবং দ্বিতীয়টি জয়ন্তিয়া পরগণার বাউরভাগ অঞ্চলে বামজঙ্ঘাপীঠ নামে খ্যাত। গ্রীবাপীঠের সঠিক অবস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক আছে। আমাদের এই বিতর্কে যাবার প্রয়োজন নেই। মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্র ও তন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রগ্রন্থে এইসব পীঠস্থানের নির্দেশ আছে; মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে: 'নকুলীশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ'। শিবের প্রচলিত শতনামের নামের মধ্যেও 'হাটকেশ্বরঃ' শিবের উল্লেখ আছে। 'নকুলেশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ'। পরবর্তী খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর গোবিন্দকেশব দেবের তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে. 'প্রাদাৎ শ্রীহট্টনাথায় শিবায় শিবকীর্তনঃ'।

অনেকে অনুমান করে থাকেন যে, 'শ্রীহট্ট' নামের উদ্ভব এই 'হট্টনাথ' থেকেই হয়েছে। কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয় কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে 'গৌড় রাজধানী'তে অবস্থিত দেশের প্রধান হাট 'শীলাহট্ট' থেকে শ্রীহট্ট নামের উদ্ভব। 'শ্রীহট্ট বলিতে মূলতঃ একটি হট্ট বা হাটের কথা মনে উদয় হয়। শীলাহট্ট বলিতেও মূলতঃ একটি হট্ট বা হাটকেই বুঝায়।' এই হাট সম্পর্কে আরও একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ আমরা যথাস্থানে করবো।

বৌদ্ধ তন্ত্রযান 'সাধন মালা' গ্রন্থে (বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) যে চারটি তন্ত্রপীঠেব উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও 'শ্রীহট্ট'-এর উল্লেখ আছে। Nik Douglas 'সাধন মালা'-তে উল্লিখিত এই চারটি তন্ত্রপীঠের নাম এইভাবে দিয়েছেন: (1) Uddiyana—Odiyana, (2) Kamakhya—Kamarupa, (3) Srihatta—Sylhet, (4) Purnagiri—Purna-Saila.[৫] উড্ডীয়ান যদি তিব্বতী গ্রন্থেব Urgyen (উরগ্যেন) হয়ে থাকে, তবে তা তন্ত্রগুরু পদ্মসম্ভব-এর জন্মভূমি কাশ্মীর দেশে হওয়া সম্ভব। তবে উড্ডীযান ও পূর্ণগিরির অবস্থান উড়িষ্যায় হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর। কামাখ্যা ও শ্রীহট্ট সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ/ ষোড়শ শতাব্দীর 'যোগিনীতন্ত্র'-এ শ্রীহট্টের স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে অবস্থিতির উল্লেখ আছে। এইসব উল্লেখ থেকে শ্রীহট্ট দেশের প্রাচীনত্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায। এটাও অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে সেই সুদূর অতীতে শ্রীহট্ট অঞ্চল ইন্দো-আর্য জাতিগোষ্ঠী ও সভ্যতার একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল।

পণ্ডিতপ্রবর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে (A.D. 600) একটি প্রত্নলেখেব উল্লেখ করেছেন যাতে এই শব্দ ক'টি উৎকীর্ণ আছে: 'শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্য'। এই প্রত্নলেখটি আবিষ্কৃত হয়েছে উত্তব-প্রদেশের Jaunsar Bawar' অন্তর্গত লখামণ্ডলের এক মন্দিরগাত্রে। শ্রীহট্টেব কোন বাজা এত দূরান্তের দেশে তাঁব প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই পি. সি. চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেছেন এই শব্দগুচ্ছ শিবেব অন্যতম 'হাটকেশ্বর' নামের প্রশস্তি মাত্র। কিন্তু শব্দগুচ্ছের অর্থ হচ্ছে 'শ্রীহট্টেব অধিশ্বব'। এ সম্পর্কে শ্রীচৌধুরীর পরবর্তী মন্তব্য একটু বিচিত্র: "The name *Śrihattadhiśvaraveya*' is derived from *Hātakeśvara Śiva*, who is said to have been worshipped by the Nāgar Brāhmanas originally in the region about Kāśmira'.[৬]

আমরা নাগর ব্রাহ্মণদের ঐতিহাসিক উপস্থিতি গুজরাট অঞ্চলেই জানি, এবং এঁরা নাগবংশীয়। যাহোক, এ প্রসঙ্গ আপাততঃ মুলতুবী থাক।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশ গিল্‌গিট্ (বর্তমানে পাকিস্তান অধিকৃত)-এর নিকটবর্তী এক পর্বতগাত্রে অসমের 'ভগদত্ত বংশোদ্ভব' এক রাজার নাম উৎকীর্ণ আছে বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] সংক্ষেপে এই নাম 'শ্রী-নব-সুরেন্দ্রাদিত্য-নন্দী-দেব'। অসমের ইতিহাসে নন্দীদেব উপাধিধারী কোন রাজা ছিলেন কিনা, তাই বিচার্য। তাছাড়া, সুদূর অসমের কোন বাজা ভারতের অতি প্রত্যন্ত দেশ দুর্গম গিল্‌গিট্ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, তা কল্পনার বাইরে বলেই মনে হয়। তবে এই 'ভগদত্ত বংশ' কী ভিন্ন কোন ভগদত্ত বংশ? এই প্রশ্নের মীমাংসা যেমন সহজ নয়, তেমনি পূর্বে উল্লিখিত শিলালেখ, যাতে 'শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্য' শব্দগুচ্ছ উৎকীর্ণ আছে, তারও কোন সহজ সমাধান সম্ভব নয়। কোন অজ্ঞাত কারণে, বা অজ্ঞাত উপায়ে, এই শিলালেখটি বাহিত হয়ে দূরান্তের দেশ 'Jaunsār Bawār' পৌঁছে মন্দিরগাত্রে প্রোথিত হয়েছিল, এ সম্ভাবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইতিহাসের অনেক রহস্যেরই মীমাংসা হয়নি।

আমরা আগে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছি যে, খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে অসমরাজ ভাস্করবর্মার রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে সাগরপারে 'শীলি-চটল' দেশের উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাঙ্ সমতট হয়ে শ্রীহট্ট দেশে পৌঁছেছিলেন। তাঁর বিবরণে শীলি-চটল দেশের অবস্থান এইভাবে বর্ণিত হয়েছে:

'The first place is Shi-li-cha-tolo, which was situated in a valley near the great sea, to the north-east of Sama-tata' (S. Julien's Heuen Tsiang-iii, p. 82).

এই 'শীলি-চটল' দেশ যে প্রাচীন শ্রীহট্ট এই তথ্য বেশীরভাগ ঐতিহাসিক দ্বারা স্বীকৃত (যথা, Martin, Cunningham, S. N. Mazumdar প্রভৃতি)। পি. সি. চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন: '....identification of this place with Sylhet is disputed by Finot who locates it in Prome in Burma'.[৮] এ যুক্তি দৃষ্টত: অদ্ভুত এবং হিউয়েন সাঙ্-এর দিক নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'কামরূপ শাসনাবলী' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা, ৪-৬) লিখেছেন: 'শ্রীহট্ট একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়াং যিনি ভাস্করবর্মার সময়েই কামরূপেও আসিয়াছিলেন— সমতট পরিভ্রমণ সময়ে যে ছ'টি রাজ্যের নাম শুনিয়াছিলেন তাহার প্রথমটির নাম ছিল শিহলিচটলো।'

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি প্রাচীন শ্রীহট্টের বৃহৎ অংশ বঙ্গোপ-শাখাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। 'শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, ময়মনসিংহের পূর্বাংশ এবং ত্রিপুরা জিলার উত্তর-পশ্চিমাংশের ভূপ্রকৃতি দর্শনে মনে বোধ হয় এইস্থানে পূর্বে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল'।[৯] এই বিস্তৃত হ্রদ দর্শনে হিউয়েন সাঙ্-এর পক্ষে সমুদ্র মনে করে বিভ্রান্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না, এবং ভুলক্রমে তিনি 'শীলি-চটল' দেশ সমুদ্রপারে বলে নির্দেশ করে থাকবেন।

শ্রীহট্টের সমুদ্র-সদৃশ বিশাল কয়েকটি 'হাওর'-এর নাম এখানে দেওয়া যেতে পারে যথা, হাকালুকি, চালি, জিঙ্কার, হালি (হাইল), চাতালি (চাতল), মাকরসি, দামুড়িয়া, ঘুঙ্গিজুরী, বরুয়াবাড়ল ইত্যাদি।

'শীলি-চটল' নামের উদ্ভব সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা সহজলভ্য নয়। এটি শ্রীহট্টের সাধারণ্যে প্রচলিত একটি বিকল্প নামের আদি রূপ হতে পারে। শীলি-চটল্ থেকে সিলট্, ছিলট্ নামের উদ্ভব একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। একটি প্রাচীন ছড়ায় পাওয়া যাচ্ছে:

'পুনির গড় ছাড়িয়া রাজা
ছিলটেতে গেল।
হট্টনাথের পূজা করি
ঠাকুরালি পাইল॥

এ নামের উৎস সম্পর্কে আমরা প্রসঙ্গত পূর্বোল্লিখিত 'হট্টনাথের পাঁচালীর' সাক্ষ্য উল্লেখ করতে পারি। আমরা আগেই বলেছি 'হট্টনাথের পাঁচালীর' ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত বলা যাবে না। যা হোক, কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয় এ সম্পর্কে লিখেছেন :

'পাঁচালী গ্রন্থখানিতে রাজাগণের বিবরণ এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেওয়া আছে যে এবং পাঁচালীর লিখিত বিবরণের সূত্র অবলম্বনে স্থানীয় অনুসন্ধানে শ্রীহট্ট, উত্তরকাছ অঞ্চল, বরশালা, ভাটেরা, ব্রহ্মচাল (বরম্‌চাল) ইত্যাদি স্থানে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়'[১০]।

হট্টনাথের পাঁচালীর সাক্ষ্য অনুসারে 'কৃষক রাজবংশ'-এর ৪র্থ পুরুষ রাজা গুহকের ছিল তিন পুত্র ও দুই কন্যা, শীলা ও চটলা। গুপ্ত মহাশয়ের বর্ণনা এইরকম :

'গুহক রাজা শীলা কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থ রাজধানীর সান্নিধ্যে (অগ্নিকোণে) শীলাহট্ট নামে হাট স্থাপন করেন। চটলা কন্যা কলুষিতা হওয়ায় তাহাকে দক্ষিণসাগর দ্বীপে নির্বাসিত করা হইলে সে তথায় চট্টলরাজ্য বিস্তার করে। (শীলা ও চটলার নামে শীলিচটল দেশ)।'[১১]

এই আপাতগ্রাহ্য ব্যাখ্যার পক্ষে কোন ঐতিহাসিকতা দাবি করা যাবে না। শুধু এটুকু বলা চলে 'হট্টনাথের পাঁচালী' যদি জনশ্রুতি ও জনপ্রবাদের ভিত্তিতে রচিত হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক সূত্র থাকা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। এখানে প্রশ্নঃ হিউয়েন সাঙ্‌ 'শীলি-চটল' নাম কোথায় পেলেন ?

হিউয়েন সাঙ্‌-এর বর্ণনায় শ্রীহট্টের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্যথায় তিনি শ্রীহট্টের কামরূপ অন্তর্ভুক্তির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। ভাস্কর বর্মার আমন্ত্রণেই তাঁর কামরূপ রাজ্যে আগমন হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ্‌-এর উল্লেখের পর শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাসের দৃঢ় ঐতিহাসিক সাক্ষ্যর পাওয়া যাচ্ছে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর নিধনপুর তাম্র-পাট্টালীতে। শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে আবিষ্কৃত ভূমিদান-সংক্রান্ত এই তাম্রশাসনের দানকর্ত্তা নৃপতি ও দানকৃত ভূখণ্ডের অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এই ভূখণ্ডের অবস্থান উত্তর-বঙ্গের রংপুর অঞ্চলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর যুক্তি হল অসমের আর একরাজা বনমাল রংপুরের চন্দ্রপুরী বিষয়ে ভূমিদান করেছিলেন। তাঁর মতে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে (আঃ ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রীহট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের অধিগত ছিল। ত্রিপুরা রাজ যে পঞ্চব্রাহ্মণ পরিবার পঞ্চখণ্ডে স্থাপিত করেন, তাঁদেরই কাত্যায়ণ গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিধনপুর তাম্রপাট্টালী বাহিত হয়ে শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে পৌঁছেছিল।

অসমের ঐতিহাসিক কে. এল. বড়ুয়া অভিমত প্রকাশ করেছেন, ভূতিবর্মা বা ভাস্কর বর্মা যার দ্বারাই এই ভূমিদান সংঘটিত হয়ে থাকুক, দানকৃত ভূখণ্ডের অবস্থান বিহারের কোন অঞ্চলে হওয়াই সম্ভব, কারণ তাম্রপাট্টালীতে উল্লিখিত 'কৌসিকা' নদী ও বর্তমান 'কোসি' (Kosi) নদী অভিন্ন[১২]

পি. সি. চৌধুরী মহাশয় তাঁর সিদ্ধান্ত এভাবে প্রকাশ করেছেন: ‘Several factors combine to show that it was in *Pundravardhana*. The strongest argument in this regard is the reference to *Chandrapuri Visaya* which as we have stated, lay to the west of *Triśrota* or Teesta.... The omission of the river *Triśrota* in Nidhanpur grant is only incidental.’[13]

চৌধুবী মহাশয় অসমরাজ ভূতিবর্মাকে তাম্রশাসনের দানকর্ত্তা বলে নির্দেশ করেছেন। আর একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার লিখ্ছেন: ‘এক সময়ে ভাস্করবর্মা গৌড় বাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরে অবস্থান কবেছিলেন বলে জানা যায়। কর্ণসুবর্ণেব জয়স্কন্দাবার থেকে তিনি নিধনপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি দান করেছিলেন।’[১৪]

দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর একটি পরবর্তী গ্রন্থে দানকৃত ভূমির অবস্থান সম্পর্কে বিষয়টির অন্যদিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। একটু দীর্ঘ হলেও তাঁর মন্তব্য এখানে উদ্ধাব করা হয়ত প্রাসঙ্গিক হবে:

‘এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আছে। ভাস্করবর্মার শ্রীহট্ট জেলার নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন অনুসারে মহাভূতিবর্মা এবং তিনি চন্দ্রপুরী বিষয়ে কৌসিকানদীর তীববর্তী একটি গ্রাম দান করেন। শ্রীহট্টজেলার পশ্চিমভাগে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রেব (আ ৯২৫-৭৫ খ্রী) তাম্রশাসনে চন্দ্রপুব বিষয় এবং কোসিয়ার নদীর নাম আছে। ‘চন্দ্রপুরী’ ও ‘চন্দ্রপুর’ এক এবং ‘কোসিয়ার’ ‘কৌশিকা’র রূপান্তর।..... কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কেউ-কেউ বলে যাচ্ছেন, কৌশিকা নদী বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিমপ্রান্ত বাহিনী কোসী এবং ভূতিবর্মার প্রদত্ত গ্রামটি বিহারে (কারও মতে উত্তর বাংলায়) অবস্থিত ছিল। কিন্তু কুমার গুপ্তের ধনাইদহ শাসনের তারিখ ৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পঞ্চম দামোদবপুর শাসনের ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি বা উত্তর-বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেখা যায়; তখন ভূতিবর্মা (আ ৫১৮-৪২ খ্রী) কি করে উত্তর-বাংলা বা বিহারে গ্রামদান কববেন ?..... হর্ষের জীবনকালে তাঁর পক্ষে বিহারে গ্রামদানের সম্ভাবনা নেই। আবার তখন কোসী ছিল ব্রহ্মপুত্র বা করতোয়ার উপনদী।’[১৫]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয় ‘চন্দ্রপুরী বিষয়’ শ্রীহট্ট মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে ভূতি বর্মা (বা মহাভূতি বর্মা) এই ভূমিদান ক্রিয়ার আদি উৎস এবং ভূতিবর্মার প্রপৌত্র ভাস্কর বর্মার (আবিষ্কৃত) তাম্রাপাট্টালী তারই সমর্থন সূচক (Confirmatory) পরবর্তী তাম্রলেখ। আমবা পরে দেখবো যে ঐতিহাসিক বিতর্ক ‘হরিকেল’ রাজ্যের অবস্থান ও বিস্তৃতি সম্পর্কেও রয়েছে। এই নিবন্ধের সীমিত পরিসরে আমরা কেবল শ্রীহট্টের প্রাচীনত্বের ইঙ্গিতবহ তথ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকবো।

প্রাচীনকালে যুদ্ধবিগ্রহ একটি সাধারণ ঘটনা ছিল। সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে, ৭ম শতাব্দীতে সাময়িকভাবে শ্রীহট্ট ভাস্কর বর্মার অধিগত হয়েছিল। কারণ তার অব্যবহিত পরেই

শ্রীহট্টকে সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। প্রাচীনকালে রাষ্ট্রসীমার দ্রুত পবিবর্তন ছিল সামান্য ঘটনা, কিন্তু তাই বলে প্রাকৃতিক ভূখণ্ডের বা তার অধিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের তাতে কোন হেরফের হত না।

দীনেশচন্দ্র চন্দ্র সরকার আরও জানিয়েছেন: 'কিছু পূর্বে ভাস্কর বর্মার অপর একখানি তাম্রশাসন (কামরূপ জেলার দুবী নামক গ্রাম থেকে প্রাপ্ত) থেকে গৌড়-কামরূপ সংঘর্ষ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা গিযেছে। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় সুস্থিতবর্মার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর বালক পুত্রদ্বয় সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মা ও ভাস্কর বর্মা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দীভাবে গৌড়ে নীত হয়েছিলেন। কিন্তু গৌড়রাজ তাঁদের স্বরাজ্যে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়েই তাঁবা গৌড়রাজ্যেব বশ্যতা স্বীকার না করলে ইহা সম্ভব হত বলে মনে হয় না।'[১৬] 'যাহোক হর্ষবর্ধন এবং ভাস্কর বর্মার সমবেত চেষ্টায় পরিণামে গৌড়বাজ পরাজিত হয়েছিলেন।'[১৭]

সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকেও নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন খানির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে আমবা উদ্ধার করছি: '১৯৩২ সালে Indian Antiquary পত্রিকায় Prof. D.R. Bhandarkar একটি বিস্তৃত লেখা বাহির করেন (পৃঃ ৪১-৫৫ এবং ৬১-৭২)। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা এবং বাংলা দেশের কায়স্থেবা মূলত এক। নাগরদেব মধ্যে এইসব গোত্র ও উপাধি যথা, দত্ত, ঘোষ, নাগ, মিত্র, ইত্যাদি। ভূতি, দাস, দাম, দেব, পাল, পালিত, সেন, সোম, বসু প্রভৃতি উপাধি আছে (পৃঃ ৪৩)। শ্রীহট্টে নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে(র) সন্ধান পাওয়াতে এই যোগসূত্রটি ধরিবার সুবিধা হইয়াছে'।[১৮]

এই প্রসঙ্গে পি.সি. চৌধুরী মহাশয়েব যুক্তি বড অদ্ভুত: '(The) theory of the origin of the Nagar Brāhmanas and Kayasthas, based on connection of the donees of the Nidhanpur grant, who are said to have migrated from Mithila and other places, may perhaps be explained, as we have shown in another connection, by their common Alpine origin and they might have flooded Eastern India long before the Vedic Brāhmanas.'[১৯]

চৌধুরী মহাশয়েব এই যুক্তিজাল নিরর্থক মনে হয়, কারণ নাগর ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সরকারের মন্তব্য অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হয়:

'আজকাল বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজে দত্ত পদ্ধতি দেখা যায় না। বাংলা অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাচীন লেখমালায় অনেক ব্রাহ্মণাখ্যার শেষাংশ আধুনিক বাঙালী কায়স্থগণের পদ্ধতি লক্ষ্য করে ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রাচীন যুগের অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার বর্তমান বাঙালী কায়স্থ সমাজের অঙ্গে মিশে গিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য'।[২০]

খ্রীষ্টীয় ৭ম থেকে ১০ম শতাব্দীর মধ্যকালীন সময়ে আমরা শ্রীহট্টের আরও একটি বিকল্প নামের সঙ্গে পরিচিত হই। সে নাম 'হরিকেল' বা 'হরিকেলি'। 'হরিকেল' যে প্রাচীন শ্রীহট্টের অপব একটি নাম তা সর্ববাদিসম্মত, যদিও হরিকেল রাজ্যেব বিস্তার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে।

প্রথমেই আমবা প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য এখানে উদ্ধার করছি :

'More definite information is supplied by some medieval manuscripts. According to the lexicon named *Rūpachintāmani*, completed in 1515 Saka, Harikela is said to be the name of *Srihatta* and the same statement occurs in *Kalpadru-kosha*, with the variant Harikeli or Harikela. In the *Rudrakshama hātya* section of the Smriti work named *Krtyaśāra* is cited a verse from *Lingapurāna* containing the name of Harikela, and in a note the author says that Harikela is Srihattadesha.'[২১]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রাচীন হরিকেল বাজ্যের স্মাবক কয়েকশত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে (দ্রষ্টব্য : B. N. Mukherjee 'A Survey of the Coinage of Harikela'; J.P. Singh and N. Ahmad (ed.) 'Coinage and Economy of North-Eastern States', 1977, pp. 17-24).

নীহাবরঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে হরিকেল রাজ্যের অবস্থিতির বিবরণ এইভাবে দিয়েছেন :

'আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেলি তিনটি স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলিয়া ইঙ্গিত কবা হয়েছে। এই হরিকেল রাজ্য সপ্তম অষ্টম শতক হইতে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ এবং সমতটেব সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর হইতেই হরিকেল মোটামোটি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করা হয়'।[২২]

প্রসঙ্গত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকাবের মন্তব্য এরূপ :

'ত্রৈলোক্যচন্দ্র (আ. ৯০০-২৫ খ্রী) হরিকেলের রাজশ্রীর আধার বা আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন (অর্থাৎ হরিকেলের মিত্র ছিলেন)। অভিধানের সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, মূলতঃ হরিকেল শ্রীহট্টের নাম ছিল। হয়ত ত্রৈলোক্যচন্দ্র পালসম্রাটের বিরুদ্ধে শ্রীহট্ট রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন। তিনি চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি হয়ে সমতট (কুমিল্লা অঞ্চল) অধিকার করেন।'[২৩]

গায়ত্রী সেন মজুমদার লিখেছেন যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার অনেকগুলো ক্ষেত্রীয় বিভাজন ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্রী, রাঢ়া (Radha), তাম্রলিপ্তি এবং সুহ্ম (suhma) গৌড়ের অন্তর্গত ছিল, অন্যদিকে হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট এবং বঙ্গাল বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৩]

তিনি আরও জানাচ্ছেন যে, কান্তিদেব নামধেয় কোন হরিকেল অধিপতির খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর একটি ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রপাট্টালী চট্টগ্রামের বড় আখড়া (Baraakhara) মন্দিরে পাওয়া গেছে। এই তাম্রপাট্টালীতে হরিকেল রাজ্যের অন্তর্গত বর্ধমানপুর নগরের নাম আছে। তিনি আরও লিখ্ছেন: 'Vardhamanapura has not been definitely identified. D.C. Sarkar looks in for its location in Sylhet.'[২৫]

রমেশচন্দ্র মজুমদার চট্টগ্রাম মন্দিরে প্রাপ্ত কান্তিদেবের তাম্রলেখের উল্লেখ করে লিখেছেন:

'As the grant ends with an appeal to the future kings of Harikela, the territory must have formed a part, if not the whole, of his kingdom. The record may be assigned on paleographic grounds to the 9th century A.D.'[২৬]

সুনির্মল দত্ত চৌধুরী তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'গঙ্গা থেকে সুরমা' (পৃষ্ঠা ৫১) বইতে লিখেছেন: 'হরিকেলের খ্যাতি অনেকদূর এমন কি গুজরাট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীর গুজরাটি কোষকার হেমচন্দ্র তাঁর 'অভিধান চিন্তামণি'-তে এই জনপদের কথা উল্লেখ করেছেন।'

আমরা 'হরিকেলের' সর্বশেষ উল্লেখ পাচ্ছি মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বল্লাল চরিত'-এ। বল্লাল সেন কিকতদের (Kikata) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আগে সাংক্‌কোট (Sankakota)-বাসী শ্রেষ্ঠী বল্লভের নিকট এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা ঋণ হিসাবে দাবি করেন। বল্লভ ঋণদানে সম্মত হন এই সর্তে যে 'হরিকেলি'-এর রাজস্ব (revenues) তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হবে। (Majumdar History of Ancient Bengal, Reprint 1974, p 252)

কান্তিদেবের তাম্রপাট্টালীরও আগে আরও দু'টি তাম্রলেখের এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি ত্রিপুরায় প্রাপ্ত সামন্ত লোকনাথের তাম্রলেখ। এই তাম্রলেখে দানকৃত ভূখণ্ডের অবস্থান সুভূং (Suvvung) বিষয়ের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুভূং-এর অবস্থিতি সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। রাজমোহন নাথের অভিমত অনুসারে এ স্থান বর্তমান কাছাড়ের অন্তর্গত 'সুভং'; কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের নির্দেশিত স্থান শ্রীহট্টের অন্তর্গত শ্রীমঙ্গল থানার চৌতালী পরগণা।[২৮] তাঁর প্রধান যুক্তি হল একই বংশোদ্ভূত সামন্ত মারুণ্ডনাথ ভট্টারক (Mārundanāth Battāraka)-এর কালাপুর তাম্রলেখখানি শ্রীমঙ্গলের অন্তর্গত চৌতালী পরগণায় আবিষ্কৃত হয়েছে। যাই হোক, সুভং এবং চৌতালী দুই স্থানই যে প্রাচীন শ্রীহট্ট মণ্ডলের অন্তর্গত এ বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নেই।[২৯]

প্রাচীন শ্রীহট্টের প্রসঙ্গে আরও একটি তাম্রপাট্টালীর উল্লেখ করতে হয়। এটি মৌলভিবাজার অন্তর্গত রাজনগর থানার পশ্চিমভাগ নামক গ্রামাঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩০] আমরা ইতিপূর্বে শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উল্লেখ করেছি। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন: 'পশ্চিমভাগ শাসন শ্রীচন্দ্রের ৫ম রাজ্যবর্ষে ... উৎকীর্ণ।'[৩১] সুতরাং এটি খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর

মধ্যভাগের সমকালীন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন: 'শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ শাসন হতে জানা গিয়েছে যে, তাঁর পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের (আ. ৯০৫-২৫ খ্রী) সেনাদল বর্তমান কুমিল্লার নিকটবর্তী সমতট রাজধানী দেবপর্বত আক্রমণ করবার অল্পকাল পূর্বে অর্থাৎ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ নগর কাম্বোজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল।'[৩২] আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন এই কাম্বোজরা আসলে হচ্ছে কোঁচ জাতি।

রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন পশ্চিমভাগ তাম্রলেখ থেকে জানা যায় (verse 7) যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবপর্বত আক্রমণ করবার অব্যবহিত আগে কাম্বোজ কর্তৃক গৌড় আক্রমণের বার্তা শুনতে পান। রমেশচন্দ্র মজুমদার অনুমান করেছেন যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্বোল্লিখিত কান্তিদেব ও তাঁর পরবর্তী রাজার সামন্ত ছিলেন। কাম্বোজগণ কর্তৃক গৌড় আক্রমণের সুযোগ নিয়ে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু কৌতূহলের বিষয়, দীনেশচন্দ্র সরকার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'both Trailokyachandra and Srichandra were subordinate allies (*laghumitra*) or feudatories, respectively of the king of Harikela and of the Pālas' (quoted by Mazumdar, op. cit p. 202) কিন্তু পশ্চিমভাগ তাম্রলেখের সাক্ষ্য অনুসারে শ্রীহট্ট অঞ্চল (হরিকেল) শ্রীচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। শ্রীচন্দ্রের পরবর্তী রাজা লড়হচন্দ্রের ময়নামতি তাম্রলেখ থেকে জানা যায় যে, শ্রীচন্দ্র গৌড় এবং প্রাগজ্যোতিষরাজকে পরাজিত করেছিলেন (Mazumdar, p. 202)।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট একটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাজ্যরূপে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। ১৮৭২ সালে শ্রীহট্ট মহকুমার ভাটেরা (ভট্টপাটক) অঞ্চলে দুটি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম তাম্রফলকে গোবিন্দ (বণ) কেশব বটেশ্বর শিবকে ভূমি উৎসর্গ করেছেন। এই তাম্রফলক ১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোনসময়ে প্রদত্ত হয়েছিল (Epigraphia Indica XIX, 280)। তাম্রশাসনের লিপি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর 'উত্তরনাগরী' লিপির অনুরূপ। লিপির ভাষা সংস্কৃত। কিন্তু প্রথম তাম্রশাসনের কিছু অংশ (লাইন ৩০ থেকে ৫১) স্থানীয় বাংলা ভাষায় লিখিত। একটু নমুনা নীচে দেওয়া হল:

৩৮ নং লাইন:

'জগাপান্তরে নাটয়ান গ্রামদ্বয়ে ভূহল ৫ বাটী ২০ সলাচাপড়াকে মূলীকান্দি পূর্বে সাগরপশ্চিমে ভূহল ১০ ইত্যাদি'[৩৩] 'ভূহাল', 'হাল', 'ভূকেদার', 'বাটী' ইত্যাদি শ্রীহট্টের ভূমি-সীমা-নির্দেশক সংজ্ঞা। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে তাম্রশাসনে ৬৪টি গ্রামের নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং বর্তমান শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ, কাছাড় এবং সংলগ্ন ত্রিপুরায় এসব গ্রাম আজও চিহ্নিত করা যায়।[৩৪] উপরের উদ্ধৃত লাইনে 'সলাচাপড়া'-র উল্লেখ আছে এবং এই সলাচাপড়া আধুনিক শিলচর সহরের অদূরে 'সালচাপ্‌রা' হওয়াই সম্ভব। সুতরাং খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টের রাজ্যসীমার বিস্তার এ থেকে অনুমান করা যায়।

পরিশেষে এখানে প্রাচীন শ্রীহট্টের সমাজ বিন্যাসের একটু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। নিধনপুর তাম্রপাট্টালীতে দানগ্রহীতাদের গোত্র ও পদবীর উল্লেখ আছে; পদবীগুলো এইরকম: বসু, ঘোষ, নন্দী, মিত্র, নাগ, সোম, ভট্ট, পালিত, কুণ্ডু, সেন, শর্মা, দাম, দত্ত, ভট্টী ইত্যাদি। লোকনাথের তাম্রপাট্টালীতে অনুরূপ পদবী পাওয়া যাচ্ছে যথা, চন্দ্র, দাম, দাস, দত্ত, দেব, ঘোষ, মিত্র, নন্দী, সোম ইত্যাদি। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রপাট্টালীতে এইসব পদবী এবং আরও কিছু নতুন পদবীব সন্ধান পাওয়া যায় যথা, গুপ্ত, নাগ, নন্দী, পাল, ঘোষ, দাম, কর, ধর ইত্যাদি।[৩৫]

শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয় শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুরাজা গৌড়গোবিন্দের পবাজয় এবং শ্রীহট্টে মুসলমান বিজয়েব তারিখ ৭০৩ হিজরী বা ১৩০২ খ্রী: নির্দ্ধারণ করেছেন। 'গৌড়গোবিন্দ একাধিকবার মুসলমান আক্রমণ ব্যর্থ করেন।[৩৬] ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন শ্রীহট্টের জনপ্রবাদ অনুসারে গৌড়েব সুলতান শমস্-উদ্দীনের বাজ্যকালে ৭৮৬ হিজরায (১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) শেষ হিন্দুবাজা 'গৌবগোবিন্দ' পবাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময় বাঙ্‌লায় শমস্-উদ্দীন নামে কোন সুলতান ছিলেন না। সিকন্দর শাহ্ গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে তখন অধিষ্ঠিত। 'অনুমান হয় যে জনপ্রবাদমূলক তারিখের শতবর্ষপরে শমস্-উদ্দীন ইউসুফ সাহেব রাজ্যকালে শ্রীহট্টে হিন্দু স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছিল, কাবণ শমস্-উদ্দীন শাহের শিলালিপি শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আরবী শিলালিপি।'[৩৭] 'গৌড়ের সুলতান পরাজয় বার্তা শ্রবণ কবিয়া সিপাহশালার নাসির উদ্দীনকে সিকন্দর শাহের (সিকন্দর গাজির!) সাহায্যার্থ প্রেবণ কবিযাছিলেন।'[৩৮] 'গৌডগোবিন্দ নানা স্থানে পরাজিত হইয়া অবশেষে শ্রীহট্টে এক সপ্ততল মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।'[৩৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পূর্বোক্ত ভাটেরা তাম্রশাসনে সুউচ্চ (শিলাভিরুচ্চৈঃ) কংসনিসূদন ও মধুকৈটভাবির মন্দিরেব উল্লেখ আছে। গৌড়গোবিন্দ অবশেষে আত্মসমর্পণ করেন। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবও লিখেছেন মুসলমান কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট বিজয়ের সময শাহজলাল জীবিত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।[৪০]

এখানে উল্লেখ কবা প্রযোজন যে কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাব উল্লিখিত শ্রীহট্টে মুসলমান বিজয়ের তারিখের সমর্থনে নিম্নলিখিত সাক্ষ্য উদ্ধার করেছেন;

'ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত একখানি ফলক লিপি যাহা মিঃ ষ্টেপলটন ১৯১৩ ইং আগষ্ট মাসে ঢাকা রিভিউতে প্রকাশ করেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, শ্রীহট্টেব মুসলমান বিজয় ঘটে ৭০৩ হিজরী বা ১৩০২ খৃষ্টাব্দ'।

Edward Gait সাহেবেব *A History of Assam* (p. 328) গ্রন্থেও উপরোক্ত মুসলমান বিজয়ের তারিখের সমর্থন পাওযা যায়। এই প্রসঙ্গে W. W. Hunter-এর উক্তিও স্মরণ করা যেতে পারে: 'After the death of Shah Jalal, the district as then constituted was included in the kingdom of Bengal and put in charge of a Nawab. In the reign of Akbar it passed with the rest of Bengal into the hands of the

Mughal Emperors, and from that time was ruled by an *amil* (locally known as Nawab, subordinate to the Nawab of Dacca)'[৪১]

যাহোক, এ বিতর্কে আমাদের যাবার প্রয়োজন নেই। সমগ্র বাঙলা মুসলমান রাজত্বের অধিকারে যাবার পর থেকে শ্রীহট্ট যে ধারাবাহিকভাবে বাঙ্লা সুবার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা সুবিদিত। শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির ইতিহাস আরও আছে। ডঃ অতুল সুর মহাশয় তাঁর 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৭৩) এই তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন :

'ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩২৮ ১৩৪১) সম্রাট (মহম্মদ তুগলক) নিযুক্ত শাসকগণকে যুদ্ধে পরাহত করে সোনার্গাঁ সমেত পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল পুনরাধিকার করেন ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করেন। শ্রীহট্ট জেলাও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয় ... ফকরুদ্দীনের রাজত্বকালেই মিশরের ইবন্‌বতুতা বাঙলা দেশে এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে শ্রীহট্টের হিন্দুদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক বাধ্যতামূলকভাবে সরকারে দিতে হত।'

Sir Edward Gait সাহেবের একটি মন্তব্যের উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ আমরা শেষ করতে পারি :

'Although Sylhet may at times have formed part of the ancient kingdom of Kamarupa it was never during the historical period included in Assam as the term was understood prior to 1874[৪২]

ভিষগাচার্য চক্রপাণি দত্ত* :

আমরা এতক্ষণ যে প্রাচীন শ্রীহট্টের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি তা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, শ্রীহট্টের ভৌগোলিক সংস্থান ও ইতিহাস বৃহত্তর বঙ্গের ইতিহাসের সঙ্গে পূর্বাপর সম্পৃক্ত ছিল। ইতিহাসের এই প্রেক্ষিতে ভিষগাচার্য চক্রপাণি দত্তের শ্রীহট্টে আগমন খুবই সঙ্গতিপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের 'শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস' (পৃষ্ঠা ৯) পুস্তিকায় এ বিষয়ে উল্লেখ খুবই সংক্ষিপ্ত. 'গঙ্গাতীরবাসী ভিষক প্রবর চক্রপাণি দত্ত গৌড়গোবিন্দের রাজত্বকালে শ্রীহট্টে আগমন করেন।' আমরা এই উক্তির সূত্র ধরেই এগিয়ে যাবো।

ভিষগাচার্য চক্রপাণি দত্তের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি সম্পর্কে আমরা প্রথমে কিছু জেনে নেবো। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রপাণি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন: 'অনুমান হয় যে নয়পাল দেব বিংশতিবর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। নয়পাল দেবের রাজ্যকালে বৈদ্যজাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। বৈদ্যগ্রন্থকার চক্রপাণির পিতা নারায়ণ নয়পাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন'।[৪৩]

এই অংশে মূলতঃ সুনির্মল দত্ত চৌধুরীর 'গঙ্গা থেকে সুরমা' বইটি অনুসরণ করা হয়েছে।

উপরে নয়পাল দেবের মৃত্যুর যে সময়কাল উল্লেখিত হয়েছে, তা চক্রপাণি দত্তের শ্রীহট্টে আগমনের সম্ভাবিত সময় নির্দ্ধারণে সহায়ক হবে।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে কিছু বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়: '(এ পর্বের) শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় রোগনিদানবিদদের অন্যতম চক্রপাণি দত্ত নিঃসন্দেহে বাঙালী। তাঁহার পিতা নারায়ণ জনৈক গৌড়রাজের পাত্র (রাজকর্মচারী) এবং রসবত্যধিকারী (রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন। চক্রপাণির ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী টিকাকার শিবনাথ সেন যশোধর বলিতেছেন, এই গৌড়রাজ ছিলেন পাল-রাজ জয়পাল(!)। চক্রপাণি বংশ লোধ্রবলি কুলীন। মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যমতে ইঁহাদের বাড়ী ছিল বীরভূম। .. চক্রপাণি দত্ত চরকের যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহার নাম আয়ুর্বেদ দীপিকা বা চরক তাৎপর্য দীপিকা, এবং তদরচিত সুশ্রুত টীকার নাম ভানুমতী। তাঁহার অন্য দুইটি ক্ষুদ্রতর গ্রন্থের নাম যথাক্রমে শব্দচন্দ্রিকা ও দ্রব্যগুণ সংগ্রহ। শব্দচন্দ্রিকা ভেষজ গাছ গাছড়া এবং আকর দ্রব্যাদির তালিকা এবং দ্রব্যগুণসংগ্রহ পথ্যাদি নিরূপণ সংক্রান্ত পুঁথি।'[৪৪]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থেও আমরা অনুরূপ বর্ণনা পাই:

It is, however, beyond doubt that Chakrapanidatta, the well known commentator on Charaka and Susruta belonged to Bengal. In his compendium of therupy, entitled *Chikitsa samgraha* he informs us that his father Narayana was an officer (Patra) and superintendent of the culinary department (*Rasavatyadhikarin*) of the king of Gauda. Chakrapanidatta should be placed in the middle of the 11th century.[৪৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত আয়ুর্বেদশাস্ত্রী শিবনাথ সেন 'চক্রদত্ত' গ্রন্থের যে ভাষ্য রচনা করেন তাতে পাত্র শব্দের অর্থ করেছেন 'পাত্রমিতি মন্ত্রী', অর্থাৎ 'পাত্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে মন্ত্রী। এবং নারায়ণ যে পালরাজ নয়পাল দেবের পাত্র ছিলেন তাও উল্লেখিত হয়েছে

'গৌড়াধিনাথো নয়পাল দেব:
তস্য রসবতী মহানসং
তস্য [illegible] তত্র
'পাত্রমিতি মন্ত্রী;'

চক্রপাণি তাঁর 'চক্রদত্ত' গ্রন্থে নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে

'গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারী পাত্র
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োহন্তরঙ্গাৎ
ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারীঃ ।।

ভাবার্থ হলো গৌড়রাজের রসবতী, অর্থাৎ খাদ্য দপ্তরের অধিকারী বা অধ্যক্ষ (মন্ত্রী) নারায়ণের পুত্র। অন্তরঙ্গ ভানুর অনুজ, প্রখ্যাত লোধ্রবলী বংশে চক্রপাণি। চক্রপাণির অগ্রজ ভানু সুচিকিৎসক হয়েও মহারাজ নয়পালের 'সন্ধিবিগ্রহিক' বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন।

'রসবত্যাধিকারী পাত্র' কথাটির সঠিক তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু বিভ্রান্তি বা সংশয় থেকে যায়। অনেক ঐতিহাসিক এটির সহজ অর্থ করেছেন 'রন্ধনশালার অধ্যক্ষ'। যদি পাত্র শব্দের অর্থ মন্ত্রী ধরে নেওয়া যায়, তবে এটা ভাবাই যুক্তিযুক্ত হবে যে 'রাজবদ্য নারায়ণ' রন্ধনশালার সাধারণ অধ্যক্ষ ছিলেন না। তিনি তার তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রী ও খাদ্য পরীক্ষকও ছিলেন। এটাও অসম্ভব নয় যে 'রসবতী' অর্থে রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সূচিত হচ্ছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর গ্রন্থে চক্রপাণি সম্পর্কে স্যার পি. সি. রায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এই মর্মে:

'Since the days of Vāgbhata metallic preparations had begun slowly to creep into use and at the time of Chakrapani and his predecessor Vrinda, they had so fully established their claim that they could no longer be ignored Thus we find from the tenth century downward every medical work more or less recommending compounds of metals which can only be synthetically produced.'[৪৬]

অতুল সুর মহাশয়ের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' (১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৮) গ্রন্থে একই তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়:

'নিদান সম্বন্ধে এই যুগের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন চক্রপাণি দত্ত। তিনি 'আয়ুর্বেদ দীপিকা' ও 'ভানুমতী' নামে যথাক্রমে চরক ও সুশ্রুতের উপর দুখানি টীকা রচনা করে গেছেন। এ ছাড়া, তিনি আরও রচনা করেছিলেন শব্দচন্দ্রিকা, দ্রব্যগুণসংগ্রহ ও চিকিৎসাসংগ্রহ। এগুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে মৌলিক রচনা।'

ভিষগাচার্য চক্রপাণি দত্তের শ্রীভূমি শ্রীহট্টে পদার্পণের ইতিহাস সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। তাঁর দীর্ঘ ব্যক্তিগত জীবনের সব ঘটনা বা ইতিহাস সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থে থাকবার কথাও নয়। ইতিহাস শুধু তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের কথাই স্মরণে রেখেছে। সুতরাং চক্রপাণি দত্তের শ্রীহট্ট প্রবাসকালীন ঘটনাপুঞ্জ ও ইতিহাসের সূত্র আমাদের খুঁজতে হবে উত্তরকালে চক্রপাণি দত্তের যে বংশধারা শ্রীহট্টের বিভিন্ন অংশে শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়েছিল তাঁদের সংরক্ষিত কুলজি, বংশলতা ইত্যাদিতে। এইসব কুলজি গ্রন্থে ও বংশের ইতিহাসমূলক বংশ লতিকায় সন্নিবেশিত ঘটনাবলী ও বংশপরম্পরার বর্ণনায় যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় তাতে এসব কুলজি গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

যে সব ইতিহাস ও কুলজি গ্রন্থে আমরা চক্রপাণি দত্তের শ্রীহট্ট আগমন এবং তাঁর উত্তরকালীন বংশ-পরম্পবার বিষয়ে অবহিত হই সেসব গ্রন্থের কয়েকটির নামোল্লেখ এখানে করা যেতে পাবে।

(১) অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি: শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত
পূর্বাংশ (১৯১১ ইং)
উত্তরাংশ (১৯১৭ ইং)
(২) উপেন্দ্রনাথ দত্তের 'চক্রপাণি বংশ' গ্রন্থে উল্লিখিত—'চক্রপাণি বংশের বংশলতা'।
(৩) কবি গোপীনাথ দত্তের 'দত্তবংশাবলী'— প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন কুলপঞ্জিকা
(৪) লাখাই বংশ শাখাব কবি ভবানীপ্রসাদ দত্ত (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী) রচিত বংশাবলী
(৫) বসন্ত কুমার সেন রচিত 'চক্রপাণি দত্ত'
(৬) নরেন্দ্র কুমাব গুপ্ত চৌধুবীব 'শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ'

তাছাড়াও আছে শ্রীহট্টের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা 'চক্রপাণি দত্ত'-এর বংশ-প্রশাখার নিজস্ব কুলজি গ্রন্থ যথা, কেশবপুর বংশ-শাখা, চৌযালিশ বংশ শাখা এবং হরিশচন্দ্র দত্ত বচিত বনভাগ বংশ-শাখাব 'বংশাবলী পাঁচালী'

'শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯) বলা হযেছে যে শাহজলালের শ্রীহট্ট বিজয় ও গৌড়-গোবিন্দের পতনেব 'প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বৃদ্ধ চক্রপাণি পুত্রগণসহ নৃপতি গোবিন্দেব চিকিৎসার্থ শ্রীহট্ট আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।'[১৭]

উপবের উদ্ধৃতিতে যে নৃপতি গোবিন্দের উল্লেখ রয়েছে সেই গোবিন্দ কোন্ গোবিন্দ এ সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তিব সৃষ্টি হয়েছে। এই গোবিন্দ নিশ্চয়ই শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা গৌড়-গোবিন্দ নন্। গৌড়-শ্রীহট্টের রাজা অন্য কোন (গৌড়) গোবিন্দ হওযাই সম্ভব। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ বঙ্গাধীশ নয়পাল দেবের পাত্র (রাজকর্মচারী) ছিলেন। নয়পাল দেবের মৃত্যু হয় ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং চক্রপাণি দত্তের সময়কাল একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যকালীন সময়সীমা ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমরা আগে দেখেছি যে গোবিন্দ (রণ!) কেশব-এর (প্রথম) ভাটেরা তাম্রপাট্টালীর যে সম্ভাব্য সময় নির্দ্ধারণ করা হয়েছে তাহল ১০৪৯ (Epigraphia Indica XIX, 280)। এই যুক্তিব উপর নির্ভর করে এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে গোবিন্দরণ কেশব-এর রাজত্ব কালেই চক্রপাণি দত্তের শ্রীহট্টে আগমন হয়েছিল। কোন যুক্তিতেই শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুবাজা গৌডগোবিন্দেব রাজত্বকাল হতে পাবে না। এই গৌড় গোবিন্দ গোবিন্দ কেশব দেবেব অধস্তন ১০২ পুরুষ এবং তাদের মধ্যে সময়েব ব্যবধান কম কবেও দু'শ বছরের অধিক হওয়া সম্ভব।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সব আঞ্চলিক ইতিহাস ও কুলজিগ্রন্থ কুলেব আদি পুরুষ চক্রপাণি দত্তকে 'চক্রদত্ত' প্রণেতা ভিষগাচার্য চক্রপাণি দত্ত বলে চিহ্নিত করেছে। এ সম্পর্কে যে কাহিনী

প্রায় সব কুলজি গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে তা সংক্ষেপে এই : গৌড় শ্রীহট্টের অধিশ্বর কঠিন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর জনৈকা মহিষী রাজার প্রাণ রক্ষার্থে ব্যগ্র হয়ে চক্রপাণি দত্তকে দূত পাঠিয়ে সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানান। বলাবাহুল্য চক্রপাণি দত্ত কেবল একজন চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থকার ছিলেন না, ধন্বন্তরী হিসেবেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। বঙ্গের প্রত্যন্ত দেশ শ্রীহট্টেও তাঁর খ্যাতি প্রসারিত হয়েছিল। অতিবৃদ্ধ চক্রপাণি গঙ্গাতীর ছেড়ে গঙ্গাবিহীন দেশে যাত্রা করতে অস্বীকৃত হন। চক্রপাণিদত্ত দূতকে বললেন : 'গঙ্গাছাড়ি অন্তর না হইমু' (গোপীনাথ দত্তের 'দত্ত বংশাবলী')। রাণী গায়ের সব অলঙ্কার খুলে দূতের হাতে দিয়ে আবারও বার্তা পাঠালেন এই মর্মে যে, রাজার যদি মৃত্যু হয় তবে তিনি স্বামীর চিতায় উঠে সহমৃতা হবেন, এবং নারী বধের পাপ চক্রপাণিতে বর্তাবে। ধর্মভীরু চক্রপাণিদত্ত বিচলিত হলেন। অবশেষে তাঁর তিন পুত্রসহ চক্রপাণি শ্রীহট্টে আগমন করেন। সম্ভবত নৌকাযোগে তাঁর আগমন হয়েছিল। চক্রপাণির চিকিৎসার গুণে রাজা আরোগ্যলাভ করেন। রাজার শত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে ভিষগাচার্য আবার পুণ্য সলিলা গঙ্গার দেশে ফিরে যান তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উমাপতিকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর অপর দুইপুত্র মহীপতি ও মুকুন্দ শ্রীহট্টে থেকে যান। কবি ভবানী প্রসাদ দত্তের রচিত 'বংশাবলীতে' বর্ণনা এ রকম :

'মহীপতি নামে পুত্র এ দেশে রাখিলা।
জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্গে কবি নিজ দেশে গেলা।।
সেই মহীপতি দত্ত অতি গুণবান।
মহারাজ তাঁকে বহু করিলা সম্মান।।
দিলেন তিনি গ্রামাদি জমিদারী করি।
সপ্তগ্রাম স্থানেতে করিলা নিজ বাড়ী।।'

চক্রপাণি দত্তের আদি নিবাস 'সপ্তগ্রামের' নামেই মহীপতির নূতন আবাস স্থলের নামকরণ হয়, যা পরবর্তীকালে 'সাঁতগাও' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

প্রাচীন কবি কীর্তিচন্দ্র দত্ত রচিত 'পাঁচালীতে' একই তথ্য উল্লিখিত হয়েছে :

'এত শুনি নরপতি হরষিত হৈয়া।
স্বত্ব করি তাম্রপত্রে দিলেন লেখিয়া।।'

অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধিও তাঁর 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে অনুরূপ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করেছেন :

'... মধ্যমপুত্র ও কনিষ্ঠ পুত্র মহীপতি ও মুকুন্দ এদেশে রহিলেন। রাজা ইহাদিগকে মহাসম্মানে সেই ভূসম্পত্তি (যা তিনি চক্রপাণি দত্তকে দান করতে চেয়েছিলেন) দান করিয়া স্থাপন করিলেন। ইঁহারাই সাতগাঁও, লাখাই প্রভৃতি স্থানের দত্ত বংশের আদি পুরুষ (পূর্বাংশ, ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬ ৯)।

এই নিবন্ধের সল্প পরিসরে চক্রপাণি দত্তের বংশ-পরম্পরা যে ভাবে শাখা-প্রশাখায় প্রসারলাভ করে, তার প্রত্যেকটির গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড যা দক্ষিণশূর নামে তৎকালে পরিচিত ছিল রাজা মহীপতিকে দান করেন। কীর্তিচন্দ্র দত্ত রচিত 'পাঁচালী'তে আছে:

হাসিলের দক্ষিণ পারেতে কৈলা স্থান।
দীঘি সরোবর বাড়ী করিলা নির্মাণ।।
রাঢ়েতে তাহার স্থান সপ্তগ্রামে ছিল।
সেই নাম দক্ষিণসুরেতে আসি হইল।।

উপরের 'পয়ারে' উল্লিখিত 'হাসিল' সম্ভবত 'হাইল হাওর'।

মহীপতি দত্ত শ্রীহট্টে চক্রপাণি বংশধারার আদি পুরুষ। মহীপতি স্থাপিত বংশধারা কালক্রমে শাখা-প্রশাখায় শ্রীহট্টের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কালের নিয়মে আদি সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও-এর বিপুল আয়তন হারিয়ে গিয়ে চৌয়ালিশ, বলিশিরা, সতরশতী প্রভৃতি পরগণায় বিভক্ত হয়ে যায়। মহীপতির বংশের অধস্তন নবম পুরুষ ছিলেন কীর্তিমান শ্রীবৎস দত্তখান। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে শ্রীবৎস দত্তখানের এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

শ্রীবৎস দত্তের জীবদ্দশায় 'গৌড়ের বাদশাহ্ দক্ষিণশূর হইতে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। শ্রীবৎস তখন ত্রিপুরার করপ্রদ সামন্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি ভবিষ্যত ভাবিয়া এই অভিযানে গৌড়ের বাদশাহ্‌কেই বিশেষ সহায় করেন ও পরে পুরস্কার স্বরূপ ভানুগাছ, আমদপুর (আদমপুর), ছয়চিরি, ইটা-পাঁচগাঁও এবং পুটিজুরী প্রভৃতি স্থান (পরগণা) প্রাপ্ত হন। বাদশাহ্ তাঁহাকে খাঁ উপাধি দান করেন, তদবধি তিনি দত্তখাঁ নামে খ্যাত হন'।

উপেন্দ্রনাথ দত্তের 'চক্রপাণি বংশ' গ্রন্থ উক্ত গৌড়ের বাদশাহ্‌কে 'হুসেন শাহ্' (১৪৯৮-১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ) বলে চিহ্নিত করেছে। এই সময়েই শ্রীহট্ট বাংলার নবাবের শাসনাধীন হয়।

চক্রপাণি দত্তের শ্রীহট্ট বংশধারায় 'বংশবৃত্তি' চিকিৎসাবিদ্যার অনুসরণ ও চর্চা দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। শ্রীবৎসের তৃতীয় পুত্র সুরদাস (সুয়াই দত্ত) শল্য চিকিৎসকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। চক্রপাণি বংশের ইতিহাসে বহুকাল পর্যন্ত এই বংশীয়রা আদি বাসভূমি গাঙ্গেয় রাঢ়দেশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ অব্যাহত রেখেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ দত্তের 'চক্রপাণি বংশ' (পৃষ্ঠা, ৪৩) গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে: 'চক্রদত্তের বংশধরগণের মধ্যে অনেক কৃতি ব্যক্তিই রাঢ়দেশের বৈদ্যবংশে সম্বন্ধ স্থাপন করেন, এবং সেই সূত্রে বহু রাঢ়ীয় সন্তান শ্রীহট্টে আসিয়া বাস করেন।' প্রসঙ্গত, একটি নাম এখানে উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য। সে নাম চক্রপাণি বংশের কেশবপুর শাখার লোককবি এবং বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা ভাই রাধারমণ দত্ত। শ্রীহট্টের মাঠে-ঘাটে,

নদীর জোয়ার-ভাঁটায়, পথে-প্রান্তরে আজও যাঁর গান গীত হয় তার নাম 'ভাইবে রাধারমণ'। মেয়েরা 'ধামাইল' নৃত্যের সঙ্গে গান করে:

'কুঞ্জ সাজাও গিয়া গো রাই
কুঞ্জ সাজাও গিয়া,
আজ নিশীথে আসবে কানাই
বাঁশরী বাজাইয়া ॥'

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চক্রপাণির কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দের বংশধারা আজ লুপ্তপ্রায়। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (উত্তরাংশ, পৃষ্ঠা ২৮৫-৮৬) গ্রন্থের বর্ণনায় আছে:

'শ্রীহট্টের পূর্বভাগে গোয়ার নামে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ছিল, উহার একদিকে ছিল জৈন্তা, অন্যদিকে হেড়ম্ব। উহার উৎপন্ন বার্ষিক লক্ষ মুদ্রা নির্দ্ধারিত ছিল। রাজা মুকুন্দকে এই একলাখি গোয়ার দেশ প্রদান করেন। বর্তমানে গোয়ার নামে একটি ক্ষুদ্র পরগণা... পূর্বোক্ত গোয়ারের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে'। উপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন কিছুকাল পর হেড়ম্বরাজ (খাসিদের রাজা) গয়াড় দেশ আক্রমণ করেন। মুকুন্দের বংশধররা তখন দেশ ছেড়ে ইছামতী, পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে আশ্রয় নেন। উপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্ভবত ভুলক্রমে খাসিদের রাজাকে হেড়ম্বরাজ বলেছেন। খাসিদের এই রাজা খুব সম্ভবত 'পর্বতরায়' যিনি জয়ন্তীয়ার সমতল ক্ষেত্র অধিকার করেছিলেন। পঞ্চখণ্ডে 'দত্ত' পদবীধারী গোষ্ঠী বা পরিবারের বসতি ছিল, তাঁদের কুলজি গ্রন্থ আছে কিনা, এবং তাঁরা নিজেদেব 'চক্রপাণি দত্ত বংশীয়' বলে দাবি করেন কিনা জানা যায় না।

পরিসমাপ্তিতে আরও দু'চারটি কথা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি চক্রপাণি দত্তের শ্রীহট্টীয় বংশধাবায় ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার স্রোত বহুকাল অব্যাহত ছিল। 'দত্তবংশাবলী' চক্রপাণির বংশে গোপীবল্লভ, সুরদাস প্রভৃতি শাল্যবিদ চিকিৎসকদের উল্লেখ করেছে। অচ্যুৎচরণ চৌধুরীব 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থেও এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে: 'সুরদাসের সময় পর্যন্ত জাতিবৃত্তি চিকিৎসা পরিত্যাগ করা হয় নাই। সুরদাসের পর হইতে বংশে বৈদ্যক বিদ্যার আলোচনা রহিত হয়'। তবে আয়ুর্বেদচর্চা একেবারে হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও সুচিকিৎসক গোপীবল্লভ এ বংশধারায় বর্তমান ছিলেন। একথা বলা হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে চক্রপাণি বংশের প্রভাব শ্রীহট্টে আয়ুর্বেদ চর্চার ব্যাপক সূচনা করেছিল।

চক্রপাণির বংশ 'দক্ষিণ রাঢ়ীয়' বলে পরিচিত ছিল। কুলজি বর্ণিত বিবাহের কুলাচার ও বৈবাহিক সম্বন্ধের ঘটনাগুলিও এই সাক্ষ্য দেয় যে, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ়ীয় সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। চক্রপাণিদত্তের শ্রীহট্টীয় বংশধারার সঙ্গে যে সব গ্রামের নাম বিজড়িত এবং পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধিলাভ করে সেগুলো হচ্ছে সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম), বালিশিরা, সতরশতী, জগন্নাথপুর, ব্রাহ্মণশাসন, প্রভাকরপুর, কেশবপুর, দত্তবিনসনা, লাখাই, মিরাশী প্রভৃতি।

গ্রন্থনির্দেশিকা :

১। কমলাকান্ত গুপ্তচৌধুরী : শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস (১৯৪০ ইং), পৃষ্ঠা ১

২। W. W. Hunter: A Statistical Account of Assam (1871), Vol. II, p.263

৩। Sir Joseph Dalton Hooker: Himalayan Journals (1854, Reprint 1891)

৪। কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪

৫। Nik Douglas: Tantra Yoga (1971)

৬। P. C. Choudhury: The History of Civilization of the People of Assam to the Twelfth Century A.D. (1959), p.161

৭। Suniti Kumar Chatterjee. The Place of Assam in the History and Civilization of India (1970), p 19

৮। P.C. Choudhury: op. cit, p. 160-61

৯। সুনির্মল দত্ত চৌধুরী : গঙ্গা থেকে সুরমা

১০। কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫০

১১। ঐ : ঐ, পৃষ্ঠা ২

১২। P. C. Choudhury: op. cit., p 163

১৩। P. C. Choudhury: op. Cit., p. 162

১৪। দীনেশচন্দ্র সরকার : শিলালেখ — তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ (১৯৮২), পৃষ্ঠা ৪৬

১৫। দীনেশচন্দ্র সবকার : পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত (১৯৮৫), পৃষ্ঠা ১২১-১২২

১৬। ঐ : শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭

১৭। ঐ : ঐ পৃষ্ঠা ৪৬

১৮। ক্ষিতিমোহন সেন : জাতিভেদ (১৩৫৩ ফাল্গুন), পৃষ্ঠা ১৩৭-৩৮

১৯। P. C. Choudhury: op. cit. p. 162

২০। দীনেশচন্দ্র সরকার : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩

২১। R. C. Majumdar: History of Ancient Bengal (Reprint 1974), p. 1

২২। নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস (মাঘ, ১৩৫৬), পৃষ্ঠা, ১৩৯-৪০

২৩। দীনেশচন্দ্র সরকার : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫২

২৪। Gayatri Sen Majumdar: Buddhism in Ancient Bengal (1983), p. 7

২৫। Gayatri Sen Mazumdar: Ibid, note 70, p. 57

২৬। R. C. Majumdar: op. cit, p. 130

২৭। R. M. Nath: Background of Assamese Culture (1949), p. 56

২৮। Kamalakanta Gupta: Copper-Plates of Sylhet (Sylhet, 1967), p. 3

২৯। Jayanta Bhusan Bhattacharjee: Land-grants, Land Management & the nature of Social Formation in Srihatta during 7th to 11th century A.D. (Journal of Social Sciences & Humanities, NEHU, April-June 1986), p. 5

৩০। Do: Ibid, p. 6

৩১। দীনেশচন্দ্র সরকার: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫১

৩২। ঐ: ঐ, পৃষ্ঠা. ১৮৫

৩৩। Kamalakanta Gupta: Copper-Plates of Sylhet (Sylhet, 1967), p. 165

৩৪। Jayanta Bhusan Bhattacharjee: op. cit., p.8

৩৫। Do: op. cit., p.9

৩৬। কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী: শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস (১৯৪০ ইং), পৃষ্ঠা. ৯

৩৭। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়: বাঙালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (পুনর্মুদ্রণ, মার্চ, ১৯৭৪), পৃষ্ঠা. ১৭০

৩৮। ঐ,: ঐ, পৃষ্ঠা. ১৭০

৩৯। ঐ, : ঐ, পৃষ্ঠা. ১৭০

৪০। ঐ, : ঐ, পৃষ্ঠা. ১৭০

৪১। W. W. Hunter: A Statistical Account of Assam, Vol. II, p. 260

৪২। Sir Edward Gait: A History of Assam (Third Revised Edition, 1963), p. 326

৪৩। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ২২৫-২৬)

৪৪। নীহাররঞ্জন রায়: বাঙালীর ইতিহাস (মাঘ, ১৩৫৬), পৃষ্ঠা. ৬৯৭-৯৮

৪৫। R. C. Majumdar: History of Ancient Bengal (Reprint, 1974), p. 375

৪৬। Do: Ibid., p. 375-76

৪৭। সুনির্মল দত্ত চৌধুরী: গঙ্গা থেকে সুরমা (১৯৮৮), পৃষ্ঠা. ৫৮

তাম্রলিপি প্রভৃতিতে বিধৃত শ্রীহট্ট-কাছাড় জনপদের অলক্ষিত নাথতত্ত্ব

এন. সি. নাথ

১। ভূমিকা :

শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় নাথ সম্প্রদায়েব ঘন বসতি। তৎসংলগ্ন পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলগুলিও তথৈবচ। এই সমগ্র অঞ্চল জুড়ে এককালে নাথ বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন এবং নাথ গুরুরা যোগধর্ম, তন্ত্র প্রভৃতি প্রচার করতেন। এ সবের ফলে এই অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের এত ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে। তাই এই অঞ্চলকে আমরা একটি অন্য নামেও অভিহিত করতে পারি— 'নাথ মণ্ডল'। ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' গ্রন্থে দেখা যায় প্রচীনকালে বৃহত্তর ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী পদ্মানদীর উপকূল ভাগ 'গঙ্গামণ্ডল' নামে অভিহিত হত।[1] অনুরূপ ভাবে কুমিল্লা ও নোয়াখালি অঞ্চলে অবস্থিত মেহারকুল ও পাটিকাবা রাজ্য থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ শ্রীহট্ট ও উত্তর শ্রীহট্ট হয়ে কাছাড় জেলার জয়তুঙ্গ/বর্ষ (বর্তমান নাম জাটিঙ্গা) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাটি বিভিন্ন নাথোপাধিক রাজন্যবর্গের শাসনাধীন থাকা হেতু এই সমগ্র অঞ্চলটিকে 'নাথমণ্ডল' আখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক নয়। এই অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায় ও নাথ ধর্মের প্রচার-প্রসার অন্তত বার-তের শত বৎসরের প্রাচীনত্ব দাবী করতে পারে। এমন ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের হাতে রয়েছে।

২। সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদান— তাম্রলিপি :

এই অঞ্চলের নাথ সম্প্রদায় বিষয়ক কয়েকখানি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। সেগুলি হল— (১) শ্রীমঙ্গল অঞ্চলের রাজা মরুন্ডনাথের তাম্রলিপি; (২) শ্রীহট্ট সহরের সমীপবর্তী ভাটেরা অঞ্চলে প্রাপ্ত রাজা দ্রুমনাথ বা গৌড়গোবিন্দের তাম্রলিপি; এবং (৩) কুমিল্লার কাছাকাছি প্রাপ্ত রাজা লোকনাথের তাম্রলিপি। এই তাম্রলিপিগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।[2] এগুলো থেকে এই অঞ্চলের নাম, ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক তথ্য উপলব্ধ হয়। বহুদিন যাবৎ এগুলো উপেক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল তবে সুখের বিষয় অধুনা এগুলি কিছু ঐতিহাসিকের নজরে এসেছে এবং এর ফলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাথ সম্প্রদায় ও নাথ ধর্ম সম্পর্কে কিছু লেখালেখিও হচ্ছে। এই লেখক এ সম্পর্কে বিস্তৃত লেখালেখি করে আসছেন দীর্ঘকাল যাবৎ। তৎকৃত—

"তাম্রলিপি, শিলালিপি, মোগললিপি প্রভৃতি
নূতন আলোকে নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস"—

এই বিষয়ে একখানি বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থ। এছাড়া ত্রিপুরার কিছু কেছু লেখক[৩]ও এই তাম্রলিপিগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে তাঁরা অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন এবং সব দিক নিয়ে আলোচনা করেনওনি। আরো যথেষ্ট আলোচনার দরকার রয়ে গেছে। এবার উক্ত তাম্রশাসনগুলি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

২(ক) মরুন্ডনাথের কালাপুর তাম্রশাসন :

এই তাম্রশাসনখানি পাওয়া গেছে দক্ষিণ শ্রীহট্ট জেলার শ্রীমঙ্গল থানার চাউতলী পরগণার অন্তর্গত কালাপুর গ্রামে। এতে দেখা যায় সেখানে "শ্রীমঙ্গলা' নামে একটি পার্বত্য[৪] বাজ্য ছিল। সেখানে রাজা ছিলেন মরুন্ডনাথ। তাঁব এক পূর্বপুরুষের নাম দেওয়া আছে শ্রীনাথ। এতে সন্দেহ থাকে না যে এরা নাথবংশীয় রাজা ছিলেন। মরুন্ডনাথের পূর্বপুরুষ শ্রীনাথ কুমিল্লায় প্রাপ্ত লোকনাথ তাম্রশাসনেও উল্লিখিত হয়েছেন। এতে বোঝা যায কুমিল্লার লোকনাথ রাজবংশ এবং শ্রীমঙ্গলা রাজ্যের মরুন্ডনাথ রাজবংশ উভয়ই এক কুলসম্ভূত। দুটিই নাথ রাজবংশ। মরুন্ডনাথের নাম দেখে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজমোহন নাথ মহোদয় মনে কবেন, মরুন্ডনাথ দক্ষিণ-ভাবতের কর্ণাটক অঞ্চল থেকে আগত।[৫] তিনি আরো বলেন যে, দক্ষিণ-ভারতে নাথ সম্প্রদায়েব মঙ্গলাদেবীর মন্দির আছে ম্যাঙ্গালোর শহরের কাছে। মরুন্ডনাথ সেখানে মঙ্গলাদেবীর নামানুসাবে তাঁব রাজ্যের নামকরণ করেন 'শ্রীমঙ্গল'। শ্রীহট্টের বর্তমান শ্রীমঙ্গল সহর প্রাচীন শ্রীমঙ্গলা রাজ্যের স্মৃতি বহন করছে। শ্রীমঙ্গলা = শ্রী (কমলা, লক্ষ্মী) + মঙ্গলা। কমলা বা শ্রী দেবী মৎস্যেন্দ্রনাথজীর অন্যতমা সাধনসঙ্গিনী ছিলেন।

মরুন্ডনাথ ও কুমিল্লার রাজা লোকনাথ ৭ম শতাব্দীর লোক। এরা মগধেব গুপ্ত রাজগণের পতনের যুগে বিদ্যমান ছিলেন। তাম্রলিপিতে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী লোকনাথ ও মরুন্ডনাথের কাল বলে স্থিরীকৃত হয়েছে।

কিন্তু লিপি দুখানিতে মরুন্ডনাথ ও লোকনাথেব বেশ কয়েকজন পূর্বপুরুষের উল্লেখ থাকায় এই রাজবংশদ্বয় যে আরো বেশ আগে থেকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা অনুমেয়। সুতরাং এই অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায়ের বসতি ও নাথ যোগধর্মেব প্রচাব প্রসার মোটামুটি ৬ষ্ঠ শতক থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

২(খ) রাজা গৌড় গোবিন্দের ভাটেরা তাম্রশাসন :

রাজা গৌড় গোবিন্দ[৬] ১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শ্রীহট্ট সহরে রাজত্ব করতেন। তাঁর পরিবারের দুখানি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। শ্রীহট্ট সহর থেকে ২০/২২ মাইল দক্ষিণে ভাটেরা নামক স্থানে। একখানি লিপিতে তাঁর নাম 'দ্রুমনাথ' বলা হয়েছে, যথা—

গোবিন্দবীরো দ্রুমনাথ সংজ্ঞঃ।

বীর গোবিন্দ, যিনি দ্রুমনাথ নামে অভিহিত হতেন। দ্রুমনাথ নাম থেকে বোঝা যায় ইনি নাথ মার্গে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। নতুবা তাঁর এই নাথান্ত নাম আসবে কোথা থেকে? ইনি জন্মসূত্রেও নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারেন। কারণ শ্রীহট্ট অঞ্চলে বহু পূর্ব থেকেই নাথ রাজারা রাজত্ব করতেন এবং নাথ সম্প্রদায়ের বসতিও গড়ে উঠেছিল। শ্রীমঙ্গল অঞ্চলে রাজা মরুন্ডনাথের তাম্রলিপি থেকেই এটা জানা যায়। মরুন্ডনাথের বংশ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী থেকেই সেখানে রাজত্ব করতেন। তাই শ্রীহট্ট শহরে নাথবংশীয় 'দ্রুমনাথ' বা গৌড় গোবিন্দের রাজত্ব খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এখনও শ্রীহট্ট শহরে ও আশেপাশে 'রাজা' উপাধিধারী কিছু নাথ পরিবার দৃষ্ট হয়। এদের আর্থিক অবস্থা ও আচার-আচরণ থেকেও এদের উচ্চ বংশ মর্য্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। এরা খুব সম্ভবতঃ প্রাচীন রাজা দ্রুমনাথ ও গৌড় গোবিন্দের বংশধর। কেউ কেউ 'গোবিন্দ কেশব দেব' নাম দেখে মনে করেন এই রাজা বোধ হয় দেব উপাধিধারী। কিন্তু দেব শব্দ রাজাদের নামের সঙ্গে প্রায়ই সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। এটা রাজাদের প্রাচীন দৈব উৎপত্তি (divine origin) মতবাদ থেকে উৎপন্ন প্রথা। মহর্ষি মনুও লিখেছেন— মহতী দেবতা হ্যেষা নর-রূপেন তিষ্ঠতি[৭] (রাজা নররূপে অবস্থিত দেবতা)। তাই রাজাদের নামে ব্যবহৃত দেব শব্দ কুলবাচক নয়, সম্মানার্থক। এই কারণেই গোবিন্দ কেশব দেব দেবকুলোৎপন্ন হবেন এমন কোন কথা নয়। আর তাঁর দ্রুমনাথ নাম সকল সংশয়ের নিরসন করে দেয়। তিনি যে নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এটাই প্রমাণিত হয়। জন্মসূত্রে বা দীক্ষাসূত্রে তিনি নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত। এই যুগে বঙ্গদেশে নাথ ধর্মের গৌরব তুঙ্গে পৌঁছেছিল। বঙ্গের সেনরাজ বল্লাল ও তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের কল্যাণে নাথ সম্প্রদায় ধর্মজগতের নানা ক্ষেত্রে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কাজেই শ্রীহট্ট অঞ্চলেও এই সম্প্রদায়ের বিস্তার খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। রাজা গৌড় গোবিন্দ প্রভৃতির পক্ষে এই ধর্মে প্রবেশ মোটেই বিচিত্র নয়। বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র (১০ম—১১শ শতাব্দী) বঙ্গদেশে নাথ যোগীদের বিপুল সংখ্যা এবং যোগবল দর্শনে বিস্মিত হয়েছিলেন—

হুঙ্কার ছাড়িল যোগী যোগ করি সার।
  ষোল শত যোগী আইল সিদ্ধা হাড়িপার
ললাটে চন্দন লেখা, ভস্ম কলেবর
  সিংহনাদ কাঁথা-ঝুলি অতি ভয়ঙ্কর
বিস্ময় মানিল রাজা না জানে বিশেষ
  আচম্বিতে এত যোগী আইল বঙ্গদেশ
যোগীর চরণে রাজা কাঁপে থর থর
  পড়িল যোগীর পায় বঙ্গের ঈশ্বর।[৮]

গৌড় গোবিন্দ বা রাজা দ্রুমনাথের রাজ্য শ্রীহট্ট ছাড়াও কাছাড় জেলা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে উল্লিখিত হয়।[৯] এছাড়া অনুমান করা যায় তাঁর রাজত্বকালে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যে নাথ ধর্ম ও নাথ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট বিস্তার সাধিত হয়েছিল।

গৌড় গোবিন্দের কিছু বংশধর দাবী করেন তাঁরা ব্রাহ্মণ। আর ইতিহাস লেখকগণের মতে এই বংশ দেবকুলের। আমরা মনে করি, এই সব মতবাদই কিছু না কিছু সত্য। কিন্তু তবুও এরা নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত।

নাথ সম্প্রদায় সেই প্রাচীন আমলে 'কদ্রজ ব্রাহ্মণ' নামেই খ্যাত ছিলেন। এরা পৌরোহিত্য ও গুকতা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। রুদ্রজ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা পূজা করানো সেই যুগে অত্যন্ত গৌববের বিষয় ছিল, একথা বলেছেন মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া। গোপল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট কৃত 'বল্লাল চরিতম্' গ্রন্থে লিখিত আছে, সেন রাজা বল্লালসেনের রাণী পদ্মাক্ষী রুদ্রজ ব্রাহ্মণ পুরোহিত মোহান্ত ধর্মগিবির মন্দিবে পূজা দিতে গৌড় রাজধানী থেকে দূববর্তী মহাস্থানগড়[১০] মন্দিবে গিয়েছিলেন, যথা--

কস্মিংশ্চিৎ কালে পদ্মাক্ষী
বল্লাল দয়িতা পুবা
শঙ্কবং পূজিতুং তত্র
মহাস্থানম্ উপাগতা
গৃহীত্বা বহু দ্রব্যাণি
হৈমানি বজতানি চ।

--- একদা বল্লালদয়িতা পদ্মাক্ষী শিবপূজা দেওয়াব জন্য মহাস্থানগড়েব মন্দিবে গমন করেন। তিনি সঙ্গে স্বর্ণ বৌপ্য নির্মিত বহুবিধ উপহার দ্রব্য নিয়ে গিয়েছিলেন।

এসব উপহার দ্রব্য থেকেই বোঝা যায় মহাস্থানগড়ের মন্দির ও তাব কদ্রজ ব্রাহ্মণ অধ্যক্ষ ধর্মগিরির প্রতি সেন রাজবংশের কিরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

কাজেই গৌড় গোবিন্দ সে যুগে নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াতে তাঁর ব্রাহ্মণ পরিচিতি খুবই স্বাভাবিক। নাথেরা তখন ব্রাহ্মণ বলেই গণ্য হতেন। এই কাবণেই গৌড় গোবিন্দেব বংশধরেরা ব্রাহ্মণ বলে দাবী করে থাকেন। এটা অযৌক্তিক নয। আসলে এরা কদ্রজ ব্রাহ্মণ বা নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত যোগী, ভগবদ্ গীতায় যে জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে---

এতদ্ হি দুর্লভতরং
লোকে জন্ম যদ্‌ঈদৃশম্। (গীতা, ৬/৪২)

— এই যে যোগিকুলে জন্ম সেটা অতি দুর্লভ। যাক্ গোবিন্দ কেশব, গৌড় গোবিন্দ বা দ্রুমনাথ যে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যেব একাংশ জুড়ে রাজত্ব করতেন এবং তিনি ছিলেন রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বা নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত সেটা ভাটেরা তাম্রশাসন থেকে প্রমাণিত হয়।

দুঃখেব বিষয় ভাটেরা তাম্রশাসন নিয়ে যে পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা কেউই 'দ্রুমনাথ' শব্দটি খেয়াল করেন নি, বা করলেও ধামাচাপা দিয়ে চলে গেছেন। এটা নিয়ে

কোন আলোচনা করতে যান নি। কিন্তু দ্রমনাথ শব্দ এই রাজার বা রাজবংশের প্রকৃত বংশ পরিচয় বহন করছে— নাথ বংশ। এটা আজ আর অস্বীকার করবার প্রশ্ন ওঠে না। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বর্তমান নাথ সম্প্রদায় এই রাজবংশের জন্য গৌরবান্বিত। এই অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায়ের বিস্তারও এই বংশের কল্যাণেই সাধিত হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা। এই অঞ্চলের রুদ্র বা ব্রাহ্মণ (নাথ) সমাজের উচিত এই রাজবংশের স্মৃতিতে বার্ষিক একটি দিবস উদ্‌যাপন করা। তাছাড়া ভাটেরা তাম্রলিপির বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা।

২(গ) লোকনাথ তাম্রশাসন ও জয়তুঙ্গবর্ষ রাজ্য :

কুমিল্লায় প্রাপ্ত ৭ম শতাব্দীর লোকনাথ তাম্রশাসনে আছে, জয়তুঙ্গবর্ষ নামে একটি রাজ্য ছিল। কোথায় ছিল তা অবশ্য ঠিক ঠিক বলা হয় নি। তবে রাজা লোকনাথের রাজ্যের আশে পাশে কোথাও ছিল এটা বোঝা যায।

লোকনাথের রাজ্য কুমিল্লা থেকে শুরু করে চতুর্দিকে বহু বিস্তৃত ছিল। তারপরে ছিল জয়তুঙ্গবর্ষ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজমোহন নাথ মহোদয় মনে করেন জয়তুঙ্গবর্ষ ছিল কাছাড় জেলায়। কাছাড়ের এই অঞ্চল বর্তমানে 'জাটিঙ্গা' নামে পরিচিত। লোকনাথ বংশের কোন রাজা এখানে রাজ্য স্থাপন করেন বলে অনুমান করা হয়। জয়তুঙ্গ শব্দের তুঙ্গ (উচ্চ) শব্দ থেকে মনে হয় এই অঞ্চল উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ছিল। 'টং' বা পাহাড়ী ঘর অর্থও হতে পারে। বর্তমান জাটিঙ্গা সহরও পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। তাই জাটিঙ্গায় জয়তুঙ্গবর্ষ রাজ্য ছিল এ কথা গ্রহণীয় হতে পারে। আব এখানের রাজবংশ লোকনাথ বংশের কোন শাখা হওয়া বিচিত্র নয়। সেটা ৭ম শতাব্দীর কথা। তখন অন্য কোন বাঙালী রাজবংশ এই অঞ্চলে ছিল বলে জানা যায় না। লোকনাথের রাজ্যের পাশে জীবধারণ রাত ও শ্রীধারণ রাত নামক রাজাদের অস্তিত্বও তাম্রলিপি সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে। এরাও নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে অনুমিত হয়। চর্য্যাপদে দেখা যায় নাথ যোগী ভূসুকু রাউত বা রাউতু উপাধি ব্যবহার করতেন।[১১] রাউতু বা বাউত থেকে 'রাত' এসেছে। এটাই জীবধারণ রাত ও শ্রীধারণ রাত নামে ব্যবহৃত হয়েছে। রাওল ও রাও উপাধিও রাজপুত নাথ সম্প্রদায়ের প্রাচীন পদবী। মেবার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পাদিত্য[১২] নাথ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বাপ্পা রাওল বা বাপ্পা রাও নাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে এই রাও, রাওল থেকে রাউল, রাউত, রাউতু, রাত এসেছে। স্ত্রীলিঙ্গে রাউলানী শব্দ ব্যবহৃত হত। "ভাল কথা রাউলানী-এ বলিল বচন।"[১৩] নাথ সম্প্রদায়েব রাউল (রাজপুত নাথ যোগী) শব্দের অনুকরণে পরে আউল, বাউল প্রভৃতি সাধক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। যাক্, জাটিঙ্গা বা জয়তুঙ্গবর্ষ রাজ্যের রাজারা কুমিল্লার ময়নামতী - মেহারকুল - পাটিকারা রাজ্যের নাথ বা রাত উপাধিধারী নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলেই আমাদেব ধারণা। রাজমোহন বাবুও এরূপ মনে করতেন। লোকনাথের তাম্রশাসনে এই আভাস পাওয়া যায়।

জাতিঙ্গার নাথ রাজবংশেব প্রভাবেই কাছাড় জেলায় নাথ সম্প্রদায়ের প্রচার-প্রসাব ঘটে। কাছাড় জেলার শিলচর, হাইলাকান্দি[১৪], লালাবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে এই রাজবংশের উত্তরপুরুষেরা ছড়িয়ে আছেন বলে মনে হয়। এই অঞ্চলের নাথ সম্প্রদায় বহু প্রচিন কাল থেকেই অর্থ, বিত্ত ও জ্ঞান গরিমায় সমুন্নত। জয়তুঙ্গবর্ষের নাথ রাজবংশই এব মূল অথবা অন্যতম প্রধান কারণ।

৩। কদলী রাজ্য :

কাছাড় জেলার প্রাচীন একটি নাম কদলী বলে অনুমিত হয়। হেড়ম্বও ছিল আরেকটি নাম। মহাভারতের হিড়িম্বা নাম্নী অসুর বাজকন্যাব নামানুসাবে হেড়ম্ব নাম হয়। পববর্তী কালে কি ভাবে 'কদলী' নাম আসে ঠিক জানা যায না। তবে বাংলা গোর্খবিজয প্রভৃতি নাথ সাহিত্যে কদলী বাজ্য একটি বহু বিশ্রুত নাম। এই রাজ্য ছিল মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথের তন্ত্র সাধনাব লীলাক্ষেত্র।

এই কদলী রাজ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল সাধনায় মগ্ন ছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের আদিলীলা নিম্নবঙ্গেব সমুদ্র উপকূলে। একথা বলেন প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মহোদয়।[১৫] মৎস্যেন্দ্রনাথজীর মধ্যলীলা এই কদলী রাজ্যে। এখানে তিনি তান্ত্রিক সাধনা করেন। কথিত আছে, ষোলশত কদলী অর্থাৎ কদলীদেশীয় নারী তাঁর সাধনায উত্তবসাধিকার কাজ কবেন। এই কদলী নারীদের দেশ বা কদলী রাজ্য কোথায় ছিল ? প্রায সকলেবই ধাবণা বর্তমান কাছাড় জেলা এবং তৎসন্নিহিত নওগাঁ জেলার কিছু অংশ জুড়ে ছিল প্রাচীন কদলী বাজ্য। নামটি কেন কদলী হয়েছিল বলা দুষ্কর। এখানে কি এককালে কদলী বনের প্রাচুর্য্য ছিল, অথবা কদলী শব্দের অন্য কোন অর্থ ছিল বলা যায না। গোর্খবিজয় গ্রন্থে যুবতী নাবী অর্থেও কদলী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যথা—

অরোগ ভাণ্ডার গুরু
কদলী সে রোগ।

— হে গুবো, ভাণ্ডার অর্থাৎ দেহ স্বভাবতঃ নীরোগ। কিন্তু কদলী বা যুবতী নারীই পুরুষের রোগের কারণ (অর্থাৎ অতিরিক্ত নারী সম্ভোগ থেকেই পুরুষের নানাবিধ রোগ সৃষ্টি হয়)।

হয়ত, এককালে এখানে নারী জাতির সংখ্যাধিক্য ছিল অথবা নারী স্বাধীনতা ছিল এখানে অধিক। তাই ইহা 'কদলী' নামে অভিহিত হত এবং পরে কদলী থেকে কাছাড় হয়।

যাই হোক, এই কদলী রাজ্যে (কাছাড়) মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথের দীর্ঘ অবস্থান ও ধর্ম প্রচারের কালেও এখানে নাথ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে। জয়তুঙ্গবর্ষের নাথবংশীয় রাজাদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

৪। উপসংহার :

উপরের আলোচনায় দেখা যায় গৌড়বঙ্গের পূর্ব প্রান্ত থেকে শুরু করে কুমিল্লা, শ্রীহট্টের শ্রীমঙ্গল, সদর শ্রীহট্ট, ও করিমগঞ্জ হয়ে আসামের কদলী রাজ্য বা কাছাড় নওঁগাঁ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি 'নাথ-মণ্ডল' বা নাথ প্রধান অঞ্চল ও নাথ রাজবংশসমূহের শাসিত বেশ কয়েকটি রাজ্য ছিল, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ৭ম শতাব্দী থেকে ১২শ-১৩শ শতক পর্যন্ত। উল্লিখিত তাম্রলিপি সমূহ থেকে এই তথ্য উপলব্ধ হয়। এই সব নাথ রাজা এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিখ্যাত নাথগুরুদের কল্যাণেই এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নাথ ধর্ম ও নাথ সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি বহু শ্রেণীর লোকই নাথ গুরুদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে নাথ পদবী গ্রহণ করতঃ এক বিশাল নাথ সম্প্রদায় গঠন করেন। তাই এখানে নাথ সম্প্রদায়ের এত ঘন বসতি। সে যুগে নাথ যোগীদের এত নাম ছিল যে নাথ উপাধি গ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত সম্মানের। এটা যেন ডক্টরেট ডিগ্রী ধারণের মত ছিল। সাধক সর্বানন্দ নাথ[১৬] জন্মতঃ ব্রাহ্মণ (ভট্টাচার্য) হলেও নাথতন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে নাথ পদবীই লিখে গেছেন সমগ্র জীবন। কাজেই এইভাবে নাথ যোগ ও তন্ত্রে আকৃষ্ট হয়ে বিগত বহু শতাব্দী যাবৎ এই 'নাথ মণ্ডল' এলাকায় লক্ষ লক্ষ লোক নাথ ধর্ম ও নাথ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয়ে এই বিরাট সমাজ গঠন করেন। এটা এক সর্ব বর্ণ ধর্ম সমন্বয়ের জ্বলন্ত উদাহরণ। এটাই বর্তমানের নাথ সম্প্রদায়। এর গৌরবময় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপরের পৃষ্ঠাগুলোতে কিঞ্চিন্মাত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করা হল।

১। রাজমালা (কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত)— ধন্যমাণিক্য খণ্ড, পৃঃ ১৩।

২। এই তাম্রলিপিগুলো যে যে গ্রন্থে আছে—

(ক) মরুণ্ডনাথের তাম্রলিপি বা কালাপুর তাম্রশাসন— দ্রষ্টব্য গ্রন্থ কমলাকান্ত গুপ্ত সম্পাদিত— The Copper Plates of Sylhet Vol I P 74 এই লিপির আলোচনার জন্য দেখুন রাজমোহন নাথ কৃত বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, Tripura State Gazetteer (Edited by K D Menon Agartala 1975)

(খ) ভাটেরা তাম্রশাসন—

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, No VIII, August, 1880

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা ১৭৫—১৮৩। এই পত্রিকায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত প্রবন্ধ 'শ্রীহট্ট ভাটেরা তাম্রশাসন' দ্রষ্টব্য।

(গ) লোকনাথ তাম্রশাসন (Tippera Copper Plate Grant of Samanta Lokanatha)

দ্রষ্টব্য গ্রন্থ. Epigraphia Indica, Vol XV, pp 301—315

এছাড়া কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'রাজমালা' ২য় লহর, পৃষ্ঠা ২৮৯—৯০, Tripura District Gazetteer, p 72 প্রভৃতিতে এই লিপির আলোচনা আছে।

৩। নলিনীরঞ্জন রায় চৌধুরী, ডঃ সুধাংশুবিকাশ সাহা প্রভৃতি।

৪। অটবী। তাম্রলিপিতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। দ্রষ্টব্য: রাজমোহনবাবু কৃত—— 'বঙ্গীয় নাথ পন্থের প্রাচীন পুঁথি' গ্রন্থে সংযুক্ত প্রবন্ধ।

৬। ইনি গৌড় গোবিন্দ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁকে গোবিন্দ কেশব এবং গোবিন্দ কেশব দেব নামেও অভিহিত করা হত।

৭। মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়।

৮। গোপীচন্দ্রের গান (আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত)

৯। কমলা কান্তগুপ্ত—— Copper Plates of Sylhet, P 194, জগদীশ গণ চৌধুরী— Tripura, the Land and its People, p 18

১০। বগুড়া জেলায় এই মন্দির ছিল। বর্তমানে এর ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। 'মহাস্থান' নাম থেকে বোঝা যায় এটা সেখানে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান রূপে গণ্য ছিল। এখানে একটি শিলালিপিও পাওয়া গেছে। দ্রষ্টব্য: Inscriptions of Bengal (Ed Mukherjee & Maity)

১১। দ্রষ্টব্য: চর্য্যাগীতি সংখ্যা ৪১ ও ৪৩

১২। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী। কর্নেল টড্ কৃত— Annals and Antiquities of Rajasthan গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৩। গোর্খ বিজয়

১৪। প্রাচীন নাম হালিয়া কান্দি। 'রাজমালা' গ্রন্থে এই নাম ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫। তৎ সম্পাদিত ও মৎস্যেন্দ্রনাথ কৃত 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। তা ছাড়া পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত গোর্খ বিজয় গ্রন্থের ভূমিকা।

১৬। পূর্ববঙ্গের মেহার কালীবাড়ীর।

হরিকেল

সুনির্মল দত্ত চৌধুরী

আমরা জানি যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশ (অবিভক্ত বাংলা) কয়েকটি জনপদ বা রাষ্ট্রীয় বিভাগে বিভক্ত ছিল, যেমন পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র (মূলত উত্তরবঙ্গ), গৌড় (উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ), বঙ্গ (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ), রাঢ় (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ) ইত্যাদি। সম্ভবত কতগুলি বিশিষ্ট কোম বা উপজাতীয় গোষ্ঠীর (tribal community) নাম এবং তাদের আঞ্চলিক বিভাজন ও পৃথক বসতি থেকে এইসব বিভাগীয় নামের উৎপত্তি। বস্তুত, ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক বন্ধনে প্রাচীন কোমগুলির সমন্বয় ও সমাজবিন্যাসের গতিধারায় কালক্রমে বৃহত্তর জাতি হিসাবে বাঙালীর অভ্যুদয় এবং এই অভ্যুদয়ের ইতিহাস অতি প্রাচীন নয়। কৌমবসতি থেকে গড়ে ওঠা সুপরিচিত ঐ বিভাগীয় নামগুলির সঙ্গে আমরা কখনো কখনো পাই বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তিক অঞ্চলে এই বাংলারই প্রায় অচেনা একটি দেশের নাম— হরিকেল। হরিকেল নামটি হরিকেলি, হরিকোলা, হরিকেলা ইত্যাদি নামে ইতিহাসে উল্লিখিত। বঙ্গ ও সমতটের (পূর্ব ও নিম্ন পূর্ববঙ্গ) সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হলেও হরিকেল ছিল একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। কিন্তু এই রাজ্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস, তার পরম্পরা, আমাদের অজানা। প্রাচীন হরিকেল ইতিবৃত্তের সমগ্র রূপটি এখনও ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত হয়নি। হরিকেল সম্পর্কে আমরা অস্পষ্ট অতীতের স্বল্প যেটুকু জানি তা কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, ইতিহাসের কিছু ছিন্ন সূত্র বলা যায়। কিন্তু এই সূত্রগুলি এক প্রাচীন সভ্যতা, সমৃদ্ধ জনপদ ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করছে। সাহিত্য, তাম্রলিপি ও মুদ্রা— এই তিনটি উৎস থেকে আমরা হরিকেলের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক তথ্যগুলি পাই, এবং যত স্বল্পই হোক তা আমাদের বিস্মিত করে।

চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিং (সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) বলেছেন, হরিকেল দেশটি ভারতের পূর্ব সীমান্তবর্তী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত মধ্যযুগের কিছু পাণ্ডুলিপিতে আছে এই সীমান্ত দেশের পরিচয়। 'রূপচিন্তামণিকোষ' (পঞ্চদশ শতক) নামে একটি অভিধানের পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে হরিকেল শ্রীহট্টের নাম। 'রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য' নামে পাণ্ডুলিপিতেও উল্লিখিত হয়েছে যে হরিকেল ও শ্রীহট্টদেশ সমার্থক। শ্রীহট্ট ও হরিকেল যে একই দেশ এবং অভিন্ন তা 'কল্পদ্রু-কোষ' নামক অভিধান থেকেও সমর্থিত হয়। রাজশেখরেব 'কর্পূরমঞ্জরী' (নবম শতক) গ্রন্থে হরিকেল দেশের নারীদের খুব প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে তাঁরা রাঢ় ও কামরূপের নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতরা এবং তাঁরা পূর্বদেশবাসিনী। 'ডাকার্ণব' গ্রন্থে বর্ণিত চৌষট্টিটি (মতান্তরে একান্নটি) তান্ত্রিক মহাপীঠের অন্যতম একটি পীঠ হরিকেল। উল্লেখ্য যে শ্রীহট্ট তান্ত্রিক পীঠভূমি বলে

পুরাণে চিহ্নিত। তান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী শ্রীহট্ট জেলায় বামজঙ্ঘা ও গ্রীবাপীঠ নামে দু'টি মহাপীঠ এবং একাধিক উপপীঠ অবস্থিত। বৌদ্ধগ্রন্থ 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'র (আনুমানিক অষ্টম শতক) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে বঙ্গ, সমতট এবং হরিকেলি ছিল তিনটি স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ। হরিকেল যে শ্রীহট্টের অন্য নাম, উপরোক্ত প্রাচীন আভিধানিক পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থগুলির মিলিত সাক্ষ্যই তার সাহিত্য-প্রমাণ।[১] এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সরকারের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য— "কয়েকটি অভিধানে শ্রীহট্ট জনপদের নাম রূপে হরিকেলা, হরিকেলি বা হরিকেল উল্লিখিত হয়েছে। কখনও ঐ দেশের অধিকার বঙ্গে প্রসারিত হয় বলে বোধ হয় একটি অভিধানে বঙ্গের জনগণের হরিকেলীয় নাম দেখা যায়"।[২]

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধধর্মী চন্দ্রবংশীয় রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র (আ ৯০৫-২৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র (দশম শতক) হরিকেলের অধিপতি ছিলেন, এবং চন্দ্রদ্বীপ (বাখরগঞ্জ জেলা) ছিল তাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র। অন্যত্র তিনি বলেছেন, শ্রীচন্দ্রের রামপাল (ঢাকা জেলা) তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে আগে হরিকেল এবং পরে চন্দ্রদ্বীপেরও রাজা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৩] চন্দ্রদ্বীপ ছিল নিম্নবঙ্গের বাখরগঞ্জ-সহ বরিশাল-খুলনা অঞ্চল। হরিকেল অঞ্চলের আরেক বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেবের (আ দশম শতকের প্রথমার্ধ) চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে হরিকেল একটি মণ্ডল বলে উল্লিখিত। কান্তিদেবের রাজধানী ছিল হরিকেল রাজ্যের অন্তর্গত বর্ধমানপুর। দীনেশচন্দ্র সরকারের অনুমান এই বর্ধমানপুর সম্ভবত ছিল শ্রীহট্টে।[৪] উল্লেখ্য যে শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনেও শ্রীহট্ট একটি মণ্ডল বা বিভাগ হিসাবে বর্ণিত, যেখানে 'পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী শ্রীহট্টমণ্ডল'— এই বিবৃতিটি আছে।[৫] শ্রীচন্দ্রের রাজত্বকাল কান্তিদেবের সমকালীন।

আদি মধ্যযুগে হরিকেল ছিল একটি বিখ্যাত রাজ্য। এই রাজ্যের খ্যাতি সুদূর গুজরাট পর্যন্ত ছড়িয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর গুজরাটি কোষকার হেমচন্দ্র তাঁর 'অভিধান-চিন্তামণি'তে এই রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও তিনি বলেছেন বঙ্গ ও হরিকেল জনপদ এক ও সমার্থক, 'বঙ্গাস্ত হরিকেলিয়া':। নীহাররঞ্জন রায় বলছেন, "এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে মনে হয়, হরিকেল সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ (চন্দ্রদ্বীপও বঙ্গে) এবং সমতটের সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর হইতেই হরিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করা হয়।"[৬] কিন্তু দীনেশচন্দ্র সরকারের অভিমত হচ্ছে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছিলেন হরিকেলের রাজার লঘুমিত্র (subordinate ally) বা সামন্ত। "অভিধানের সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, মূলতঃ হরিকেল শ্রীহট্টের নাম ছিল। হয়ত ত্রৈলোক্যচন্দ্র পালসম্রাটের বিরুদ্ধে শ্রীহট্ট রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন।"[৭] তিনি আরো বলেছেন, ". . . তাঁকে (চন্দ্রবংশীয় রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র) হরিকেল-রাজশ্রীর আধার অর্থাৎ হরিকেল বা শ্রীহট্ট রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ (মিত্র, লঘুমিত্র বা সামন্ত) বলা হয়েছে। 'হরিকেল' মূলত শ্রীহট্টের নাম এবং শ্রীহট্টরাজ্যের বঙ্গে বিস্তৃতির ফলে পরবর্তীকালে ওটি বঙ্গেরও নাম রূপে ব্যবহৃত

হত। . . . কিন্তু ত্রৈলোক্যের পুত্র শ্রীচন্দ্রের রাজত্বের ৫ম বর্ষে প্রদত্ত শাসনে দেখা যায় তিনি বাংলার বিক্রমপুর থেকে শ্রীহট্টমণ্ডলে ভূমি দান করেছিলেন। সুতরাং ইতিমধ্যে পূর্ববাংলায় হরিকেল বা শ্রীহট্ট প্রভুত্বের অবসান ঘটেছিল।[৮]

দশম শতাব্দীতে শ্রীচন্দ্র শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছিলেন যে তাম্রশাসনের মাধ্যমে তা পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন নামে খ্যাত। তাম্রশাসনটি দক্ষিণ শ্রীহট্টের পশ্চিমভাগ গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছিল। শাসন-বর্ণিত প্রদত্ত ভূমিটি ছিল 'শ্রীহট্টমণ্ডলের চন্দ্রপুরবিষয়ে'। শ্রীহট্টের পরবর্তী রাজা গোবিন্দকেশবের ভাটেরার তাম্রশাসনে আমরা দেখি যে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চন্দ্রপুরবিষয়ের বৃহদাংশ ছিল 'শ্রীহট্টরাজ্যের' অন্তর্ভুক্ত।[৯] পশ্চিমভাগ এবং ভাটেরার তাম্রশাসনে হরিকেল নামটি অনুক্ত। পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের বিবরণীতে আছে 'শ্রীহট্টমণ্ডল' এবং ভাটেরার তাম্রশাসনে রাজ্যের নাম 'শ্রীহট্টরাজ্য'। তাহলে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সময় হরিকেল-রাজশ্রী বা হরিকেলের রাজার যে কথা বলা হচ্ছে তিনি কে ছিলেন, হরিকেল রাজবংশেরই বা কী পরিচয় ? কোথাও তার উল্লেখ নেই। হরিকেলের মূল রাজধানী কোথায় ছিল তাও আমাদের অজ্ঞাত। লিপি-প্রমাণ হিসাবে পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনই শ্রীহট্ট নামের প্রথম ঐতিহাসিক সাক্ষ্য। তাই মনে হয়, একাদশ শতকের আগে হরিকেল ছিল প্রাচীন শ্রীহট্টের একটি পরিচয়জ্ঞাপক নাম অর্থাৎ শ্রীহট্ট ও হরিকেল নাম দুটি ছিল সমার্থক।

হরিকেলের কেন্দ্রভূমি শ্রীহট্ট, কিন্তু হরিকেল রাজ্যের ব্যাপ্তি শ্রীহট্টেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল বঙ্গে এবং সমতট অঞ্চলেও। এইজন্যই আমরা দেখি বঙ্গের জনগণের এককালীন নাম ছিল 'হরিকেলীয়'; এবং কোষকার হেমচন্দ্র হরিকেল ও বঙ্গ জনপদ দুটিকে এক বলে ইঙ্গিত করেছিলেন। সম্ভবত অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর কালসীমার মধ্যে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন সময়ে হরিকেলের রাজ্যসীমারও পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণ হয়েছিল। তাম্রলিপির বিবরণ থেকে অনুমেয় যে দশম শতাব্দীতে ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্রের সময় হরিকেল রাজ্য বিস্তারলাভ করেছিল শ্রীহট্ট থেকে ত্রিপুরা, কুমিল্লা, ঢাকা হয়ে সম্ভবত ফরিদপুর এমন কি চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ-বরিশাল অঞ্চল পর্যন্ত।[১০] আবার হরিকেলীয় মুদ্রার প্রাপ্তিস্থানগুলি, আরাকানের রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে আপাতসাদৃশ্য এবং আনুষঙ্গিক ঐতিহাসিক তথ্যগুলি দেখায় যে হরিকেলের সীমা কুমিল্লা পেরিয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্তই প্রসারিত হয়েছিল। হয়তো এক সময় চট্টগ্রাম ছিল হরিকেল রাজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। হরিকেল প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, "It would be quite reasonable to conclude that Harikela primarily denoted the region now known as Sylhet though its boundaries and political status as an independent country underwent changes in the course of centuries."[১১]

পূর্ব বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী হরিকেলের রৌপ্যমুদ্রার[১২] প্রচলন ছিল, এবং এই মুদ্রার নিয়মিত ব্যবহার হরিকেল রাজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সম্প্রসারিত হয়েছিল। শ্রীহট্ট,

কুমিল্লার ময়নামতি, রাজশাহীর পাহাড়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া অঞ্চল ইত্যাদি বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার নানা স্থান থেকে এই মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। মুদ্রাগুলির ধরন গোলাকৃতি। হরিকেলের মুদ্রার দু'টি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ের রৌপ্যমুদ্রার সম্মুখভাগে উৎকীর্ণ একটি ব্রাহ্মীলিপি, মাল্যভূষিত একটি ত্রিশূল-সদৃশ প্রতীক এবং একটি বৃষের মূর্তি— গলায় মাল্যচক্র। ত্রিশূল ও বৃষ স্পষ্টতই শৈব ধর্মের অভিজ্ঞান। মুদ্রার পশ্চাদভাগে ত্রিশূলের উপর সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিবিম্ব। এই নিদর্শনগুলি একটি বৃত্তের অন্তর্বর্তী। বৃত্তের পরিধি বিন্দু-চিহ্নিত। উৎকীর্ণ লিপির প্রাচীন লিখন-পদ্ধতি থেকে মনে হয় যে মুদ্রাগুলি আনুমানিক সপ্তম শতকের, যে সময় চট্টগ্রাম হরিকেলের অন্তর্গত ছিল। ত্রিশূল ও বৃষের প্রতীক-চিহ্নিত দু'টি স্বর্ণমুদ্রাও ময়নামতিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের রৌপ্যমুদ্রাগুলির পরিচায়ক চিহ্ন মোটামুটি প্রথম পর্যায়ের মুদ্রার মতোই, তবে বৃষের মূর্তিটি মালা-পরা নয়। তাছাড়া এই মুদ্রাগুলি অপেক্ষাকৃত হালকা কিন্তু আকারে বড়, এবং পশ্চাদভাগটি শূন্য। উৎকীর্ণ লিপির লিখন-পদ্ধতি, আগের মুদ্রাগুলির চেয়ে উন্নত ধরনের। দ্বিতীয় পর্যায়ের মুদ্রা দৃশ্যত পরবর্তী সময়ের স্মারক। হরিকেল বা হরিকেলা নামটি দু'টি পর্যায়ের সব মুদ্রাতেই উৎকীর্ণ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হরিকেলের মুদ্রার একটা আর্থিক বিনিময় মূল্য নিশ্চয়ই ছিল। তদুপরি এই মুদ্রা ছিল হরিকেল রাজ্যের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার প্রতীক।

অষ্টম শতকের 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের অধিবাসীরা, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র বাংলার জনগণ, 'অসুর' ভাষাভাষী।[১৩] এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাসে' যে কথা বলেছেন তার মর্মার্থ হলো অসুরভাষীরা ছিল আদি-অস্ট্রেলীয়। কোল-মুণ্ডাদের একটি প্রধান ভাষার আখ্যা ছিল অসুর, এবং তাঁরা আদি অস্ট্রেলীয়। বাংলার আদিম অধিবাসীরাও প্রধানত আদি-অস্ট্রেলীয়। তাঁদের ভাষা ছিল সম্ভবত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর কোনো একটি ভাষা। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা ভাষাভাষী জনসৌধের বিস্তৃত ভিত্তিমূলটি অস্ট্রিক। তবে আমাদের ধারণায়, 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের' গ্রন্থকারের এই অসুর আখ্যাটি বিবিধ অর্থে ও তাৎপর্যে ব্যবহৃত হতে পারে। ঋগ্বেদের দেবতা ইন্দ্র ও বরুণকে ঋগবেদেই একাধিকবার অসুর বলা হয়েছে। অসুর শব্দের আভিধানিক অর্থ পুরাণ-বর্ণিত শক্তিমান জাতি, যাঁরা ছিল দেবগণের বিপক্ষ। 'দেবগণ' বলতে যদি বৈদিক আর্যদের বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে আমরা জানি যে নর্ডিক আর্যদের (নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে যাঁরা dolichocephalic বা দীর্ঘশির এবং যাঁরা ঋগবেদের রচয়িতা বলে পণ্ডিতদের অভিমত) আগে আর্যদের আরেকটি জনপ্রবাহ ভারতে এসেছিল যাঁদের বলা হয় অ্যালপাইন (নৃতত্ত্বের সংজ্ঞায় যাঁরা brachycephalic বা প্রশস্তশির)। এমন হতে পারে যে অ্যালপাইনরা ঋগবেদীয় বর্ণাশ্রম মানেনি, সম্ভবত তাই তাঁদের বলা হয়েছে ব্রাত্য কিংবা অসুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী একটি তথ্যনিষ্ঠ আলোচনায় দেখিয়েছেন যে 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বাংলার লোকভাষাকে অসুর ভাষা বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা আদিবাসীদের ভাষা নয়। আসলে এ ছিল এক আর্য ভাষা।'[১৪] অর্থাৎ এই ভাষা ছিল অ্যালপাইন আর্যদের ভাষা। আর্যভাষী হলেও অ্যালপাইনরা ছিল আর্যাবর্তের

(উত্তর ভারত, বিশেষত গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অঞ্চল) বহির্বলয়ের অধিবাসী। এই অ্যালপাইন নরগোষ্ঠীর জনধারাটি ছড়িয়ে আছে ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম থেকে পূর্বে— সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, মধ্যভারত, বিহার, আসাম, ওড়িশা ও বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ— বাঙালী সমাজের উপরের বর্ণস্তরে, এবং নাগরব্রাহ্মণদের মধ্যে। অষ্টম শতকের আগেই বাংলায় আর্য সংস্কৃতির ধারা সঞ্চারিত হয়েছিল, তার অনেক প্রমাণ আছে। বাংলাদেশে এই সংস্কৃতির রূপটি প্রধানত অ্যালপাইন। ষষ্ট-সপ্তম শতকেই যে পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ এবং উত্তববঙ্গের মধ্য দিয়ে শ্রীহট্টে আর্য সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করেছিল তা ঐতিহাসিক। "বস্তুত, বাংলাদেশের যে জন ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার প্রায় সমগ্র মূল রূপায়নই প্রধানত অ্যালপাইন ও আদি-অস্ট্রেলীয় এই দুই জনের (people) লোকের কীর্তি।"[১৫] প্রসঙ্গত, রমাপ্রসাদ চন্দের একটি উক্তি স্মর্তব্য। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলার আর্যীকরণ ঋগবেদীয় আর্য সমাজব্যবস্থানুযায়ী হয়নি। বাংলার বর্ণসমাজ অ্যালপীয় এবং অ্যালপীয় আর্যভাষীরা ঋগবেদীয় আর্যভাষী হতে পৃথক।' ভাষার প্রসঙ্গে ফিরে এসে আমরা দেখছি যে অষ্টম শতক থেকে হরিকেল-সহ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেব ভাষা ক্রমশ রূপান্তবিত হচ্ছিল। বাংলার পালযুগেব সূচনা অষ্টম শতক থেকেই। "এই পর্বে (পাল-চন্দ্র পর্ব) আনুমানিক ৮০০—১১০০ মধ্যে এবং তাহার পরেও বাংলাভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে বাংলাদেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ — এই তিন রকমের ভাষা প্রচলিত ছিল। . . . এই পর্বে লোকায়ত বাঙালী সমাজের লোকভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপ, যে-রূপ ক্রমশ প্রাচীন বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হইতেছিল।"[১৬] বস্তুত, বাংলাভাষাকে একসময় বলা হতো 'গৌড়ীয় সাধু ভাষা'। এই ভাষা ছিল 'গৌড়ী নামে একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃত ভাষা'। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত এবং প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত থেকে মাগধী ও মাগধী অপভ্রংশেব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দশম শতাব্দীর সমকালে যখন জন্ম নিল বাংলাভাষার একটি আদিরূপ তখন হরিকেল অর্থাৎ শ্রীহট্টের রাজা ছিলেন বঙ্গাধিপতি শ্রীচন্দ্র।

গ্রন্থনির্দেশিকা :

১। (ক) R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, Calcutta, 1974, pp 1, 202

(খ) নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ১৩৯-১৪০।

২। দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১০৩।

৩। (ক) নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ১৩৯-১৪০, ৪৮৩।

(খ) Epigraphia Indica, Vol XII, p. 136.

৪। (ক) Gayatri Sen Majumdar, Buddhism in Ancient Bengal, 1983, p. 57.

(খ) নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ ১৩৯-১৪০, ৪৮২।

৫। Kamalakanta Gupta, Copper-Plates of Sylhet, 1967, p. 97.

৬। নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ১৩৯-১৪০।

৭। দীনেশচন্দ্র সরকার, শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৫২।

৮। দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১০৬।

৯। Kamalakanta Gupta, op. cit., 1967, p 152.

১০। নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ৪৮৩।

১১। R. C. Majumdar, op. cit, p. 9.

১২। B. N. Mukherjee, A Survey of the Coinage of Harikela, published in the 'Coinage & Economy of North Eastern States of India', pp. 17-23.

১৩। নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ৬০।

১৪। জ্যোতিবিন্দ্রনাথ চৌধুরী, দেবাসুর সংবাদ, সাপ্তাহিকী সময়প্রবাহ, গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর '৯৫।

১৫। নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ৪৩।

১৬। নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ৬৯৩-৯৪।

> **"ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, কুমিল্লা (পট্টিকেরা)**
> **ও চট্টল অঞ্চল — এই সমস্ত ধরিয়া 'বঙ্গদেশ'....."।**
> **— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙালীর সংস্কৃতি, ১৯৯০, পৃঃ ৩৮**

প্রসঙ্গ : কমলাকান্ত গুপ্তের পুস্তিকা—
'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব
শ্রীহট্টের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা'

অনুলেখক : মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য

কমলাকান্ত গুপ্তের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব শ্রীহট্টের ভূমি ও বাজস্ব ব্যবস্থা' নামক পুস্তিকার বিষয়বস্তু নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে পরিবেশন কবা হবে :

: কাল ও ভৌগোলিক সীমা
: ভূমি অধিকারী
: পরিমাপক মান
: ভূমি হস্তান্তর
: রাজস্ব
: মুদ্রা
: রাজস্ব সংগ্রহকারী
: বিবিধ

: পুস্তিকা পরিচয়—

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব শ্রীহট্টের ভূমি ও বাজস্ব ব্যবস্থা' শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত লিখিত ৬৮ পৃষ্ঠাব প্রবন্ধ পুস্তিকা। প্রথমে এই প্রবন্ধ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে পঠিত হয় এবং পববর্তীতে পরিষদ সভাপতি শ্রীচন্দ্রকুমার দে মহাশয় লিখিত ভূমিকা-সহ ১৯৬৬ ইংরেজীতে সিলেটের গীতাপ্রেসে মুদ্রিত হয়।

আলোচ্য পুস্তিকা প্রকাশের পরবর্তী বৎসব ১৯৬৭ ইংরেজীতে এই লেখকের 'Copper-plates of Sylhet' গ্রন্থ, শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য পুস্তিকা এবং Copper-plates of Sylhet গ্রন্থ— এ দু'টিব আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় অনুসন্ধান এবং অধ্যয়ন কাল মূলত একই সময় সীমায় চিহ্নিত।

এই নিবন্ধে পুস্তিকার বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কন করা হবে। প্রয়োজনানুসারে লেখকের Copper-plates of Sylhet গ্রন্থে আলোচিত খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের ভাস্কর বর্মার নিধনপুর তাম্রলিপি, খৃষ্টীয় দশম শতকের শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রপত্র প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

: কাল ও ভৌগোলিক সীমা—

পুস্তিকার বিষয় বস্তুর আলোচনা সুপ্রচীন কাল থেকে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পূর্ব-অর্থাৎ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তারিত।

পুস্তিকায় শ্রীহট্টের ভৌগোলিক ক্ষেত্র—

"বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্য অধিকার ক্রমে ইহার একটি অংশ শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্ভুক্ত করেন। সুতরাং জৈন্তিয়ার ঐ অংশের ১৮টি পরগণা এখন শ্রীহট্ট জিলান্তর্গত হইলেও আমাদের বর্তমান সীমিত আলোচনাব বহির্ভূত থাকিবে। অপর দিকে কাছাড় জিলার (ভারত) করিমগঞ্জ মহকুমার পাথারকান্দি, রাতাবাড়ী, বদরপুর ও আংশিক করিমগঞ্জ থানা এখন শ্রীহট্ট জিলান্তর্গত না থাকিলেও প্রসঙ্গত কোন কোন বিষয়ে আমাদের বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

মুসলমান আমলে ও বৃটিশ আমলের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট জিলা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা দেশের একটি অংশ হিসাবেই ঢাকা, মুর্শিদাবাদ বা কলিকাতা হইতে শাসিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ ঐ সময়কার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা বহুলাংশে বঙ্গের অন্যান্য জিলার অনুরূপই হইবে।"

পুস্তিকার আলোচনায় ভূমি ও বাজস্ব সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থ মনু-সংহিতার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। অতি প্রচীন কালে শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা এ প্রসঙ্গ পুস্তিকায় আসেনি।

পুস্তিকায় প্রসঙ্গক্রমে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের ভাস্কর বর্মনের নিধনপুর তাম্রপত্র প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এই তাম্রপত্রে শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের বিস্তারিত তথ্য নেই। এই তাম্রপত্রে দানকৃত চন্দ্রপুর বিষয়ের ময়ূরশাল্মল অগ্রহার ক্ষেত্র শ্রীহট্টে অবস্থিত বলে লেখক শ্রীগুপ্ত মত প্রকাশ করেছেন।

চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন সাং বর্ণিত 'Shih-Li-Cha-To-Lo' নামক দেশকে শ্রীহট্টদেশ বলে M. Vivien-de-Saint যে মত প্রকাশ করেছিলেন, লেখক শ্রীগুপ্ত তা সমর্থন করেন (কঃ প্লেঃ সিলেট, পৃ. ৩)

খৃষ্টীয় দশম শতকের মহারাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রপত্র আলোচনায় পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে— "অনুমিত হয় যে, মহারাজা শ্রীচন্দ্রের রাজ্যান্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন

প্রদেশেব) অন্তঃপাতী শ্রীহট্ট মণ্ডল বা শ্রীহট্ট বিভাগ বর্তমান শ্রীহট্ট জিলা হইতে বিস্তৃততর ছিল। খুব সম্ভব বর্তমান কুমিল্লা (ত্রিপুরা), ত্রিপুরা রাজ্য (ভারত) ও ময়মনসিংহ জিলা সকলের ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশ বিশেষ সেকালে শ্রীহট্ট মণ্ডলেব অন্তর্গত ছিল।"

শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুরাজা গৌড়-গোবিন্দের রাজ্যেব পশ্চিম সীমা ব্রহ্মপুত্রনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মোগলযুগে শ্রীহট্টের সীমা——

"আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত সতরখণ্ডল মহলের উল্লেখ আছে। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত সরাইল পরগণার কিয়দংশ অদ্যাপি সতর খণ্ডল নামে পবিচিত। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সহর এই অংশ মধ্যে অবস্থিত (কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় কৃত 'বাজমালা' ২৯৪ পৃঃ)।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন কালে বর্তমান কুমিল্লা (ত্রিপুরা) জিলান্তর্গত সবাইল (সতরখণ্ডল সহ) পরগণা ও বর্তমান ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত জোয়ানসাহী পবগণা চাকলা শ্রীহট্ট হইতে খারিত হইয়া ঢাকা নেয়াবতের 'নাওবা' সেবেস্তাব (naval establishment) অন্তর্ভুক্ত হয়।" (রাজমালা ২৯৫ পৃঃ)

: ভূমি অধিকারী—

পুস্তিকায় শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের অধিশ্বর হিসাবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মহারাজা ভাস্কব বর্মনের নাম দেখা যায়। তবে ভাস্করের অধীনে শ্রীহট্টের কতটুকু অঞ্চল ছিল তার সম্পূর্ণ বিবরণ নেই।

খৃষ্টীয় দশম শতকে শ্রীহট্টের বিপুল অঞ্চল মহারাজা শ্রীচন্দ্রের অধিকাবে ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের বাজা গোবিন্দ কেশব দেব এবং রাজা ঈশান দেবের ভাটেরা তাম্রপত্রে শ্রীহট্টের এই দুজন রাজার নাম পাওয়া যায়। রাজ্যের বিস্তাবাদিব কোন তথ্য নেই।

শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা গৌড়-গোবিন্দ। "গৌড়-গোবিন্দের সমকালে আচাক (আচমকা বা হঠাৎ আগত) নারাযণ নামে ত্রিপুরা বা গৌড়ের একজন সামন্ত বা আশ্রিত রাজা উভয় বাজ্যের মধ্যবর্তী স্থলে তরপের ক্ষুদ্র রাজ্যাধিপতি ছিলেন। ঐ রাজা খুব সম্ভব গৌড়ের (শ্রীহট্টেব) সহিত সংযুক্ত ছিলেন।"

গৌড়-গোবিন্দের পব শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান শাসক সিকন্দর গাজী।

"In the begining of the 14th cen. A.D. after the fall of the last Hindu King i.e. Raja Gaura–Gobinda of Gaur (North Sylhet) the commander of the Muslim invading army namely Sikandar Gazi became the first Muslim admini–

strator of Gaur ; within a short time the small kingdom of Taraf (in the present Habiganj-Sub-division) of Raja Āchāk Nārāyan came under Muslim administration."

Cop. Plt. of Sylhet, P.5

সম্রাট শেরশাহ শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের অধীশ্বর হয়েছিলেন কি না এ প্রসঙ্গে লেখক তার পুস্তিকায় লিখেছেন যে এ বিষয়ে তার হাতে প্রামাণ্য তথ্যাদি নেই। শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের অধীপতি রূপে সম্রাট আকবরের নাম উল্লেখিত হয়েছে। আকবরের পর সম্রাট শাহ্‌জাহান এবং সম্রাট ঔরঙ্গজেব।

সম্রাট আকবরের সময় কালে শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের অন্যান্য রাজার নাম দেখা যায়। "শ্রীহট্ট জিলার লাউড় রাজ্য সম্রাট আকবরশাহের রাজত্বকালে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তৎপূর্ব্বেই ঐ লাউড় রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়। ঐ ব্রাহ্মণরাজবংশের এক শাখা জগন্নাথপুরের ও অপর শাখা বানিয়াচুঙ্গের অধিপতি হন। বানিয়াচুঙ্গপতি গোবিন্দ সিংহ সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার ক্রমে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হবিব খাঁ নামে খ্যাত হন।"

"অনুরূপ ভাবে ইটার ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা সুবিদ নারায়ণের পুত্রগণ স্বাধীনতা হারাইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ক্রমে জমিদার হইয়া পড়েন।"

মুসলমান সম্রাটগণের শাসনকালে বাংলার সুবাদারগণ যারা প্রত্যক্ষভাবে শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের অনেকের নামই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মুসলমান যুগের পরবর্তী কালে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হয়।

: ভূমির মান—

ভূমি পরিমাপক ব্যবস্থা :

ভূমি-রাজস্বের সাথে ভূমির পরিমাপ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পুস্তিকার প্রথম দিকে মনু সংহিতার ভূমি-কর সম্পর্কীয় আলোচনা হয়েছে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে মনু-সংহিতা অনুসরণে কোন ভূমি পরিমাপক মান প্রদর্শিত হয়নি। তবে পুস্তিকায় 'প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী' লিখিত হয়েছে—

"প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী দৈর্ঘ্য গণনায় ৮ যবে (barley corn) ১ অঙ্গুল (thumb's breadth যাহা প্রায় $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চির সমান), ১২ অঙ্গুলে ১ বিতস্তি (সম্যক প্রসারিত বৃদ্ধাঙ্গুলীয় অগ্রভাগ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাপ), ২৪ অঙ্গুল বা ২ বিতস্তিতে ১ হস্ত, ৪ হস্তে ১ ধনু ইত্যাদি।"

ভাস্কর বর্মনের খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের নিধনপুর তাম্রপত্রে ভূমি 'অংশ' নামক পরিমাপে দান করা হয়েছে। 'অংশ' নামক ভূমিমাপের প্রকৃত মান জানা যায়নি।

শ্রীচন্দ্রের খৃষ্টীয় দশম শতকের পশ্চিমভাগ তাম্রপত্রে 'পাটক' নামক ভূমি পরিমাপের সংবাদ জানা যায়। লেখক তার Copper-plate of Sylhet গ্রন্থে পাটক সম্পর্কে লিখেছেন—

"Pāṭaka means 'grāmikādeśāḥ' i.e. word or part of a grāma (village) According to some scholars the word 'Pāḍā' in derived from the word Pāṭaka and ordinary two Pāṭakas make a grāma, though in many copper plates we find more than two pāṭakas comprising a grāma (village).

From the old formula of land measurement, namely—

8 Drōṇas = 1 Kulya.
5 Kulyas = 1 Pāṭaka.
we find 1 Pāṭaka is equal to 40 drōṇas.

A Kulya measurement of land, is such quantity of land which requires one Kulya (i.e. a winnowing fan or basket) full of seeds for the purpose of sowing.

A drōṇa is such quantity of land as is sown with a drōṇa of corn. A drōṇa is equal to 16 to 32 seras . . . in the adjacent Tripura State. A drōṇa is about 15 bighas or 5 acres of land approximately. During the latter part of the Mughal administration in some sanads issued by the Amils (locally known as Nawabs) of Sylhet the measurement of 'dun' (drōṇa) is mentioned and the 'dun' (drōṇa) in those measurements is almost equal to the Tripura measurement of drōṇa'. (C.P. Sylhet, P.77-78)

মুসলমান শাসনকালে ভূমি-পরিমাপক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে—

"সুলতান সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে ৩২ অঙ্গুলীতে ১ গজের পরিমাপ করা হইত। ইহা সিকন্দরী গজ নামে পরিচিত। সম্রাট শেরশাহ্ ঐ সিকন্দরী গজ অনুসারেই ভূমি পরিমাপ ক্রমে রাজস্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর শাহ্ বিভিন্ন জিনিষের মাপে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের গজের প্রচলন বন্ধ করিয়া ৪১ অঙ্গুলীতে ১ গজ সাব্যস্ত করেন। ঐ গজ ইলাহি গজ বা আকবরী গজ নামে খ্যাত। সেই ভাবে—

৬০ গজ (আকবরী) x ৬০ গজ (আকবরী)
= ১ বিঘা বা জরিপ পরিমাণ ভূমি
= বর্তমান ১৮ ইঞ্চি হাতের প্রায় ১০,৫০৬ বর্গহাত।

রাজা তোডরমল্ল ১ বিঘা পরিমাণ ভূমির উৎপন্ন ফসলের গড়পড়তার উপরেই বিভিন্ন প্রকার ভূমির বিঘাপ্রতি রাজস্ব নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু শ্রীহট্টে ঐ প্রকার বিঘার কোন প্রচলন হয় নাই। জরিপ বিঘাক্ষেত্রেরই নামান্তর। তবে পাক-ভারতের অন্যান্য স্থানেব ন্যায় শ্রীহট্টে জরিপ শব্দ নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি না বুঝাইয়া ভূমি পরিমাপ ক্রিয়া অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আমাদের মনে হয় যে, শ্রীহট্টে অন্যান্য স্থানের ন্যায় আকবরী গজের ১ বিঘা বা ১ জরিপ ভূমির খাজানার নিরিখ সাব্যস্থ না হইয়া এতদঞ্চলে প্রচলিত প্রচীন প্রথানুযায়ী হাল, কেদারের মাপেই প্রচলিত খাজানা বলবৎ থাকে। কারণ মোগল আমলেও দেখা যায় যে, শ্রীহট্টে আকবরী গজের প্রচলন না হইয়া ২১$\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চি দীর্ঘ দস্ত বা হাতেব ব্যবহার করা হইত। ঐ প্রকার ৬$\frac{১}{৪}$ দস্ত বা হাতের ব্যবহার করা হইত। ঐ প্রকার ৬$\frac{১}{৪}$ দস্ত বা হাতে (cubit) ১ নল (pole), ২ নলে ১ কাহণ এবং এক বর্গকাহণে ১ যষ্টি, ৭ যষ্টিতে ১ পোয়া, ৪ পোয়াতে ১ কেদাব বা কেয়াব, ১২ কেদারে ১ হাল। ঐ আর্যা বা ধারা (formula) অনুযায়ী দস্তিদাবী অর্থাৎ সরকারী দস্ত অনুযায়ী ১ কেদার ভূমির পরিমাপ বর্ত্তমান ১৮ ইঞ্চি হাতের প্রায় ৬৩১৫ বর্গহাত। প্রকাশ করা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান ১৮ ইঞ্চি হাতের ৭ হাতে ১ নল (pole) ধরিলে ১ কেদারের পরিমাণ হয় ৫৪৮৮ বর্গহাত এবং ১৮ ইঞ্চি হাতে বর্ত্তমান বিঘা হয় ৮০ × ৮০ = ৬৪০০ বর্গহাত।"

শ্রীহট্টে প্রচলিত পুরানো একটি ভূমি পরিমাপক ব্যবস্থা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে—

"দস্তিদার কানুনগো সরকারী ও বেসরকারী দলিলপত্রাদিতে সরকারী মোহরাঙ্কিত করিয়া বহাল করিতেন। সরকারী জরিপের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ছিলেন। সরকারী দস্ত বা হাতের পরিমাপ অনুযায়ী যে নল (pole or reed) ব্যবহার করা হইত তাহাকে দস্তিদারী নল বলা হইত। শ্রীহট্ট মহাফেজ খানায় অদ্যাপি রক্ষিত ২১$\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চি লম্বা ইস্পাত খণ্ডকে সরকারী দস্তেব (হাতের) পরিমাপ বলা হয়। ঐ প্রকার ৬০$\frac{১}{২}$ দস্ত বা হাতে এক+নল (pole) হয়। ঐ ২ নলে ১ কাহণ এবং ১ বর্গকাহণে ১ যষ্টি, ৭ যষ্টিতে ১ পোয়া, ৪ পোয়াতে ১ কেদাব (কেয়ার), ১২ কেদারে ১ হাল।"

পুস্তিকায় বর্তমানে শ্রীহট্টে প্রচলিত ভূমি মাপ সম্পর্কে লিখিত হয়েছে—

"বর্ত্তমানে শ্রীহট্টে প্রচলিত ভূমির পরিমাপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে হল, কেদারের মাপকাঠি প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান কালেও সেই হল (হাল), কেদার (কেয়ার), পোয়া, যষ্টি, রেখ, পণের মাপকাঠি প্রচলিত। খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনদ্বয়ে শ্রীহট্টে ভূ-হল, ভূ-কেদারের মাপ পরিলক্ষিত হয়।

হল অর্থ লাঙ্গল। খুব সম্ভব একজোড়া বলদে (অর্থাৎ এতদঞ্চলে বহুল প্রচলিত এক হাল গরুতে) এবং এক হল বা লাঙ্গলে যে পরিমাণ ভূমি চাষ করা যাইত সেই পরিমাণ

ভূমিকে এক হল (বা হাল) ভূমি বা এক ভূ-হল বলা হইত। ১২ কেদারে (বা কেয়ারে) এক ভূ-হল হয়। এক ভূ-হল বা একহল ভূমি প্রায় ১১ বিঘা বা ৩$\frac{১}{২}$ একবের সমতুল্য। ভূ-হলের পবিমাপ কেবল মাত্র শ্রীহট্ট ও পার্শ্ববর্ত্তী কাছাড় (ভাবত) জিলাযই সীমাবদ্ধ ছিল না। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীব মহারাজা শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা তাম্র-শাসনে পৌণ্ড্র (বর্দ্ধন) ভুক্ত্যান্তঃপাতি বল্লীমুণ্ডমণ্ডলে ও ষোলামণ্ডলে ভূ-পবিমাণ ভূ--হলে দেওয়া হইতেছে। আমাদের মনে হয় ভূমিব পবিমাণ লিখিতে হল (বা হাল), কেদার বা দ্রোণ না লিখিয়া ভূ-হল, ভূ-কেদার, ভূ-দ্রোণ লিখাই সমীচিন। কাবণ ইহাতে কোন প্রকার দ্ব্যর্থ থাকে না। হল বা হালেব পবিমাপ ব্যতীত মহারাজা শ্রীচন্দ্রের (খৃঃ দশম শতাব্দীব) পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে অন্ততঃ শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণাংশ (কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণে) দ্রোণ বা ভূ-দ্রোণেব পরিমাপ দৃষ্ট হয়। এক দ্রোণ ভূমি প্রায় ১৫ বিঘা বা ৫ একরেব সমতুল্য। পববর্ত্তী মোগল আমলেও শ্রীহট্ট জিলাব দক্ষিণাংশে দুণ বা দ্রোণেব পরিমাপেব প্রচলন নিম্নলিখিত দুইখানি সনদ হইতে পাওযা যাইতেছে, যথা-—

(১) শ্রীহট্টেব আমিল নবাব পরশওয়ান দাস লাংলা পবগণার কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তীকে ১০৭৫ হিজরী সনে ১ দুণ (দ্রোণ) ভূমি এক ব্রহ্মত্র সনদে দান করিতেছেন। (শ্রীহট্ট মহাফেজখানায রক্ষিত সনদবহি ১৭ নং ২১১ পৃঃ)

(২) শ্রীহট্টের আমিল নবাব মহম্মদ আলী খাঁ বেজুড়া পবগণায় ৩২ দুণ (দ্রোণ) অর্থাৎ ৪২ হাল ৮ কেদার ভূমি সৈযদ ইমামবক্সকে জলুস ৭ সফব ৬ অর্থাৎ ১১৭৯ হিজরীর ৬ই সফর তাবিখে মদতমাস দিয়াছিলেন। (শ্রীহট্ট মহাফেজখানায বক্ষিত সনদবহি ১৬ নং ৪২৫ পৃঃ)

শেষোক্ত সনদে ৩২ দুণ (দ্রোণ) বা ৪২ হাল ৮ কেদার হইতে দেখা যায যে, এক দুণ (দ্রোণ) ভূমি ১৬ কেদার বা প্রায় ১৫ বিঘার সমতুল্য হয়। মোগল রাজত্ব কালেব প্রায় সনদেই হাল ও কেদাবের পবিমাপ দৃষ্ট হয়। দুই একটি ক্ষেত্রে হাল না বলিয়া 'কুলবা' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র।"

: ভূমি হস্তান্তর—

ধর্মীয় পুণ্য, সাংস্কৃতিক উন্নতি, সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বাজস্ব সংগ্রহ ইত্যাদিব প্রয়োজনে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ভূমি-হস্তান্তর আবশ্যক।

পুস্তিকায় প্রাচীন ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখিত হযেছে-—

"মনু বলিতেছেন, যে ব্যক্তি জঙ্গল ও বৃক্ষাদি কর্ত্তনক্রমে ভূমি আবাদ করিয়া কর্ষণ করে সেই ভূমি তাঁহারই হইবে। রাজা কৃষককে রক্ষা করিবার দায়িত্ব পালনেব জন্য কর্ষিত ভূমির উৎপন্ন ফসলেব একাংশ পাইবার অধিকারী মাত্র। কৃষক বৎসর বৎসর জমি কর্ষণ করিতে বাধ্য। কোন বিশেষ কারণে তাহাব ব্যতিক্রম সহ্য করা হইত। নতুবা বিনা কাবণে কৃষক জমি

অকর্ষিত অবস্থায় রাখিলে রাজা কর্তৃক দণ্ডিত হইত। কিন্তু কৃষকের উক্ত জমি দখলাধিকারে কোন ব্যতিক্রম হইত না। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, প্রাচীনকালে কর্ষিত আবাদী ভূমিতে রাজা ও কৃষক উভয়ই যুক্তভাবে মালীক ছিলেন। পরবর্ত্তী কালের তাম্র-শাসনগুলিতে রাজা ভূমিদান করিতে গিয়া সতল (with bottom) সোদ্দেশ (with surface), সাম্রপুনস (with mango and jackfruit tree), সগুবানালিকের (with betelnut and coconut trees), সঝাটবিটপ (with forest and branches), তৃণপুতিগোচরপর্য্যন্ত (along with grass, puti-plant and pasture-grounds), সমস্তরাজভোগকরহিরণ্যপ্রত্যয়সহিত (with all the income such as taxes and gold enjoyed by the king), অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্য (free from all dues) ও তাম্রশাসনকৃত প্রায় দানেই অন্যান্যদের সহিত প্রজাসাধারণকেও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ক্রমে ভূমিদান সম্বন্ধে সকলের অভিমত কামনা করা ইত্যাদি উক্তি হইতে ভূমির উপর রাজা ও প্রজার মালীকানার প্রকৃতির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।"

বৌদ্ধ-হিন্দু ঐতিহাসিক কালের নানা তাম্রপত্রে দেখা যায় ভূমির অধিকর্তাগণ ধর্মীয় পুণ্য, সাংস্কৃতিক উন্নতি, অনাবাদী-ভূমির সংস্কার রাজস্ব সংগ্রহ ইত্যাদি কারণে ভূমি হস্তান্তর করতেন।

পুস্তিকায় মনু-সংহিতার একটি শ্লোক সংখ্যা উদ্ধৃত হয়েছে— যেখানে "শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি কল্পে বিশেষ এক ধরনের ভূমি-হস্তান্তরের সংবাদ পাওয়া যায়।

"মনু সংহিতার ৭ম অধ্যায়ের ১৩৩ ও ১৩৭ শ্লোকদ্বয়ে বলা হইতেছে, "যে ব্রাহ্মণ কল্পশাস্ত্রের সহিত এক বেদ বা ব্যাকরণাদি ছয় অঙ্গের সহিত বেদ ও বেদব্যাখ্যা অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যাপনা প্রভৃতি ষট্ কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাঁহাকে শ্রোত্রিয় বলে। রাজা ধনাভাবে মরণাপন্ন হইলেও উক্ত ব্রাহ্মণের নিকট কর গ্রহণ করিবেন না।"

উল্লেখ্য এই ধরনের ভূমিদান — কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'স্রোত্রীয় ন্যায়' নামে উল্লেখিত হয়েছে।

ভাস্কর বর্মনের নিধনপুর তাম্রপত্রে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায় অনুসারে ব্রাহ্মণদের নিকট ভূমি হস্তান্তরিত করা হয়। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রপত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে-- শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে প্রায় এক-হাজার বর্গমাইল পরিমিত ভূমি ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায় অনুসারে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পতিত অনাবাদী ভূমি চাষাবাদ করে উৎপাদন-যোগ্য করার প্রক্রিয়াকালে নিষ্কর রূপে ভূমি হস্তান্তরের নাম 'ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়'। পরবর্তীকালে এই 'ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়' শব্দটি নিষ্কর রূপে ভূমি হস্তান্তরের নাম ধারণ করে।

এক রাজার হাত থেকে অন্য রাজার হাতে অনেক সময় সংগ্রামের মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তরিত হত। এ সম্পর্কে বহুতাম্রপত্রের মত শ্রীচন্দ্রের পশ্চিম ভাগ তাম্রপত্রে লিখিত হয়েছে—

'যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলঃ।।" অর্থাৎ যখন ভূমি যার দ্বারা অধিকৃত হয়— সেই অধিকারীই ভূমিদানের পুণ্যলাভ করে।

পুস্তিকায় ভূমিচ্ছিদ্রন্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলমান শাসনকালে পতিত জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখিত হয়েছে—

"মুসলমান রাজত্বকালেও পতিত ভূমিকে গরজমাই অর্থাৎ করবিহীন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র ও হিদায়ার মধ্যে পার্থক্য অতি অল্পই বিদ্যমান। ফতোয়াআলমগীর গ্রন্থে উক্ত আছে, যে ব্যক্তি পতিত ভূমি উদ্ধার করিল সে ঐ ভূমির জীবন দানই করিল। হিদায়ার মতে পতিত ভূমি (waste land) ইমামের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। তাহা রাষ্ট্রেরই সম্পত্তি। ইমাম রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে পতিত ভূমি আবাদ করাব অনুমতি দিবার অধিকারী মাত্র এবং ইহা পতিত উদ্ধারকারী কৃষকের সম্পত্তি গণ্য হইত।"

পুস্তিকায় মুসলমান শাসনকালে শ্রীহট্টীয় অঞ্চলে ভূমির কিছু অধিকর্তাগণের ভূমির উপব বিশেষ অধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। সাধারণতঃ রাজা-সম্রাট রাষ্ট্রের ভূমির সার্বভৌম অধিকারী। মুসলমান রাজত্বকালে শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের বহু স্থান রাজস্বমুক্ত ছিল — এবং বহু ছোট-বড় খাজনা আদায়কারী স্বাধীন জমিদার ছিল। সম্রাট শেরশাহ থেকে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ পর্যন্ত অনেক শাসক ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। নবাবগণ শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের জমিদারদের বংশানুক্রম ব্যবস্থার লোপসাধন করে ক্ষমতা খর্ব করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলের জমিদারগণের এই স্বাধীন মানসিকতার একটি ঐতিহাসিক বিবরণ পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুস্তিকা লেখক শ্রীগুপ্ত মনে করেন— খৃষ্টীয় দশম শতকে মহারাজা শ্রীচন্দ্র শ্রীহট্ট অঞ্চলে যে ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন — সেই নিষ্কর ভূমিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণই শ্রীহট্টের এই স্বাধীন জমিদার গোষ্ঠীর মূল উৎস। পুস্তিকা লেখক শ্রীগুপ্ত, শ্রীচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে 'মধ্যসত্বভোগী' রূপে চিহ্নিত করেছেন। এব অর্থ এই ব্রাহ্মণগণ তাদের ভূমি অঞ্চলে বসতিযুক্ত জনসাধারণের নিকট থেকে ভূমি-কর আদায় করতেন কিন্তু স্বয়ং রাজাকে কোনপ্রকার কর প্রদান করতেন না। উল্লেখ্য শ্রীহট্ট অঞ্চলেব জমিদারগণের অধিকাংশ হিন্দুধর্মাবলম্বী।

: রাজস্ব

পুস্তিকার বিশেষ উল্লেখ্য বিষয়— ভূমি-কর বা রাজস্ব প্রথা। পুস্তিকায় মনুসংহিতার রাজস্ব প্রথা উল্লেখিত হয়েছে—

"মনু সংহিতার ৭ম অধ্যায়ের ১২৯ শ্লোকে কর নির্দ্ধারণ সম্পর্কে রাজার কর্তব্য প্রসঙ্গে উক্ত হইতেছে, "যে প্রকারে জলৌকা বা জোঁক রুধির পান, বৎস দুগ্ধ পান, ভ্রমর মধু পান করে, সেই প্রকারে অল্পে অল্পে রাজা বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন, যাহাতে প্রজাদিগের মূলধনের প্রতি কোন ব্যাঘাত না হয়।"

ধান্যাদি কৃষিক্ষেত্রের বার্ষিক কর সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন যে, ভূমির কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে ক্ষেত্রের বলাবল বিবেচনায় ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ অংশের একাংশ রাজা পাইবেন। কয়েকটি বিশেষ স্থলে নিষ্কর বা স্বল্পকর লওয়ারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন।"

"মনু নির্দ্দেশিত কৃষি জমির উৎপন্নের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ বার্ষিক রাজকর হিসাবে লওয়ার প্রথা নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে দেশ, কাল ও পাত্রের বিভিন্নতায়, নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইলেও মোটামুটি তাহার মূল নীতি দীর্ঘকাল যাবৎ পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল।"

করমুক্তভূমি বিষয় ইতিপূর্বে ভূমি-হস্তান্তর সম্পর্কীয় আলোচনায় করা হয়েছে।

প্রাক্ মুসলমান যুগের করব্যবস্থা সম্পর্কে পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে—-

"প্রাক্ মুসলমান যুগে ফলিত ফসলের একাংশ ব্যতীত নগদ রাজস্ব আদায়ও কিছু কিছু হইত বলিয়া অনুমান করা যায়। কারণ বাস্তুভূমি বা ফলের বাগান বা পূর্ত্তবিভাগের খাল হইতে জল ব্যবহার নিমিত্ত কর ইত্যাদি খুব সম্ভব নগদ আদায় করা হইত। এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ড পরগণার অধীন নিধনপুর গ্রামে আবিষ্কৃত কামরূপপতি মহারাজা ভাস্কর বর্ম্মার খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর তাম্রশাসনে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণের সহিত চন্দ্রপুরি বিষয়ের দত্তকারপূর্ম নামক একজন উৎখেটয়িতার নামোল্লেখ আছে। 'উৎখেটয়িতা' নগদরাজস্ব আদায়কারী কর্ম্মচারী বটে।"

আলোচ্য সমীক্ষায় ইতিপূর্বে মহারাজা শ্রীচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ছয় হাজার ব্রাহ্মণ কিভাবে মুসলমান শাসনকাল পর্যন্ত স্বাধীন জমিদারের মত ছিলেন এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তিকায় খৃষ্টীয় দশম শতকে সৃষ্ট 'মধ্যসত্বভোগী' গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে— তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

মুসলমান শাসনকালের ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে—-

"সম্রাট শেরশাহের পূর্ব্বে ভূমিরাজস্ব ও মুদ্রাব্যবস্থা ভারতের প্রাচীন রীতি অনুসারেই চলিতেছিল। সম্রাট শেরশাহ ভূমিরাজস্ব ও মুদ্রাব্যবস্থা সম্বন্ধে বহুতর সংস্কার সাধন করেন। তিনি ভূমিরাজস্ব উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ সাব্যস্ত করেন। সম্রাট শেরশাহের ঐ সকল সংস্কার বঙ্গের পূর্ব্ব সীমান্তবর্তী শ্রীহট্ট জিলা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আমলে আসিয়াছিল কিনা সঠিক বলা যায় না। যাহাই হউক ইহার কিছুকাল পর শেরশাহী ভূমিরাজস্ব ও মুদ্রা সংস্কারের উপর প্রধানতঃ নির্ভরক্রমে মোগল সম্রাট আকবর ভারতে যে ভূমিরাজস্ব ও মুদ্রা সংস্কার করেন তাহা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত শ্রীহট্টের অধিকাংশ স্থলে অর্থাৎ মোগলান শ্রীহট্টে প্রবর্ত্তিত হয়। সে সময় জৈন্তিয়া রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের বহির্ভূত থাকায় জৈন্তিয়ায় ঐ ভূমি সংস্কার ইত্যাদি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জৈন্তিয়াপতি রাজা রাজেন্দ্র সিংহের আমলে জৈন্তিয়া রাজ্য ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আসে।

সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজা তোডরমল্ল ভারতে ভূমি রাজস্ব সংস্কার সাধন করেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের সমীপবর্ত্তীকালে ইহা সুবা বাঙ্গালায় কার্য্যকরী হয়। রাজা তোডরমল্ল জমি জরিপ ক্রমে ও জমির গুণাগুণ নির্ভরে বিঘাপ্রতি প্রাচীন রীতি অনুযায়ী ফসলের অংশ বা তন্মূল্য আদায়ের নিরিখ সাব্যস্ত করেন।”

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে

“সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজা তোডরমল্ল ‘আসল তোমার জমা’ (Original complete assessment of rent roll) নামক যে রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত করেন তাহার অংশ তকসীমজমা (assessment of the land) আবুল ফজল আইন ই আকবরী গ্রন্থে (Akbar's regulation of the Government of Hindustan) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে সুবা বাঙ্গালার অন্তর্গত সরকার শ্রীহট্টের ৮টি মহলের উল্লেখ আছে। ঐ ৮টি মহলের মধ্যে জৈন্তিয়া একটি ক্ষুদ্র মহল বলিয়া এ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, হয়তঃ মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী জৈন্তিয়া রাজ্যের কোন ক্ষুদ্র অংশ তৎকালে সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্ভূক্ত হইয়া থাকিতে পারে। নিম্নে সরকার শ্রীহট্টের অধীন ৮টি মহলের নাম ও প্রত্যেক মহলের রাজস্ব পরিমাণ দেওয়া গেল। যথা

মহল	প্রতাপগড়	রাজস্ব পরিমাণ	৩,৭২,০০০	দাম
”	বিয়ানচুঙ্গ (বানিয়াচুঙ্গ)	”	১৬,৭২,০৮০	”
”	বাহুয়াসর	”	২০,৯৪,০৮০	”
”	চৈন্তার (জৈন্তা)	”	২,৭২,২০০	”
”	হাবিলী সিলেট	”	১০,২৯,৭১৭	”
”	সেরংগেল (সতরখণ্ডল)	”	৩,৯২,৪৭২	”
”	লেউড় (লাউড়)	”	-,৪৬,২০২	”
”	হেরনগর (হরিনগর)	”	১০,০২,৮৫২	”

(Ayeen Akbery Vol II, Part II, Page 470,
Translated By Francis Gladwin)

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের রাজস্ব সম্পর্কীয় আলোচনা পুস্তকে লিখিত হয়েছে

“সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে শ্রীহট্টের পরগণার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ‘জমা কামালে তোমার’ (revised revenue details) নামক রাজস্বের যে হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহাতে সুবা বাঙ্গলাকে ১৩টি চাকলায় এবং চাকলা শ্রীহট্টকে ১৪৮টি মহলে (বা পরগণায়) বিভক্ত করা হয়। চাকলা শ্রীহট্টের মোট রাজস্ব পরিমাণ ১,৩৮,৪৫৫ টাকা ধৃত করা হয়। ইহার পরেও শ্রীহট্টে প্রায় ২৫টি নুতন পরগণার সৃষ্টি হয়। খারিজা পরগণাসকল

অনেক সময মূল পবগণা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে অভিহিত- যেমন তবপ হইতে খাবিজা গদাহাসাননগব, নূবহাসাননগব, পুটিজুবী ইত্যাদি। ইটা হইতে খাবিজা সমশেবনগব, আলীনগব। পঞ্চ খণ্ড হইতে খাবিজা বাহাদুবপুব, সাহাবাজপুব ইত্যাদি। আবাব অনেক খাবিজা পবগণা মূল পবগণাব নামেব সহিত, কসবা (উপসহব বা township), কালা (বড), কিসমত (অংশ), খালিসা (মূল বা বাজস্বযুক্ত), খুর্দ্দ (ক্ষুদ্র), জোযাব (প্রতিবেশী বা নিকটস্থ), নাওবা (নৌ বিভাগ সংশ্লিষ্ট), বাজু (অংশ বা অন্তর্গত), বাদে (অংশ), সিক (অংশ বা খণ্ড), হাউলি বা হাবিলী (আশ পাশ) ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। যেমন

বনভাগ	(খালিসা)
,,	(বাজু)
পানিশালি	(হাউলি)
,,	(ইটা অর্থাৎ ইটা পবগণা হইতে খাবিজা)
মৈবাপুব	(হাউলি)
,,	(ইটা অর্থাৎ ইটা পবগণা হইতে খাবিজা)
কুশিযাবকুল	
,,	(বাদে)
,,	(কিসমত)
পঞ্চখণ্ড	(কালা)
,,	(খুর্দ্দ)
সতবশতী	(হাবিলী)
,,	(বাজু)
,,	(কিসমতবাজু)
সাতগাও	
সাতগাও	(হাউলি)
বানিযাচুঙ্গ	(কসবা)
,,	(জোযাব)
সুনাইতা	(বাজু)
,,	(সিক)
,,	(হাউলি)
আতুয়াজান	
,,	(কিসমত)

জাতুয়া	(হাউলি)
”	(বাজু)
বেতাল	
”	(কিসমত)
”	(খালিসা)
”	(নাওরা)
সিংচাপড়	(হাউলি)
”	(বাজু)

ইত্যাদি—”

পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে সম্রাট আওরঙ্গজেব মুর্শিদাকুলী খাঁকে বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত কবেন। ঐ সময় শ্রীহট্ট জিলা নিম্নলিখিত দশটি বাজস্ব বিভাগে বিভক্ত ছিল—

“বর্ত্তমান সদর মহকুমায়

(১) পাবকুল (জৈন্তিয়ার ১৮টি পরগণা ব্যতীত সদব মহকুমার উত্তরাংশ লইয়া)

(২) তাজপুর (সদর মহকুমার দক্ষিণাংশ লইয়া)

বর্ত্তমান সুনামগঞ্জ মহকুমায়

(৩) রসুলগঞ্জ (প্রায় সমুদয় সুনামগঞ্জ মহকুমা লইয়া)

বর্ত্তমান হবিগঞ্জ মহকুমায়

(৪) নবিগঞ্জ (দিনারপুর, জোয়ার বানিয়াচুঙ্গ ইত্যাদি পরগণা লইয়া)

(৫) শঙ্করপাশা (বেজুড়া, উচাইল, কাশিমনগর ইত্যাদি পরগণা লইয়া)

(৬) লস্করপুর (তরপ, পুটিজুরী ইত্যাদি পরগণা লইয়া)

বর্ত্তমান মৌলবীবাজার মহকুমায়

(৭) হিঙ্গাজিয়া (লংলা ইত্যাদি পরগণা লইয়া)

(৮) বাজনগর (ইটা ইত্যাদি পরগণা লইয়া)

(৯) নোয়াখালি (চৌয়ালিশ, সাতগাও ইত্যাদি পবগণা লইয়া)

বর্ত্তমান মৌলবীবাজার, সাবেক করিমগঞ্জ মহকুমায়

(১০) লাতু (পঞ্চখণ্ড, বড়লিখা ইত্যাদি সাবেক করিমগঞ্জ মহকুমার অংশ লইয়া)

ঐ সকল রাজস্বজিলার উপরোক্ত ১০টি তহশীল অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্বজিলার রাজস্ব আদায় হইত।”

শ্রীহট্টের রাজস্ব-সংক্রান্ত আলোচনা পুস্তকে 'রাজমালা' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে—

“৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বাজমালা গ্রন্থের ২৯৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হইতেছে যে, “১১৩৫ বঙ্গাব্দে নবাব সুজাউদ্দিন 'জমা তোমাব তকছিছি' নামক রাজস্বের যে হিসাব প্রস্তুত করেন তাহাতে শিলহট ফৌজদারীর অন্তর্গত কেবলমাত্র ৩৬টি পরগণা খালিসা (রাজস্বযুক্ত) ও তাহার রাজস্ব ৭০,০১৬ টাকা লিখিত আছে, অবশিষ্ট সমস্তই জায়গীর ও নানাপ্রকার বৃত্তিতে বিভক্ত দৃষ্ট হয়।”

মুসলমান রাজত্বকালে শ্রীহট্টে ভূমি-রাজস্ব নগদ এবং ফসলের অংশবিশেষ প্রদান করেও সম্পন্ন হত। এ সম্পর্কে ১১৭২ বাংলার একটি প্রামাণ্য দলিল পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়নি। ঐ সময়কালে শ্রীহট্টের কর ব্যবস্থার একটি নিদর্শন পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে—

“খুব সম্ভব শ্রীহট্টের ভূমিরাজস্ব অত্যল্পই ছিল। কারণ ১৭৮৪ খৃঃ ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখের গভর্ণরজেনারেল Warren Hastings সাহেবের নিকট লিখিত এক চিঠিতে মিঃ লিণ্ডসে জানাইয়াছিলেন যে, যাঁহারা নিজেকে জমিদার বা চৌধুরী আখ্যা প্রদান করে তাঁহারা ব্যতীত আরও প্রায় ৩০০০ ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংজ্ঞাযুক্ত বিভিন্ন প্রকারের ভূমি ভোগ করে যাহার খাজনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎ বিধায় সরকাবের পক্ষে বা ঐ সকল ব্যক্তিগণের পক্ষে রৌপ্য মুদ্রায় খাজানা আদায় করা দুরূহ। জিলার অধিকাংশ ভূমির খাজানা নাই। বিভিন্ন ব্যক্তি ঐ সকল ভূমি সামন্ত প্রথানুযায়ী নিষ্কর ভোগ করে। (Sylhet District Records, Vol.I, by W. K. Firminger)”

: মুদ্রা—

ভূমি-রাজস্বের অন্যতম প্রধান বিষয় মুদ্রা।

ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে পুস্তকে লিখিত হয়েছে—

“প্রাচীনকালে নগদ রাজস্ব সম্ভবতঃ *পুরাণ, দ্রম্ম কার্ষাপণ (বা কাহন), কপর্দ্দকে (কৌড়িতে) আদায় হইত। পুরাণ ও দ্রম্ম, কার্ষাপণেরই (কাহনের) নামান্তর। ৮০ কপর্দ্দকে (কৌড়িতে) এক পণ; এবং ১৬ পণে এক কার্ষাপণ বা কাহন। কপর্দ্দক বা কৌড়ি এই মুদ্রামানের সর্ব্বনিম্ন মুদ্রা থাকায়, ঐ মুদ্রামানকে পুরাণ-কপর্দ্দক, দ্রম্ম-কপর্দ্দক, কার্ষাপণ-কপর্দ্দক বা কাহন-কৌড়ি বলা যাইতে পারে। অবশ্য একটি স্বর্ণ-কার্ষাপণ মুদ্রা = ৮০ রক্তিকা (রত্তি)

১৬ মাষ ১৭৬ গ্রেইণ (ট্রয়) - বর্ত্তমান ১৩$\frac{১}{৩}$ আনা ওজনের বিশুদ্ধ স্বর্ণ বুঝায়। ১ রক্তিকা বা লালকুঁচের ওজনকে ১ রত্তি বা রতি বলা হয়। এখনও স্বর্ণকারেরা ১ লালকুঁচের ওজনকে ১ রত্তি বা রতি ওজন ধরেন। তবে বর্ত্তমানে ৬ রত্তিতে ১ আনা এবং ১৬ আনাতে ১ তোলক (তোলা বা ভরি) বলা হয়। সে ভাবে প্রাগুক্ত ১ কর্ষাপণ স্বর্ণমুদ্রার (যাহাকে 'সুবর্ণম্' না বলিয়া 'সুবর্ণঃ' বলা হয়) বর্ত্তমান ওজন ১৩$\frac{১}{৩}$ আনা হয়।

প্রাগুক্ত স্বর্ণ-কার্ষাপণের ন্যায় এক রৌপ্য কার্ষাপণ বা তাম্র-কার্ষাপণ, ঐ পরিমাণের রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা বটে। এক কার্ষাপণ কপর্দ্দক বা এক কাহন কৌড়ি বলিতে ১ পণ বা ৮০ কৌড়ি × ১৬ - ১২৮০ কৌড়ি বুঝায় এবং ঐ প্রকার ১ কাহন কৌড়িকে পরবর্ত্তীকালে ১ সিক্কা (প্রচলিত) রূপিয়া বা টাকার চতুর্থাংশ গণ্য করা হইত। উল্লেখযোগ্য যে, এ প্রকার কাহন-কৌড়ির মুদ্রাই শ্রীহট্টে প্রাচীনকাল হইতে খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দশসনা বন্দোবস্ত কালে শ্রীহট্টের তালুক ও পরগণানুযায়ী রাজস্বের যে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা কাহন-কৌড়ির হিসাবেই ধরিয়াছিলেন এবং ১ কাহনকে ১ সিক্কা (প্রচলিত) রূপিয়ার চতুর্থাংশ গণ্য করিয়াছিলেন।"

মুদ্রা মান সম্পর্কীয় উপরে উদ্ধৃত নীতি নীতি, হিন্দু বৌদ্ধ যুগে বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল। পুস্তিকায় এ বিষয়ে আলাদা কোন আলোচনা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য খৃষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠাদি শতকে পূর্ববঙ্গ ইত্যাদি অঞ্চলে 'দীনার' নামক বিশেষ ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল - এই 'দীনার' প্রসঙ্গ পুস্তিকায় দেখা যায় না।

মুসলমান যুগের মুদ্রা সম্পর্কে পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে

"আইন-ই-আকবরী গ্রন্থমতে দাম, ১ তুলা ৮ মাষা ৭ রতি ওজনের একটি তাম্রমুদ্রা এবং ৪০ দামে এক শেরশাহী সিক্কা রূপিয়া।সে ভাবে সরকার শ্রীহট্টের মোট রাজস্ব পরিমাণ হয় ৬৬,৮১,৬২০ দাম বা প্রায় ১,৬৭,০৪০ প্রচলিত রূপিয়া।

আবুল ফজল বলিতেছেন, দামকে পূর্ব্বে পয়সা (হিন্দি পৈসা) বলা হইত এবং ৮ দমড়ীতে এক দাম। 'দাম' বোধ হয় প্রাচীন দ্রম্ম মুদ্রারই নামান্তর। কাজী আবদুল ওদুদ এম, এ, সংকলিত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' অভিধানে দাম (সংস্কৃত দ্রম্ম, গ্রীক drakme) বলিয়া উল্লিখিত আছে। দ্রম্ম বা পুরাণ, কার্ষাপণ (বা কাহন) মুদ্রারই নামান্তর। সেভাবে ১ দাম (দ্রম্ম), ১ কাহন (কার্ষাপণ) মুদ্রারই নামান্তর মাত্র। আইন-ই আকবরী গ্রন্থে শ্রীহট্টের তথা পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের রাজস্ব দাম (দ্রম্ম) মুদ্রায় যদিও উল্লেখ আছে, তথাপি আমাদের মনে হয়, শ্রীহট্টের রাজস্ব কাহন-কৌড়ির হিসাবেই দেওয়া হইত। দ্রম্ম (বা দাম) যদিও কার্ষাপণের (বা কাহনের) নামান্তর তবুও শ্রীহট্টে ইহার কার্ষাপণ (বা কাহন) নামই সু-প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই।"

পুস্তিকার এগারো পৃষ্ঠায় মুসলমান শাসনকালের একটি দলিল উদ্ধৃত হয়েছে। এই দলিলে কার্ষাপণ নামক এক ধরনের বিনিময় মুদ্রার নাম উল্লেখিত হয়েছে। কার্ষাপণ 'কাহন' নামে পবিচিত ছিল। এই কাহনের মান বর্ত্তমানকালের এক টাকাব চতুর্থাংশ বলে পুস্তকে লিখিত হয়েছে।

পববর্তী বৃটীশ শাসনকালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি, উনবিংশ শতাব্দীতে কৌডিব প্রচলন বন্ধ করে দেয়। পুস্তিকায় লিখিত হযেছে---

"১৭৭৮—৭৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ লিণ্ডসে (পবে লর্ড লিণ্ডসে) শ্রীহট্ট জিলার বেসিডেন্ট কালেক্টাব হইয়া শ্রীহট্টে আসেন। তিনি লিখিতেছেন, "ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায শ্রীহট্টে বাজস্ব আদায় হইত না। এদেশে রৌপ্য বা তাম্রের প্রচলন ছিল না বলিলেও হয। আফ্রিকাব বমণীগণ যে কৌড়িকে অঙ্গের ভূষণ মনে কবে তাহাই এথায় মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। বাংলার অন্যান্য অংশে যে কৌড়ি নাই তাহা নহে। তথায ইহা সামান্য খাদ্যোপকবণ ক্রয়ার্থ ইতব শ্রেণীব মধ্যে আবদ্ধ। সমুদ্র হইতে সার্দ্ধশতক্রোশ দূববর্ত্তী শ্রীহট্টে কিরূপে কৌডি প্রধান মুদ্রাব স্থান অধিকার করিল বলা যায না। আশ্চর্য্যেব বিষয যে, বালেশ্বব হইতে চট্টল পর্য্যন্ত অথবা মালাবার বা কবমণ্ডলের বিশাল উপকূল ভাগেব কোথাও কৌড়ি অধিক পবিমাণে দৃষ্ট হয না।

শ্রীহট্ট হইতে অর্দ্ধসপ্তশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী মালদ্বীপ ও নিকোবব দ্বীপদ্বয়ে বহুল পরিমাণে কৌডি জন্মিয়া থাকে।" (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত)

মিঃ লিণ্ডসে এ সম্বন্ধে নিজ কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আরও অনুসন্ধানে জ্ঞাত হন যে, শ্রীহট্টে প্রচলিত কৌড়ি মালদ্বীপ ও লাক্ষা দ্বীপেব কৌড়ি ছিল (Sylhet District Records, Vol. I, by W. K. Firminger)। মিঃ লিণ্ডসে বঙ্গেব অন্যান্য জিলাতে কৌডিব প্রচলন দেখেন নাই সত্য। তবে এক কালে ঐ সকল স্থানে ব্যাপক কৌডির প্রচলন যে ছিল তাহাব যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বে নানা কারণে ঐ সকল জিলায ব্যাপক কৌড়িব প্রচলন উঠিয়া গিয়াছিল। আইন-ই-আকববী গ্রন্থে আবুল ফজল খৃষ্টীয ষোড়শ শতাব্দীব শেষাংশে উড়িষ্যায কৌডির বহুল প্রচলনেব উল্লেখ কবিযাছেন। আইন-ই-আকবরী উল্লিখিত উড়িষ্যাব কাহন-কৌড়ির আর্যা (formula) শ্রীহট্টে প্রচলিত কাহন-কৌড়িব আর্যারই অনুরূপ দেখা যায। যথা :---

৪ কৌড়ি (সংস্কৃত, কপর্দ্দক বা ববাটক) = ১ গণ্ডা
৫ গণ্ডা = ১ বুড়ি (সংস্কৃত, কাকিণী)
৪ বুডি = ১ পণ
১৬ পণ = ১ কাহণ

মিঃ লিণ্ডসে শ্রীহট্টে ব্যাপক কৌড়ির প্রচলন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে, হয়তঃ---

(১) শ্রীহট্টেব অধিবাসীবা অন্য জিলার অধিবাসী হইতে সাধারণভাবে গরীব ছিলেন।

অথবা

(২) শ্রীহট্টেব ভূমিবাজস্ব অপেক্ষাকৃত অল্প থাকায় কাহন-কৌড়ির মত ক্ষুদ্র মুদ্রামান অপবিহার্য্য ছিল।'

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইস্ট-ইন্ডিযা কোম্পানিব শাসনকালে শ্রীহট্টেব দেওয়ান অফিসে বিভিন্ন স্তরের কর্মচাবীদের মাসিক বেতনেব তালিকা পুস্তিকায় উদ্ধৃত হয়েছে—

“দেওয়ান	মাসিক বেতন	১০০ টাকা
পেস্কাব	”	৪০ টাকা
সেরেস্থাদাব	”	২৫ টাকা
২ জন মুন্সী	”	৫০ টাকা
৪ জন বাংলানবীশ মুহুরী	”	৪৫ টাকা
৩ জন ফাবসীনবীশ মুহুরী	”	৪৫ টাকা
১ জন নাজির ও ১ জন নাযেব-নাজিব	”	২৫ টাকা
খাজাঞ্চী	”	২৫ টাকা
পোদ্দাব	”	১২ টাকা

ইত্যাদি—

(Sylhet District Record, by W. K. Firminger)

সর্ব্বমোট ঐ বিভাগেব কর্ম্মচাবীদেব মাসিক বেতনের পবিমাণ ছিল ৫৪৩ সিক্কা রুপিযা বা ২৫২৬ *কাহন ১০ কৌড়ি।”

: রাজস্ব আদায়কারী—

পুস্তিকায় মনু-সংহিতাব ভূমি-বাজস্ব বিষয়ক আলোচনায় ভূমিকব বা বাজস্ব সংগ্রহকাবী কোন কর্মচারীব কথা উল্লেখিত হয়নি।

আলোচ্য পুস্তিকায নৃপ, রাজা এবং মণ্ডলেশ্বব নামক তিনপ্রকাব ভূমি অধিকারীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। এদেব পবস্পবের সম্পর্ক যাই হোক না কেন— এরা প্রত্যেকেই ছিলেন ভূমি কব সংগ্রহকারী।

ভূমি করাদি আদায়েব ব্যবস্থায় প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামেব বিশেষ ভূমিকা ছিল। পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে—

“প্রাচীনকাল হইতেই পাক-ভাবত উপমহাদেশে গ্রামকেই বাজস্ব ও শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে সর্ব্বনিম্ন unit হিসাবে ধবা হইত। গ্রাম-পঞ্চাযেৎ (village council)-এব প্রধানকে গ্রামণী,

গ্রামপতি (chief or superintendent of the village) নামে আখ্যায়িত করা হইত। ঐ পদ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইত। পরে অবশ্য সাধারণভাবে ইহা বংশানুক্রমিক হইয়া পড়ে। ঐ গ্রামণী বা গ্রামপ্রধানকে শিরপঞ্চ, মণ্ডল, পেটেল, প্রধান ইত্যাদি নানা নামে নানা প্রদেশে অভিহিত করা হইত। গ্রামপ্রধান বা মণ্ডল একদিকে গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে অপরদিকে সরকারের কর্ম্মচারী রূপে, গ্রামবাসীদের দেয় রাজস্ব নির্দ্ধারণে, গ্রাম শাসনে ও রাজস্ব আদায়ে গ্রামবাসীগণ ও সরকার উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব করিতেন। তজ্জন্য তাহারা গ্রামের কতক ভূমি নিষ্কর বা অল্পকরে ভোগ করিতেন। গ্রামণী বা মণ্ডলগণ কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি বিষয়ের (পরগণা বা মহলের) অধিপতিগণের নিকট নিজ নিজ গ্রামের আদায়ী রাজস্ব পরিশোধ করিতেন। ঐ পরগণা বা বিষয়পতিগণ চতুর্ধুরী (চৌধুরী), বিষী বা বিষয়ী, খণ্ডাধিপতি, দেশমুখ্য (দেশমুখ) ইত্যাদি নামে বিভিন্ন প্রদেশে পরিচিত। ঐ সকল পদও ক্রমে ক্রমে বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ পদাধিকারীগণ নিজ নিজ বিষয় বা পরগণার রাজস্বের একাংশ বা নির্দ্দিষ্ট ভূমির উপসত্ব জায়গীর হিসাবে প্রাপ্ত হইতেন। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমাদের বিশেষ পরিচিত 'চৌধুরী' শব্দটি সংস্কৃত চতুর্ধুরিন্ শব্দেরই রূপান্তরমাত্র। অভিধানানুযায়ী চতুর্ধুরিন্ শব্দ চতুর্ (চারি বা চৌ) ধুর (ভার) + ইন্ (নিন্) অর্থাৎ গ্রামের প্রধান বা নগরের মধ্যে প্রধান ব্যবসায়ী। চতুর্ধুরিন্ শব্দের প্রথমার এক বচনে হয় চতুর্ধুরী। চতুর্‌কে চৌ ধরিলে হয় চৌধুরী।"

পাটোয়ারী নামক এক ধরনের কর্মচারী পরোক্ষভাবে করসংক্রান্ত ভূমিপরিমাপকাদি কার্যের সাথে যুক্ত ছিল—

'গ্রাম্য পাটোয়ারী প্রথা পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত। ইহা একটি প্রাচীন হিন্দু প্রতিষ্ঠান। খুব সম্ভব পট্ট বা সরকারী হিসাব রক্ষক হিসাবে ইহাদিগকে * পাটোয়ারী বা কুলকরণ নামে অভিহিত করা হইত। কুল অর্থ দেশ, গোষ্টি, জনপদ, ক্ষেত্রবিশেষ। করণ অর্থ কেরাণী। সুতরাং পাটোয়ারী বা কুলকরণী বলিতে গ্রামের রেজিষ্ট্রার ও হিসাবরক্ষক (village registrar and accountant) বুঝায়। পাক-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহারা দেশপাণ্ডে, কানুনগো, পাটোয়ারী, নাডকরণী, কুলকরণ ইত্যাদি নামে অভিহিত।'

হিন্দু রাজত্বকালে খুব সম্ভব গ্রাম্য পাটোয়ারীর উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হিসাবে বিষয় বা বিষীতে "আক্ষপটলিক" ও তদ্‌উর্দ্ধ কর্ম্মচারী "মহাক্ষপটলিক" নামে অভিহিত হইতেন'।

শ্রীহট্ট জিলায় অনেক ছোট বড় খাজনা আদায়কারী জমিদার বা "চৌধুরাই"আবির্ভাবের কারণ হিসাবে শ্রীচন্দ্রের "মধ্যসত্ব ভোগী" ব্রাহ্মণদের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

মুসলমান রাজত্বকালে শ্রীহট্টের বিপুল পরিমাণ রাজস্বহীন ভূমিকে করযুক্ত করার প্রচেষ্টা হয়। এই প্রসঙ্গে পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে—'সম্রাট শেরশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ পর্য্যন্ত মুসলমান শাসকগণ ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে বার বার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন। ভূমিরাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাদের দুইটি মূল লক্ষ্য ছিল, যথা—

(১) পরগণার চৌধুরী বা জমিদারপদের বংশানুক্রম ব্যবস্থার লোপ সাধন ও তাহাদের অর্জ্জিত ক্ষমতা খর্ব্ব করা।

(২) খাজনা স্বরূপ ফসলের একাংশ না লইয়া বর্দ্ধিত নিরিখে নগদরাজস্ব আদায় করা।

বঙ্গের অন্যান্য জিলাতে তাঁহারা বহুলাংশে সফলকাম হইলেও শ্রীহট্টে তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বংশানুক্রমিক চৌধুরী ও জমিদারদের বিলোপসাধন করিয়া বর্দ্ধিত খাজনায় বড় বড় নূতন মারফতদার জমিদার (Contractor or farmer of revenue) সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহা বঙ্গের বহু জিলায় সম্ভব হইলেও শ্রীহট্টে ঐ প্রকার কোন জমিদারী সৃষ্টি হয় নাই। অধিকন্তু অন্যত্র ভূ-রাজস্বের নিরিখ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলেও বোধহয় শ্রীহট্টের রাজস্বপ্রদানকারীগণ ঐক্যবদ্ধভাবে বাধা সৃষ্টি করায় সরকারের পক্ষে সাবেক স্বল্প পরিমিত রাজস্ব কোন প্রকার চাপ বা প্রলোভন দেখাইয়া বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই।'

মোগল শাসনকালে সম্রাটদের অধীনে দুটি প্রধান বিভাগ যথা দেওয়ানী এবং নিজামত সম্পর্কে ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলী খাঁকে সুবা বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ প্রাচীন জমিদার বা চৌধুরীদের বংশানুক্রমিক পদাধিকার লোপ করার বিশেষ চেষ্টা করেন। পুস্তিকায় রাজস্ব আদায়কারীগণ সম্পর্কে লিখিত হয়েছে— 'প্রাচীনকালে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে বিষয় বা চতুরকে অভিহিত করা হইত। পরবর্ত্তীকালে এগুলিই মোটামুটিভাবে মহল বা পরগণায় অভিহিত হইত। সেভাবে প্রত্যেক পরগণায় গ্রামণীগণের উপরে রাজস্ব আদায়কারী উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ও শাসক হিসাবে বিষী, চৌধুরী, খণ্ডাধিপতি, দেশমুখ্য (দেশমুখ) উপাধিধারী জমিদার ছিলেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে জমিদারী প্রথার উৎপত্তি মোটামুটিভাবে হিন্দু চৌধুরী, রাজা, গ্রামণী বা মণ্ডল, সামরিকপ্রধান, রাজস্বমারফতদার (farmer of revenue), রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারী, ক্রোরি, এমন কি দস্যুসর্দ্দার হইতে হইয়াছে। জমিদারেরা মূলতঃ রাজস্বআদায়কারী কর্ম্মচারীই ছিলেন। কালক্রমে নানা অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহারা পরগণার জমিদারীর উপর রাজস্ব ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে একটা বংশানুক্রমিক অধিকার অর্জ্জন করেন।'

মুসলমান শাসনকালে সৃষ্ট "দেওয়ানী" নামক বিভাগের প্রভাব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে বিস্তারিত হয়। পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে '১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে বৃটিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর নামেমাত্র বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলম হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সুবা বাঙ্গালার 'দেওয়ানী' চিরতরে লাভ করেন। তৎপর হইতে বাঙ্গালার সুবাদার কেবলমাত্র সুবা বাঙ্গালার নায়েব নাজিম বা নবাব নাজিম পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।'

পুস্তিকায় শ্রীহট্টের অধিকাংশ জমিদার শ্রেণীর পূর্ব-পুরুষগণ প্রাচীন হিন্দু চৌধুরী বলে লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য এই সমীক্ষায় ইতিপূর্বে চৌধুরী শব্দকে পুস্তিকায় সংস্কৃত শব্দ 'চতুর্ধুরিণ' শব্দের রূপান্তর এবং গ্রামের সমষ্টি "বিষয়ের" বা মহলের অধিপতির নিকট নিজ নিজ অঞ্চলের আদায়ী রাজস্ব প্রদান করতেন বলে উল্লেখিত হয়েছে।—

'শ্রীহট্ট জিলায় অধিকাংশ পরগণার জমিদারগণের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ প্রাচীন হিন্দু চৌধুরীদেরই উত্তরপুরুষ। অনেক পরগণায়ই একাধিক পরিবারের যুক্ত চৌধুরাই ছিল। আবার উক্ত সরিকান মধ্যে নানা কারণে ভাগ বাটোয়ারা হইয়া সরকার কর্ত্তৃক অনেক নূতন নূতন খারিজা পরগণার সৃষ্টি হয়। অনেক খারিজা পরগণা হইতে আবার নূতন পরগণা খারিজ হইতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই সাবেক সরিকচৌধুরীগণ নূতন খারিজা পরগণার চৌধুরাই প্রাপ্ত হইতেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে নূতন চৌধুরীও নিযুক্ত হইতেন। এইভাবে শ্রীহট্ট জিলায় বহু পরগণার সৃষ্টি ও পরগণার চৌধুরীদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।'

শ্রীহট্ট জিলায় আর এক শ্রেণীর জমিদার যারা "দেওয়ান" উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে—

'শ্রীহট্ট জিলায় প্রাচীন হিন্দু রাজা বা সামন্ত, মুসলমান সম্রাট বা নবাব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ক্রমে জমিদারে পরিণত হওয়ায় ও জমিদার হিসাবে তাঁহার সাবেক রাজ্যের বা রাজ্যাংশের সদরজমা সাবেক চৌধুরীগণ হইতে আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তিনি রাজা বা নবাব উপাধি না পাইয়া জিলার অন্যান্য চৌধুরীদের ঊর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারী "দেওয়ান" পদের ন্যায় "দেওয়ান" উপাধি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন।..........

শ্রীহট্টের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণার চৌধুরী হইতে পৃথকত্ব সূচিত করার উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তীকালে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জমিদারীর মালিকগণ "চৌধুরী" পদের ঊর্দ্ধতন পদ "দেওয়ান" পদের অনুকরণে নিজদিগকে "দেওয়ান" নামে অভিহিত করিতে পারেন।'

পুস্তিকায় জমিদার শ্রেণী সম্পর্কে লিখিত হয়েছে —

'বর্ত্তমান জমিদারপদ নিম্নলিখিত মতে উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। যথা :—

(১) প্রাচীন গ্রামণী বা গ্রামাধিপতি যাঁহারা পরবর্ত্তীকালে মণ্ডল বা মকদুম নামে পরিচিত হইতেন।
(২) রাজস্ব ইজারাদার (farmer of revenue)।
(৩) হিন্দু চৌধুরী।
(৪) হিন্দু রাজা বা সামন্তরাজা।
(৫) সামরিকপ্রধান (জায়গীর প্রাপ্ত)।
(৬) দস্যুসর্দ্দার (Robber chief)।
(৭) রাজস্ব বিভাগের নানা শ্রেণীর কর্ম্মচারী।
(৮) মোগল আমলের রাজস্বআদায়কারী কর্ম্মচারী "ক্রোরি"
(এক কোটি 'দাম' আদায়কারী ঊর্দ্ধতন রাজস্ব কর্ম্মচারী ইত্যাদি—)

শ্রীহট্ট জিলায় প্রত্যেক পরগণায় এক বা যৌথভাবে বিভিন্ন পরিবারের একাধিক চৌধুরী বা জমিদার ছিলেন। অনাবাদি এলাকায় বিশেষভাবে সুনামগঞ্জ এলাকায় অনেক পরগণা পরবর্ত্তীকালে

সৃষ্ট হইয়াছিল এবং ঐ সকল এলাকার চৌধুরীবাই পদ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালের। শ্রীহট্টের পরগণা চৌধুরীরা বঙ্গের অন্যান্য জিলার চৌধুরীগণের ন্যায়ই পরগণার রাজস্ব আদায় ও অনেক বিষয়ে পরগণা শাসন করিতেন। বঙ্গের অন্যান্য জিলার চৌধুরী বা জমিদারের ন্যায়ই তাঁহাদের অধিকার ও দায়িত্ব ছিল। ঐ পদের জন্য তাঁহারা নানকার জমিদারী ও নানকারখানেবাড়ী আখ্যাপ্রাপ্ত বিভিন্ন পরিমাণ ভূমি, বেতন ও বাসস্থান হিসাবে নিষ্কর বা লাখেরাজ প্রাপ্ত হইতেন। মোগল আমলের অনেক দলিলে দেখা যায়, জমিদারের দানকৃত ভূমির বর্ণনা প্রসঙ্গে "আমার কদিম নানকার" বা "আজদাদি মিরাস" ভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ফার্সী "কদিম" শব্দার্থ প্রাচীন এবং "আজদাদি" শব্দার্থ পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক (ancestral)। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ঐ নানকার ভূমি তাঁহার পিতা, পিতামহের লব্ধ কদিম (প্রাচীন) নানকার ভূমি বা ঐ মিরাস আজদাদি (ancestral) ছিল। পরবর্ত্তী দশসনা-বন্দোবস্ত কালেও জমিদার বা চৌধুরীগণের বন্দোবস্তীয় তালুকে কতক পরিমাণ ভূমি নানকারজমিদারী ও নানকারখানেবাড়ী বলিয়া রাজস্বমুক্ত রাখা হইয়াছে।' •

পরবর্তীকালে খণ্ডিত জমিদারীর অধিকারীগণ মিরাসদার নামে পরিচিত হন। 'পরবর্ত্তীকালে বংশবৃদ্ধি হেতু বা ক্রমিক হস্তান্তর সূত্রে পরগণার ভূমি খণ্ডিত হইয়া যায়। ইহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজস্বযুক্ত ছোট বড় হুজরি (independent) তালুকের সৃষ্টি হয়। ঐ সকল হুজরী তালুকদারগণ স্বাধীনভাবেই সরকারের নিকট সদর জমা আদায় করিতেন। ঐ সকল হুজরী তালুকদার বা খিরাজ মালগুজারগণ মধ্যে যাঁহারা প্রজা বা পাইকাস্ত হইতে খাজানা আদায় করিতেন, তাঁহারা শ্রীহট্টে মিরাসদার আখ্যাপ্রাপ্ত হইতেন। মিরাসদারী বলিতে heritable and transferable istemrary tenure বুঝায়। পার্শ্ববর্ত্তী কাছাড় জিলায় (ভারত) ম্যাদি অস্থায়ী পাট্টার ভূমিতেও মিরাসদার দেখা যায়।'

ভূমি-রাজস্ব আদায়কারী অন্য আর এক শ্রেণী কর্মচারীর নাম তালুকদার। পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে —

'বঙ্গের অন্যান্য জিলার ন্যায় শ্রীহট্টেও অসংখ্য অধীনস্থ তালুকদারের (dependent Talukdar) সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সকল তালুকদারগণ মুজকরি, শিকমি, মফঃস্বীল বা সামিলী মালগুজার অথবা তালুকদার নামে অভিহিত হইতেন। ফার্সী "শিকম" শব্দার্থ পেট বা উদর। সেভাবে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারগণকে শিকমি বা পেটের তালুকদার নামে সাধারণতঃ বলা হয়। সিকমি তালুকদারগণ তাঁহাদের দেয় রাজস্ব পরগণার জমিদার বা চৌধুরী মারফতেই সরকারকে আদায় করিতেন। সরাসরি সরকারের নিকট রাজস্ব আদায় করার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। অনেক জমিদার ও চৌধুরী তাঁহাদের পরগণার শিকমিতালুকদারগণের দেয় যথার্থ জমা হইতে অধিক পরিমাণ সদরজমা তাঁহাদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া বার্ষিক কিছু কিছু লভ্য করিয়া লইতেন। দশসনা-বন্দোবস্তকালে ঐ সকল শিকমি তালুকদারগণ নিজ নামে তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুজরী তালুকদার বা শিকমি তালুকদারগণের অধীনে কোন রায়ত বা পাইকাস্ত প্রজা ছিল না। তাঁহারা ঐ সকল তালুকের জমি ও বাড়ী নিজ নিজ খাস দখলেই ভোগ দখল করিতেন।'

কানুনগো নামক কর্মচারী সম্পর্কে পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে—

'সম্রাট শেরশাহের বা সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালে আমরা প্রত্যেক সরকারে বা পরবর্ত্তীকালে প্রত্যেক চাকলায় এক একজন সদর কানুনগো দেখিতে পাই। ঐ সকল সদর কানুনগোর সহকারী হিসাবে প্রত্যেক পরগণায় মফঃস্বল কানুনগো বা পরগণা পাটোয়ারী ছিলেন। কোন কোন পরগণায় একাধিক পরগণা পাটোয়ারী ছিলেন।'

'কানুনগোরা সাধারণভাবে মজুমদার নামেই অভিহিত হইতেন। মজুমদারগণ (ফার্সী মজমাদার শব্দজ) মুসলমান আমলে রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাব-পত্র রাখিতেন। কানুনগো-গণ মধ্যে যিনি জরিপ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তাঁহাকে দস্তিদার-কানুনগো বলা হইত।'

পুস্তিকায় —— পুরকায়স্থ সম্পর্কে লিখিত হয়েছে——

'পুরকায়স্থ বলিতে জাতি কায়স্থ বুঝায় না। কায়স্থ একটি বৃত্তিবাচক উপাধি। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট জিলায় পরগণা পাটোয়ারীগণের বংশানুক্রমিক প্রাচীন উপাধি "পুরকায়স্থ"। ঐ প্রাচীন উপাধি হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, দাস ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। শ্রীহট্ট ব্যতীত বঙ্গের অন্য কোন জিলাতে এ উপাধি বড় দেখা যায় না।'

বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব-আদায় এবং এই বিষয়-সংক্রান্ত, রাজকীয় কর্মচারী-গণের কর্মসংক্রান্ত নামগুলি কি ভাবে সামাজিক তথা পারিবারিক ক্ষেত্রে, পদবী চিহ্নে রূপান্তরিত হয়েছে- — পুস্তিকায় এর ইতিহাস সুন্দরভাবে লিখিত হয়েছে।

বিবিধ :

পুস্তিকায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শ্রীহট্ট তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত চিত্রাদির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

মনুসংহিতার উদ্ধৃতাংশে শ্রোত্রীয় এবং ভূমিচ্ছিদ্রন্যায় অনুসারে ভূমিদানের প্রক্রিয়া রাজন্যবর্গের ধর্মীয় এবং জ্ঞানগরিমার প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়।

ভাস্কর বর্মনের নিধনপুর তাম্রপত্রানুসারে লক্ষ্য করা যায়— রাজা ভাস্কর বর্মন চতুর্বর্ণাশ্রম যুক্ত আর্যধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ভাস্কর বর্মনের দানপত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখিত হয়েছে। উল্লেখ্য কোন্ ধর্মের চাপে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম বিপন্ন হয়ে উঠেছিল—- সে সম্পর্কে কিছু লিখা হয় নি। Copper plates of Sylhet গ্রন্থে লিখিত আছে — "....for the proper organisation of the duties of (various) caste and stages (বর্ণাশ্রমধর্ম প্রবিভাগায়) (of lif) that had mixed up."

শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রপত্রে দেখা যায় মহারাজা শ্রীচন্দ্র বহু ব্রাহ্মণদের এবং এই সাথে হিন্দু এবং বৌদ্ধমঠগুলিকে নিষ্কর ভূমি দান করেছেন। উল্লেখ্য শ্রীচন্দ্র স্বয়ং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

সম্রাট আকবরের কালে শ্রীহট্টের লাউড় রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইতিপূর্বে লাউড় রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়। এক খণ্ড জগন্নাথ পুরের এবং অপর শাখা বানিয়াচুঙ্গের রাজা হন। বানিয়াচুঙ্গের ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা গোবিন্দ সিংহ মুসলমান সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে মুসলমান ধর্মে দিক্ষিত হন এবং হবিব খাঁ নাম প্রাপ্ত হন। হবিব খাঁ জগন্নাথপুর রাজ্যের তাঁর নিজ বংশীয় ব্রাহ্মণ অধিপতির রাজ্য আক্রমণ করে, রাজ্যের অধিকাংশ দখল করেন। জগন্নাথ পুরের এই ব্রাহ্মণ রাজবংশ সাধারণ জমিদাররূপে টিকে থাকেন।

পুস্তিকায় শ্রীহট্টের ইটারাজ্য সম্পর্কে লিখিত হয়েছে— 'ইটার ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা সুবিদনারায়ণের পুত্রগণ স্বাধীনতা হারাইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক্রমে জমিদার হইয়া পড়েন।' পৃঃ ৪৩

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কালে সুবা-বাংলার প্রসিদ্ধ দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে পুস্তিকায় তাঁর রাজস্ব আদায়-সংক্রান্ত কৌশল লিপিবদ্ধ হয়েছে—

'মুর্শিদকুলী খাঁর সময় সুবার রাজস্ব বিভাগে আমিল (মালগুজার), দেওয়ান ইত্যাদি রাজস্ববিভাগের উর্ধ্বতন কর্ম্মচারী অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন। কিন্তু রায়তদের সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল সেই সকল নিম্ন পর্য্যায়ের পদে পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দু সংখ্যাধিক্যই ছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সদরে ও মফঃস্বলে রাজস্ব আদায়কারী অত্যধিক হিন্দু কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ নিযুক্তির কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, মুসলমানেরা চালুনী (seive)-এর মত থাকায় রাজস্ব-আদায়কারী হিসাবে রাজস্বের কোন ভাগ আত্মসাৎ করিলে পরে তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছুই চাপ দিয়া আদায় করা সম্ভব নয় কিন্তু হিন্দুরা স্পঞ্জ (sponge)-এর মত থাকায় পরে চাপ দিলে কিছু না কিছু রস অর্থাৎ অর্থ বাহির করা যাইবে।'

পুস্তিকায় শ্রীহট্টে প্রচলিত কৌড়ি সম্পর্কে কৌতুহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থানুসারে আলোচিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনকালের প্রথম দিকে শ্রীহট্ট জিলায় ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত রৌপ্য বা তাম্রমুদ্রার প্রচলন নগণ্য ছিল কিন্তু কৌড়ির প্রচলন অধিক ছিল। এ সম্পর্কে পুস্তিকায় মিঃ লিণ্ডসের (১৭৭৮-৭৯) মন্তব্য— 'শ্রীহট্টের অধিবাসীরা অন্য জিলার অধিবাসী হইতে সাধারণভাবে গরীব ছিল।' পৃঃ ১৭

কৌড়ি প্রসঙ্গে পুস্তিকার আর একটি উদ্ধৃতি— 'সমুদ্র হইতে সার্দ্ধশত ক্রোশ দূরবর্তী শ্রীহট্টে কিরূপে কৌড়ি প্রধান মুদ্রার স্থান অধিকার করিল বলা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বালেশ্বর হইতে চট্টল পর্যন্ত অথবা মালাবার বা করমণ্ডলের বিশাল উপকূলভাগের কোথাও

কৌড়ি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। শ্রীহট্ট হইতে অর্দ্ধশত ক্রোশ দূরবর্তী মালদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপে বহুল পরিমাণে কৌড়ি জন্মিয়া থাকে। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত)" পৃঃ ১৬/১৭
'...শ্রীহট্টে প্রচলিত কৌড়ি মালদ্বীপ ও লাক্ষা দ্বীপের কৌড়ি ছিল।' পৃঃ ১৭

মুসলমান রাজত্বকালের একটি দলিলে শ্রীহট্ট জিলায় দাসপ্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। পুস্তিকায় উল্লেখিত হয়েছে-একটি মানুষ ও একটি গাভী একই মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করা হত:

'একখানি দলিলে দেখা যায় যে, বলরাম শূদ্র পঞ্চ কার্ষাপণ গৃহিত্বা অর্থাৎ পাঁচ কার্ষাপণ (বা কাহন) গ্রহণ করিয়া আত্ম বিক্রয় করিতেছে। এতদঞ্চলে প্রচলিত এক কার্ষাপণ (বা কাহন) বর্ত্তমান চারি আনা বা পঁচিশ পয়সার সমতুল্য। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, "প্রায়শ্চিত্যবিবেক" গ্রন্থমতে একটি সবৎস গাভীর মূল্য ধনী ব্যক্তির পক্ষে ৫ কার্ষাপণ ও দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে ৩ কার্ষাপণ ধৃত করা হইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তের দণ্ড হিসাবে ১টি সবৎস গাভীর মূল্য ৩ কার্ষাপণ বা ১২ আনা ধৃত করা হয়।'

শ্রীহট্ট জিলার ভৌগোলিক গঠন সম্পর্কে শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁর Copper plate of Sylhet গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচ্য পুস্তিকায় এই ভৌগলিক গঠন সম্পর্কে লিখিত হয়েছে — 'জিলার মধ্যাংশের ও পশ্চিমাংশের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সেকালে পতিত, বিল, ঝিল, হাওর ও জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। তথায় মনুষ্য বসতিও বিরল ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশ-সনা বন্দোবস্ত কালেও দেখা যায় যে, খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে শ্রীহট্ট জিলার অর্দ্ধাংশ মাত্র ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঐ বন্দোবস্তীয় ভূমির এক চতুর্থাংশ মাত্র আবাদী ভূমি ছিল। ঐ বন্দোবস্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে তদানীন্তন কালেক্টার Mr. Willes শ্রীহট্ট জিলায় ১৭৮৮—৮৯ খৃঃ যে জরীপ ক্রমে হস্তবোদ (enquiry of assets and resources of each estate) পরিমাপ করেন, তাহাতে শ্রীহট্ট জিলার প্রায় অর্দ্ধাংশ ভূমিই অর্থাৎ বিল, ঝিল, হাওর, জঙ্গল পরিপূর্ণ পতিত ভূমি ও বিশেষভাবে জিলার দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চল বাদ পড়িয়া যায়।'

শ্রীহট্টাঞ্চল সম্পর্কে Copper plate of Sylhet গ্রন্থে একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে—
'Mr. Lindsay came to Sylhet town as the Resident of Sylhet during the rainy season, in the 18th cen. A.D. and he had to get through a vast tract of water between Dacca and Sylhet and Mariner's compass had to be used in route.' P. 3.

পুস্তিকায় শ্রীহট্টের একটি কৌতূহল উদ্দীপক পরিমাপক মান সম্পর্কে সংবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বর্তমানকালে ১৮ ইঞ্চিতে 'একহাত' দৈঘ্য পরিমাপ প্রচলিত। মুসলমান যুগের এক সময়ে এই একহাত দৈর্ঘ্যের পরিমাপ $২১\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চিরূপে প্রচলিত ছিল বলে পুস্তিকায় উল্লেখিত হয়েছে। উদ্ধৃতি—

‘সরকারী দস্ত বা হাতের পরিমাণ অনুযায়ী যে নল (Pool or reed) ব্যবহার করা হইত তাহাকে দস্তিদারী নল বলা হইত। শ্রীহট্ট মহাফেজ খানায় অদ্যাপি রক্ষিত $২১\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চি লম্বা ইস্পাত খণ্ডকে সরকারী দস্তের (হাতের) পরিমাপ বলা হয়।’

উল্লেখ্য, এক-হাত দৈর্ঘ্য পরিমাপ, একটি মানব দেহের $\frac{২}{৭}$ অংশ। সুতরাং উদ্ধৃত ঐ $২১\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চি পরিমাপক হাতের অধিকারীর দৈহিক উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট তিন ইঞ্চির কাছাকাছি।

মুসলমান রাজত্বকালে শ্রীহট্ট জিলা শীতলপাটী যোগবস্ত্র এবং হাতী রপ্তানী বিষয়ে প্রসিদ্ধ ছিল। পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে, “দিল্লীর রাজদরবারে শীতল পাটি ও মোগা তসর প্রেরণের জন্য ৩১টি মহালের রাজস্ব ২৮,৯৬৪ টাকা। হস্তীধৃত করার খরচ বাবদ ১৫টি পরগণার রাজস্ব ২৮,৯৮৮ টাকা এবং হস্তীর খোরাকী বাবদ ৩০টি পরগণার রাজস্ব ১৮,০৪৪ টাকা জায়গীরস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল।’

শ্রীহট্ট অঞ্চলের পুরানো বাংলা কথ্যভাষার সাক্ষাৎ একটি দলিলে লক্ষ্য করা যায়—

‘দৃষ্টান্তস্থলে সন ১১৭২ বাংলা সালের একখানি ব্রহ্মত্তোর পত্রে জমিদারগণ দানকৃত ভূমিতে “আগেও জমা নাই অখনও সদরি ও মপছলীও ভাইআচারী ও ফসলবন্দি জব্দ জমাবন্দি সামীল না হইব” বলিয়া উক্তি করিতেছেন।’

উর্দ্ধাংশে বর্তমান কালের মার্জিত বাংলা ভাষার ‘এখন’ স্থানে ‘অখন’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। উল্লেখ্য শ্রীহট্টের আঞ্চলিক কথ্যভাষায় এই “অখন” শব্দ বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত আছে। উদ্ধৃতির অন্য শব্দ ‘না-হইব’ প্রাচীন বাংলা ভাষার চিহ্ন যুক্ত।

শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে Copper plates of Sylhet গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠায় একাদশ শতকের ভাটেরা তাম্রপত্রের ভাষাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখিত

‘...The language of L.L. I—29 and I.I 53–56 in Sanskrit, of the rest 29–51 is couched in local Bengali and probably Oriya dilects .....’ C.P.S p. 154

এই ভাটেরার তাম্রপত্রের সময়কাল খৃঃ একাদশ শতক। লেখক এই তাম্রপত্রের কিছু অংশের ভাষাকে স্থানীয় কথ্য বাংলা এবং ওড়িয়া কথ্যভাষার সংমিশ্রণ বলে মন্তব্য করেছেন। বাংলা-অসমীয়া- ওড়িয়া এই তিনটি ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খৃঃ নবম শতাব্দী পর্যন্ত উপরোক্ত তিনটি ভাষা একই আধারে এবং আকারে ছিল বলে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের অভিমত। বাংলা-অসমীয়া থেকে ওড়িয়া খৃঃ নবম শতকের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করে। খৃঃ পনেরো-ষোল শতকে বাংলা-অসমীয়া পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা ভাষার রূপ ধারণ করে।

সুতরাং খৃঃ একাদশ শতকের ভাটেরার তাম্রপত্রে প্রাপ্ত গদ্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। বিষয়টি পরিপূর্ণ বিস্তারিত গবেষণার দাবী রাখে। এখানে আলোচ্য তাম্রপত্রের ক্ষুদ্র

একটি অংশের উদ্ধৃতি এবং লেখক কর্তৃক তার ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করা হল। লেখকের এই অনুবাদ আরো বিশ্লেষণ এবং বিচার সাপেক্ষ :

'... ভাটপড়াকে কেদাকাদি + বারগৃহ ১০ তথাকে অমৃতকাদি গোপগৃহ ১ তথাকে উত্তরে পাকাদিতে গৃহ ৫ তথাকে কাস্যগোবিন্দা গৃহ ১. ..' ইত্যাদি।

অনুবাদ —

'In Bhātapadā 10 outside house belonging to Kedāka (Kedāra?) and others one house belonging to Amritaka and other Gōpas 5 Kitchens etc. to the north of that one house belonging to Gōbinda the belmetal workers there ... .' (C.P.S page 154)

অন্য আর একটি অংশের উদ্ধৃতি :—

'.... জগাপান্তরে নাটয়ান গ্রামদ্বয়ে ভূহল ৫ বাটী ২০ সলাচাপডাকে মূলীকান্দি পূর্বে সাগর পশ্চিমে ভূহল --- ১০....'

অনুবাদ :—

5 halas of land and 20 Vātis in the two villages of Jagāpantara and Nātayāna, 10 halas of land in Śalāchāpada and to the east of Mulikāndi and to the west of Sāgara (lit. sea or lake) C.P.S.p 154.

নিধনপুর, পশ্চিমভাগ এবং ভাটেরা তাম্রপত্রে খৃঃ সপ্তম— একাদশ শতকের শ্রীহট্টের সাধারণ মানুষের কিছু বৃত্তির উল্লেখ আছে যেমন— কুম্ভকার, উপাধ্যায (অধ্যাপক), ছাত্র, ব্রাহ্মণ, অপূর্ব ব্রাহ্মণ (অতিথি), গণক, কায়স্থ (লেখক) মালাকার, তেলী, কাহালিক (বড ঢাক বাদক), শঙ্খবাদক, ঢাকবাদক, ড্রাগডিক (ঢোলবাদক), কর্মকার. চর্মকার, নট, সূত্রধর, স্থপতি, ভেট্রিক (ঝাড়ুদার), নবকর্মী (ধর্মীয় কাজ)., গোপ (দুগ্ধ ব্যবসায়ী), কাসার, দন্তকার (হস্তিদন্ত শিল্পী), নাপিত. ধোবা, নৌচালক, হড্ডিপ (নিম্নবর্ণের ভৃত্য) ইত্যাদি।

শ্রীহট্টে বর্তমান কালেও প্রচলিত "শান্তির বারমাসী' নামক করুণ লোকগাথার উৎসকাহিনী পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে—

'শ্রীহট্ট বা গৌড আক্রান্ত হওযার পর গৌড়ের খঞ্জ যুবরাজ গরুড় বা গড়ুল এবং তাঁহার স্ত্রী শান্তি ও মাতা অপর্ণা, ভৃত্য ঝাটু সহ গৌড হইতে নৌকাযোগে তরপের দিকে পলায়ন করেন। পথে আক্রান্ত হইয়া যুবরাজ গরুড প্রাণত্যাগ করিলে রাজবধূ শান্তি ও রাজমাতা অপর্ণা বড় কষ্টে জীবনধারণ করে। তাঁহাদের পরবর্ত্তী জীবনের দুঃখের কাহিনী "শান্তির বারমাসী" ইত্যাদিতে অদ্যাপি করুণভাবে গীত হয়।'

খৃষ্টীয় ৬/৭ম থেকে ১০ম শতকের নানা তাম্রপত্রের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় শ্রীহট্টের উচ্চশিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের উপাধি-- দত্ত দাম পাল কর ধর নন্দী শর্মা সোম নাগ প্রভৃতি ছিল।

(Copper Plates of Sylhet, page 144)

শ্রীহট্টের লোকছড়ায় সমাজচিত্র

অজিতকুমার চক্রবর্তী

প্রথম পর্ব

আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মউ।
এতো ডাকি তবু কথা কও না কেন বউ।।

— ছোট্ট একটুকরো ছড়ার মাঝেই ফুটে উঠেছে বাংলা ছড়ার চিরন্তন চরিত্রটি। একটি চিত্র, একটি কাহিনীর স্বল্পভাস যেন উঁকি মারছে ভোরের আলোর স্নিগ্ধতার মাঝে। শুধু ছড়া নয়, লোকসাহিত্যেরই এটা একটা বৈশিষ্ট্য।

লোকসংস্কৃতি (Folk-lore)-র একটা অংশ লোকসাহিত্য, ছড়া যার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বাংলা লোকসাহিত্যের অঙ্গনে একটি বহমান ধারা হিসাবে বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে ছড়া। শ্রীহট্ট তথা সুরমা-বরাক উপত্যকার লোকমানস লোকসাহিত্যের এক আকরবিশেষ। ছড়া, লোকসঙ্গীত, বিয়ের গান, মুর্শিদা, পুজোর গান, ধামালি, ধাঁধা প্রভৃতি লোকসাহিত্যের নানা উপকরণে ঋদ্ধ বাঙলার এই পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চল।

ছড়া যাঁরা সংকলন বা আলোচনা করেছেন, তাঁরা ছড়াকে বিন্যাস করেছেন কয়েকটি শ্রেণীতে আপন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে। ছড়া সংকলন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। ছড়া সংকলন ও সমীক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অগ্রণী ভূমিকা সকলেরই জানা। তিনি ছড়াকে ভাগ করেছেন দু-ভাগে — মেয়েলি ছড়া আর ছেলে ভুলানো ছড়া। সুকুমার সেন ভাগ করেছেন তিন ভাগে — ঘুমপাড়ানি, মনভুলানি আর খেলাচালানি *(দ্রঃ ভূমিকা, ভবতারণ দত্ত সংকলিত 'বাঙলাদেশের ছড়া')*। আশুতোষ ভট্টাচার্য করেছেন ছ'ভাগে— শিশুবিষয়ক, নারীবিষয়ক, পশু-পক্ষীবিষয়ক, প্রকৃতিবিষয়ক, সমসাময়িক ঘটনা বা উপকথা বিষয়ক। *(দ্রঃ বাঙলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮-৩৬)*। সঙ্গে অবশ্য কিছু উপবিভাগও আছে। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী তাঁর 'যশোর-খুলনার ছড়া' গ্রন্থে দুটি মুখ্য ও দশটি উপভাগে ভাগ করেছেন (বাংলা একাডেমি, ঢাকা)। নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর সংকলনে ছড়াকে আনুষ্ঠানিক (Functional, Ritualistic) এবং অনানুষ্ঠানিক (Non-Functional, Non-Ritualistic) এই দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। কয়েকটি উপবিভাগও অবশ্য আছে। *(দ্রঃ 'বাংলা ছড়ার ভূমিকা'। ১৯৭৯, পৃ ১২৬)*।

এ সকল শ্রেণীবিন্যাস সর্বসম্মত এবং বিতর্করহিত হতে পারে না। সে কারণে কোনও সূক্ষ্মবিন্যাসে না গিয়ে আলোচনার সংক্ষিপ্তির জন্য বাংলা ছড়াকে আমরা ভাগ করতে চাই মাত্র দুটি শ্রেণীতে, — 'লোকছড়া' এবং 'সাহিত্যিক ছড়া'। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে Primitive Epic বা Authentic Epic অর্থাৎ মৌলিক মহাকাব্য এবং Literary Epic বা Epic Art অর্থাৎ আলঙ্কারিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্য। তেমনি যে ছড়া সচেতন বুদ্ধির কুশলতায় নির্মিত হয়নি, অপরিমিত অবসরের আনন্দ সঞ্চয়রূপে মানবমনে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত হয়ে ওঠে, যার কোনও নির্দিষ্ট রচয়িতা নেই, লিখিত রূপ নেই, স্মৃতিবাহী হয়ে চলে এসেছে যুগ হতে যুগে। সেই সব শোলোক (< শ্লোক) বা ছড়াকেই বলা যাবে লোকছড়া ; লোকসাহিত্যের অঙ্গ। অপরদিকে সাহিত্য-সচেতন কাব্য-নির্মিতি যে ছড়ায় তাকেই বলতে হবে আলঙ্কারিক বা সাহিত্যিক ছড়া। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখের রচিত ছড়াকে সাহিত্যিক ছড়ার শ্রেণীতে রাখাই সমীচীন।

আমাদের এই লোকছড়ার আলোচনা আবদ্ধ রাখতে হবে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায়। শুধুমাত্র শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোকছড়াই এখানে আলোচ্য। সুতরাং এখানে ছড়ার Structural Typology বা ভাষাতাত্ত্বিক Epic (অর্থাৎ Non-Functional) অথবা Emic (অর্থাৎ Functional) প্রভৃতি তাত্ত্বিক বিচারের বিস্তার্য পথ পরিহার করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ছড়া শব্দটির উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তির দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। এ সম্পর্কেও নানা মুনির নানা মত। যোগেশচন্দ্র রায় এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে তাঁদের 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' (১৩২০) ও বঙ্গীয় শব্দকোষ *(১৯৬৮ প্রথম খণ্ড)* জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' *(১ম ভাগ, দ্বিতীয় সং)* এবং রাজশেখর বসু তাঁর 'চলন্তিকা'তে (১৩৬২ অষ্টম সং) ছড়া শব্দের মূল নির্ণয় করেছেন সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে। অর্থ নির্ণয় করেছেন প্রায় একই প্রকারের — 'পরম্পরা, শ্লোক পরম্পরা' ইত্যাদি। ছড়া শব্দের মূল বা অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা এ অর্থে বর্ণিত হয় না।

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' (১৩০২, ষষ্ঠ খণ্ড) গ্রন্থে শব্দটিকে দেশজ বলেছেন। অর্থ নির্ণয়ে সকলেই অবশ্য গ্রাম্যকবিতাও বলেছেন। কিন্তু গ্রাম্যকবিতা এবং লোকসাহিত্য এক বস্তু নয়। যাই হোক ছড়া শব্দটিকে আমরাও দেশজ বলেই মনে করি। শ্রীহট্ট ও তাঁর প্রতিবেশী ত্রিপুরা রাজ্য ও বরাক উপত্যকায় ক্ষুদ্র নদীগুলিকে (Rivulet, Streamlet) বলে ছরা বা ছড়া। মনছড়া, কাটলিছড়া প্রভৃতি। সাধারণতঃ বৃষ্টির জলেই জলবতী হয়। অন্যথায় শুষ্ক। উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলে একই অর্থে ছড়া শব্দের ব্যবহার *(দ্রঃ 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' বা আ ঢাকা)*। শব্দটির উদ্ভব পাওয়া যেতে পারে 'বোড়ো' ভাষার শব্দভাণ্ডারে। এই ভাষাগোষ্ঠীর 'ককবরক' ভাষায় চেরা বা চেরাই অর্থে ছোট, শিশু, বালক এবং ছাবি অর্থে শব্দ। ছড়া শব্দের উৎস সন্ধানে সংস্কৃতের শব্দসমুদ্রে না নেমে এই কিরাতজনের ভাষা-বাপিতে অনুসন্ধান নিশ্চয়ই অকাম্য নয়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, আজ যাকে ছড়া বলা হয়, উত্তর ও পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে শ্রীহট্টে তাকে বলা হয় শিলল[২] বা শিলুক[৩] (< শোলোক < শ্লোক)। পূর্ববঙ্গে কোথাও আবার বলা হয় সক্‌কোল বা শিগ্‌কলি। শহিদুল্লা সাহেবের মতে শ্লোক শব্দের বর্ণবিপর্যয়ে সৃষ্ট উক্ত শব্দদ্বয় *(দ্রঃ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান পৃঃ ৪৮৮, ৫০৪)*। ছড়ায় গাঁথা রূপকথাকে শ্রীহট্টে বলা হয় 'শোলোকী কিসসা'।

উপরিউক্ত তথ্যগুলি থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ছড়া শব্দটি অর্বাচীন। উত্তর ও পূর্ববঙ্গেও ছড়া শব্দ বর্তমান অর্থে চলন ছিল না। ছিল শ্লোকজাত শব্দ অঞ্চলভেদে নানা রূপে। রবীন্দ্রনাথও ছড়া বুঝতে শ্লোক শব্দই ব্যবহার করেছেন— 'এই সকল অসঙ্গত, অর্থহীন, যদিচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে' *(দ্রঃ র. র. ১০/১৪৬-৪৭)*।

ছড়ার তাত্ত্বিক আলোচনা সর্বপ্রথম করেন বোধহয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'জয়দেব' *(নবজীবন, ফাল্গুন ১২৯৩/ পৃ ৫০০-৫১২ এবং চৈত্র ১২৯৩। পৃঃ ৫৬২-৫৭৪)* প্রবন্ধে। আলোচনা প্রসঙ্গে পাদটীকায় তিনি দুটি ছড়ার উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন :

— শোলোক মোলক বাঁশের গোজা/ ভাতটি খেলেই পেটটি সোজা।' এবং

'শোলোক শিখিনু বালক কালে/ শোলোক ভুলিনু ঘর ফুটিলে॥' এখানে তিনিও ছড়ার পরিবর্তে শোলোক শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। সুকুমার সেন সংকলিত 'An Etymological Dictionary of Bengali (*Calcutta 1971, Vol-I & II*) গ্রন্থে দশম শতক অর্থাৎ বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হলেও ছড়া শব্দের উল্লেখ সেখানে নেই। ভবতারণ দত্ত সংকলিত 'বাংলাদেশের ছড়া' (১৩৭৭) গ্রন্থের ভূমিকা 'শিশুবেদ' নামের প্রবন্ধে সুকুমার সেন বলেছেন— 'ছড়া শব্দটি পুরানো, কিন্তু এ অর্থে নয়, কবিতা কবিতাছত্র, কবিতা ছত্রাংশ অর্থে ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পাইনি।' বস্তুত উনিশ শতকের প্রথম পাদেও বোধহয় ছড়া শব্দটি স্থান পায়নি সাহিত্যভুবনে। শ্লোক বা শ্লোকজাত শব্দেরই ছিল একাধিপত্য। এ প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর — 'বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই/ মাগো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই' — বহু পরিচিত এই কবিতা বা গানটিও মনে পড়ে। এই গানটি আমাদের মনের পটে গড়ে তোলে একটি চিত্র। সন্ধ্যায় বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ দেখা দিয়েছে, ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে কোন এক কাজলাদিদি তার স্নেহের ভাইটিকে 'ঘুমপাড়ানি শোলোক' বলছে। গ্রাম বাংলার বহু পরিচিত এ চিত্র আজ বিলীয়মান হলেও একদিন কিন্তু দুর্লভ ছিল না। চিত্রধর্মিতাই এই শোলোক বা লোকছড়ার প্রাণ।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সংশয়হীনভাবে বলা যায় যে, শ্লোক শব্দ থেকেই এসেছে শোলোক, শিলয় বা শিলুক প্রভৃতি শব্দ। 'ছড়া' শব্দটি বাংলা ভাষা-ভাণ্ডারে কিছুটা অর্বাচীন এবং দেশজ, সম্প্রসারিত অর্থে এসেছে বাঙলার পূর্বপ্রত্যন্ত থেকে।

লোকসাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ ও সেই প্রসঙ্গে ছড়া সংগ্রহ ও সংকলনে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'র অবদান অনস্বীকার্য। অবশ্য এই পত্রিকা প্রকাশের বহু পূর্বেই পাদ্রী মর্টন (১৮৩২ এবং ১৮৩৫) এবং প্রাদ্রী জেমস্ লঙ্ (১৮৬৮ এবং ১৮৭২) প্রবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে কিছু ছড়াও সংগৃহীত হয়, অনেকটা অসতর্কভাবেই। অনেক প্রবাদই কিন্তু রূপ পায় ছড়ার আকারে। তবে ছড়া ও প্রবাদে কিছু মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। ব্যঙ্গ বক্রোক্তি ব্যতীত প্রবাদ হয় না। নিতান্তই সোজাসুজি যা বলা হয়, তা ছড়া। ছড়ায় বিশ্বাস, প্রবাদে অবিশ্বাস। সুতরাং প্রবাদের সঙ্গে মিশে থাকলেও চরিত্রগুণেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে ছড়া ও প্রবাদের পার্থক্যটি। গ্রিয়ার্সন সংগৃহীত (১৮৭৩) মানিকচন্দ্র রাজার গান-এর মাঝেও একটি বহু পরিচিত ছড়া ধরা পড়েছে। ছড়াটি 'দুগ্ধ মিঠা, চিনি মিঠা আরো মিঠা ননী/ সবাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী।' এ ছাড়া দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিক্রম' নাটকে (১৮৬৫) এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রহসনে দুটি ছড়া ব্যবহৃত হয়েছে। লালবিহারী দে তাঁর 'Folk tales of Bengal' (১৮৮৩) গ্রন্থে 'আমার কথাটি ফুরালো/ নটে গাছটি মুড়ালো'— ছড়াটি ইংরেজিরূপে ব্যবহার করেছেন। তবে এর কোনটিই ছড়া সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সংকলিত নয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে ছড়া সংগ্রহের কাজে রবীন্দ্রনাথই প্রথম পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছড়াকে প্রথম প্রতিষ্ঠা দেন সাহিত্যের আসরে। সাধনা পত্রিকায় ১৩০১ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় মোট ২৭টি শ্লোক বা ছড়া ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ১৩০১, তৃতীয় সংখ্যা : মাঘ) ভূমিকাসহ ২৬টি ছড়া। এই সংখ্যার পাদটীকায় সম্পাদক রজনীকান্ত গুপ্ত তিনটি ছড়ার পাঠান্তর বা কথান্তর দেখান। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩০২) মোট ৫৫টি ছড়া 'ছেলেভুলানো ছড়া : মেয়েলি ছড়া' নামে প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। এই সংখ্যাতেই রজনীকান্ত গুপ্ত প্রকাশ করেন ১৬টি 'সাঁওতাল পরগণার ছড়া'। এরপর নানা জন এগিয়ে আসেন এ কাজে।

বিশেষ একটি অঞ্চল বিশেষের ছড়া সংগ্রহ ও প্রকাশে বোধহয় পথিকৃৎ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার নবম বর্ষ (১৩০৯) দ্বিতীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় তাঁর সংগৃহীত ৭৮টি 'চট্টগ্রামী ছেলেভুলানো ছড়া'। এর দীর্ঘকাল পর শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত 'যশোর-খুলনার ছড়া' *(বা. এ. — ১৯৬৩)*, আলমগীর জলিল সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া'। *(বা. এ. — ১৯৬৪)*, সেকেন্দার মোমতাজ সম্পাদিত বরিশাল থেকে প্রকাশিত— 'বরিশালের ছড়া'। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর 'সিলেটি ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে *(বা . এ. — ১৩৬৮)* সিলেটের মাত্র ২০টি ছড়া স্থান পেয়েছে। জীবন চৌধুরী সংকলিত 'পূর্ব ময়মনসিংহের ছড়া' *(বা. এ. — ১৯৭৭)* আর আছে বদিউজ্জমান সম্পাদিত 'লোকসাহিত্য-১২' (বা.এ. — ১৯৭৬) গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন জেলার কিছু ছড়া। এর মধ্যে সিলেটের কিছু ছড়াও অবশ্য স্থান পেয়েছে।

উনিশ শতকেব শেষ দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছড়া সংগ্রহেব কাজ আবম্ভ করেছিলেন বলেই হয়তো মনে করা যায় যে, এই উদ্যমেব প্রেরণা এসেছিল প্রতীচ্যেব 'ফোকলোর' সংগ্রহের আন্দোলন থেকে। ফোকলোর কথাটি প্রথম ব্যবহাব কবেন উইলিযম জোনস্ থম্‌স (১৮০৩-১৮৮৫) লণ্ডনের 'The Athenium' পত্রিকায় (No. 982—, Aug 22 1846) একটি প্রবন্ধে। এরপব ১৮৭৮ সালে ফোকলোব সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুখপত্ররূপে প্রকাশ পায় 'ফোকলোব' পত্রিকা। এরই সঙ্গে ফোকলোব সমাজবিজ্ঞানেব শাখারূপে স্বীকৃতিলাভ করে সমস্ত প্রতীচ্য খণ্ডে।

বাংলা লোকছড়াগুলিব মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে যে অমূল্য রত্ন সম্ভার সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ববীন্দ্রনাথ। বলেন— এগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। এবং সেগুলিকে স্থায়ীভাবে সংগ্রহ কবে বাখা প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ছড়াগুলিব উদ্দেশ্য কেবল শিশুদের মনোরঞ্জন, কিন্তু শুধুমাত্র সেদিক থেকেও ওগুলির রয়েছে একটি চিরত্ব বা চিবকালীন চবিত্র। তিনি বলেন :

> 'এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিবত্ব আছে। কোনোটিব কোনোকালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয মাত্র নাই এবং কোন্‌খানে কোন্ তাবিখে রচিত হইযাছিল এমন প্রশ্নও কাহাব মনে উদয হয় না। এই স্বাভাবিক চিবত্বগুণে ইহাবা আজ রচিত হইলেও নূতন।' *(র. ব ১০/১৪৬ — ১৪৭)*।

লোকসাহিত্যের এটাই বিশিষ্ট গুণ যে কবে কোন বিস্মৃত ববষে, কোন নিভৃত গৃহকোণে বা কোন বনানীর শ্যামচ্ছায়াতলে অবসরক্লান্ত কোন গ্রাম্য কবি রচনা করেছিল— এ সম্পর্কে মহাকাল নিরুত্তব। কোনও প্রশ্নও জাগে না শ্রোতাব অন্তরে। এ কথাটিই প্রকাশ পেয়েছে ববীন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটিতে। একই কথা বলেছেন প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী M. Bloomfield, তিনি বলেন :

> 'There are many popular rhymes which cannot be definitely assigned to any specific moment in history The very same popular rhyme may have been in existence for decades, each time adopting itself, now to one and now to another manifestation of actual life, and being subjected some times to slight, some time to very extensive changes... 'যে কোনও মৌখিক সাহিত্যের (Verbal folk lore) কাল নির্ণয়ন সহজ নয়, সম্ভবও নয়। মৌখিক প্রচল এবং শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভব বলেই নিয়ত পবিবর্তনশীল এর রূপ। এ চলে এসেছে— যুগ হতে যুগে, রূপ হতে রূপে। ছড়া বিশেষ করে ছেলে ভুলানো ছড়া শিশুর মতোই পুবাতন, 'তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।'

বাংলা ভাষার উদ্ভবেব দিন থেকেই বাংলা ছড়ার অস্তিত্ব কল্পনা কবলে কোনও অন্যায় বা অসঙ্গত হবে না। লোক বিজ্ঞানীদেব মতে ঘুমপাড়ানি গান — 'genesis of all songs' (দ. Introduction— 'Oxford Dictionary of Nursury Rhymes') সুকুমার সেনের মতেও ছড়া হচ্ছে মানুষের আদিম সাহিত্য, যা পরবর্তী সাহিত্যের বীজ" (পূর্বোক্ত — ভূমিকা)।

ছড়া বলতে আজ আর শুধুমাত্র 'মেয়েলি ছড়া' বা 'ঘুমপাড়ানি ছড়া'কেই বুঝায় না। ছড়া অভিধার প্রশস্ত ছায়াতলে সহজেই আশ্রয় পেতে পারে প্রবাদ, ধাঁধা, মঙ্গলকাব্য, ব্রতকথা, পূজার গান, খেলার ছড়া, ঘুমপাড়ানি গান বা ছেলেভুলানো ছড়া প্রভৃতি সব কিছুই আপন আপন চারিত্র্যগুণ রক্ষা করেও। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজি লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে বাংলা 'ছড়া' শব্দটির মতো এমন সর্বাচ্ছাদ সর্বত্রচারী কোনও শব্দ নেই। একমাত্র 'light verse'-এ কতকাংশে এ গুণ বর্তমান। সেখানে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি নাম। যেমন, Nursery rhymes, Craddle songs, Lullaby songs, Nonsense Verse, Game songs — ইত্যাদি।

বাংলা ছড়ার যেমন কোনও জন্ম ইতিহাস পাওয়া যাবে না— সে যেন 'সৃষ্টিবাদের ধাতুঃ', ইংরাজি রাইমগুলির অনেকেরই কিন্তু কোষ্ঠীপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যাই হোক এদের কিছু পরিচয় পেলেই সহজ হবে বুঝতে বাংলা ছড়ার সঙ্গে চরিত্রগতভাবে কোথায় এদের মিল আর কোথায় গরমিল।

নার্সারী রাইম বলতে বুঝি — 'Jingling rhymes invented to amuse children...... The verse generally consists of a rhyming couplet or a quartain...... there is frequently a refrain accompanying the traditional music settings তা ছাড়াও The nursery rhyme proper, embodying a simply told tale, and marked by either wit or pathos....... are more ornate and fantastic [*Girling, D.A (ed.). Everyman's Encyclopaedia. vol-9 1978 (1st ed. 1913) London. P-81/*] নার্সারি রাইমের ধুয়া (refrain) বা একই কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসা আর সুরের হাতছানির সঙ্গে আমাদের ঘুমপাড়ানি ছড়ার কিছুটা আত্মীয়তা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এই নার্সারি রাইমস নামটি চালু হয়েছে ১৮২০ সালের কাছাকাছি। আগে শুধুই songs বা ditties নামেই ছিল এর পরিচিতি। নামে অর্বাচীন হলেও বয়সে এই রাইমস কিন্তু বেশ প্রাচীন। ছড়াতত্ত্ববিশারদ হ্যালিওয়েল-এর মতে, এ ধরনের অধিকাংশ ইংরাজি ছড়ারই নাকি জন্ম অষ্টম হেনরির সময়কালে, এগারো শতকের কাছাকাছি। অর্থাৎ বলা চলে ইংরেজি ভাষার উন্মেষ কালেই" রাইমস বা ছড়ার সৃষ্টি। সে যুগের একটি ছড়া :

Three wisemen of Gothem
Went to sea in a bowel.
If the boat had been stronger
My story would have been longer.

—নিঃসন্দেহে এখানে আধুনিক ভাষার প্রলেপ পড়েছে। শ'খানেক বছর আগেও ইংল্যাণ্ডের নটিংহামের কাছে 'Gotham' নামের একটি গ্রামের অস্তিত্ব ছিল, এবং মূর্খদের গ্রাম বলেই ছিল তার পরিচয়। ছড়াটি কিন্তু ভাষার পোশাক বদল করে ঢুকে পড়েছে বাংলা ছড়ার জগতেও :

'তিনবুড়ো পণ্ডিত টাকচুড়ো নগরে
চ'ড়ে এক গামলায় পাড়ি দেয় সাগরে,
গামলাতে ছেঁদা ছিল আগে কেউ দেখেনি,
গানখানি তাই মোর থেমে গেল এখনি।

(দ্র. সুকুমার রায়, ছড়া— ছিটেফোঁটা)।

নার্সারি রাইমকে বলা চলে ছেলে ভুলানো ছড়া, যেমন Craddle song, Lullaby songs-কে বলতে হয় ঘুমপাড়ানি গান। Nonsense Verse সম্পর্কে বলা হয়েছে, A failure of logic may be justly said to make nonsense and so may a geometrical impossibility...... the best way to describe it is to say that it must be made with no ulterior purpose but to amuse by absurdity. *[Steinberg, SH (ed.) Encyclopeadia of Literature, Vol-1, London, 1953. P-382]*।

এ ছাড়াও ছড়া জাতীয় সৃষ্টির মধ্যে আছে Limerick, Clerihew, Leonine rhyme, Haiku বা Hokku ইত্যাদি। সবগুলির পরিচয়ের চেষ্টা না করে একমাত্র লিমেরিক-এরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন, কারণ বাংলা সাহিত্যে লিমেরিক একটি স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'-র কিছু কবিতায় লিয়রের লিমেরিকের স্বাদ ও রস পেয়েছেন কোনও কোনও সমালোচক (দ্র. শুদ্ধসত্ত্ব বসু: রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়— ১ম, ১৩৭৩, পৃ. ১৪২)। অধ্যাপক পবিত্র সরকার বলেছেন, 'লিয়রের ধরনের বিচিত্র স্থানের নাম ও পদবী এবং মানুষের উদ্ভট ও মজাদার স্বভাবকে কেন্দ্র করে 'খাপছাড়া'র অধিকাংশ কবিতা রচিত।' গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'পাগলামির পুঁথি' (১৩২৯)-কেই বাংলার প্রথম ও সার্থক লিমেরিক ছড়া বলে দাবি করেছেন এবং সমর্থন করেন এ দাবি অনেকেই।

লিমেরিকের প্রথম স্রষ্টারূপে Edward Leer-এর নামই জানেন সকলে। তবে আগের দিনে গানের শেষে ধুয়োর মতো (refrain) আবৃত্তি করা হত— 'Won't you come up, come up, won't you come up to Limerick?' এই প্রাচীন রীতির বিলুপ্তি ঘটলেও রয়ে গেছে 'লিমেরিক' নামটি। প্রথম লিমেরিক ছড়া প্রকাশিত হয় ১৮২০ সালে। এর থাকে পাঁচটি পঙ্‌ক্তি, যার শেষ পঙ্‌ক্তিটা প্রথম পঙ্‌ক্তিরই অনুরূপ। সামান্য কিছু শব্দ বা কথার হেরফের থাকে *[Longford Reed, 'Everymans Encyclopaedia' Vol-7, 1967 (1st ed. 1913) P-587]*। এ প্রসঙ্গে একটি বাংলা লিমেরিকের দিকে তাকালেই লিমেরিকের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'এক যে ছিল মানুষ/ নিত্য ওড়ায় ফানুস।
অবশেষে একদিন/ ব্যাপার হল সঙ্গীন—
ফানুস ওড়ায় মানুষ।।' (অন্নদাশঙ্কর রায়, ক্ষীর নদীর কূলে। পৃ. ৬)

লিমেরিকের অদ্ভুত, অসংলগ্ন ও আকস্মিক প্রসঙ্গের আবির্ভাব ও পুনরাবৃত্তির সঙ্গে বাংলা ছড়ার শরীর গঠনের দিক থেকে অনেকখানি মিল পাওয়া গেলেও এগুলি সচেতন মনের সাহিত্যকৃতি। লোকছড়ার সঙ্গে সেখানেই এদের মৌলিক পার্থক্য।

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীহট্টের লোকসাহিত্যে ছড়া প্রসঙ্গে আলোচনার ভূমিকা পর্বের পরিধি অনেকটা বিস্তারিত হয়ে গেল। এই বিস্তৃতির কারণ রবীন্দ্রনাথের একটি কথাতেই পাওয়া যাবেঃ 'গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত, এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে। তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়, তাহা কেবল জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য। (র. র. ১৩/৭১৭)। আকাশের দিকে ছড়ানো অংশের আলোচনা একটু ছড়িয়ে অর্থাৎ বিস্তার করেই শিকড়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কথিত এই সাহিত্যই লোকসাহিত্য। সেই সাহিত্য কেবলভাবে স্থানীয় জনসাধারণেরই উপভোগ্য সে সাহিত্য উপভোগ করতে হলে একাত্ম হয়ে উঠতে হবে সেই অঞ্চলের লোকের মানসিকতা, আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনা, আচার-সংস্কার প্রভৃতির সঙ্গে। লোকসাহিত্য বিশেষ অঞ্চলের হলেও মানবিক আবেদনে তা সর্বজনীন, সার্বত্রিক। এখানেও দেখা যাবে একই লোকছড়া বাংলার একপ্রান্ত থেকে ছড়িয়ে পড়েছে অপরপ্রান্তে, অবাধে। লোকসাহিত্যের ছড়া তাই শ্রীহট্টের হয়েও অন্তর্লীন আবেদনে সে সর্বকালীন ও সর্বাঞ্চলের। কিছু কথান্তর, কিছু রূপান্তর ঘটতে পারে— কিছুটা আঞ্চলিকতার প্রভাবে, কিছুটা স্মৃতিনির্ভর লোকসাহিত্যের স্বভাবগুণে। লোকছড়া মানুষের মানসলোকের 'Striking example of the poetic primitive'— যার সূচনা 'almost to the primitive archaic'— যুগের *(M. Bloomfield)*।

লোকসাহিত্যের আলোচনায় এ সকল কারণেই প্রয়োজন বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন কথান্তরকে যথাসম্ভব পাশাপাশি এনে তার অন্তর্নিহিত ঐক্যটিকে অনুভব করা। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরাও বলেন : 'The Oldest and still the most common technique of flok-lore analysis is comparison, usually of many different versions of the same item' *(J. HAROLD BRUNVAND, 'The Study of American Folklore'— N. Y. 1968. P-15)*। আমরাও তাই শ্রীহট্টের ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে পাশাপাশি বাংলার নানা অঞ্চলের একই সুরের ছড়াকে তুলে ধরে দেখাতে চেষ্টা ক'রব গঙ্গাতীরের বাঙালি আর মেঘনা-সুরমা (বরাক উপত্যকারও) তীরের বাঙালি আন্তর সম্পদে অভিন্ন। প্রথমেই একটি ঘুমপাড়ানি ছড়ার পরিব্রজনের ভূগোলটি লক্ষ করলেই দেখা যাবে এই উক্তির যাথার্থটি।

২৪-পরগনা : ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ি এসো।.......
বর্ধমান : ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যেও।......
ঢাকা : ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ি আইস।.....
চট্টগ্রাম : নিদ্রালি মাউরে আঁরো বাড়িত্ আইও!......
শ্রীহট্ট : নিদ্গুনুর মা'ইনি আরায় গো— আমরার বাড়ি আইঅ।.....

ভাষার আঞ্চলিকতা-চিহ্ন সত্ত্বেও এরা ভাবে অভিন্ন। একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতেই পশ্চিমবাংলার ভাষারূপটির সঙ্গে পূর্ববাংলার ভাষারূপের ক্রমপরিবর্তনটিও এখানে পরিস্ফুট। অনেক সময় একই লোকছড়া বিভিন্ন উপভাষার সংস্পর্শে আঞ্চলিক রূপ পেয়েছে। ভাষার বাধা অপেক্ষা উচ্চারণের পার্থক্য জনিত বাধা অনেক বেশি এবং সহজ বোধগম্যতার পক্ষে হয়ে ওঠে দুরূহ ও দুরতিক্রম্য। এরই জন্য সিলেট বা শ্রীহট্টীয় ছড়ার অন্দরমহলে প্রবেশ করতে প্রয়োজন এর ঔপভাষিক রূপ সম্পর্কে কিছু ধারণা। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এই ভাষাবন্ধের গুণেই আঞ্চলিক ছড়াগুলি হয়ে ওঠে অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী। ম্যাক্সমূলার যথার্থই বলেছেন— 'The real and natural life of Language is in its dialect'।

উপভাষার পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে— 'In its widest sense, languages which are branches of a common or parent language.' *(Encyclopaedia Britanica. Vol-7, P-356)*। উপভাষা হ'ল একটি ভাষার বিশেষ একটি রূপ যা অঞ্চল বিশেষেই প্রচলিত। মান্য ভাষার সঙ্গে ধ্বনিগত, রূপগত বা বাগধারার কিছু পার্থক্য আছে, অথচ তা এত বেশি নয় যাতে সে হয়ে উঠতে পারে স্বতন্ত্র একটি ভাষা। বাংলা ভাষার সিলেটি উপভাষা সম্পর্কেও এই লক্ষণগুলি প্রযোজ্য। গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁর বিখ্যাত *'Linguistic Survey of India' (Vol-v, P-I, 1903, P-221)* গ্রন্থে সিলেটি উপভাষার উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলেছেন — 'There are peculiarities of pronunciation which tend to render it unintelligible to stranger. The inflections also differ from those of regular Bengali'— এ সম্পর্কে ব্যাকরণগত অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক, ধ্বনিগত ও রূপগত আলোচনাও তিনি করেছেন। সে আলোচনায় না গিয়ে এই উপভাষার ভৌগোলিক অবস্থিতি (geographical area) সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ এ বঙ্গের অধিবাসীরা শ্রীহট্টীয় উপভাষা সম্পর্কে সামান্যই ধারণা রাখেন। অথচ বাংলা ভাষার কিছু আলোচনার একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে এ সকল 'প্রাদেশিক বুলি' বা উপভাষার ব্যাকরণ আলোচনা ও পরিচয় লাভ করা। বলেছেন স্বয়ং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার *(বাংলা উচ্চারণ: বা. ভা. প্রসঙ্গে, ১৯৭৫/ পৃ.-৭৩)*। সুনীতিকুমার আরও বলেছেন — 'চাঁটগা অঞ্চল আর কিছুটা নোয়াখালি কুমিল্লা শ্রীহট্ট আর মণিপুরের বিষ্ণুপুর অঞ্চল— এ ক'জায়গায় লোকেদের মধ্যে প্রচলিত বাংলার ব্যাকরণে, ওই ওই অঞ্চলের নিজস্ব কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে *(তদেব. পৃ— ৭২)*। মণিপুরের বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এককালে শ্রীহট্ট অঞ্চলেরই কিছু লোক গিয়ে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে তাদের ভাষা সাধারণত বিষ্ণুপুরিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়া

নামেই পরিচিত। যাই হোক শ্রীহট্ট অঞ্চলের উপভাষার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব স্বীকার করেছেন সুনীতিকুমারও।

বাংলাব এই উপভাষা এবং তার লোকসাহিত্যের বিলীয়মান অমূল্য সম্পদ লোকছড়াগুলির সঙ্গে পরিচিতি প্রয়োজন আজ বিচ্ছিন্ন সমস্ত বঙ্গভাষীব— এ কথা নিশ্চিতভাবেই স্বীকার্য। এ কথা মনে বেখেই প্রবেশ করতে হবে সিলেট বা শ্রীহট্টের লোকছড়ার ভুবনে।

ঘুমপাড়ানি ছড়া এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবে আছে বাংলা ছড়ার জগতে। এর প্রচলন শুধুমাত্র শ্রীহট্টে নয়, পৃথিবীর সব দেশে, সব কালেই পাওয়া যাবে এর অস্তিত্ব। ঋক্‌বেদেও ঘুমপাড়ানি ছড়ার সন্ধান পেয়েছেন অধ্যাপক সুকুমার সেন (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৮, পৃ-৭৭২-৭৭৩ এবং বাংলা আকাদেমী প্রকাশিত পুস্তিকা— 'বাঙালীর ভাষা'— ১৯৯০। পৃ-১৭)। ঋক্‌বেদের ৭ম মণ্ডলের কয়েকটি শ্লোকে (> শোলোক = ছড়া?) ঘুমপাড়ানিব কথা আছে। যেমন: 'যদর্জুন সারমেয় দতঃপিসঙ্গ যচ্ছসে।/ বীবভ্রাজন্তে ঋষ্টয় উপস্রক্কেষু বপ্সতো নিসুস্বপ॥' (৭/ ৫৬/ ২ ॥পৃ-২/ ১৪০)। যদর্থ— 'হে শ্বেত ও পিঙ্গল বণ সারমেয়! তুমি যখন দন্তপ্রকাশ কর তা আমার নিকট আহারের সময় মুখপ্রান্তে বর্শার ন্যায় বিশেষভাবে শোভা পায়। তুমি সুখে নিদ্রা যাও।' পরবর্তী শ্লোকেও— 'তোমার মাতা নিদ্রা যান, পিতা নিদ্রা যান, কুকুর সকল নিদ্রা যাক, গৃহস্বামী নিদ্রা যাক, বন্ধুগণ ও চতুর্দিকস্থ জনগণ নিদ্রা যাক্।' (৭/ ৫৬/ ৫ ॥)। এগুলিকে সুকুমার সেন ঘুমপাড়ানি ছড়া বললেও একে ঘুমপাড়ানি মন্ত্র বলাই সমীচিন, যা চোব বা দুষ্কৃতকারীদের প্রয়োজন সাধন করতে পারে। আমাদের ঘুমপাড়ানি ছড়ায় 'যে স্নেহটি, যে সঙ্গীতটি, যে সন্ধ্যাদীপালোকিত সৌন্দর্য ছবিটি'— মিশে আছে তা এখানে নেই। একাট স্নেহস্নিগ্ধ সঙ্গীতের সুর পাওয়া যাবে সিলেটের ঘুমপাড়ানি ছড়াটিতে:

> 'নিদ্‌গুনুর মায়নি আরায গো'!/ আমব'ব বারি আইঅ।
> আম্ দিমু কাভোল দিমু/ ডাল'অ বইয়া খা'ইঅ।
> ডালডুল বা'ঙ্গিয়া/ তেলিব বাবি জা'ইঅ।
> তেলিএ দিব' তেল, মালিএ দিব ফু'ল্;
> আমার সুনার বিয়ার কাল'অ/ ব্যাঙ্গ' বাজা'য় ডু'ল॥'

এ ছড়াটিরই আর একটি রূপান্তরও পাওয়া যাবে আর একটি ছড়ায়।[৮]

এরই পাশে চট্টগ্রামের একটি ছড়া:

> 'নিদ্রালি মাউরে আঁরো বাড়িত্ আইঅ।
> খাট নাই পালঙ নাই/ পিড়ি দিতাম জে'গা নাই
> মণির চক্ষ্যুর উপর বই'অ॥'

এবার বাংলার পশ্চিম প্রান্তেব ঝাড়খণ্ডী উপভাষাব একটি ছড়া:

> 'আয়রে ভুরকুড়া/ আমার ধনকে ঘুম করা,
> খাবি দাবি কলকলাবি/ কলেব (< কোলের) ছা'কে ঘুম কবাবি॥'

একই সঙ্গে দেখা যাক গঙ্গাতীরেব একটি ঘুমপাড়ানি ছড়া :

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ি এসো,
সেজ নেই মাদুর নেই পুটুর চোখে বোসো।
বাটাভরে পান দেবো, গাল ভরে খেয়ো।
খিড়কি দুয়ার খুলে দেবো ফুড়ুৎ কবে যেয়ো॥ (র. র. — ১৩/৬৯৪)

প্রত্যেকটি ছড়াতেই ঘুমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে (অর্থাৎ ঘুমের মা বা মাসিপিসি) আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে একই ভঙ্গিতে। সাধ্যমতো আপ্যায়নেরও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সকল ছড়া বা লোকসাহিত্যে লোকমানসের প্রতিফলনের প্রক্রিয়াটিকে প্রবহমানভাবে সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিতে অনুধাবন করাই সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্র। সমাজজীবনেব অগ্রগতিব পরম্পরাব ক্রমপরিবর্তনেব চিত্রটিও প্রতিফলিত হযে ওঠে লোককথা বা ছড়াগুলিতে। সমাজজীবনেব প্রতিবেশ-চিত্র, সমাজমনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনাব চিত্র ছড়ানো বয়েছে লোকসাহিত্যের এই ছড়াগুলিতে। এঙ্গেলস্‌ও লোকসাহিত্যকে শুধুমাত্র শিল্পগত দিক থেকেই না দেখে তাব সামাজিক ভূমিকা বিচারের উপব গুরুত্ব আবোপ করেছেন।

উপরের ছড়া বা ছড়াংশগুলিতে দু'টি বিষয় আমাদেব দৃষ্টিপথে আসে সহজেই। প্রথমত ছড়াগুলির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটি সামাজিক কাঠামোব রূপ। শ্রীহট্টেব এবং চট্টলেব ছড়াতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ঘুমেব মা-কে (নিদ্‌গুনুব মাই এবং নিদ্রালিমাউ) শ্রীহট্টের ছড়ায় সেই নিদ্‌গুনুর মাই-কে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আম-কাঁঠাল খাওয়ানোব। গ্রামসমাজে যা সহজপ্রাপ্য। বসতে খাট-পালঙ্ক নয়, পিড়িও নয়। গাছেব ডালে বসেই খেতে হবে। তাতে গাছের ডালপালা (ডাল-ডুল) ভাঙলে ভাঙুক। এই সঙ্গেই সোনামণির বিয়ের সংবাদও আছে। বিয়েব মাঙ্গলিক তেল ও ফুল জোগান দেবে যথাক্রমে গ্রামেবই তেলী এবং মালী। বিয়ে বাজনায় বোশনচৌকির সম্ভাবনা নেই, ব্যাঙ্ বাজাবে ঢোল (ঢুল)— ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্ নিনাদে। ভবিষ্যতের এই স্বপ্নের জাল বোনার মাঝেই সোনামণির নিশ্চিন্তনিদ্রা।

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত একটি ছড়াতেও পাই—

'আয় ঘুম আয় বাগদিপাড়া দিয়ে।
বাগদিদের ছেলে ঘুমায় জালমুড়ি দিয়ে॥'

—'ওই শেষ ছত্রে জালমুড়ি দিয়া বাগদিদের ছেলেটা যেখানে সেখানে পড়িয়া কিরূপ অকাতরে ঘুমাইতেছে সে ছবি পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক কিছু নহে, ওই জালমুড়ি দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া বলাতেই বাগদি সন্তানেব ঘুম বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে।' (ব.র. — ১৩/৬৭৪-৬৭৫)।

অনেক আলোচকের মতে, রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের শুধুমাত্র সাহিত্যিক গুণটিকেই তুলে ধরেছেন, কিন্তু উপরের মন্তব্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যায়নি গ্রামবাংলার বাস্তব সমাজচিত্রগুলিও।

এবার আর একটি ছড়া— যেখানে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিকে বলা হয়েছে:

'আঁবকাঁঠালেব বাগান দেবো ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
চার চার বেয়ারা দেবো কাঁধে করে নেবে॥
দুই দুই বাঁদি দেবো পায়ে তেল দেবে।
উল্‌কি ধানেব মুড়কি দেবো নারেঙ্গা ধানের খই।
গাছপাকা রম্ভা দেবো, হাড়িভবা দই॥' (ব.র.-১০/ ৬৯৩)

রীতিমতো রাজসিক আয়োজন। শ্রীহট্টের গ্রাম-সমাজেব যে স্তরের চিত্র আমরা পাই ছড়াগুলিতে সেখানে পায়ে তেল দিতে বাঁদী, চাব বেয়াবাব পাল্কী বা হাড়িভরা দই-এর স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়। আবেকটি ছড়াতে দেখেছি— 'নিদ্রাবতী মাসি তুমি মোদেব বাড়ি এসো...... ছানা দেব, ননী দেব/ দেব মিঠে কথা।' প্রত্যন্ত পুববাংলাব গ্রাম-সমাজে মিঠে কথাটি পাওয়া যেতে পাবে, কিন্তু ছানা-ননী প্রভৃতি ধনীভোগ্য বস্তু সেখানে কল্প-সম্ভবও নয়। এই সব ছড়াগুলিতেই প্রকাশ পায় সমাজেব শ্রেণীগত বৈষম্যেব চিত্রটি। অপর লক্ষণীয় বিষয়— এই প্রান্তিক পুব-বাংলায় ঘুমপাড়ানি মায়েরই ডাক পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মতো মাসি-পিসির নয়। এ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, নিদ্রাদেবী পূর্বে মা-ই ছিলেন, সমাজ বিবর্তনের পথে পরবর্তীকালে অন্য আত্মীয-স্বজনেরা এসেছে (*বাংলার লোকসাহিত্য: ২য় পৃ. ৯৫*)। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, প্রত্যন্ত পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ শ্রীহট্ট, চট্টল প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন ভাষাব রূপতত্ত্বে, তেমনই লোকসাহিত্যেও বয়েছে প্রাচীন সমাজের জীবাশ্ম-চিহ্ন।

শ্রীহট্টের ছড়ায় মা'র পরই যে আত্মীয়েব উপস্থিতি বারংবার, তিনি মামা। যেমন,

'আমপাতালো তুলসী/ জামপাতালো তুলসী
মামীর নাম রূবসী (রূপসী)/ মামুয়ে কাডে (কাটে) চিকন সূতা,
মামীয়ে বান্দইন বা'ত (ভাত) কাইন্দ'নাগো সুনা মামী/ মামুয়ে তুমাব বাপ॥'

অথবা,—

'আইআব আইঅ/ মামুব বাবি জাইঅ'/ মামুবেটা যেমুন তেমুন
মামীব মুখ'ত্ চুমি/ পান সাজ' চুন লাগাইলে বেটি উটে ঘামি॥'

এখানে লক্ষণীয় মামীর সঙ্গে গ্রাম্য-বসিকতার সম্পর্কটি প্রকাশ পেয়েছে। আব একটি ছড়া,

'পুয়া পুবী (ছেলে-মেয়ে) আউরে/ মামুর বারি জাইবে,
মামুয়ে আইনছন্ নয়া মামী/ ভা'ত রান্দতে উটেন ঘা'মি।
এক আগা (হাগা) তিন মুতা/ বেইল গেলগী পূবর পুতা,
পূবব পূতায় টাঙ্গীগব'/ বাইর' তা'কি সালাম কব॥'

মামাবাড়ি শিশুর আনন্দনিকেতন, বাঙালি সমাজে এ তথ্যটুকু সকলেরই জানা। পশ্চিমবঙ্গের বহু পবিচিত— 'তাই তাই তাই, মামাবাড়ি যাই'— কিংবা শ্রীহট্টের — 'তাই তাই তাই

মামুর বারিত্ যাই/ মামীয়ে দিল কেলা-মোলা/ দূয়াবত্ বইয়া খাই'— ছড়াতে পাই এর সাক্ষ্য। এই সঙ্গে মামীর সঙ্গে সম্পর্কটি যে মধুরতর এবং গূঢ়-ঠাট্টা সম্পৃক্ত এ তথ্যটি বোধহয় একমাত্র সিলেটি ছড়াতেই বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঠাট্টার সম্পর্কের মূল অনুসন্ধানে সমাজতত্ত্ববিদ্ বলেছেন ; '.....Formerly a marriage was allowed between the two, and now joking survives as an indication of that,' *(দ্র. Naik, T.B.— 'Joking Relationship'— Man in India, Vol-XXVII, 1947, P-262-263)*।

দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও ক্ষেত্রে এবং অনেক আদিম সমাজে এখনও প্রচলিত আছে এ ধরনের মিলন-রীতি।[১০] (এ প্রসঙ্গে দেবর শব্দটির ব্যুৎপত্তিটিও স্মরণ করা যেতে পারে। এর সমর্থন ঋক্‌বেদেও পাওয়া যাবে)। সমাজতাত্ত্বিকের সমর্থনে আরও একটি ছড়া উদ্ধার করা যেতে পারে, যেখানে মামী বলছে—

'বাইগ্‌নারে (ভাগিনারে) তুর মাগনা কথা/ সয়না আমার গায়,
তুর মামু গে'ছে পরবাসে/ আমার নউ-জৌবন অমনি জায়।।'

এ ছড়ার ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনায় কোনও আবরণই নেই। এখানে রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কটিও স্মরণ করা যায়। মামা-মামীর পর এবার মামুর শাশুড়িকে নিয়ে রসিকতা :

'মামুর হুরীর (< শাশুড়ির) হেংগা (< সাংগা = দ্বিতীয়বার বিয়ে)।
কুত্তায় বাজায় শিঙ্গা / বিলাইয়ে বাজায় বাঁশী।
আমরা দুইঅ বইনে / দুয়ারে বইয়া আসি (< হাসি)।।

মামুর শাশুড়ি সম্পর্কে ঠানদি, সুতরাং সেখানে ঠাট্টা-রসিকতা থাকতেই পারে। তবে পরবর্তী ছড়ায় সেই সঙ্গে একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

'মামুনি আরায় (আস্‌ছে) রে বো পুরব্ বন্দদিয়া!
তুমার হুরী মইবা রইছন্ দুয়ার বেন্দা দিয়া।
দুয়ার পর্‌ল খা'ল (-অ) / বাইগনা উটল চা'ল (-অ)
হা'ত বা'ইয়ে (= সাত ভাই-এ) টাইনা নিলা চিনাই গাঙ্গর (ঝিনুক নদী) পারত
চিনাইগাঙ্গ্ চিনাই গাঙ্গ্ অলঅলি ক'রে—
এ্যাক চিনাই রান্দে বা'রে, এ্যাক চিনাইয়ে খা'য়্—
এ্যাক চিনাইয়ে গুস্‌সা করি বাপ'র গর' জা'য়্।।'

ছড়াটি মাঝপথে গতি পরিবর্তন করে প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হয়েছে। লোকছড়ার শরীর নির্মিতিতে অকস্মাৎ এই প্রসঙ্গ পরিবর্তন বা এক ছড়ার সঙ্গে অপর একটি ছড়ার মিলন ঘটানো— এক সাধারণ বিশেষত্ব। এখানে মামুর শাশুড়ির প্রসঙ্গ থেকে তিন চিনাই বা ঝিনুক কন্যার কাহিনীতে উত্তরণে ধরা পড়েছে লোকছড়ার আপন বৈশিষ্ট্যটি।

রবীন্দ্রনাথ—'যমুনাবতী, সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে'— ছড়াটির উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন : 'ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ নাই সেকথা নিতান্তই পক্ষপাতী সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইবে। কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন : 'পূর্বোদ্ধৃত ছড়াটিতে সংলগ্নতা নাই, কিন্তু ছবি আছে।' উপর্যুক্ত ছড়াটিতেও অনুরূপভাবে সম্বন্ধহীন কতকগুলি চিত্র যেন ছড়ার ছন্দ-সুষমায় বাঁধা পড়েছে। আরও লক্ষণীয় ছড়াটির শেষাংশ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বহু পরিচিত একটি ছড়ার কথান্তর ঘটিয়ে এখানে এসে মিশেছে। সেই পরিচিত ছড়াটি :

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এল বান
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান
এক কন্যা রাগ করে বাপের বাড়ি যান॥'

ছড়াটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,— 'ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলতে পারি নাই।' সেই ছড়াটির সামান্য রূপবদল করেই চিনাই গাঙের তিন চিনাই কন্যারূপে উপস্থিত হয়েছে শ্রীহট্টের ছড়ার জগতে।

ছড়ায় এই 'তিন কন্যা দান' — প্রাচীন বাংলার সমাজ ইতিহাসের একটি চিত্রকে যেন তুলে ধরে। সিলেটি ছড়ার চিনাই বা ঝিনুক কন্যা আর শিবঠাকুরের বিয়ের পাত্রী তিন কন্যা — মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন সমাজে তিন কন্যাদানের রীতি। লোক-সংস্কৃতি প্রাচীন সমাজচিত্রকে এভাবে ধরে রাখে। এ সম্পর্কে লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ বলেনঃ 'Combined history and folklore can restore much of the picture of early times.' *(George Lawrence Gomme— 'Folklore as historical Science', London. 1908 CH-I P-22)*। আলোচ্য ছড়াটিতে তিন কন্যাদান সম্পর্কে ড. মুহম্মদ্ এনামুল হক বলেছেন : "১১শ শতাব্দীর রাজা গোপীচন্দ্র অদুনাকে বিবাহ করিয়া তাহার ভগ্নী পদুনাকে যৌতুক স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। শিবঠাকুরও পিতার এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে আরও দুই কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ লাভ করেন।' *(দ্র. মনীষা-মঞ্জুষা, ১ম খণ্ড। ঢাকা, ১৯৭৫)*। এনামুল হক সাহেবের মন্তব্যটির সঙ্গে সহমত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ছড়াটির ভাষাবন্ধে— যৌতুক নয়, তিন কন্যাদান অর্থাৎ বিবাহের কথাই স্পষ্টভাবে বলা আছে। 'চিনাই' কন্যাদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। গোপীচন্দ্র পদুনাকে যৌতুকস্বরূপ পেয়েছিলেন— এ উক্তিটিও স্বীকার্য নয়। গোপীচন্দ্রের গানে মা রানী ময়নামতী বলেছেন :

'আর কেহ নাই আমার এক গোপীচন্দ্র
পুত্রকে করাইব আমি এ তিন সম্বন্ধ॥'

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এখানে গোপীচন্দ্রের তিন কন্যাকেই বিবাহের উল্লেখ রয়েছে। যৌতুক নয়।

তিন কন্যা বিবাহে কিন্তু কন্যাদের মধ্যে নিত্য কলহেবই এক চিত্র ফুটে উঠেছে ছড়াগুলিতে। ভারতীয সমাজ তথা সমগ্র প্রাচ্য সমাজেই পুরুষের বহুবিবাহ ও তাব ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নারীব জীবনে একটি তিক্ততম সমস্যা — সতীন সমস্যা। সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণস্বরূপ। লোকসাহিত্য শিষ্টেতব সমাজেব অন্তরলোকে জন্মলাভ কবে স্মৃতিপথবাহী হয়ে কাল থেকে কালান্তবে প্রসারিত হয়ে চলে। জনমানসেব হৃদয-স্ফুবণের আগ্রহেই সৃষ্টি হয় লোকসাহিত্য। জনপদবাসীব অনাড়ম্বর আনন্দ-বেদনারঞ্জিত জীবনকথাই প্রকাশ পায় এই লোকসাহিত্যে। সপত্নী কলহের রূপটিও তাই সহজ কথায় ধবা পড়েছে লোকছড়াগুলিতে। সিলেটের একটি ছড়ায পাই— 'সইতনব ব'র জ্বালা/ জান কবে জ্বা'লা পা'লা অথবা— সইতনর ধুন্বা পু'যা/ আমাব ন'খিনি প'না।। (অর্থাৎ সতীনের একটি ছেলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আব আমার ন'টি সন্তানই অপুষ্ট)। আরেকটি ছড়া :

'আমরার বা'জাব (অ) লাল লাল গুযা
কি খেইল খেলাইলবে সইতনের পুয়া।।'

বাংলাব পশ্চিমপ্রান্তের ঝাডখণ্ডী উপভাষায় একটি ছড়াতেও দেখা যায়—

'আয় ল' সতীন/ বস-ল'সতীন/ খা-ল' সতীন পাখাল ভাত।
অদা ঘরে শুয়াই রাইখ্যে/ ধরাই দিব সান্নিপাত।।' (অর্থাৎ আয লো সতীন, বস লো সতীন, খা লো সতীন পান্তা ভাত। ভিজে ঘবে শুইয়ে বেখে ধবিয়ে দেব সান্নিপাত।।) সতীনকে কী আপ্যাযন!

যশোব খুলনার একটি ছড়াতে পাই—

'সতীন সতীন ফুলেব মালা/ সতীন হলি বড় জ্বালা,
সতীন গেল শাগ (শাক) তুলতি, / সাপে দে'ল পা—
সত্যপীরের সাপ হইস্তো, / সতীন ধবে খা।।'

(শিবপ্রসন্ন লাহিড়ি। য. খু ছড়া, বা-এ-ঢাকা)।

সতীনেব মৃত্যু কামনায় দৈবশক্তিব কৃপা প্রার্থনাতেও পরান্মুখ নয। সতীন সমস্যার উল্লেখ পাওয়া যাবে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে *(দ্র. কবিকঙ্কন চণ্ডী, কলি, বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৬৩)*। পাওয়া যাবে রাজা লক্ষ্মণ সেনেব কালের — 'আর্যাসপ্তসতী'তে *(দ্র. জাহ্নবীকুমাব চক্রবর্তী অনূদিত — আর্যাসপ্তসতী ও গৌড়বঙ্গ — ১৩৬৮! পৃ-১৫০, ২০৪, ২৪০)*। এই চিত্র পাওয়া যাবে ঋক্‌বেদে *(১০ মণ্ডল, ১৪৫ সুক্ত)*। যেমন :

'ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাম্।
যয়া সপত্নীং বাধতে যযা সংবিন্দতে পতিম্' ।। ১।।

অর্থাৎ 'এই যে তীব্র শক্তিযুক্ত লতা (ওষধি), এ আমি খনন করে তুলেছি, এ দ্বাবা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, লাভ করা যায় স্বামীব প্রণয।' ওষধির কাছে প্রার্থনা 'সপত্নীকে ধ্বংস

করে স্বামীর উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রাপ্তির প্রার্থনা'— আছে পরবর্তী শ্লোকগুলিতেও। সমাজের একটি প্রাচীনতম সমস্যা— এই সতীন সমস্যা।

লোকছড়ায় বাঙালি সমাজের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। সঙ্গে মিশে থাকবে ইতিহাসের টুকরো স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির টুকরো অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।' উদাহরণস্বরূপ বহু পরিচিত একটি ছড়ার উল্লেখ করা যায়। ছড়াটি:

'খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ালো/ বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে/ খাজ্‌না দেব কিসে।।'

ছড়াটিতে বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামার তিক্তস্মৃতি বিধৃত হয়েছে।[১১] ছড়াটি শ্রীহট্টে রূপ পেয়েছে—

'মণি গুমাইচে পড়া জুড়াইচে/ গোর্‌কি আইল দেশে,
গুলগুলিয়ে দা'ন খাইচে/ খাজনা দিবো কিসে।।'

এখানে লক্ষণীয়, বর্গীর পরিবর্তে এসেছে 'গোর্‌কি' অর্থাৎ প্রচণ্ড বন্যা (< আ. গোরকাই = সামুদ্রিক বন্যা), যার সঙ্গে ওই অঞ্চলের লোকেরা পরিচিত। বর্গীর সঙ্গে প্রত্যন্ত পূর্ববঙ্গের বস্তুত কোনও পরিচয়ই নেই। যেমন নেই বুলবুলি পাখির সঙ্গে পরিচয়। তার পরিবর্তে এসেছে গুলগুলিয়ে (< গুলগুইল্যা = খালি বা শূন্য) শব্দটি। অর্থাৎ সামুদ্রিক বন্যায় ধানের ক্ষেত শূন্য করে দিয়েছে। এভাবেই ছড়াতে কথান্তর ঘটে সমাজ পরিবেশকে নির্ভর ক'রে। গঙ্গাতীরের ছড়াটিতে রয়েছে ইতিহাসের টুকরো স্মৃতি কিন্তু মেঘনা সুরমা তীরে পরিবর্তিত হয়ে যে রূপ পেয়েছে সেখানেও রয়েছে ইতিহাসের আর পরিবেশের স্পর্শ।

ছেলের কান্না থামাতে মায়ের কাছে ছেলে আদরে শ্যাম-রূপ পেয়েছে একটি ছড়ায়।

'আমার সুনায় কান্দইন্‌না/ শামর গলা বাঙ্গইন্ না।
শাম গেলা নদীর কূল/ তুইল্যা আন্‌লা চম্পা পু'ল (ফুল)।
চম্পা পু'লর গ'রানে (ঘ্রাণে)/ দামান্দ্ (জামাই) আইলা আনন্দে।'

ছড়াটিতে আদরে ছেলে যেমন শ্যামে রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি পরবর্তী অংশে শ্যাম নদীকূল থেকে চাঁপা ফুল তুলে এনেছে, সেই ফুলের গন্ধেই আনন্দে চলে এসেছে জামাই। ছড়ার গতি সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী এখানে। পরবর্তী অংশ:

'খাও দামান্দ্ বাটার পান/ হুন্দরীরে (সুন্দরীকে) ক'রলাম দান।
মা'র আত' (হাতে) লকটেকা, / বাপ'র্ আত' শারী।
কইন্যার আত' দুতরা (ধুতরা) পাতা/ জাইতা কইন্যা জামাই বারি।।

জামাই-এর চাঁপাফুলের গন্ধে বাড়ি এসেই সুন্দরী কন্যা লাভ। ছেলের কান্না থামাতে যেয়ে এসে গেল কন্যাদানের প্রসঙ্গ। ছড়াটিতে প্রাসঙ্গিকতা ভঙ্গ হলেও আছে ছবির মালা। ছড়ার কায়া গঠনে অপ্রাসঙ্গিক বলে কিছুই থাকে না। সমাজের যৌতুকদানের চিত্রটিও বিধৃত এই অবসরে।

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক লক্ষ্য করেছেন — বিয়ের প্রসঙ্গ থাকলে জল, ফল, পান, সাপ, গাছ্ ইত্যাদি প্রতীক হিসাবে এসে থাকে, তবে তার কোনও একটি এককভাবে বা দু-তিনটি মিলিতভাবে আসতে পারে। এ কারণেই ছড়া চিত্রমালাব সমষ্টি হয়ে ওঠে। *(দ্র. 'বাঙলা ছড়ার ভূমিকা'* ১৯৭৯/ *পৃ-*১৪১)। আলোচ্য ছড়াটিতেও বিয়েব প্রসঙ্গ আসতেই এসে গেল ফুল, নদী (জল) পান প্রভৃতি বিয়ের নানা উপকবণ। ছড়ায় একাধিক চিত্র দেখে, ববীন্দ্রনাথ ঝাঁকবাঁধা পাখির সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে প্রতীকগুলি বুঝতে হবে, চিত্রমালার ব্যঞ্জনা বুঝতে হ'লে। লোকমানস প্রায়শই একটি ভাব প্রকাশ করতে অন্যান্যভাবেব সঙ্গে মিশিয়ে প্রকাশ করে। ফলে পাখিব ঝাঁকেব মতো একটির পর একটি চিত্র আসতে থাকে। যেমন :

'কাউলায় খেইল খেলায/ বাশব আগত্ বইযা
ডুপিলায় মঙ্গল কবে/ চিনা খে'ত (-অ) ব'ইয়া।
আজকুয়া (আজকে) ডুপির্ (ঘুঘুপাখিব) কেল্‌মেল্ (অধিবাস),
কা'লকু'য়া (কালকে) ডুপিব বিয়া।।
ডুপির মার' (-অ) নিত' আইচে/ বেলাইন তলা দিইয়া।
বেলাইনব্ পু'ল (ফুল) প'রেব/ ডেপা ডেপা অইয়া (রাশি রাশি হয়ে)'।।

ছড়াটিতে বিয়ের প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত প্রতীকী গুণেবও ইঙ্গিত বয়েছে। কবিত্বলক্ষণাক্রান্ত চিত্রমালাবও অভাব নেই ছড়াটিতে। ডুপি বা ঘুঘুর বিয়ে। কিন্তু নিতে এসেছে ডুপির মাকে! বাঁশের আগায় বসে কাকেরা আনন্দ করছে। চিনার ক্ষেতে বসে ঘুঘুরা মঙ্গল বা হুলুধ্বনি দিচ্ছে। ঘুঘুব আজ অধিবাস। কাল বিয়ে। রাশি রাশি বেলফুল পড়েছে পথে। ছড়াটির সঙ্গে গঙ্গাতীরেব একটি ছড়ার সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

'আজ দুর্গার অধিবাস/ কাল দুর্গাব বিয়ে
দুর্গাকে নিয়ে যাবে/ বেলতলা দিয়ে।।'

আরেকটি ছড়াতে প্রায় একই চিত্রের দেখা পাওয়া যায়। ছড়াটি :

'উড়উড়ি ঘুড়মুড়ি/ কদমতলা দিয়ে/ দামান আবায় চৌদল চড়ি/
আইজ ময়নাব বিয়া।।'
—একই সুরে পশ্চিমবাংলার—
'যমুনাবতী সরস্বতী/ কাল যমুনার বিয়ে/ যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি/ কাজিতলা দিয়ে।।'

বিয়ের সামাজিক প্রথাগুলি ধরা পড়েছে ছড়াগুলিতে।

বিয়ের প্রসঙ্গেই উপস্থিত হয় জামাই (দামান্দ্) প্রসঙ্গ নানাভাবে, জামাই আপ্যায়ন ও রসিকতা বিষয়ক ছড়া। যেমন :

'মেয়ের মাগো অরুণা/ হল্‌দি মরিচ বাড-ওনা (বাটোনা)।
দামান্ আইচে নদী কূ'ল/ ফুইট্যা রইচে চম্পা ফূ'ল।
চম্পা ফু'লর গ'ন্দে'/ দামান্ আইয়ে আনন্দে॥'

অথবা,

'এট্টা মুরগা করবার/ দামান্দ্ আইল জবা কর্
ও দামান্দ্ আগ' আইছন্ না/ গুছ্তর টেলাটেলি/ ডাইলে পুইল না॥'

অর্থাৎ মুরগি জবা করার আশা দিয়েও বলা হচ্ছে জামাই আগে আসেনি বলে মাংসের টানাটানি—'ডাইলে'ও কুলোচ্ছে না। পরবর্তী ছড়াতেও—

'ঝেংগা ফুল ফুট্ছে/ দামান্দ্ আইয়া উট্ছে।
কইন্যার মাইনি গ'র (অ) গো/ মুরগার টেংগ দ'রগো।
মুরগায় দিল ফা'ল/ আর্নি খাইলায় বরাতির পাল॥'

ঠিক সন্ধ্যা (ঝিঙ্গাফুল সন্ধ্যার প্রতীক) হতেই জামাই সদলে (বরযাত্রী/ বরাতি) উপস্থিত। কিন্তু মুরগি এক লাফে পালিয়ে গেল বলে 'বরাতির পাল'-এর নিশ্চিত উপবাস! এখানে 'পাল' শব্দটি লক্ষণীয়। 'বরাতিপাল' বলতে অনাদর বা বিরক্তিরই প্রকাশ।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বাংলায় জামাই সম্পর্কিত ছড়াগুলিতে লক্ষ করা যায় যে, জামাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কটি খুব হৃদ্যতাপূর্ণ নয়। 'একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ' পেয়েছে। *(দ্র. 'বাংলার লোকসাহিত্য'— ২য়, পৃ. ৪২৪/ ২৭)*। পরবর্তী ছড়াটিও এই উক্তিকে সমর্থন করে।—

'অ' যমুনা উঠ্ উঠ্ / তিনটা বাইগন কুট্।
জামাইয়র পা'ত (-অ) সূর্কা নাই/ চিরচিরাইয়া মুত্॥'

জামাইয়ের হতাদরতার চরম পর্যায়ের চিত্র এখানে। রবীন্দ্রনাথ সংকলিত একটি ছড়াতেও দেখি জামাইকে—

'ভাঙা ঘরে শুতে দিলাম, ইঁদুরে নিল কান।
কেঁদো না কেঁদো না জামাই গরু দিব দান॥' *(র.র. — ১৩/৭০৯)*

এ যেন 'জুতো মেরে গরু দান' প্রবাদটিরই রূপান্তর মাত্র। একটি সংস্কৃত ছড়া বা শ্লোকেও জামাই সমাদরের একটি করুণ চিত্র পাওয়া যায় :

'হবির্বিনা হরির্যাতি, বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নে পুণ্ডরীকাক্ষ প্রহারেণ ধনঞ্জয়॥'

যার শেষাংশটি একটি প্রবাদে পবিণত হযেছে, (প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ)[২২]। জামাই এবং জামাইবাড়ি সম্পর্কে এ সব তিক্ততাব আতঙ্কে অসহায়া মায়ের বেদনার চিত্রটিও কম করুণ নয়। অথচ মেয়েব বিয়ে না হলে মা বাবাব দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। মেয়ে যেন বোঝা হয়ে ওঠে; যতো ভালোই সে মেয়ে হোক না কেন:

'উমা বা'লা ফু'লব ডালা/ ক'লসী বরা ঘি'।
মায় কইন্ জ্বা'লা জ্বা'লা/ বাপে কইন্ বেইচ্যা ফা'লা
নানায় ক'ইন আমার উমাই বা'লা।।'

একমাত্র দাদুর কাছেই নাতনী অনাদবেব নয়। কিন্তু সত্যিকারেব বিদায় বা বিয়ের আগে মায়েব দুঃখ নতুনরূপে এসে উপস্থিত হয়। 'পরানোর সার' মেয়েকে কি পবের ঘরে পাঠানো সহজ মায়ের পক্ষে! তাই তো ছড়াতে পাই:

'ঝিয়াইর বিয়া আইতোরে/ মায়ে কান্দেন করৈন রে,
কেমনে ঝিয়াই দিতাম্ রে।
ঝিয়াই আমাব পরানোব সাব/ কেমনে করতাম গ'বব্ বা'ব।।'

কিন্তু বাব তো কবতেই হবে। পবেব ঘরে মেয়ে পাঠাতেই হয বিযে দিযে। এব কি কোনও সান্ত্বনা আছে! প্রতিবেশিনীরা তাই এসে বলেন:

'থা'ক্ থা'ক্ কইন্যার মাইগো/ পা'টা বুকুত্ দিযা,
তুমার পুরী লইয়া যা'ইতো/ পবার মাইন্সে আইয়া।।'

বুকে পাথর চাপা দিয়ে ব্যথাকে চেপে বাখতে হবে। বালিকা বধূরও শ্বশুব ঘরে যেতে অনীহা। ঝাড়খণ্ডী অঞ্চলেব মেয়ে বলে:

'মাথা বাঁধে দেগো মাসী/ সিন্দুর পরাই দে
শ্বশুর ঘরের খাল ভবারা / লেগ্তে (নিয়ে যেতে) এযেছে।।'

শ্রীহট্টের মেয়ে আরও বিরূপ। সে বাঙাল (অমার্জিত?) শ্বশুরবাডি যেতেই নাবাজ। বলে, 'বিয়াল বিয়াল দুইপর/ না যাইতাম হউর গ'র / হউর-বেটা বাঙ্গাল।।' বাঙ্গাল কুটুমেব প্রতি মেয়ের মাও বিরূপ। বলেন: 'আগে যদি জানতাম/ বিয়াই না দিত্তাম্। / ঝিয়াইব হউর বাঙ্গাল।/ নিজর আ'ত' (হাতে) বা'র আল (হাল)/ ধান কড়িতে তার থুক্/ মানবে না দেখাইল্ যায মুখ'।।' মেয়ের শ্বশুব আপন হাতে হাল বয়, জানলে সে ঘরে মেয়ে দিতামই না। লোকের কাছ্ মুখ দেখানো যায় না। গঙ্গাতীরের একটি ছড়ায় কিন্তু বিপবীত দৃশ্যই দেখি।— 'খুকুমণির বিয়ে দেব হটুমালার দেশে, তারা গাই বলদে চষে। / তারা হীরেয় দাঁত ঘষে। / রুই মাছ্ পালঙ শাক ভাবে ভারে আসে/ খুকুর মা তাই নিযে পেছন ফিবে বসে।।' — খুকুমণির শ্বশুরবাড়ি থেকে সবজি, মাছ্ প্রভৃতি ভারে ভাবে আসে। মা খুব খুশি।

আর একটি ছড়ায় দেখি— শ্রীহট্টের এক মা দেখে-শুনে সচ্ছল ঘবে মেয়ে বিয়ে দিয়েও কপালদোষে অল্পদিনেই মেয়ে নিঃসম্বল হযে পড়ে। কথায় বলে— 'নিযতি কেন বাধ্যতে!' তাই মা বলেন;—

'— ঝি নি গো মাই/ তোমার কপাল' দুক্কে ভরা।
আমি কি করমু কও চাই/ ভালা চাইয়া দিলাম বিয়া/ গায় গিরোছ্থি দেখি,
তিন বছরর মাঝে/ কুইরা গেলদি কেমন দি
পাশংপীড়ি দেখি দিলাম/ অখন নাই চাচর্ খেক্ড়া,
সুখর কপাল দুক্কর আয়/ বরাত হইলে তেড়া।।'

বালিকা কন্যার কপালে বৃদ্ধ বর আর একটি কলঙ্কচিহ্ন সমাজের বুকে। সুরমা তীরের মেয়ে সখেদে বলে :

'বুরা ব'র নিত' আইচে ডুলে বাড়ি দিয়া,
তার তনে মরতাম আমি গলত্ দরি দিয়া।।'

বৃদ্ধ বরের ঘর করা অপেক্ষা গলায় দড়ি দিয়ে মরাও ভাল। প্রত্যন্ত পশ্চিমবাংলার ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের মেয়েও বলে—

'মায়ে বাপে বিহা দিল/ ঠেঙ্গাধরা বরকে
আর যাব নাই শ্বশুর ঘরকে।।'

বাংলার দুই প্রত্যন্তের দুই মেয়েই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে একই সুরে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবার দুর্বল কৈফিয়ৎ হিসাবে সুকুমার সেন একটি ছড়া ধরেছেন তাঁর 'বিচিত্র সাহিত্য' গ্রন্থে :

'তালগাছ কাটন, বেসর বাটন / গৌরী হেন ঝি
তোর কপালে বুড়া বর/ তা' করব আমি কি ?'

—এ শুষ্ক কৈফিয়তে কি মেয়ের মন ভরে? এই শিশু বা বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের আর এক দুঃখজনক প্রথা।

এই অসমবয়সী বিয়ে সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন : '..... এ দেশে কুলীনের গৃহে কন্যাদান করা যে সামাজিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত, তাহারই সূত্র ধরিয়া বর ও কন্যার মধ্যে..... অসমতা অপরিহার্য হইয়া উঠিত।..... ইহার ফলে বালিকা কন্যাকে বৃদ্ধ বরের নিকট সমর্পণ করিতে হইত।' *(দ্র. 'বাংলার লোকসাহিত্য'— ২য়, পৃ. ৪৩৯)*। কিন্তু কৌলিন্য প্রথাকে এই অসম-বয়স-বিয়ের সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক হবে না বলেই আমরা মনে করি। এ প্রথা উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজেই ছিল সীমাবদ্ধ। এবং কৌলীন্য প্রথা আনুমানিক ১২শ শতকের আগে ছিল না। কিন্তু খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেও শিশু বিবাহ তথা অসম বিবাহের প্রচলন ছিল— তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বৌদ্ধ শাস্ত্র 'মিলিন্দ পঞহো' গ্রন্থে। 'অস্তিত্ব প্রবাহ'-এর উদাহরণ দিতে ভদন্ত নাগ সেন একটি উপাখ্যান বলেন রাজা মিলিন্দকে। সেখানে আছে— একটি ক্ষুদ্র শিশু বালিকাকে বরণ করে বিবাহ-শুল্ক দিয়ে একটি লোক বিদেশে গেল।'— উপাখ্যানটি নিশ্চয়ই সমকালীন সমাজ পরিবেশ থেকে গৃহীত। এর থেকে তৎকালীন দুটি সামাজিক তথ্য আমরা পেতে পারি। প্রথমটি— প্রায় দু হাজার বছর আগেও প্রচলিত ছিল অসমবয়সী (অর্থাৎ শিশুকন্যা এবং বয়স্ক পাত্র) বিবাহ। অপরটি সমাজে প্রচলিত ছিল কন্যাপণ। পঞ্চাশ বছর আগেও ব্রাহ্মণেতর সমাজে প্রচলন ছিল কন্যাপণ। এ পণ নির্ধারিত হত সাধারণত কন্যার

বয়সের অনুপাতে। শিশুকন্যা বরণ বা বিবাহের এটাই ছিল মুখ্য কাবণ, ড. ভট্টাচার্যকথিত কৌলীন্য প্রথা নয়।— কন্যাপণের দৃষ্টান্ত পরবর্তী ছড়াটিতেও বয়েছে।

বিয়ের পর কন্যা বিদায়ের কালে স্নেহাকাতর মা বাবা কাঁদছে— আর ক্ষুব্ধ মেয়ে বলছে:

“এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদনাতলায় বসে—
এখন কেন কান্দ বাবা গামছা মুখে দিয়ে!’ *(র. ব. — ১৩/৭০৮)*।

শ্রীহট্টের ছড়াটিতেও কন্যাপণের সাক্ষ্য পাই:

‘খাও দামান্দ্ বাটাব পা’ন্/ সুন্দরীরে কবলাম দান্।
মা’র আত (-অ) লক্ক টে’কা/ বাপ’র আত (-অ) শাড়ী,
কইন্যার আত’ (-অ) দুত্‌রা পা’তা/ জাইতা জামাই্ বাড়ি বাড়ী॥’

কন্যাদান করে মা-বাবা লক্ষ টাকা, শাড়ি প্রভৃতি পেলেন বলেই মনে হয়।

এর পরেও আছে শাশুড়ি-বৌয়ের নিত্য কলহ্। অবশ্য শ্রীহট্টেব কন্যাও কম নয়। একটি ছড়ায় তারই চিত্র পাওয়া যায়। শাশুড়ি বৌয়ের কলহ-চিত্র:

‘হুরি-বউয়ে কেবেংকাল (কেলেঙ্কাবী)/ ম’ঝ’ পড়েন বড় জা’ল।

কইন্ ইতা করছ্ কি?/ মা তা-কি কমনি?.....
মিন্‌কারী মাতৈন্ কতা (কথা)/ হুনছনানি তুমি ইতা-—
মান-পরমান বুজ’না/ উবে কেনো মরো না॥’

বড় জা’-এর মধ্যস্থতায় শাশুড়ি বধূব কলহ্ সাময়িক শান্ত হলেও মেঘনা তীরের বধূব অন্তরের বেদনার কি উপশম হয়! প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে বাপের বাড়ির জন্য! তাবই্ একটি চিত্র:
কে’জাওরে ম্যাগ্‌না গাংগ দিয়া / লাল চইব বাইয়া, নীল চইর বাইয়া/ আমার-মামুরে কইঅ গিয়া—/ নাইঅব নিত’ অইয়া। তা’ক্ তা’ক্ বাগিনী গো/ কিল-মুবা খাইয়া, / আষাঢ মাস’ (-অ) নিমু নাইঅর/ পানসী নাও বাইয়া।

‘নদীর ঘাটে মামাবাড়ির দেশের মাঝিকে নৌকা বেয়ে যেতে দেখেই্ মামুর স্নেহেব ভাগিনী সেই মাঝি মারফৎ-ই আবেদন পাঠায় মামুর কাছে— তাকে নাইঅর (বাপেব বাড়ি) নিয়ে যেতে। মামা হয়তো আসেন কিন্তু অনুমতি মেলে না। মামু অগত্যা সান্ত্বনা দিযে যান— ভাগ্‌নীগো কিল-ঝাটা সহ্য কবে ক’টা মাস কাটিযে দাও। আষাঢ় মাসে পানসী নৌকা কবে তোমাকে নিয়ে যাবো।

গঙ্গাতীরের একটি ছড়াতেও বিধুরা কন্যার একই্ চিত্র পাই।

‘এ পারেতে কালো রঙ/ বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম্/ এ পারেতে লঙ্কা গাছটি
রাঙা টুক্‌টুক্ করে/ গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে॥’

বোনের বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসেব—‘মেঘালোকে ভবতি

সুখিনোপ্যনাথাবৃত্তিচেতঃ —এর তুলনা করে বলেছেন— 'কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কান্দিয়া উঠিযাছে।'

দুটি ক্ষেত্রেই বেদনার সেই একই চিত্র। এখানে গুণবতী ভাই এসে বলেছে : 'এ মাসটা থাক দিদি কেঁদে কঁকিয়ে/ ও মাসেতে নিয়ে যাবো পাল্কী সাজিয়ে।' নদীবহুল পূর্ববঙ্গের যান পান্‌সী আর পশ্চিমবঙ্গে পাল্কী। কিন্তু উভয়েই বেদনার সেই একই বুকফাটা ক্রন্দনের চিত্র। এ বেদনা চিরন্তন। এ বহমানতা লোকসাহিত্যের এক বিশেষ লক্ষণ। এই চিত্র কাহিনী— 'Originated anonymously among unlettered folk in times past and which remained in currency for a considerable time, as a rule for centuries.'

'জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলিতেছে— সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতোরের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা-দামের মোটরি নির্মাণ হইতেছে— তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠনকার্যও চলিতেছে।' *(র. র. — ১৩/১৭৬)*। এই সাহিত্যই লোকসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি থেকেই প্রকাশিত হয়ে ওঠে যে, জনপদের অর্থনীতি এবং সাহিত্য পরস্পরে সম্পৃক্ত। গ্রামসমাজের অর্থনৈতিক আনন্দ বেদনার চিত্রটিও ধরা পড়ে লোকসাহিত্যে। শ্রীহট্টের কৃষিজীবী গ্রামবাসীর ঘরে অতিথি বা আত্মীয়-স্বজন আসলে দরিদ্র গৃহস্থের বিব্রত অবস্থার একটি করুণচিত্র ধরা পড়েছে শ্রীহট্টের একটি ছড়ায় :

'ও তালই কুবায় (কোথায়) যাও
এখান্‌ ক'থা হুনি (শুনে) যাও।
আমি আইলাম তুমার বারি॥
আইচো পুত্‌বা (জামাই এর ভাই) খাইতায় কিতা?
বরুয়ার ভা'ত কর্‌লা তিতা
বরুয়ার ভা'ত যেমন বাব্‌
আনা ছালনে (বিনা তরকারিতে) পালি তিন কাব॥'

বাংলার অপরপ্রান্তে ঝাড়খণ্ডী সমাজেও একই সমস্যা দেখতে পাই একটি ছড়াতে :

'ধুবের কুটুম আইল/ ঘরে নাই কিছু খাতে দিব কি?
আওয়া চাল মাড় কুটুম, জাইড় শাগ বেসাতি
সেই খায়া বধূ-কুটুম রহিতে হবেক॥'

শুধু এ কালেই নয়— হাজার বছর আগেকার চর্যাগীতিতেও দেখতে পাওয়া যাবে একই সমস্যা। ঢেণ্ডণ পাদ-এর একটি পদেও (৩৩), পাওয়া যায় একটি চিত্র :

'টালতে মোর ঘর নাহি পরবেষী।
হাড়ীত্‌ ভাত নাহি নিতি আবেশী॥'

—হাড়িতে ভাত নেই, নিত্যই অতিথির আগমন— গৃহস্থকে বিব্রত করে। গ্রাম সমাজের এই চিত্র বাংলার সকল প্রান্তে একই।

বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শ্রেণীচিত্রটিও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে লোকছড়ায়। যেমন রবীন্দ্রনাথ ধৃত একটি ছড়ায় :

'খোকা যাবে নায়/ লাল জুতুয়া পায়,
পাঁচশো টাকার মলমলি থান/ সোনার চাদর গায়॥'

— খোকার পোশাকেব এই আতিশয্যের পাশাপাশি শ্রীহট্টেব ছড়ায়— 'বাপেব পিন্নো উবা লেমটি/ পুয়ার পিন্নো ইজাব।' — যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সমাজের বৈষম্যের তিক্ত, তীব্র চিত্রটি। বাপের এক টুকবো নেংটি (জঘনাংশুক), ছেলের পবণে তবু একটি ইজের জুটেছে। লাল জুতো, মলমলি থানা বা সোনার কাজ করা চাদরের নামও হয়তো এ সমাজে অজানা।

অনেকের ধাবণা বাংলা লোকছড়ায় সাধারণত খোকন সোনাদেরই প্রাধান্য, খুকুমণিরা উপেক্ষিত। এ ধাবণা যথার্থ নয়, অন্তত শ্রীহট্টের লোকছড়ায় তো নয়ই। যেমন :

'অরুণা নারে নারে?/ মেঘনা গাঙ্গর পারে/ ইচা-বেচা মাবে!
অরুণা কইর‍্যা ডাক দিলে/ উইরা আইয়া পবে॥'

—এ অরুণা নিশ্চয়ই খুকুমণি। প্রায় একই ছড়া উত্তব বা পশ্চিমবঙ্গে :

'খোকা গেল মাছ ধবিতে / ক্ষীব নদীর কূলে,....
খোকা বলে পাখিটি কোন বিলে চবে/ খোকন বলে ডাক দিলে
উড়ে এসে পড়ে॥'

ঝাড়খণ্ডী অঞ্চলেও :

'আমার যাদু কইসে/ মাছ ধরিতে যাইছে ;
মাছের মুহে আগুন লাগুক/ কত'কাদা হইছে॥'

তিন অঞ্চলের তিনটি ছড়াতেই খোকা বা খুকুব মাছ ধরতে যাবার একটি স্নেহস্নিগ্ধ কল্পচিত্র। কিন্তু খুকুমণি শুধুমাত্র স্থান পেয়েছে শ্রীহট্টের ছড়াটিতেই, অন্যত্র খোকা বা যাদুমণি। পূর্ব ময়মনসিঙেব একটি ছড়াতেও দেখি—

'আবু নাবে নারে/ ধনু গাঙ্গেব পারে,
আবু করিয়া ডাক দিলে/ উইরা আইয়া পরে॥'

—সবক্ষেত্রেই কিন্তু সোনামণিদের মাছ ধবতে যাবাব চিত্র। সে ক্ষীবনদী হোক, মেঘনা পারই হোক বা ধনুগাঙ্গই হোক— নদীমাতৃক বাঙালি সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীব চিন্তা-চেতনাব ছাপ কিন্তু ফুটেছে ছড়াগুলিতে।

বাংলার লোকছড়ায় বাঙালির জীবনচর্যা আব সমাজ প্রতিবেশের চিত্র অঙ্কিত হওয়া যেমন অনিবার্য, তেমনই অনিবার্য পুরুষাগত বহমান সমাজের অতীত জীবন-প্রবাহেব কিছু পলিরেণু সেখানে মিলেমিশে থাকা। পল লাফার্গ লোককথার ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁব 'Sketches of the History of Primitive Culture' বইতে। তিনি সেখানে

লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতিকে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রেক্ষণীতে অনুধাবনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিশেষভাবে। শ্রীহট্টের লোকসাহিত্যে ছড়ায় এই স্বল্পাবসর আলোচনাতেও মুখ্যত সেই দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

শ্রীহট্ট অর্থাৎ সুরমা-বরাক উপত্যকার কয়েকটি মাত্র লোকছড়ায় পাশাপাশি বাংলার অন্য অঞ্চলের লোকছড়াকে উপস্থাপন করে যে আন্তর মিল দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে— তা 'Wondering of Tales' বা 'Borrowing of Tales'-- তত্ত্বের ব্যাপার নয়। এখানে এই সহজ সত্যটিই প্রকাশ করতে চেষ্টা হয়েছে যে প্রকৃতির ভূগোলের তুলনায় লোকছড়ায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভূগোল ঐকতানের ভাবটি অধিকতর স্পষ্ট, আঞ্চলিক বা উপভাষার বাধা সেখানে এমন কিছু দূরত্যয় নয়।

টীকা :—

১। ক্ষুদ্র নদীকে যে ছড়া বলা হয় তার সাক্ষ্য এই ছড়াটিতেও পাওয়া যাবে :

আতুজান ছৈদপুর/ তাত্তো থুড়া দূর।
গাং নায় ছড়া, / নও বাওয়ার দাড়া
দাড়ার ধারো বটর গাছ / জালদি ধরের মাছ! (দ্র. বদিউজ্জমান— ১২১/২)

২। শিলখ : ড মুহম্মদ শহীদুল্লা সম্পাদিত 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' পৃ. ৪৭৪/৭৫। শব্দটি সেখানে এভাবে দেখানো আছে, শিলখ্ = [সি] বি শ্লোক, প্রবাদবাক্য, ছড়া <(শ্লোক)

৩। শিলখ : 'হলদির চক্‌মক্ দুধের বর্ণ/ এই শিলুক যে না ভাঙ্গাইতে পারে
তার মাউগের (স্ত্রী) পেড' (পেটে) জন্ম।' = (ডিমের কুসুম)
(২) উপরে কামসিন্দুর ভিতর ছাই/ এই শিলুক যে না ভাঙ্গায়/ তার বাপ দা-ই।
= (মাকাল ফল) (দ্র. পূ. ময়মনসিং পৃ.-৬৭/২২, ২৩) [এখানে 'শিলুক' ধাঁধা অর্থে ব্যবহৃত]।

৪। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া' (১৩০৬ প্রথম সং। ১৬ সংখ্যা ৪৩১)। এ ছড়ার আর একটি পঙ্‌ক্তিও পাওয়া যায় : 'পানটি খেলে আরো মজা।'

৫। ইংরেজি ভাষার জন্মকাল : 'Historians of the English Language distinguish three main stages in its development. The first in the 'Old English' (or the Anglo-Saxon) period extending from about the year AD 600 to 1100. This is followed by the Middle English period, from 1100 to 1500. and finally there is the period of Modern English from 1500 onwards (Frederck T. Wood. An Outline History of the English Language, Lodon, 1969 p-21)।

৬। Limerick metrical frivolity of rimes of verse of which the first second and fifth rhyme, with an intermediate distich (Bozman, B I (ed) Everymans' Encyclopaedia Vol 7 1967 p-587)

৭। উপভাষা: 'A specific form of a given language spoken in a certain locality of geographic area showing sufficient difference from the standard or literary from of that language as to pronounciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language (A Dictionary of Linguistics London, Peer Owen, 1970 P-55)।

৮। রূপান্তরটি: আমরার আবু শু'মাযরে/ খাল বাহাদুরের ছা'য
আম কাডল পাইক্যা রইচে'/ ডাল' রইয়া খা'য।
ন গেল বা'ইঙ্গা/ তেলি বাড়িত যাও/ তেলিয়ে নিল তেল কাড়ানি
মাইল্যে দিল ফু'ল/ উন্দুর বাজার বিযার কাল'/ চিকায বাজায ঢু'ল।
চিকা আইযে চিরাচিকাইযা/ সিলট্যা বামুন আইযে
সারিন্দা বাজাইযা।' (পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের)।

৯। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের একটি রূপান্তর:
'মামীর মাথায় সরু সিঁথা
মামুর মাথায় পাগা
হেই মামী তুমি রেন্দু না
মামু তুমার বাপ।'

১০। 'মাদ্রাজে তামিলদের মধ্যে, এমনকি তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মাতুলের সঙ্গে ভাগিনেয়ীর বিবাহ হয়।' রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'মানব সমাজ' (অনু. সুবোধ চৌধুরী, ১৩৫২। পৃ. ৩৮)। আরও শুক্রনীতিতে উদ্ধৃত বৃহস্পতির উক্তিতে আছে: পূর্বে গো ভোজনম্। মধ্যদেশে শিল্পা কর্মকার চ গবাশ্চিন। দক্ষিণে মাতুলকন্যা বিবাহ, উত্তরে ব্যাভিচারিণ্য স্ত্রীলোক মদ্যপ। এগুলি কিন্তু মাতুলানী ভাগিনেয় মিলন সম্পর্ক বুঝায় না'। যেমন 'দেবর' সম্পর্কে বুঝায়।

১১। মারাঠা সৈন্যদেরকেই বর্গী বলা হত বাংলায় (মারাঠী বর্গীর ~ বর্গী)। অতি অল্প বেতনের নিম্নমানের সৈন্যদেরই বলা হত 'বর্গীর'। এদের ছিল লুণ্ঠনের অবাধ অধিকার (দ্র. সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, 'বর্গী এল দেশে'; বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' মাঘ চৈত্র, ১৩৮৮। কলকাতা, পৃ. ৩৪৩)।

১২। জামাইয়ের সঙ্গে তিক্ততার সম্পর্কটাই সব নয়। নতুন জামাইকে ঠকানোর ছড়াগুলিতে যে প্রফুল্ল রঙ্গ-কৌতুকের স্বাদ পাওয়া যায় সেখানে অনাবিল আনন্দদায়ী বলে গ্রহণ করাই সমীচীন। যেমন : প্রশ্ন—

‘পিড়ির নাই আগাগুড়ি/ পিড়ির নাই বাও
পিড়ির উপরে গুরুর চরণ/ কেমনে তুলাইবাইন পাও।

বুদ্ধিমান জামাই উত্তর দেবে।

‘পিড়ির আছে আগাগুড়ি/ পিড়ির আছে বাও।
গুরুর চরণ শিরে রাইখ্যা/ পিড়ত তুললাম পাও॥

সেকালের লৌকিক ভাষার সাহিত্য সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত ছিল। সেই সূত্রে বিবাহের অনুষ্ঠানে বিনোদনরূপে স্ত্রী-আচারের স্থান সমস্যাপূরণ পেয়েছিল। আর বুদ্ধির লড়াই হিসাবে বরযাত্রী ঠকানো হেঁয়ালিতে পর্যবসিত হয়েছিল। এ ধরনের কয়েকটি হেঁয়ালি ষোড়শ শতাব্দীর কোন কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। (সুকুমার সেন। ‘কবির লড়াই’। বিচিত্র নিবন্ধ, ১৯৬১। পৃ. ১৭৪)। এর ধারা শ্রীহট্টের এবং পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরার নিকটবর্তী অঞ্চলে বরাক উপত্যকার লোকজীবনে আজও বহমান। সুতরাং জামাই সম্পর্কিত আত্মীয়জনের সঙ্গে শুধু বিদ্বিষ্ট ও তিক্ত সম্পর্কই ছিল, এ ধারণা সঠিক নয়।

গ্রন্থপঞ্জী :

[সহায়ক গ্রন্থগুলির উল্লেখ যথাসম্ভব যথাস্থানে প্রাসঙ্গিকভাবেই করা হয়েছে। সেগুলি এখানে পুনরুল্লেখ করা হয়নি। তদরিক্ত গ্রন্থগুলি এখানে উল্লেখ করা হল।]

১। ঋক্‌বেদ সংহিতা : হরফ প্রকাশনী। কলকাতা।
২। ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি : ড. সৈয়দ মোহম্মদ সাহেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। বাঙলা ছড়ার ভূমিকা : ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক।
৪। ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা : ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা। কলকাতা।
৫। মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি : সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। ১৯৮৬ কলকাতা।
৬। র. র. (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ। ১৩শ খণ্ড-১৩৬৮)
৭। লোকসাহিত্য— ১ম আশরাফ সিদ্দিকী। ঢাকা।
৮। লোক ভাষা এ সংস্কৃতি : ড. পবিত্র সরকার। ১৯৯১, কলকাতা।
৯। লোকসাহিত্য— ১২ : সম্পা. বদিউজ্জমান (বা. আ.) ঢাকা।
১০। সিলেটি ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী। (বা. আ.) ঢাকা।
১১। On Literature : M. Gorky, Progress Pub. Moscow.
১২। Russian Folklore : Y.M. Sokolor. (ঐ)।
১৩। The Golden Bough : James G Frazer (Abridged ed Macmillan & Co. London, 1960)

সিলেটি উপভাষা : ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

জন্মজিৎ রায়

১

ভারতীয় আর্যভাষাগুচ্ছের নব্যস্তরের অন্যতম প্রধান ভাষা হচ্ছে বাংলা। হোর্নলিকে (Hoernle) অনুসরণ করে জর্জ অ্যাব্রাহাম গ্রিয়ার্সন বাংলা ভাষাকে Outer Indo-Aryan Language-রূপে চিহ্নিত করেছেন। চর্যাগীতিকোষ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত আমরা বাংলা পদ্যভাষার বিবর্তনের ধারা ও রূপবৈচিত্র্য লক্ষ করতে পারি। কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগে বাংলা গদ্যসাহিত্য গড়ে না ওঠার ফলে মধ্যযুগে অঞ্চলভেদে বাংলা কথ্য গদ্যভাষার রূপ কী ছিল, তার নির্ভরযোগ্য লিখিত নিদর্শন আমরা পাই না। মধ্যযুগে নবদ্বীপ এবং আধুনিক যুগে কলকাতা বাঙালি জাতির সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চা ও সারস্বত সাধনার প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করার ফলে ভাগীরথী তীরের বাংলা ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা (Standard Colloquial Bengali) রূপে সাহিত্যের মাধ্যম এবং শিষ্টসমাজে যোগাযোগের ভাষারূপে গৃহীত হয়। মধ্যযুগে, অর্থাৎ অবিভক্ত বৃহৎ বঙ্গের যুগে, 'বঙ্গদেশ' বলতে বর্তমান বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আসামের করিমগঞ্জ জেলাকে বুঝাত। পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় ছিল রাঢ় ও সুহ্মদেশ, অথবা, বরেন্দ্রভূমির সঙ্গে একযোগে, 'গৌড়দেশ'। উত্তরবঙ্গকে একযোগে 'গৌড় বঙ্গ' বলা হত। মধুসূদন পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গকে বুঝাতে 'রাঢ় বঙ্গ' ব্যবহার করেছেন। ('অলীক কুনাট্য রঙ্গে / মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে / নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।') আবার বাঙালি জাতি অর্থে 'গৌড়জন' শব্দও তিনি ব্যবহার করেছেন। ('গৌড়জন যাহে / আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।') রাজা রামমোহন রায় তাঁর বাংলা ব্যাকরণের নামকরণ করেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। বৃন্দাবন দাসের উক্তির প্রামাণিকতা মেনে নিলে বলতে হয়, 'চৈতন্যভাগবত' রচনাকালে নবদ্বীপ অঞ্চলের কথা বাংলা ভাষার সঙ্গে বঙ্গদেশ এবং বিশেষ করে শ্রীহট্টের আঞ্চলিক বাংলা ভাষার পার্থক্য ছিল। তাই বঙ্গদেশ ভ্রমণের পর দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিত বাঙ্গালের, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গবাসীর বাক্যরীতি নিয়ে হাস্য পরিহাস করেন। তাছাড়া, শ্রীহট্টিয়াদের ভাষা নিয়েও তিনি রসিকতা করেন।

১. বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥ (চৈতন্যভাগবত, আদি/১২/১৬২)

২. বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া॥ (চৈতন্যভাগবত, আদি/১৩/১৮)

গ্রন্থভুক্ত সাক্ষ্য মেনে নিয়ে বলতে পারা যায় যে, মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালেই বৃহৎ বঙ্গের শাসনকেন্দ্র বা সারস্বতকেন্দ্রে শিষ্টজনের ব্যবহার্য বাংলা ভাষার সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক বাংলা ভাষার পার্থক্য লক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। 'স'-ধ্বনির 'হ'-কার প্রবণতাই ছিল সম্ভবত তৎকালীন বঙ্গদেশের বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভাষা হচ্ছে একটি জাতি বা ভাষাগোষ্ঠীর ভাব ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বা আদানপ্রদানের জন্য উচ্চারিত এবং লেখ্য প্রতীকের দ্বারা প্রকাশিত সুবিন্যস্ত ধ্বনিগুচ্ছ। একটি ভাষা সম্প্রদায় বা জাতির শিক্ষাকেন্দ্রে বা শাসনকেন্দ্রে শিষ্টজনের ব্যবহৃত ভাষাই তার সাহিত্যের মাধ্যম এবং পারস্পরিক যোগাযোগের জনমান্য মাধ্যমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। লেখ্য বাংলার গদ্যভাষার দুটি রূপই বর্তমানে সাহিত্যে ও চিঠিপত্র ইত্যাদিতে প্রচলিত। একটি 'সাধু' এবং অপরটি 'চলিত'। একটি ভাষাগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ বা প্রদেশের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে শিষ্টজনের ব্যবহার্য ভাষা ছাড়াও ভাষার আঞ্চলিক রূপবৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে 'উপভাষা' (Dialect) বলা হয়। উপভাষাগুলির পারস্পরিক ধ্বনিগত, রূপগত বা অন্যবিধ পার্থক্যের কারণস্বরূপ জাতিগত সংমিশ্রণ ও ভৌগোলিক প্রভাবের কথা বলা হয়। ভাষার সঙ্গে উপভাষার সম্পর্কের কথাও প্রসঙ্গত এসে পড়ে। একটি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি উপভাষার মধ্যে সাধারণত একটি উপভাষাই প্রাধান্য লাভ করে অঞ্চল নির্বিশেষে শিষ্টসমাজে যোগাযোগের ভাষারূপে গৃহীত হয় এবং সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। একটি ভাষাগোষ্ঠীর শিক্ষাকেন্দ্র বা প্রশাসনিক কেন্দ্র যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত, সেই অঞ্চলের ভাষাই সাধারণত এ-জাতীয় প্রাধান্য লাভ করে। যেমন, মধ্যযুগে নবদ্বীপ ছিল বাঙালির সারস্বত কেন্দ্র। আর আধুনিক যুগে রাজধানী-শহর কলকাতা বাঙালির শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। তাই এই অঞ্চলের ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইংরাজি ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায়, খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে চতুর্থ হেনরির রাজত্বকাল থেকে ইংল্যান্ডের পূর্ব মিডল্যান্ড উপভাষাই (East Midland dialect) শিষ্টজনের ব্যবহার্য এবং সাহিত্যে ব্যবহৃত আদর্শ (standard) ইংরাজি ভাষারূপে গণ্য হয়। কেননা, উক্ত উপভাষা যে অঞ্চলে কথিত হত, সে অঞ্চলে অবস্থিত ছিল ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। ইংল্যান্ডের সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক ও প্রশাসনিক জীবনে সে অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও সে অঞ্চলের থেকে খুব একটা দূরবর্তী নয়। তাছাড়া, লন্ডনের কথ্যভাষাও পূর্ব মিডল্যান্ড উপভাষার আধারেই গড়ে ওঠে।

অনেক সময় শিষ্টজনের ব্যবহার্য ভাষার আদর্শ (standard) বা সাহিত্যিক (literary) রূপটির মধ্যে একাধিক উপভাষার প্রভাব দেখা যায়। যেমন, বাংলা সাধুভাষা তিন-চার শত বছর পূর্বের পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষার আধারে গড়ে উঠলেও সাধুভাষার ক্রিয়াপদের রূপ অনেকাংশে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার দ্বারা প্রভাবিত। প্রত্নভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক রূপটিতেও একাধিক উপভাষার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। আমেরিকার ইংরাজি ভাষাও একটিমাত্র উপভাষাশ্রিত (monolithic) নয়। মার্কিন দেশে তিনটি প্রধান উপভাষা-অঞ্চল আছে। এই তিনটির প্রভাব

আমেরিকার ইংরাজি ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক কারণে একটি উপভাষা-গোষ্ঠী মূল ভাষাগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সেই উপভাষা-গোষ্ঠীর উপভাষাই কালক্রমে নূতন একটি ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। যেমন, মধ্য ইউরোপের জার্মানিক (Germanic) ভাষাগোষ্ঠীর একটি দল খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের কিছুকাল আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে ইংল্যান্ডে উপনিবিষ্ট হয়। এই দলের একটি উপভাষাই কালক্রমে স্বতন্ত্র ইংরাজি ভাষার রূপ লাভ করে। অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত উপভাষা কী করে কালক্রমে স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে, ইউরোপের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। রোম সাম্রাজ্য বিস্তারের পর ইউরোপের বৃহদংশে লাতিন ভাষাই শাসনকার্যে ব্যবহৃত সরকারি ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের পর হূন, শ্লাভ, জার্মান প্রভৃতি বর্বর জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় রোম সাম্রাজ্য। আদি মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে লাতিন ভাষা থেকে উপজাত বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষা প্রচলিত ছিল। কালক্রমে এ-সকল অঞ্চল পৃথক পৃথক জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় এ-সকল অঞ্চলের উপভাষাগুলি স্বতন্ত্র ভাষা বলে গণ্য হয়। বর্তমানে ইউরোপের পাঁচটি রাষ্ট্রের পাঁচটি রাষ্ট্রভাষা এককালে লাতিন ভাষারই উপভাষা ছিল। এগুলি হচ্ছে পোর্তুগিজ (Portuguese), স্পেনীয় (Spanish), ইতালীয় (Italian), ফরাসি (French) এবং রুমানীয় (Roumanian)।

আধুনিক যুগে ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলা উপভাষার যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তা নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ইরাক জাহাঙ্গির সোরাবজি তারাপুরওয়ালা বাংলা উপভাষাগুলিকে চার ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। এই চারটি শ্রেণী হচ্ছে রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গ ও কামরূপী। সুকুমার সেন 'বঙ্গ' উপভাষার নামকরণ করেছেন 'বঙ্গালী'। তাছাড়া, রাঢ়ী উপভাষাকে তিনি দ্বিধাবিভক্ত করে 'ঝাড়খণ্ডী' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করেছেন। রাঢ়ী হচ্ছে কলকাতা-সহ হুগলী, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, নদীয়া, পূর্ব বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের উপভাষা। আর ঝাড়খণ্ডী হচ্ছে মেদিনীপুর-ধলভূম, পুরুলিয়া-মানভূম, বাঁকুড়া ও সাঁওতাল পরগণার উপভাষা। উত্তরবঙ্গের উপভাষা হচ্ছে বরেন্দ্রী, যা মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। কামরূপী উপভাষা রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, দিনাজপুর ও আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত। বঙ্গ বা বঙ্গালী উপভাষার অধিকারভুক্ত অঞ্চল হচ্ছে বাংলাদেশের খুলনা, যশোর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট এবং দক্ষিণ আসামের বরাক উপত্যকা, অর্থাৎ কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা এবং ত্রিপুরা রাজ্য। গোপাল হালদারের মতে, যশোর-খুলনার আঞ্চলিক ভাষা, বিশেষ করে খুলনার উপভাষা রাঢ়ীর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে একে বঙ্গালীর 'transitional form' বলে গ্রহণ করাই সমীচীন এবং নোয়াখালি-চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাকে বঙ্গালীর অন্তর্গত একটি পৃথক বিভাগ (সুকুমার সেনের মতে 'বিভাষা') বলে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

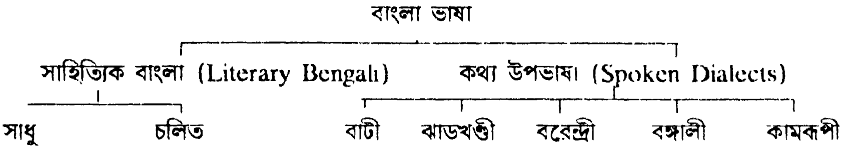
বাংলা ভাষা
সাহিত্যিক বাংলা (Literary Bengali)
কথ্য উপভাষা (Spoken Dialects)
সাধু
চলিত
রাঢ়ী
ঝাড়খণ্ডী
বরেন্দ্রী
বঙ্গালী
কামরূপী

সর্বাধিক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বঙ্গ বা বঙ্গালী উপভাষা প্রচলিত। সামান্য লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত হলেও অঞ্চলভেদে কিছু পার্থক্যও বঙ্গালী উপভাষার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। তাই গোপাল হালদার 'বঙ্গালী উপভাষা' না বলে বলেছেন 'East Bengali dialects', অর্থাৎ পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাগুচ্ছ। অধুনাতন বাংলাদেশের শ্রীহট্ট অঞ্চল এবং দক্ষিণ আসামের বরাক উপত্যকায় প্রচলিত কথ্য বাংলার আঞ্চলিক রূপটিকে 'সিলেটি উপভাষা' বা 'শ্রীহট্ট কাছাড়ের উপভাষা' বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে এটি বঙ্গ বা বঙ্গালী উপভাষারই অন্তর্গত। বৃহৎ বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত শ্রীহট্ট মধ্যযুগে একটি হিন্দুরাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীহট্টে রচিত হয় শৈব, বৈষ্ণবীয় ও লোকসংস্কৃতির ত্রিবেণী-সঙ্গম। উত্তর ভারত, গুজরাত, রাজস্থান, উড়িষ্যা, মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ রাজনৈতিক অস্থিরতায় দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে স্থিতিশীলতার সন্ধানে বিভিন্ন কালে শ্রীহট্ট অঞ্চলে এসে উপনিবিষ্ট হয়। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষও আসে শ্রীহট্টে। ইংরাজ আমলে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয় শ্রীহট্ট জেলা। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অচ্ছেদ্য থাকে এই বন্ধন। কাছাড় ছিল ইন্দো-মোঙ্গোলীয় কাছাড়ী রাজাদের দ্বারা শাসিত একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য। কাছাড়ী রাজ্যের রাজধানী মাইবং থেকে শিলচরের অদূরবর্তী খাসপুরে স্থানান্তরিত হওয়ার আগেই কাছাড়ী রাজারা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিলেন। রাজধানী খাসপুর ও কাছাড় রাজ্য শ্রীহট্ট-সংলগ্ন বলে তাঁরা বাংলাভাষাও গ্রহণ করেন। কাছাড়ী রাজার সভাপণ্ডিত ও পুরোহিতবর্গ ছিলেন শ্রীহট্টের মানুষ। পরবর্তীকালে শ্রীহট্ট থেকে দলে দলে মানুষ আসে কাছাড় রাজ্যে। শেষ কাছাড়ী রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণদেবের মৃত্যুর পর কাছাড় রাজ্যের বৃটিশ অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয় ১৮৩২ সালে। ১৮৩৬ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত কাছাড় ছিল বৃটিশ অধিকারভুক্ত ঢাকা কমিশনারের অধীন একটি জেলা। ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয। শাসনকার্যের সুবিধার্থে শ্রীহট্ট জেলায় ১৮৭৭ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ সালে হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ এবং ১৮৮২ সালে মৌলবীবাজার মহকুমা গঠিত হয। কাছাড় জেলায় হাইলাকান্দি মহকুমা গঠিত হয় ১৮৬৯ সালে। ১৯৪৭ সালে গণভোটের রায়ে শ্রীহট্ট জেলার বৃহদংশ আসাম প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হয়। খণ্ডিত করিমগঞ্জ মহকুমা যুক্ত হয় কাছাড় জেলায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কাছাড় জেলার অঙ্গচ্ছেদ ঘটে ১৯৫৩ সালে। তার একাংশ পৃথক হয়ে গঠিত হয় উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা। বর্তমানে কাছাড় জেলা ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় পরিণত হয়েছে। ১৮৭৪-১৯৪৭ কালপর্বে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে একযোগে বলা হত 'সুরমা উপত্যকা'। বর্তমানে কাছাড়,

করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলাকে একযোগে ‘বরাক উপত্যকা’ বলা হয়। তথাকথিত ‘সিলেটি উপভাষা’ এখনো বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলা এবং দক্ষিণ আসামের বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক কথ্যভাষা।

২

সিলেটি উপভাষা বঙ্গালীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিলেটিতে বঙ্গালীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই চোখে পড়ে। এখানে প্রথমেই এগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. মধ্যযুগীয় বাংলাভাষার অন্তিম পর্যায়ে ‘ই’ এবং ‘উ’ স্বরধ্বনি শব্দমধ্যে স্বস্থানে থেকেও পূর্বে উচ্চারিত হত বলে অনেকে অনুমান করেন। এরই নাম অপিনিহিতি (Epenthesis)। বাংলাভাষায় অপিনিহিতি বলতে সাধারণভাবে স্বরধ্বনির বিপর্যয় বা স্থান পরিবর্তন (যেমন, চারি > চাইর) এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে ‘ই’ ধ্বনির উচ্চারণকে বোঝানো হয় (যেমন, সত্য > সইত্ত)। বঙ্গালীতে অপিনিহিতির প্রাধান্য দেখা যায়, কিন্তু অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি লক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ স্বরধ্বনির সংকোচ যেমন হয় না, তেমনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরবর্তী স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে না। তাই ‘রেখে’, ‘করেছে’, ‘বিলিতি’, ‘দিশি’ প্রভৃতি শব্দ এখানে গঠিত হয় না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, অপিনিহিতি খ্রিস্টীয় ১৪শ শতকে লক্ষিত হলেও অভিশ্রুতির আবির্ভাব ১৮শ শতকের আগে হয় নি। সিলেটি উপভাষায় অপিনিহিতির কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়।

গণ্য > গইন্ন
পণ্য > পইন্ন
লজ্জা > লইজ্জা
মান্য > মাইন্ন
সন্ধ্যা > সইন্ধা
বার্ধক্য > বার্ধইক্ক
সাক্ষ্য > সাইক্ক
বাত্য > বাইত
ন্যায্য > নাইজ্‌জ
ঠাকুরাণী > ঠাকুরাইন্‌

ষষ্ঠি > ষাটি > ষাইট
চক্ষু > চখু / চউখ
লক্ষ্য > লইখ্‌খ
ব্রাহ্ম > ব্রাইম্ম
সখ্য > সইখ্‌খ
ব্রাত্য > ব্রাইত্ত
বাক্য > বাইক্ক
ভাগ্য > ভাইগ্‌গ
ফরমাস > ফরমাইশ
মানুষের > মাইন্‌সের

এতসব দৃষ্টান্তের পর ব্যতিক্রমেরও উল্লেখ করতে হয়। ভণ্ড > ভইণ্ড কিংবা ব্রাহ্মণ > ব্রাইহ্মণ হবে না।

২. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলিক নোয়াখালি-চট্টগ্রামের কথ্যভাষা ছেড়ে দিলে সাধারণভাবে বঙ্গালীতে স্বরধ্বনির আনুনাসিকতা দেখতে পাওযা যায় না। আনুনাসিক স্বরধ্বনির অভাব সিলেটি উপভাষারও সাধারণ লক্ষণ। যেমন,

কাঁটা > কাটা
ফোঁটা > ফুটা

রাঢীতে কাটা (= cut) ও কাঁটা (= কন্টক) শব্দদুটি পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়। তেমনি ফোটা (যেমন, ফুল ফোটা) ও ফোঁটা (যেমন, ভাই ফোঁটা) শব্দদুটিও। সিলেটিতে এ-জাতীয় পার্থক্য নেই। চাঁদ ও কাঁদা শব্দদুটি সিলেটিতে হবে যথাক্রমে চান্দ্‌ (বা চাদ) ও কান্দা। অনুরূপভাবে---

বাঁধ > বাদ / বান্দ্‌
ফাঁদ > ফাদ / ফান্দ্‌
সাঁঝ > হাঞ্জা (< সন্ধ্যা)

স্বরধ্বনির আনুনাসিকতার পরিবর্তে নাসিক্য ব্যঞ্জন উচ্চারিত হতে দেখা যায় সিলেটি উপভাষায়।

৩. বাংলা ভাষার ধ্বনি-পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মে সিলেটিতেও (ক) বর্ণবিপর্যয় (Metathesis), (খ) স্বরভক্তি (Anaptyxix) ও স্বরাগম দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

বর্ণবিপর্যয় : মুকুট > মুটুক / মটুক
লাফ > ফাল
বছর > বরছ্‌
Taxi (ট্যাক্সি) > টেস্‌কি
Tax (ট্যাক্স্‌) > টেস্‌ক
Box (বক্স) > বাস্ক
Rickshaw (রিক্‌শ) > রিস্কা
ফুরসৎ > ফুসরৎ

স্বরভক্তি : স্বাদ > সোয়াদ
স্নান > সিনান / হিনান
ত্রাহি > তরাই ('- - মধুসূদন')
প্রীতি > পিরীতি > পিরিত্‌
পর্দা > পরত্‌
গ্রাস > গরাস
Glass > গলাস
ত্রাস > তাইস্‌ (চলিত বাংলায় 'তরাস্‌')
শ্রাদ্ধ > হরাদ্‌ (রাঢীতে 'ছেরাদ্দ')

স্বরাগম : Station (স্টেশন) > ইস্টেশন
(রাঢীতে স্বরসঙ্গতির ফলে 'ইস্টিশন')
School (স্কুল) > ইস্কুল

Scale (স্কেল) > ইস্কেল
Stupid (স্টুপিড) > ইস্টুপিড
Steamer (স্টিমার) > ইস্টিমার
Screw (স্ক্রু) > ইস্ক্রু)

৪. দ্রুত উচ্চারণের ফলে সিলেটিতে প্রায়ই পদমধ্যস্থ স্বরধ্বনিলোপ এবং ব্যঞ্জনলোপ ঘটে থাকে। সুকুমার সেন কেবল পদমধ্যস্থিত হ-কারের লোপের কথা বলেছেন। যেমন, হয় > অয়। সিলেটিতে স্বরধ্বনিলোপ এবং ব্যঞ্জনলোপের কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

স্বরধ্বনিলোপ : উপরে > উপ্রে
গোবরের মাঝে > গুপ্রর্ মাজে
ঠাকুরাণী > ঠাক্রাইন্
অবসর > অব্সর / অপ্সর
Municipality (মিউনিসিপালিটি) > মিন্সিপাল্টি

ব্যঞ্জনলোপ : স্বামী > হাই
মাসি > মই
শহর > শঅর / শ'র
সাহেব > সাএব / সা'ব
বহিন > বইন
শ্বশুর > হউর
দাদাচান্দ > দা-চান্

ব্যঞ্জনলোপের ফলে অনেক সময় অন্ত্যবর্ণের ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘটে থাকে। যেমন, বাবুদাদা > বাউদ্দা, ঠাকুর-মা > ঠাম্মা।

একইসঙ্গে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় কিছু শব্দে। যেমন, বহিন + ইয়ারি > বইনারি (= ভগিনীসুলভ সখ্য)।

অন্ত্য ব্যঞ্জনের দ্বিত্বপ্রবণতাও অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে এখানে।

চাকা > চাক্কা (= lump, wheel)
চাকু > চাক্কু
ডাকু > ডাক্কু
ঘুড়ি > গুড্ডি
হাড় > হাড্ডি

সকল > হক্কল
নাড়ু > লাড্ডু

৫. বঙ্গালীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য 'স' ধ্বনির স্থলে 'হ' ধ্বনির আগমন সিলেটিতেও দেখা যায়। যেমন,

সে > হে
শ্রাদ্ধ > হরাদ্
সুদ্ধ > হুদা / হুদ্দা
শ্বশুর > হউর
শাশুড়ি > হারি

পূর্ব শ্রীহট্টে বা করিমগঞ্জ-কাছাড়ে স / শ ধ্বনির স্থলে 'ফ' ধ্বনির আগম হয়। যেমন,

শোও (অনুজ্ঞা) > ফোও
শোন্ (অনুজ্ঞা) > ফুন্
সে শুনল > হে ফুইন্ল

৬. ড / ঢ ধ্বনির 'র'-প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন,

বড় > বর
বাড়ি > বারি
হাঁড়ি > হারি / আরি

৭. বঙ্গালীতে বর্গের চতুর্থ মহাপ্রাণ (Aspirate) ধ্বনি (ঘ, ধ, ভ) কণ্ঠনালীয় (Glottal) অবরুদ্ধ (Recursive) ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন,

ঘাম > ঘাʼম
ধামাইল > ধাʼমাইল
ভাত > ভাʼত

ঢাকা অঞ্চলে এবং অনেকটা শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ অঞ্চলে এ-জাতীয় অবরুদ্ধ কণ্ঠনালীয় ধ্বনির মহাপ্রাণতা ত্যাগ করার প্রবণতা (Deaspiration) দেখা যায়। যেমন,

ভাত > বাʼত

৮. সিলেটিতে বঙ্গালী উপভাষাগুচ্ছের সাধারণ ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সিলেটিতে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির মোট সংখ্যা ৩২ (২৪ + ৮) বলে ধরা হয়। কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ক' সিলেটিতে কণ্ঠমূলীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি (Plosive / Stop) রূপে উচ্চারিত হয়।

কার > কাʼর .

এই 'ক' ধ্বনির গ-কার প্রবণতাও লক্ষিত হয়। যেমন,

সকল > হগল
উঁকি > উগি
বক > বগ
কাছে > গেছে

উষ্মধ্বনি (Frictive / Spirant) উচ্চারণের প্রবণতা সিলেটির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন,

চা > ৎসা (tsā)
জামা > জামা (dzāmā)
আছে > আসে (āse)
স্নান > সান (tsān)
ফুল> ফু.ল

উষ্মধ্বনি 'প' অনেকক্ষেত্রে ফ-কার প্রবণ। যেমন,

বাপ্‌দাদা > বাফ্.দাদা

৯. ও-কারান্ত শব্দের উ-কার ও অ-কার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন,

লোক > লুক
দোষ > দুশ
ধোপা > দুপা
ঘোমটা > গুমটা
ওখানে > অকান'
সোমবার > সম্‌বার
Loan (লোন) > লউন্

১০. 'ন' ধ্বনির ল-কার প্রবণতা সিলেটি উপভাষায় লক্ষিত হয়। যেমন,

নড়চড় > লরাচরা
নড়া > লরা
নামা > লামা
নাড়ু > লারু

১১. প্রথম পুরুষের একবচনে স্ত্রী-বাচক 'তাই' (= she) শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়।

১২. এরপর বিভক্তি-ঘটিত বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লিখিত হতে পারে। কর্তৃকারকে একবচনে 'এ' / 'য়' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন,

কামটা বামে করসে। (= কাজটা বাম করেছে।)
পাখিয়ে ধান খাব। (= পাখি ধান খাচ্ছে।)
কাউয়ায় উবাউরি করের। (= কাক ওড়াওড়ি করছে।)

দ্বিতীয়া ও চতুর্থীতে একবচনে 'রে' এবং বহুবচনে 'রারে' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন,

তারে কও। আমরারে কও।
ভিকারিরে চাউল দেও। ভিকারিরারে চাউল দেও।

পঞ্চমী বিভক্তির রূপ হচ্ছে 'তনে', 'অনে', 'তাকি', 'তাকিয়া', 'তাইক্যা', 'অইতে'। যেমন,

হে বাজার তনে (বা অনে) চাউল আনসে।
(= সে বাজার থেকে চাল এনেছে।)

ঘরর তাকি দুই পাও আউগাইয়া
(= ঘরের থেকে দু'পা এগিয়ে)

তিল অইতে তাল অয়।
(= তিল হতে তাল হয়।)

সপ্তমীতে '—অ', '—ত্', 'এ' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন, কাইল বাড়িত্ থাকবায় নি?
(= কাল বাড়িতে থাকবে না কি?)

রসইঘর' আও চাইন।
(= রান্নাঘরে এসো দেখি।)

বিয়ালে জাইও।
(= বিকেলে যেও।)

১৩. সুকুমার সেনের মতে, বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ অপভ্রংশে কখনো কখনো মূল শব্দে সংলগ্ন থাকত না। এ-জাতীয় প্রয়োগ হতে বাংলায় ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'কার' / 'কের' এসেছে। যেমন, মধ্যবাংলায় 'নদীকের বান'। আধুনিক বাংলায় 'আজকের খবর'। সিলেটিতে ষষ্ঠী বিভক্তির বিশেষ রূপ হচ্ছে 'কুর' (অথবা ঘোষীভবন বা Vocalization-এর ফলে 'গুর')। যেমন,

আইজকুর খবর।
(= আজকের খবর)।

বিয়ালকুর আগে জাইমু।
(= বিকেলের আগে যাব।)

এছাড়া কালবাচক শব্দে বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গের মতো 'কু' ব্যবহৃত হয়। যেমন,

পরুকু (= পরশু)
কাইলকু (= কালকে)
আইজ বিয়ালকু (= আজ বিকেলে)
এব্লাকু (= এ বেলাতে)

এখানে স্মরণীয় যে, সংখ্যাবাচক শব্দে 'টা' ছাড়া 'গু' ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন,

তার পুয়া দুগু (= তার ছেলে দুটি)

তাছাড়া সংখ্যাবাচক শব্দ প্রয়োগের কিছু বিশেষ রীতি লক্ষিত হয়। যেমন,

বাজার' অকন্ নাইরকলর গুটা অইল আট টাকা।
(= এখন বাজারে নারকেল প্রতিটি হচ্ছে আট টাকা।)

তার বয়স তো অই গেল তিন কুরি পাচ।
(= তার বয়েস তো হয়ে গেল তিন কুড়ি পাঁচ, অর্থাৎ ৬৫।)

১৪. যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, সিলেটিতে অঞ্চলভেদে তাদের দুটি পৃথক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। গোপাল হালদার পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার যে চারটি বিভাগ উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে দুটি হচ্ছে 'Maimansing East–Sylhet West Group or Central North EB' এবং 'Sylhet–Kachar Group or North Eastern Group'। সিলেট-কাছাড় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত সদর শ্রীহট্ট, মৌলবীবাজার এবং দক্ষিণ আসামের করিমগঞ্জ, কাছাড় ও হাইলাকান্দি। প্রথমোক্ত বিভাগের মধ্যে রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রথমটিকে 'পশ্চিম সিলেটি' এবং দ্বিতীয়টিকে 'পূর্ব সিলেটি' বলে নামাঙ্কিত করতে পারি। এখানে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে উভয় বিভাগের ক্রিয়া-বিভক্তির রূপবৈচিত্র্য সহজবোধ্য হবে।

আদর্শ চলিত বাংলা	পূর্ব সিলেটি	পশ্চিম সিলেটি
লক্ষ্মী বলে, এটা ওর কলম।	লক্খীয়ে কয়, ইটা তাইর কলম।	লক্খীযে কয, ইটা তাইর কলম।
তাড়া দেন কেন ?	তাইস্ দেইন কেনে ?	তাইস্ দেইন কেল্লাইগ্গা (কিয়ের লাইগ্গা) ?
আমি খাচ্ছি।	আমি খাইযাব / খাইবাম।	আমি খাইত্যাছি।
তাঁরা (ওঁরা) খাচ্ছেন কি ?	তাইন্ তাইন্ (হেইন্ তাইন্) খাইবা (/খাইত্রা) নি / তারা (হেরা) খাইরা (খাইত্রা) নি ?	তারা (হেরা) খাইত্যাছইন নি ?

আদর্শ চলিত বাংলা	পূর্ব সিলেটি	পশ্চিম সিলেটি
আমি খুঁজছি।	আমি খুজিয়ার (/খুজরাম) / তুকাইয়ার (/তুকাইরাম)।	আমি খুইজত্যাসি / তুকাইত্যাসি।
সে বই পড়ছে।	হে বই পরের্।	হে বই পরত্যাসে।
তুই যাচ্ছিস।	তুই জাইরে (/জাইত্রে) / তুইন্ জাইরে (/জাইত্রে)।	তুই জাইত্যাসস্।
তুমি যাচ্ছ।	তুমি জাইবায় / জাইত্রায়।	তুমি জাইত্যাস।
তারাই কথাটা বলেছে।	তারাউ (/হেবাউ) কথাটা কইসে।	তাবাই (/হেবাই) কথাটা কইসে।
আমি ভাত খেয়ে ফেলেছি।	আমি বাত্ খাইয়া সাবসি / আমি বাত্ খাইলাইসি (/খাইলিসি)।	আমি বাত্ খাইযা লাইসি (/ফালাইসি)।
সে কাজটি করে ফেলেছে।	হে কামটা করিয়া সারসে / হে কামটা করিলাইসে (/করিলিসে)।	হে কামটা কইব্যা সারসে (/ফালাইসে)।
তুই চেয়ে থাক্।	তুই (/তুইন্) চাই তাক্।	তুই চাইযা তাক্।
তুমি চলে যাও।	তুমি জাও গি (/জাও গিয়া)।	তুমি জাও গা (/চইল্যা জাও
সে খেল।	হে খাইল।	হে খাইল।
তিনি ভালোমানুষ ছিলেন।	তাইন্ ভালামানুষ আস্লা।	তাইন্ ভালামানুষ আস্লাইন্।
রাম চলে গেল।	রাম গেল গিয়া।	রাম গেইল্ গা।
আমি দেখে এলাম।	আমি দেখিয়া আইলাম (/দেখি' আইলাম)।	আমি দেইখ্খা আইলাম।
তিনি দেখলেন।	তাইন্ দেক্লা।	তাইন্ দেক্লাইন।
তিনি দেখতে গেলেন।	তাইন্ দেক্তা গেলা।	তাইন্ দেক্তা গেলাইন্।
সে কথাটা ঠিকই বলত।	হে কথাটা ঠিকউ কইত।	হে কথাটা ঠিকই কইত।
আমি যেতাম।	আমি জাইতাম।	আমি জাইতাম।
আমি তখন যাচ্ছিলাম।	আমি তকন জাইয়ার (/জাইরাম)।	আমি তকন জাইতে আস্লাম

আদর্শ চলিত বাংলা	পূর্ব সিলেটি	পশ্চিম সিলেটি
আমি হতেছিলাম।	আমি অইতাম্ আস্লাম।	আমি অইতে আস্লাম।
সে যাবে না।	হে্ জাইত নায়।	হে্ জাইত না।
আমি খাব না।	আমি খাইতাম নায়।	আমি খাইতাম না (/খাইত্যাসি না)।
আমরা খাব।	আমরা খাইমু।	আমরা খাইমু।
তিনি যাবেন।	তাইন্ জাইবা।	তাইন্ জাইবাইন্।
তুই যাবি।	তুই (/তুইন্) জাইবে।	তুই জাইবি।
তুমি যেতে থাকবে।	তুমি জাইতায় তাকবায়।	তুমি জাইতা তাকবায়।
আপনি খেতে থাকবেন।	আপ্নে খাইতা তাক্বা।	আপ্নে খাইতা তাক্বাইন্।
তুই খেতে থাকবি।	তুই (/তুইন্) খাইতে তাক্বে।	তুই খাইতে তাক্বি।
আমি খেয়েছিলাম।	আমি খাইস্লাম।	আমি খাইসিলাম।
তিনি খেয়েছিলেন।	তাইন্ খাইস্লা (/খাইসিলা)।	তাইন্ খাইস্লাইন (/খাইসিলাইন)।
আমরা গিয়েছিলাম।	আমরা গেস্লাম।	আমরা গেসিলাম।
সে গিয়েছিল।	হে গেসিল্।	হে গেসিল’ (—অ)।
এসো দেখি।	আও চাই (/চাইন্)।	আইও দেখি (/চাই)।
বসুন।	বইন্ (/বউকা / বউক্কা)।	বসেন (/বয়েন)।
কাল আসবেন।	কাইল্ (/কাইলকু) আইবা।	কাইল্ আইবাইন্।
তোমরা যাবে।	তুমরা জাইবায়।	তুমরা জাইবায়।

১৫. ‘গিয়া’ / ‘নিয়া’ শব্দদুটি বিভক্তির মতো ক্রিয়াপদে যুক্ত হয়ে নূতন ক্রিয়ারূপ গঠন করে। যেমন,

দেখ গিয়া > দেক গি / দেক গিয়া / দেক গা
যাও গিয়া > জাও গি / জাও গিয়া / জাও গা
দেব নিয়া > দিমু নে / দিমু অনে
দেখো নিয়া > দেইক্খ নে / দেইখ নে
দেখব নিয়া > দেকমু নে / দেইক্মু নে

১৬. 'আ' / 'আই' প্রত্যয়যোগে নামধাতু গঠিত হয়। সিলেটিতে নূতন নামধাতু গঠনের প্রবণতা লক্ষিত হয়। যেমন,

হে গপায়।
(= সে গল্প করে।)

তার বাফে তারে বেতাইল।
(= তার বাপ তাকে বেত্রাঘাত করল)

হে চুররে মারিয়া হুতাইল।
(= সে চোরকে মেরে শায়িত / ধরাশায়ী করল।)

কমলায় গাই খিরাইল।
(= কমলা গাভী দোহন করল।)

হে বিট্‌কাইল।
(= সে বিকট মুখভঙ্গি করল।)

তাবে টেক্‌রাইমু।
(= তাকে ঠক্কর মেরে দেব।)

রাম টেরাইয়া চায়।
(= রাম তির্যক চোখে তাকায়।)

তারে জিগাইলাম।
(= তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।)

মধুএ লেংবাইত্যাছে।
(= মধু খুঁড়িয়ে হাঁটছে।)

পাগল সলাইও না।
(= পাগলকে খেপিয়ো না।)

দরিয়া থাপ্‌রাই দেও।
(= ধরে থাপ্পড় মেরে দাও।)

উবাইয়া দেখ।
(= দাঁড়িয়ে / অপেক্ষা করে দেখ।)

তাইন্ টাকাপয়সা কব্‌জাইয়া রাক্‌সইন্।
(= তিনি টাকাকড়ি কব্জির মধ্যে / মুঠোর মধ্যে রেখেছেন।)

গোরুএ লেদাইছে।
(= গোরু বিষ্ঠা ত্যাগ করেছে।)

১৭. 'উয়া' / 'ইয়া' প্রত্যয়যোগে বিশেষণ পদ গঠনের প্রবণতা বহুল পরিমাণে লক্ষ করা যায়। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

(ক) লাউয়া (= লাউয়ের মতো ন্যাড়া)
গাউয়া (= গ্রাম্য)
কালুয়া (= কালা ; স্ত্রী. কালুয়ানি)
আলুয়া / হালুয়া (= চাষী)
মাছুয়া (= মাছ বিক্রেতা / মৎস্য-ব্যবসায়ী ; স্ত্রী. মাছুয়ানি)
চালুয়া (= চালবাজ)
তেলুয়া (= তৈলমর্দনকারী, চাটুকার)
তলুয়া (= বশংবদ, অধীন)
তালুয়া (= যে একের কথা অন্যকে বলে / লাগানি দেয়)
মারুয়া (= মারোয়াড়ি)
জালুয়া (= জেলে)
খারুয়া (= ক্ষয়কারী / অপচয়কারী)
মদুয়া (= মদ্যপ)
সলুয়া (= যে সহজেই খেপে যায়)
ভারুয়া (= ভারী)
ফথুয়া (= পথে পথে যে ঘোরে / ভবঘুরে)
আউয়া / আরুয়া (= বোকা)

(খ) চলইয়া (= যে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে)
ভাদমাইয়া (= ভাদ্রমাসের / কপালপোড়া)
আগনমাইয়া (= অগ্রহায়ণ মাসের)
কার্তিকমাইয়া (= কার্তিক মাসের)
মাগমাইয়া (= মাঘ মাসের)
ঢাকাইয়া (= ঢাকার / ঢাকা-বাসী)
গাইয়া (= গব্য, 'গাইয়া ঘি')

১৮. 'রা' / 'উরা' প্রত্যয়যোগে বিশেষণ এবং 'অন' প্রত্যয়যোগে বিশেষ্য গঠিত হতে দেখা যায়। 'অন'-প্রত্যয়ান্ত শব্দ পশ্চিম সিলেটিতেই বেশি ব্যবহৃত হয়। এখানে কিছু বহুল ব্যবহৃত শব্দ উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) খাউরা (= যে ভালো খেতে পারে)
মাত্‌রা (= বলিয়ে)
[illegible] (= যাত্রী)

পাওরা (= প্রাপক)
নাচ্‌রা (= নাচিয়ে)
দেউরা / দেওরা (= দাতা)
বওরা (= উপবেশনকারী)
হাস্‌রা (= হাস্যপরায়ণ ; 'হাস্‌রা-মাত্‌রা')
দেখ্‌বা (= দর্শক)
হুন্‌বা (= শ্রোতা)
আল্‌-বাউরা (= হালচাষী)

(খ) বওন (= বসা)
খাওন (= খাওয়া)
কওন (= বলা)
দেওন (= দেওয়া)
চলন্‌- ফিরন্‌ (= চলাফেরা)
ঘুরন্‌-ফিরন্‌ (= ঘোরাফেরা)
খাওন-পরন্‌ (খাওয়া-পরা)
আওন (= আসা)
ফিরিয়া আওন / ফির‍্যা আওন (= ফিরে আসা)

১৯. সম্বোধনে কিছু অব্যয় ও বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন,

এরে (রাটিতে / চলিত বাংলায় হ্যাঁরে)
ও রে বা / এ রে বা / ও বা' (বা' < বাবা ; আদরার্থক)
রে / ও রে / কিতা রে / কিতা বা / কিতা গো
নি / নি রে / অয় নি (= তাই নাকি) / হাচা নি
কিতা মে' (< কি-টা মিঞা)

ভুবনমোহন বিদ্যার্ণবের মতে, 'কিতা' শব্দের মূলে রয়েছে সংস্কৃত শব্দ 'কতি'। যেমন, বিদ্যাপতির কবিতায় আছে, 'সখি হাম জিউম কতি লাগি ?' এখানে স্মরণীয় যে, সংস্কৃত 'কতি' (= how many) সংখ্যাবাচক শব্দ। সিলেটি উপভাষায় 'তা' (= টা) আলাদাভাবে বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন, অউতা (= এইটা), হউতা (= ওইটা), জেতা (= যেটা)।

অনুরূপভাবে জোর দিতে স্পষ্টার্থক অব্যয় 'নু' ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এর মূলে সংস্কৃত সন্দেহার্থক অব্যয় 'নু' থাকতে পারে। যেমন, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌' নাটকে কালিদাসের উক্তি, 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু।' এর পাশাপাশি উপভাষিক প্রয়োগ লক্ষণীয়।

আমি দিলাম নু। (= আমি দিলাম যে।)
মায়া নু গেল। (= মায়া তো গেল।)

সন্দেহার্থক অব্যয় হচ্ছে 'বুলে' (= বলা হয়, They say)।

আমি বুলে ইতা জানি। (= আমি নাকি এটা জানি।)

'আরি' / 'হারি' (< সারিয়া) মূলত অসমাপিকা ক্রিয়াবাচক হলেও আলাদা অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

অসমাপিকা : আমি গিয়া আরি' দেখলাম।
(= আমি যাওয়াব পর দেখলাম।)
হে খাইয়া হারি' যাইব।
(= সে খাওয়া সেরে যাবে।)

অব্যয় : আমি তকন কইলাম আরি।
(= আমি তখন বললাম আর-কি।)

২০. বহিরাগত মানুষের ভাষা থেকে বহু হিন্দী ও আরবি-ফারসি শব্দ সরাসরি এব ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রবেশ করেছে সিলেটিতে। এ-রকম কিছু শব্দ এখানে উল্লেখ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষায় শতকরা ৫১টি শব্দ হচ্ছে তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম, ৪৪টি হচ্ছে বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ এবং আরবি-ফারসি-ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশি শব্দ হচ্ছে শতকরা প্রায় ৪টি। কলকাতা অঞ্চলের মুখের ভাষায়, তদ্ভব শব্দের সংখ্যাধিক্য (৮০ শতাংশ) থাকলেও বিদেশি শব্দের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৩টি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'বাংলাদেশেব আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' গ্রন্থের শব্দাবলি বিশ্লেষণ করে গোপাল হালদার দেখিয়েছেন যে, চলিত ভাষার বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফাবসি ও ইউরোপীয় ভাষার বিদেশি শব্দের হার যেখানে ৩.৭ শতাংশ, সেখানে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় কেবলমাত্র আরবি-ফারসি শব্দের হার হচ্ছে ১২ শতাংশ। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, সিলেটি উপভাষায় আরবি-ফারসি এবং হিন্দী প্রভৃতি শব্দের কতটা প্রভাব রয়েছে।

অক্ত (< আরবি বক্‌ৎ, = বার, বেলা)
এব' / আব' (= এখনও)
ক'ক্তে (< কোন্ অক্তে, = কোন সময়)
খুসবয় (< উর্দু খুশবু, = সুগন্ধ। লোকনিরুক্তির প্রভাবে 'খুশবায়ু' শব্দ থেকে সম্ভবত আগত।)
খুচিধরা / খুচাধরা (= মোগল আমলে শ্রীহট্ট থেকে খোজা চালান হত দিল্লীব হারেমে। 'খুচি' শব্দের মূলে রয়েছে 'খোজা' শব্দটি।)

ডরালুক্ (= হিন্দী ডরপোক ; < ডর + আলু + লোক)
জেব্ (= জামার পকেট)
জেরা (< আরবি জিরাহ্, = প্রশ্ন)
নেনা (গ্রিয়ার্সনের মতে, ভোজপুরীতে শব্দটির অর্থ শিশু। কেউ কেউ শব্দটির মূলে দেশজ 'নুনু' শব্দ রয়েছে বলে মনে করেন।)
বাজু (= হাত, দিক। অউ বাজুত্ = এই দিকে)
বাভন্ (< ব্রাহ্মণ)
বুরা (< হিন্দী বুরাহ্ ; 'ভালাবুরা')
ভৈস্ (< ভৈঁস < মহিষ ; রাঢ়ীতে 'মোষ')
মত্লবী (= মতলববাজ)
রসইঘর (= রান্নাঘর)

৩

মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বহু শব্দ এখনো সিলেটিতে পাওয়া যায়, যে শব্দগুলি কালোচিত ধ্বনি পরিবর্তন লাভ করে নি। সিলেটি উপভাষার এ-সকল শব্দ যে এককালে বৃহৎবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং বাংলা সাহিত্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হত, প্রাগাধুনিক তথা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু রচনা থেকে নির্বাচিত উদাহরণগুলি থেকে তা স্পষ্টতর হবে।

১. 'ন' স্থলে 'ল' (যেমন, লরাচরা, লড়া, লাড়ু) :

বুড়া গরু **লড়া** দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি **লাড়ু**॥

(অন্নদামঙ্গল, হরগৌরীর কন্দল)

২. স্বরধ্বনিতে আনুনাসিকতার পরিবর্তে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি :

দুটা লাউ **বান্ধা কান্ধে** কাঠ একখান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥

(অন্নদামঙ্গল, শিববিবাহের সম্বন্ধ)

কিসক নাগরী বাধা ষোড়সি **কান্দনে**। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ড)

দেখি লাজে গেলা **চান্দ** দুই লাখ যোজনে।

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বূলখণ্ড)

৩. পিন্ধা (= পরিধান করা) :

আর না **পিন্ধিবোঁ** বড়ায়ি **সুরঙ্গ** পাটোল। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দানখণ্ড)
নাহিঁ **পিন্ধে** উত্তম বসনে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ড)

৪. সামাই (= প্রবেশ কবি ; সিলেটিতে 'হামাই') :

মেদিনী বিদবে যদি তাহাতে **সামাই**। (অন্নদামঙ্গল, শিববিবাহ)

৫. উছ্‌টা (= হোঁচট) :

পথে যাইতে সদাগব লাগিল **উছ্‌টা**।
(কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতির সিংহলযাত্রা)

৬. গুয়াপান, পানগুয়া (= পানসুপারি) :

এহা **গুআ পান** তোহ্মে আপণেই খাহা। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বূলখণ্ড)

শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন **পানগুয়া**। (অন্নদামঙ্গল, হরগৌরীব কন্দল)

৭. ছাতি (= ছাতা < ছত্র) :

ছাতী ধরিআঁ তার তোষিআঁ মনে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ছত্রখণ্ড)

৮. রৌদ্ (= বোদ < রৌদ্র) :

রৌদেঁ বিকলী রাধা চলিতেঁ না পারে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ছত্রখণ্ড)

৯. কেটা (= কে সে) :

কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক **কেটা**।
(অন্নদামঙ্গল, হবগৌরীর কন্দল)

১০. এবো / আবো (= এখনও ; < হিন্দী আভি) :

এভোঁ নাইল সে ত নন্দেব পুত।

(শ্রীকৃষ্ণকীতন, বংশীখণ্ড)

১১. লুড়া (= ন্যাকড়া) :

উমার মুখ চাঁদের চূড়া।
বুড়াব দাড়ি শণের **লুড়া**॥ (অন্নদামঙ্গল, কোন্দল ও শিবনিন্দা)

১২. কেনে (= কেন) :

পণ্ডিত হইয়া **কেনে** না কর বিচার।
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯ম)

১৩. লাগ্ (= নাগাল) :

হেন বুঝোঁ বনে তোর কাহ্নু পাইল **লাগ**।
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দানখণ্ড)

১৪. বিহান / বিয়ান (= সকাল) :

লাস বেশ করে রাধা বড়াই **বিহাণে**।
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বূলখণ্ড)

১৫. বাসা (= বাড়ি, ঘর) :

এত বলি ভারতী লঞা নিজ **বাসা** আইলা।
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১০ম)

১৬. নাও (= নৌকা) :

নাঅ লআঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে।
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নৌকাখণ্ড)

১৭. সিয়ান (= চালাক) :

অতি বড় **সিআন** সে কাহ্নে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহখণ্ড)

১৮. সুতা (সিলেটিতে ‘হুতা’; = শোওয়া) :

বিরহে আন্তর জ্বলে **সুতিলোঁ** কদমতলে।
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহখণ্ড)

১৯. চখু (< চক্ষু) :

কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি **চখুত** নাইসে নিন্দে।
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহখণ্ড)

২০. ছাওয়াল (সিলেটিতে ‘ছাবাল’ ও ‘ছাওয়াল’) :

ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ বল করে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ড)

২১. চিন্ (< চিহ্ন) :

হাসি বোলে প্রভু আগে পড় কত দিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের **চিন**।। (চৈতন্যভাগবত, আদি, ৯ম)

২২. তান (= তাঁর), তানে (= তাঁকে) :

তথাপিও হেন তান মায়ার বড়াঞি।' (চৈতন্যভাগবত, আদি, ১১শ)

বাদীসিংহ বলিয়া পদবী দিব তানে। (চৈতন্যভাগবত, আদি, ১১শ)

২৩. আপনে (= আপনি) :

আপনে করেন সব এই তান ধর্ম। (চৈতন্যভাগবত, আদি, ১২শ)

২৪. সপ্তমীতে এ / য়ে / য় / তে স্থলে 'ত' বিভক্তি :

বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বূলখণ্ড)

২৫. ভবিষ্যৎ কালে উত্তম পুরুষে ক্রিয়াবিভক্তি '—মু' :

প্রভু বোলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না **যাইমু** সংসার ভিতরে॥(চৈতন্যভাগবত, আদি, ১৫শ)

৪

সিলেটি উপভাষার নিম্নলিখিত দুটি দৃষ্টান্ত থেকে এই আঞ্চলিক কথ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য সহজবোধ্য হবে। প্রথমে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে ব্যবহৃত চলিত বাংলাভাষার একটি নিদর্শন উল্লিখিত হল। তারপর পূর্ব ও পশ্চিম সিলেটিতে এব রূপান্তব দেওয়া হল।

(ক) আদর্শ চলিত বাংলাভাষার নিদর্শন :

তখন তার বড়ো ছেলে ক্ষেতে ছিল, সে এসে বাড়ীর কাছে যেমনি পৌঁছুলো, ওমনি নাচ-গান-বাজনার শব্দ শুনতে পেলে। তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে— এসব ব্যাপার হচ্ছে কেন? তাতে চাকব বললে— আপনার ভাই ফিরে এসেছেন, আর আপনার বাবা তাঁকে ভালোয় ভালোয় ফিরে' পেয়েছেন বলে নাচ-গান খাওয়ান-দাওয়ান করছেন।

(বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃ. ৮৮)

(খ) পূর্ব সিলেটিতে রূপান্তর :

হি সময় তার বর' পুয়া খেত' আছিল্। হে জকন্ আইয়া বাসার কাছে পউস্ল, তকন্ নাচ-গান-বাজনার আওয়াজ হুনল। তকন্ হে চাকব এগুরে ডাকিয়া জিগার্ করল— ইতা বেপার্ কিতা অর্? তৌ চাকরে কইল— আপ্নার বা'ই ফিরিয়া আইসইন্, আর আপ্নার বাবায় (/বাপে) তানে ভালায় ভালায় ফিরিয়া পাইসইন্ করি' (/করিয়া) ফুর্তি-আমুদ কর্‌রা।

(গ) পশ্চিম সিলেটিতে রূপান্তব :

হেই সময় তার বর' পুলা খেত' আছিল্। হে জকন্ আইয়া ঘরর কাছে পউস্‌ল, তকন্ নাচগান বাজনার শব্দ হুন্‌ল। হে তকন্ চাকর একটাবে ডাইক্যা জিগাইল— ইতা বেপার কি অইত্যাসে? তারে চাকরে কইল— আপ্‌নের বা'ই বারি ফিইর‍্যা আইসেন। আপ্‌নের বাবা তাইনেরে ভালায় ভালায় ফিইর‍্যা পাইসেন, এর্‌লিগা (/এর্ লাইগ্‌গা) নাচ-গান-বাজনার আয়োজন করসইন্।

(চ) আধুনিক বাংলা কাব্যভাষার নিদর্শন :

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে। (রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, ১৮৯২)

(ছ) পূর্ব সিলেটিতে রূপান্তর :

গান গাইয়া নাও বাইয়া কে আয় পার'।
দেখি' হারি' মন' অয়, চিন্ পাই তাবও।

অথবা

গান গাইয়া নাও বাইয়া পারত্ কে আব্।
দেখি' হারি' মন' অয়, তাবে চিনিয়াব্।

(জ) পশ্চিম সিলেটিতে রূপান্তর :

গান গাইয়া নাও বাইয়া আইত্যাসে কে পারে।
দেইক্‌খ্যা জেন মন' অয়, চিনত্যাসি যে তারে।

(ঝ) সুনীতিকুমার-কৃত প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর :
(আনুমানিক ১১০০ খ্রিস্টাব্দ)

গাণ গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই পারহি।
দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই চিণ্‌হিঅই ওহারহি।

৫

সিলেটি উপভাষার নির্বাচিত শব্দকোষ

আইটা (= এঁটো, উচ্ছিষ্ট)
আউলি (= পাগলাটে)
আউশ (< আশা)

আচাভুয়া (< অত্যদ্ভুত)
আচানক (= সৃষ্টিছাড়া)
আজাইরা (= অনাবশ্যক)
আদিলকা (= ন্যাকা)
আন্দু (= আন্দাজে)
আলি / হালি (= ১. দুই জোড়া, ২. টিকটিকি)
আলুচা / হালুচা (= হালচাষীর ছা বা ছেলে)
আলুয়া / হালুয়া (= হালচাষী)
আরি-পরি (= আড়শী-পড়শী)
এম্দি (= এই দিকে)
এমলা (= এভাবে)
উছ্টা (= হোঁচট)
উলস্ (= ছারপোকা)
কলে কলে (= কৌশলে, চুপি চুপি)
কাউছালি / কাউছাইল্ (= কাকের ছা বা শাবকের মতো হৈ-চৈ)
কাম্লা (= মজুর)
কুটা (= আঁকশি)
কুবাই (= কোথায)
কুবাইকুব (= কোথাকার)
খলই (= মাছ ধোওয়ার বাঁশের পাত্র)
খেইব্ / খেইল্ (= খেলা)
খাল্ (= গায়ের চামড়া)
খাবাক্খাবা (= খাড়া হয়ে থাকতে থাকতে, মুহূর্তের মধ্যে)
গতর (= শরীর)
গচা (= কাঁটা, মাছের কাঁটা)
গপ্পিসা (< গল্পেশ্বর = গল্পবাজ)
গাইল্ (= কাঠের বড় হামামদিস্তা)
গাট্টা (= বড়, মোটা)
গাট্টিবুচকা (< গাঁটরি বোঁচকা)
গির (= গ্রন্থি, গেরো)
গুডিড (= ঘুড়ি)
ঘানুয়া (- ঝুল)
চক্কব (< চক্র, = চক্রাকারে ঘুরে আসা)

চগা (= বোকা)
চালাকে (= তাড়াতাড়ি)
চিপা (= সংকীর্ণ)
চিল্লানি (= চীৎকার)
চুঙ্গাপিঠা (= মকর সংক্রান্তির সময় বাঁশের চোঙের মধ্যে চাল ভরে আগুনে তাতিয়ে বিশেষ ধরনের পিঠা)
চুকুম-বুদাই (= বুদ্ধিহীন ও নিস্তেজ)
চেমা (= নরম, ঠাণ্ডা প্রকৃতির)
ছন্‌টেকই (= ভবঘুরে, যে টুনটুনি পাখির মতো শনের চালে উড়ে বেড়ায়)
জেব্‌ (= পকেট)
জিতা (= জীবিত)
জুকার (< জিহ্বাকার > জিভকার < জিউকার ; = উলুধ্বনি)
টাইন্‌ (= কাছে, নিকটে ; < ঠাঞি)
টুমা (= টুকরো)
টেংরা (= ১. বিশেষ প্রকার মাছ, ২. দুষ্ট প্রকৃতির)
ডুক্‌লা (= অন্ত্যজ শ্রেণীর)
ডুগি / ডগা (= অগ্রভাগ)
ঢেং (= মাটিতে পড়া, drop)
তনাই (< তনু + আই ; = শরীর)
তালাতালি (= লাগানি, একের কথা অন্যকে বলা)
তালুয়া (= যে লাগানি দেয়)
তুকানি (= খোঁজা)
তুকাতুকি (= খোঁজাখুঁজি)
তেলচুবা (= আরশোলা)
দম্‌ (= শ্বাস)
দম্‌ লওয়া (= অপেক্ষা করা, থামা)
ধাইর / ধারি (= বারান্দা)
নিরাই (< নিরীহ)
নিমাত্‌ / নিমাত্‌রা (= নির্বাক)
পই (< পদা ; = পদ্যে গাঁথা)
পতা (< প্রাতঃ)
পাইল্‌ (= পাখার ব্যজন)

পাথাইর / পাথারি (= প্রস্থ)
পিন্ধন্ (= পরিধান)
পিঁয়া (= ১. পান করা, ২. পিসে)
পুঙ্গা (= জারজ)
পুলাপান্ (< পোলা + পোনা ; = ছোট ছেলেমেয়ে)
ফাইজ্‌লা (= ফাজিল, বাচাল)
ফাজিল্ (= অতিরিক্ত)
ফুটানি (= দেমাক)
বইতল্ (< বেতাল / বিতল ; = যার তাল বা শৃঙ্খলা নেই অথবা যার তল (স্থল) নেই, অর্থাৎ ঠিকানাহীন)
বটর গাইল্ (বটগাছের 'গাইল', অর্থাৎ অলস ও স্থিতিশীল)
বগঢুল্ (= যে বকের মতো ন্যাড়া-মাথা ও বসে বসে যার ঢুলুনি আসে।)
বনাজি (< বনজ ; = বনৌষধি)
বাইঙ্গন (< বাতিঙ্গনিক ; = বেগুন)
বাইলে বাইলে (ভালোভাবে, ভ্রাতৃভাব বজায় রেখে)
বাউটা (= ভবঘুরে)
বারিন্দা (= বারান্দা)
বাওটা (= damp)
বাট্টি / বাটুল (= বেঁটে ; 'বাট্টিমুল্লা' = বেঁটেখাটো মোল্লা)
বাদুয়া (= খারাপ ; অনুরূপ শব্দ বজ্‌রা)
বিট্‌লা (= ফাজিল)
বিট্‌লামি (= ফাজলামো)
বিজাঙ্গা (= বেয়াড়া, দুরন্ত)
বেন্দা (= কাঠের বরগা)
বুঙ্গা (= চোরা চালান)
বিলাই (= বিড়াল)
বাইরম্-বাইরম্ (< 'বাইর হইমু' ; = বহির্গামী মনোভাব)
বুজর্ বান্দর (= চালাক বাঁদর, স্বার্থপর লোক)
বুদ্ধু (= বোকা ; বৌদ্ধ + তুচ্ছার্থক 'উ' প্রত্যয় = বৌদ্ধু > বুদ্ধু ; অর্থাৎ মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধের মতো নিরীহ ও বোকা)
ভাইল্ / বাইল্ (= ভ্রাতৃভাব)
ভাইয়াপি (= ভ্রাতৃত্ব)

ভাগর ছাগি (= মালিকানাহীন নগণ্য ব্যক্তি, ভাগবাটোয়ারার সময়
যে ছাগলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।)
ভাদমাইয়া (= কপালপোড়া, ভাদ্রমাসের)
মই (= মাসি)
মউয়া (= মেসো)
মউলইবাজার / মলৈবাজার (< মৌলবীবাজাব)
মাইর্ / মারি (= মারামারি)
মাজন (< মহাজন)
মেকুর (= বিড়াল)
মেন্দা (= মেনীমুখো)
মুর' (= তলায়, মোড়ে)
লরাচরা (= সাড়াশব্দ, নড়চড়)
লরোত্তম্ (< লড়াই + উত্তম)
লাক্ (= যোগ্য ; < লায়েক)
লাকান্ (= তুল্য ; 'ই লাকান্'= এ-রকম)
লেদা (= গোময়)
সান (< স্নান)
সিলট্ / (< শিলা হাট / শীলাবতীর হাট (শীলা-হাট) ; অনুরূপ শব্দ
'শিল-চর' > শিলচর)
হরু / হুরু (= সরু, ছোট)
হরুব্‌তা / হুরুব্‌তা (= ছোট ছেলেমেয়ে)
হা'গ্ (< স্বর্গ = আকাশ, ঊর্ধ্ব)
হাগাঠালু (= যার ঠালি, অর্থাৎ মাথা আকাশমুখী, বোকা)
হাউকি (= হাঁক)
হাচা-মিছা (= সত্যমিথ্যা)
হাচারর্ (= সত্যিকার)
হাজম্ (= সদ্য-সদ্য)
হিনান (< সিনান < স্নান)
হুমা (= গোঁয়ার)
হেঙ্গা (= বিয়ে)
হৈর' (= সর্ষপ)

গ্রন্থপঞ্জি

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৬৮

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয, ৭ম সংস্করণ, ১৯৬২

সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ৯ম সংস্করণ, ১৯৬৫

I. J. S. Taraporewala, Elements of the Science of Language, Calcutta University, 3rd edition, 1962

C. L. Barber, The Story of Language, London, 1965

Gopal Haldar, A Comparative Grammar of East Bengali Dialects, Calcutta, 1986

S. S. Tunga, Bengali and Other Related Dialects of South Assam, New Delhi, 1995.

সুরমা-বরাক উপত্যকার নৌকাপূজা : প্রাসঙ্গিক তথ্য — একটি পুনর্বিবেচনা

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

সুরমা বরাক উপত্যকায় এক ধরণের আড়ম্বরপূর্ণ মনসাপূজা নৌকাপূজা নামে পরিচিত। সিলেট ও কাছাড় জেলা গেজেটিয়ারে নৌকাপূজার যে বিবরণ রয়েছে তা নিম্নরূপ :

> "A special form of religious ceremony is known as the noakā, or boat puja, and is performed by a wealthy man in satisfaction of a vow, who generally spends from Rs. 300/- to Rs. 500/- on the ceremony. A shed is built, at the end of which is a boat painted and gilt, from which rise, tier upon tier, the images of various gods, amongst whom Bishahari is generally the most prominent. For several days sacrifices are offered to the deities, and Brahmans, who are well paid and feasted for their services, offer up their prayers. At the end of this time the house and its contents are abandoned and allowed to fall to pieces."[১]

এই পূজার নাম যদিও নৌকাপূজা কিন্তু নৌকা এখানে বাহন মাত্র। নৌকার উপর স্থাপিত মনসা ও অন্যান্য দেবদেবীদের পূজাই মুখ্য। বাঁশ, কাপড়, মাটি ও রঙ দিয়ে প্রতিমার আধার হিসেবে দীর্ঘতম ৪০ মিটার পর্যন্ত, একটি নৌকা নির্মাণ করা হয়। পূজকের ক্ষমতানুযায়ী নৌকাটি সাত, পাঁচ বা ত্রিতল বিশিষ্ট হয়ে থাকে। প্রতি তলে আলাদা আলাদা কোঠায় একাধিক দেবমূর্তি বসানো হয়। পাটাতনে চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা, লক্ষীন্দর, মাঝি মাল্লা ইত্যাদি মনসামঙ্গল সম্পৃক্ত চরিত্রদের মূর্তি স্থাপন করা হয়। মাঘী বা ফাল্গুনী শুক্লা পঞ্চমীতে এক নাগাড়ে ৮ দিন ন্যূনতম ৫ দিন পূজা হয়। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা নৃত্য সহযোগে মনসামঙ্গল কাব্য গীত হয়। এ ব্যাপারে গায়কদের মধ্যে একটা রীতি আছে— কোথাও নৌকাপূজা হচ্ছে শুনতে পেলে গায়ককে দলবল সহ সেখানে গিয়ে গান করতে হয়। লক্ষণীয় যে সমগ্র বাংলাদেশে, আসাম ও বিহারের কিছু অংশে মনসাপূজার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও ঠিক এ ধরনের মনসাপূজা এখন সুরমা-বরাক উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ।

মনসার এই বিশেষরূপে পূজা সম্পর্কে পূজকদের বক্তব্য হল, দেবসভায় বেহুলার নৃত্যের সময় যে সব দেব-দেবীরা উপস্থিত ছিলেন মনসার সঙ্গে এদের প্রত্যেককেই পূজা করতে হয়। কারণ এসব দেব-দেবীরা চাঁদ সওদাগরের মনসাপূজার সাক্ষী ছিলেন। মনসা-মঙ্গল কাব্যেও

দেখা যায়, লক্ষীন্দরকে পুনর্জীবিত করার আগে বেহুলা উপস্থিত দেবতাদেব সাক্ষী বেখে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন চাঁদ সওদাগরকে দিয়ে তিনি মনসার পূজা করাবেন।

"পদ্মা বোলে মোব দুঃখ কেহ নাহি বুঝে।
না জিয়াব বালাকে যাবত নাহি পূজে।।
সভাব সাক্ষাতে বালী করুক অঙ্গীকাব।
শ্বশুবেব হস্তে পূজা করাবে আমাব।।
দেবগণ বোলে বালী অঙ্গীকার কব।
পদ্মার পূজা কবে যেন চান্দো সদাগব।।
অঙ্গীকার কবি বালী বোলে দেবতাবে।
দেয়াইব ফুল জল শ্বশুবেব কবে।।
পদ্মা বোলে সাক্ষী হঅ তুমরা দেবলোক।
চান্দো বিবাদিয়া যেন পূজা করে মোক।।
দেবগণ বোলে পদ্মা না কব অন্যথা।
আমবা পুষ্পের সাক্ষী হৈলাম সর্ব্বথা।। ২

সমবেত দেবতাদেব কেন নৌকাব উপব স্থাপন কবা হয কাব্যে তাবও ইঙ্গিত বযেছে। মনসা তাঁর মহিমা প্রদর্শনেব জন্য ডুবে যাওয়া চৌদ্দ ডিঙ্গা ডাঙ্গাব উপব দিযে চালিযে চাঁদ সওদাগবের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। মনসাব মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে চাঁদ সওদাগব সেই 'বহিত্র অর্চনা' করেছিলেন।

যদি সে জগাতী দিলেন আবতি
চলে চাবিশত অহি।
বহিত্র লইয়া পৃষ্ঠে বসাইয়া
চাঁদেব বাটীতে বহি।।
চাঁদ ভাগ্যবান ডিঙ্গা চৌদ্দখান
নাগেতে বহিযা দিল।
উল্লসিত হৈয়া পুত্র বধু লৈযা
নিজ ঘবে বসাইল।।
জ্বালি ধূপধুনা বিয়াল্লিশ বাজনা
বহিত্র অর্চনা কবে।
মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি ঘন ঘন শুনি
দেবী সুপ্রসন্ন তারে।।৩

সম্ভবতঃ এই 'বহিত্র পূজা'ই নৌকা পূজা।

২.

নৌকাপূজা যেহেতু মনসারই সমারোহপূর্ণ উপাসনা তাই এর উদ্ভবের ইতিহাস নিহিত রয়েছে মনসা উপাসনার অভ্যন্তরে। মনসাপূজা তথা মনসামঙ্গল কাব্যের আলোচনায় মনসাকে মধ্যযুগে উদ্ভুত লৌকিক দেবী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সর্প উপাসনার প্রেক্ষাপটে মনসার ইতিহাস অন্বেষণ করা হয়েছে। কিন্তু মনসা উপাসনা বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে মনসার যে ব্রোঞ্জ মূর্তিটি রয়েছে, পণ্ডিতদের অনুমান, তা সম্ভবতঃ পাল যুগের।[৪] এ ছাড়াও পূর্বভারতে সর্প ভূষিতা বেশ কিছু প্রাচীন মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

> "ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার মহাশয় দক্ষিণ বিহারের মূর্তি আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব ভারতের শিশু ক্রোড়ে অথবা মাথায় সর্পছত্র সমন্বিত বহুদেবী মূর্তির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে কখনো বা সিংহ পৃষ্ঠে কখনো বা সর্পছত্র সমন্বিত একই আদিম মাতৃকা দেবী পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পূজিত হন। শেষোক্ত মূর্তিই পরবর্তীকালে বাংলাদেশে মনসা নামে পরিচিত হয়েছে।" [৫]

পুরাণে মনসা কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে নারায়ণ ধর্মমুখ থেকে শ্রুত মনসা উপাখ্যান শুনিয়েছেন নারদকে।

"কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি।।" [৬]

এই ভগবতী মনসাদেবী কশ্যপের মন থেকে উৎপন্না বলে মনসা নামে খ্যাতা। এই দেবী মানুষের মনে ক্রীড়া করেন বলে দেবী নামেও প্রসিদ্ধা।

নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনী তথা।
বিষং সংহর্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি সা।। [৭]

নাগগণের প্রাণরক্ষা করায় মনসাদেবী নাগেশ্বরী নামে বিখ্যাতা হন এবং নাগরাজ বাসুকীর ভগ্নী ছিলেন বলে নাগ ভগিনী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বিষহরণে সমর্থা ছিলেন বলে বিষহরি নাম প্রাপ্ত হন।

কুমারী সা চ সংভূয় জগাম শঙ্করালয়ম্।
ভক্ত্যা সম্পূজ্য কৈলাসে তুষ্টাব চন্দ্রশেখরম্।। [৮]

কুমারী মনসা দেবী উৎপন্না হয়ে শঙ্কর ভবনে গমন করলেন এবং কৈলাসে ভক্তি সহকারে চন্দ্রশেখর শিবকে পূজা করে তাঁর স্তব করলেন।

মহাজ্ঞানং দদৌ তস্যৈ পাঠয়ামাস সাম চ। [৯]

তখন মহেশ্বর তাঁকে মহাজ্ঞান প্রদান করলেন এবং তাঁকে সামবেদ অধ্যয়ন করালেন।

ইন্দ্র মনসার পূজা করে তাঁর স্তুতি প্রসঙ্গে বলেন,

ত্বং ময়া পূজিতা সাধ্বি জননী চ যথাদিতিঃ।
দয়ারূপা চ ভগিনী ক্ষমারূপা যথা প্রসূঃ।। ১০

যেভাবে আমি জননী অদিতি দেবীকে পূজা করি, সে ভাবে আজ আমি তোমাকেও পূজা করেছি। সুরেশ্বরি, তুমিও মায়ের মত ক্ষমারূপা হয়ে অর্থাৎ আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে ভগ্নীর মতো দয়াবতী হয়েছ।

নিত্যং যদ্যপি ত্বং পূজ্যা ভবেহত্র জগদম্বিকে।
তথাপি তব পূজাঞ্চ বর্দ্ধয়ামি চ সর্বতঃ।। ১১

জগদম্বিকে! এ সংসারে যদিও তোমার নিত্য পূজা হচ্ছে, তথাপি আমি তোমার পূজা সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত করব অর্থাৎ তোমার মহিমা প্রচার করে পূজার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করব।

মনসার এই পৌরাণিক পরিচিতিতে শিব বীর্যে মনসার জন্মের কোন উল্লেখ নেই, মনসা-চণ্ডী বিবাদের কথাও নেই। কশ্যপের মানসী কন্যার সঙ্গে জরৎকারুর বিবাহ ও আস্তীকের জন্ম এবং জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে আস্তীক কর্তৃক নাগকুলকে রক্ষা করার কথাই পুরাণের বর্ণিত বিষয়।

মহাভারতের আদিপর্বেও অনুরূপ কাহিনী রয়েছে। কশ্যপের ভার্য্যা কদ্রু ছিলেন সর্পমাতা। মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করায় কদ্রু অভিশাপ দিয়েছিলেন, যারা তার কথামত কাজ করেনি সে সব সর্পেরা জন্মেজয়ের সর্পসত্রে নিহত হবে। এই সর্পসত্র থেকে নাগদের রক্ষা করার জন্য নাগরাজ বাসুকী তার ভগ্নী জরৎকারুকে জরৎকারু নামক ঋষির সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। কারণ জরৎকারু গর্ভজাত পুত্র কর্তৃক নাগেরা রক্ষা পাবে এরকম ভবিষ্যৎবাণী ছিল। ঋষি জরৎকারু বৃদ্ধ, যাযাবর এবং পত্নীকে ভরণপোষণ দিতে অক্ষম, বাসুকী তাঁর ভগ্নীর ভরণপোষণ করবেন -- এই প্রতিশ্রুতির পর জরৎকারু বাসুকীর ভবনে গিয়ে স্বনাম্নী কন্যাকে বিয়ে করে সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। স্বামী সহবাসের ফলে যথারীতি জরৎকারুর গর্ভসঞ্চার হল :

ঋতুকালে ততঃ স্নাতা কদাচিদ্বাসুকেঃ স্বসা।
ভর্তারং বৈ যথান্যায়মুপতস্থে মহামুনিম।।
তত্র তস্যাঃ সমভবদ্‌গর্ভো জ্বলনসন্নিভঃ।
অতীব তেজসা যুক্তো বৈশ্বানর সমদ্যুতিঃ।। ১২

[তাহার পর কোন সময়ে বাসুকীর ভগ্নী ঋতুস্নান করিয়া যথানিয়মে ভর্তার উপাসনা করিলেন। তাহাতেই তাহার গর্ভ হইল, সে গর্ভ ব্রাহ্মণ্যতেজেও অগ্নির তুল্যই হইয়াছিল, আবার শরীরকান্তিতেও অগ্নির তুল্যই হইয়াছিল।]

কিন্তু স্ত্রী শপথ ভঙ্গ করেছেন এই অজুহাতে জরৎকারু তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। বাসুকী এই সংবাদ শুনে দুঃখ পেলেও ভগ্নীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তার গর্ভ সঞ্চার হয়েছে

কি না, — কারণ এর সঙ্গে নাগকুলের সুরক্ষার প্রশ্নটি জড়িত ছিল। তিনি যখন ভগ্নীর গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন তখন :

> সান্ত্বমানার্থদানৈশ্চ পূজয়া চারুরূপয়া।
> সোদর্য্যাং পূজয়ামাস স্বসারং পন্নগোত্তমঃ॥ [১৩]

[তাহার পর বাসুকি মধুর বাক্য, সম্মান প্রদর্শন ও ধনদান দ্বারা সুন্দরভাবে সেই সহোদর ভগিনীকে সন্তুষ্ট করিলেন।]

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও মহাভারতের কাহিনী এক। কিন্তু মহাভারতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, জরৎকারুর সঙ্গে সহবাস করে গর্ভধারণের পরিপ্রেক্ষিতে নাগরাজ বাসুকী কৃতজ্ঞতা বশতঃ ভগ্নীকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। নাগদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে বাসুকী ভগ্নী যেহেতু সমষ্টির প্রয়োজনে ব্যক্তি স্বার্থকে উপেক্ষা করেছিলেন সে জন্য নাগকুলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়েছিলেন।

পুরাণ ভাষ্য অনুযায়ী মনসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শিব সকলেই আর্য সংস্কৃতি জাত। অন্যদিকে মনসা নাগমাতা, নাগভগ্নী, নাগদের রক্ষাকারিণী। এমতাবস্থায় নাগদের যথার্থ পরিচিতি উদ্ধারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মনসা পূজার উৎস।

৩.

নাগ এবং সর্প এখন একার্থক হলেও হিন্দু ঐতিহ্যে নাগ এবং সর্প সম্পূর্ণ আলাদা। নিত্য স্নানের তর্পণ মন্ত্রে নাগ এবং সর্পের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে :

> দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোহসুরাঃ।
> ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
> বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশ গামিনঃ।
> নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে।
> তেষামাপ্যায়নায়ৈ তদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥ [১৪]

এই মন্ত্রে জলপ্রদানের জন্য নাগকে এবং ক্রূর স্বভাব বিশিষ্ট সর্পকেও আহ্বান করা হয়েছে। মহাভারতে নাগদের তিনটি বাসভূমির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। উতঙ্ক নাগলোকে প্রবেশ করে নাগদের স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন :

> বহূনি নাগবেশ্মানি গঙ্গায়াস্তীর উত্তরে। [১৫]

[গঙ্গার উত্তর তীরে বহুতর নাগভবন রহিয়াছে।]

> যস্য বাসঃ কুরুক্ষেত্রে খাণ্ডবে চাভবৎপুরা।। [১৬]

[পূর্বে কুরুক্ষেত্রে এবং খাণ্ডব বনে যাহার বাস ছিল।]

গঙ্গার উত্তরতীর, কুরুক্ষেত্র এবং খাণ্ডব-এ যারা বসবাস করতেন তারা নিশ্চয়ই সর্প নয়, কারণ মহাভারতে বর্ণিত নাগলোক একটি সমৃদ্ধ নগর।

> তমুতকোহনুবিবেশ তেনৈব বিলেন, প্রবিশ্য চ তং নাগলোকমপর্য্যন্তমনেকবিধ—প্রাসাদ্-হর্ম্ম্য-বলভী-নির্য্যূহ-শত-সঙ্কুলসুচ্চাবচ-ক্রীড়াশ্চর্য্য-স্থানাবকীর্নস-পশ্যৎ।। [১৭]

[উতঙ্ক তক্ষকের অনুসন্ধানে সেই গর্ত্তপথ দিয়া যাইয়া পাতালে প্রবেশ করিল, প্রবেশ করিয়া দেখিল— সে নাগলোকের সীমা নাই, নানাবিধ দেবালয়, রাজভবন, ধনিগৃহ, চিলেকোঠা এবং দেওয়ালের বড় বড় হুক রহিয়াছে; আবার নানা প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য খেলার স্থানও রহিয়াছে।]

ইতিহাসে কয়েকটি নাগবংশের উল্লেখ রয়েছে। কুষাণ রাজবংশের পতনের পর খ্রীঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ও মধ্যভারতে দুটি নাগবংশ ছোট ছোট রাজ্যশাসন করেছিল। এদের মধ্যে কোন আন্তঃসম্পর্ক ছিল কি না তা জানা যায়নি। এক নাগবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল মথুরা, অন্যটির রাজধানী ছিল পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর নাগ বংশজ ভবনাগ বাকাটক রাজাদের মিত্র ছিলেন। গুপ্ত শাসনকালে নাগরাজ্যগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। [১৮] এই নাগশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত দুটি স্থান নাম— পদ্মাবতী ও অহিচ্ছত্র — বর্তমান আলোচনায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গোয়ালিয়রের কাছাকাছি বর্তমান পদমপাওয়াই প্রাচীন পদ্মাবতী আর বেরিলি জেলার রামনগর প্রাচীন অহিচ্ছত্র। মনসার অন্য নাম পদ্মাবতী এবং মনসার মাহাত্ম্য গীতির পূর্ববঙ্গীয় পরিচিতি হচ্ছে পদ্মপুরাণ বা পদ্মাপুরাণ। [১৯] অহিচ্ছত্র স্থান নামটি নাগদের সঙ্গে সর্পের সংযোগের ইঙ্গিতবাহী।

আর্যদের আগমনকালে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে প্রাগার্য জনগোষ্ঠী ছিল তাদের এক বা একাধিক গোষ্ঠীর সাধারণ পরিচিতি ছিল নাগ। সম্ভবতঃ তারা ছিল সর্পপূজক এবং বিষের ব্যবহারে তথা বিষচিকিৎসায় দক্ষ। যুদ্ধবিগ্রহে বিষই ছিল তাদের প্রধান হাতিয়ার।

আর্যদের সঙ্গে নাগদের সুসম্পর্ক ছিল না এবং নাগ আর্য সংঘাতের বেশ কিছু বিবরণ মহাভারতে রয়েছে। ঋষি উতঙ্ক যখন তার গুরু পত্নীর জন্য পৌষ্যরাজ মহিষীর কুণ্ডল প্রার্থনা করলেন, তখন রাজমহিষী উতঙ্ককে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন— "এতে কুণ্ডলে তক্ষকো নাগরাজঃ সুভৃশং প্রার্থয়তি; অপ্রমত্তো নেতুমর্হসি।" [২০]

[নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডল দুইটীর একজন বিশেষ প্রার্থী, অতএব সাবধানে লইয়া যাইবেন।]

কুণ্ডল নিয়ে আসার সময় 'উলঙ্গ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী' বেশে তক্ষক তা অপহরণ করেন এবং ইন্দ্রের সহায়তায় উতঙ্ক সেই কুণ্ডল উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ উতঙ্ক 'তক্ষকের ব্যবহারের প্রতিশোধ

লইবার ইচ্ছা করিয়া' জন্মেজয়কে সর্পযজ্ঞে প্ররোচিত করেন। আদিপর্বের অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে রুরু কাহিনীতে রুরু পত্নী প্রমদ্বরা সর্প দংশিতা হবার পর রুরু সর্প বংশ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করেন।

স দৃষ্টা জিহ্মগান্ সর্ব্বান্ তীব্র কোপসমন্বিতঃ।
অভিহন্তি যথাসত্ত্বং গৃহ্য প্রহরণং সদা।। ২১

[রুরু সকল রকম সাপ দেখিয়াই গুরুতর ক্রোধান্বিত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়া, আপন শক্তি অনুসারে সর্ব্বদাই সে সাপকে মারিয়া ফেলিতেন।]

পরীক্ষিতের তক্ষক দংশন বৃত্তান্তে দেখা যায়, তক্ষক ভয়ে ভীত পরীক্ষিৎ একটি সুরক্ষিত প্রাসাদে থেকে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তখন তপস্বীর ছদ্মবেশে কয়েকজন নাগ সেই প্রাসাদে প্রবেশ করে পরীক্ষিতকে কিছু সুস্বাদু ফল প্রদান করেন। সেই বিষাক্ত ফল খেয়েই পরীক্ষিৎ নিহত হন। এরপর

ততস্তু তে তদ্গৃহমগ্নিনা বৃতং প্রদীপামানং বিষজেন ভোগিনঃ।
ভয়াৎ পরিত্যজ্য দিশঃ প্রপেদিরে পপাত রাজাশনিতাড়িতো যথা।। ২২

[তাহার পর তক্ষকের বিষবহ্নির আলোকে সেই ঘরখানা আলোকিত হইয়াছে ইহা দেখিয়া মন্ত্রীরা ভয়ে সে ঘর পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন, আর রাজা বজ্রাহতের ন্যায় পড়িয়া গেলেন।]

বিষবিদ্যা বিশারদ কশ্যপ মুনি যাতে পরীক্ষিতের সাহায্যে না যান এজন্য তক্ষক তাকে পর্যাপ্ত সম্পদ দানে বশীভূত করেছিলেন। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় আর্য রাজা পরীক্ষিত এর সঙ্গে নাগ রাজা তক্ষকের বিবাদে পরীক্ষিৎ সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তক্ষকের চাতুর্যের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন এবং বিষপ্রয়োগে পরীক্ষিৎকে হত্যা করার পর তক্ষক তার দুর্গটিও জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

ভাগবদোক্ত 'কালীয় দমন' কাহিনীটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক কালীয়দমনের যে কাহিনী আছে তাও নাগ আর্য সংঘাতের ইঙ্গিতবাহী। এক সুপেয় জলের হ্রদে ছিল কালীয়ের বাস। নাগের বিষ প্রভাবে সেই হ্রদের জল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠলে কৃষ্ণ কালীয়কে দমন করতে সেখানে উপস্থিত হন। শেষ পর্যন্ত শিশু সন্তান সহ নাগ পত্নীদের স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ আহত কালীয়কে হত্যা না করে তাকে এ স্থান ছেড়ে চলে যাবার আদেশ দেন।

> "নররূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ সব কথা শুনে বললেন— হে সর্প তুমি আর এখানে থেকো না। পুত্র, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সব নিয়ে সমুদ্রে যাও; দেরি করো না।" ২৩

প্রাচীন সাহিত্যের এই বিবরণগুলো নিছক মিথ্ বলে মনে হয় না। এগুলো সম্ভবতঃ আগত আর্যদের সঙ্গে স্থানীয় প্রাগার্যদের নিরবচ্ছিন্ন সংঘাতের ঘটনা। শেষ পর্যন্ত নাগদের একটা বড় অংশ তাদের সাবেক বসত ভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মহাভারতে ও ভাগবতে এই প্রব্রজনের কথা রয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বের একবিংশ অধ্যায়ে কদ্রু বিনতাকে বলেছেন,

নাগানামালয়ং ভদ্রে! সুরম্যং চারুদর্শনম্।
সমুদ্রকুক্ষাবেকান্তে তত্র মাং বিনতে! নয়॥ [২৪]

[ভদ্রে! বিনতে! সমুদ্রের মধ্যে একপ্রান্তে মনোহর একটি প্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে; সেইটিই নাগগণের উপযুক্ত বাসস্থান; তুমি আমাকে সেইখানে নিয়া চল।]

বিনতা কদ্রুকে নিয়ে সেই দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে বিনতাপুত্র গরুড়ও সর্পদের পৃষ্ঠে নিয়ে মায়ের অনুসরণ করল। গরুড় 'সূর্য্যাভিমুখ' হয়ে যাচ্ছিলেন; ফলে সূর্য্যকিরণের তাপে সর্পেরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত বারিবর্ষণে সিক্ত হয়ে নাগেরা সেই দ্বীপে এসে উপস্থিত হল। 'রামণীয়কমাগচ্ছন্ মাত্রা সহ ভুজঙ্গমাঃ।'

ভাগবতে পরাভূত কালীয়কেও কৃষ্ণ রামণীয়ক দ্বীপে যেতে বলেছিলেন,

> “. . . এসব বলে অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে ছেড়ে দিলে সে ও তার স্ত্রীরা আনন্দিত হল। তারপর উৎকৃষ্ট পোষাক, মালা, মণি-মাণিক্য ইত্যাদি নানারকম ভূষণ উপহার দিয়ে তারা গরুড়ধ্বজ জগন্নাথকে পূজো করে প্রসন্ন করল। তারপর তাঁর আজ্ঞায় ও আনন্দে তাঁকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করে স্ত্রী-পুত্র-মিত্র-সহ সমুদ্রের মধ্যে সেই রমণক দ্বীপে চলে গেল।”[২৫]

'রামণীয়ক' বা 'রমণক' দ্বীপ সম্পর্কে 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ বলা হয়েছে,

দক্ষিণেন তু শ্বেতস্য নিযধস্যোত্তরেণ ন তু।
বর্ষং রমণকং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥
শুক্লাভি জনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সুপ্রিয় দর্শনাঃ।
দশবর্ষ সহস্রাণি শতানি দশপঞ্চচ॥
জীবন্তিতে মহাভাগ নিত্যংমুদিত মানসাঃ॥

অর্থাৎ শ্বেত পর্বতের দক্ষিণে এবং নিষধের উত্তরে রমণক এর অবস্থান। পণ্ডিতেরা রমণক দ্বীপের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেছেন,

> More authentically, 'Rāmaniyaka' of the Mahabharata can be identified with Nicobar the ancient Nakkvaram called also Nāgadvipa”[২৬]

মনসামঙ্গলেও চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রার ভৌগোলিক বিবরণে রমণককে সমুদ্র মধ্যস্থ নিকোবর দ্বীপ বলেই মনে হয়। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রার যে বিবরণ বিপ্রদাস দিয়েছেন তা নিম্নরূপ,

দরিয়া প্রবেশ হৈল চাঁদোর মধুকর।
নিশি দিশি বাহে অষ্টপ্রহর সত্বর।।
অন্তরীক্ষে হইয়া সকলে যত বলে।
ছুইয়া নৌকার লোক ধরি ততো গিলে।।
কিরাতে[র] দেশ দিয়া চাঁদ রাজা যায়।
জীয়ন্ত মানুষ ধরি তারা সভে খায়।। [২৭]

বিপ্রদাসের কাব্যে 'কিরাত' প্রসঙ্গে সম্পাদক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য হল,

> "কিরাত— কোন অনার্য জাতি। কেহ কেহ কিরাত শব্দ দ্বারা ভারতীয় মঙ্গোলয়েড্ (Indo-Mongoloid) জাতিকে বুঝাইতে চাহেন। ইহা প্রধানত হিমালয় প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এখানে কিরাত সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী কোন দ্বীপের অধিবাসীকে এখানে বুঝাইতেছে, তাহারা নিগ্রোবটু জাতির অন্তর্গত। সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে এই প্রকার অনার্য জাতির ও তাহার আর্যাচার বহির্ভূত সমাজ জীবনের বর্ণনা করিবার রীতি মধ্যযুগের প্রত্যেক সমুদ্র বর্ণনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিতান্ত গতানুগতিকতার উপর নির্ভর করিয়া ইহা রচিত হইত বলিয়া, ইহাদের বাস্তবতার দাবী নির্ভরযোগ্য নহে। [২৮]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ এবং অনার্য জাতির সমাজ জীবনের বর্ণনা 'নিতান্ত গতানুগতিকতার' উপর নির্ভর করে রচিত বলে মনে হয় না। কারণ মহাভারত ও ভাগবতে উল্লিখিত নাগেরা ভাগীরথীর উত্তর তীর অর্থাৎ হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চল থেকেই রমণক দ্বীপে প্রব্রজন করতে বাধ্য হয়েছিল। অতএব এই বিবরণের বাস্তবতার দাবী উপেক্ষণীয় নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে তুলনামূলক নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নের মাধ্যমেই বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ঘাটিত হবে।

নাগেরা তাদের সাবেক বাসভূমি থেকে 'সূর্যাভিমুখে' অর্থাৎ পূর্বদিকে যাত্রা করে শেষ পর্যন্ত নিকোবর দ্বীপে নূতন বসতি গড়ে তুলেছিল। যাত্রাপথে তারা বর্ত্তমান বিহার ও বঙ্গদেশ স্পর্শ করেছিল এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে সামান্য পরিমাণে নাগ বংশজরা এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। কারণ প্রাচীন বাংলাদেশের কয়েকটি নাগপূজক জাতি দক্ষিণ ভারতে গিয়ে খ্রীঃ পূঃ কালে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিল বলে প্রাচীন দ্রাবিড় সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে। [২৯]

আর্যদের সঙ্গে সংঘাতে যখন নাগেরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল তখন মনসা পুত্র আস্তীক নাগদের রক্ষা করেছিলেন। আস্তীকের জন্মের প্রয়োজনে বাসুকী ভগ্নী বৃদ্ধ যাযাবর এবং ভরণপোষণে অক্ষম পুরুষকে বিবাহ করেছিলেন। যাযাবর জরৎকারু পত্নীর গর্ভসঞ্চারের পর পত্নীকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে ইতঃস্তত করেন নি। নিজেকে বঞ্চিত করে বাসুকী-ভগ্নী গোষ্ঠী স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, বোনের এই অবদানের জন্য বাসুকী তাঁকে সম্মানিত করতে

দ্বিধা করেন নি। নাগরাজের এই সম্মান প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতেই নাগকন্যা জরৎকারু দেবীত্বের আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। এবং সেই সূত্রেই পরবর্তীকালে নাগ গোষ্ঠীর মধ্যে তার পূজা ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল। মানবী কন্যার দেবীত্বে রূপায়ণের এরকম উদাহরণ প্রাগার্য সমাজে আরও রয়েছে। প্রাগার্য আদিম অধিবাসীরা ছিলেন মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মায়ের প্রাধান্য সুস্পষ্ট, সন্তানের পরিচিতিও মাতৃ পরিচয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট --- মা-ই পরিবার তথা সমাজের কেন্দ্র বিন্দু। এজন্যই প্রাগার্য সমাজে ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার ভাবনাই প্রথম উদ্ভুত হয়। বৈদিক আর্য সমাজ পিতৃতান্ত্রিক বলেই বৈদিক সাহিত্যে পুরুষ দেবতার এত প্রাধান্য। নাগেরা প্রাগার্য জনগোষ্ঠী, কাজেই এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে বাসুকী ভগ্নী খুব সহজেই দেবীত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। অর্থাৎ নাগদের সঙ্গে আর্যদের সংঘাতের পরবর্তী কাল থেকেই তাদের সমাজে নাগকন্যা জরৎকারু পূজার উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তী কালে নাগেরা যখন পূর্বাভিমুখে প্রব্রাজন করতে থাকে তখন সঙ্গত কারণেই নাগকন্যা উপাসনার ধারাও এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ বিহারে প্রাপ্ত মূর্তি আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারের মন্তব্যও এই ধারণার সমর্থক। এই প্রক্রিয়াতেই বাংলাদেশে মনসাপূজার উদ্ভব হয়েছিল। অবশ্য নাগেরা শুধু পূর্বাভিমুখেই আসেনি সমগ্র ভারত জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল এজন্যই ভারতবর্ষে নাগপঞ্চমী তথা সর্প উপাসনার এত বাহুল্য ও আড়ম্বর।

৪.

মনসার সঙ্গে বণিক চাঁদ সওদাগরের সংঘাতের বীজও নিহিত রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে। বৈদিক সাহিত্যে নৌবাণিজ্যের পর্যাপ্ত উল্লেখ রয়েছে। ঋক্‌বেদ-এর দশম মণ্ডলে ৪৮ নং সূক্তে সমুদ্রে নৌকা প্রেরণের কথা আছে।

উষাসোমা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাম্।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ॥ [৩০]

[উষা পুরাকালে প্রভাত করতেন, অদ্যও প্রভাত করেছেন; ধনলুব্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে, উষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জিত হয়, উষা তা সেরূপে প্রেরণ করেন।]

১১৬ নং সূক্তে দেখা যায় তুগ্র তার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠিয়েছেন এবং অশ্বিদ্বয় তাকে উদ্ধার করে এনেছেন:

তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমুবাঅবাহাঃ।
তুমুহতু নৌ ভিরাত্মবতীভিরন্তরিক্ষপ্রুড্ভিরপোদকাভিঃ॥ [৩১]

[কোন ম্রিয়মান মানুষ যেরূপ ধনত্যাগ করে সেরূপ তুগ্র অতিকষ্টে তার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠালেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদের নৌকাসমূহ দ্বারা তাকে ফিরিয়ে এনেছিলে! সে নৌকা জলে ভেসে যায় তাতে জল প্রবেশ করে না।]

বাণিজ্যযাত্রাকালে বণিকদের সমুদ্রস্তুতির রেওয়াজ ছিল—

নু রোদসী অহিনা বুধ্নোন স্তবীত দেবী অপ্যেভিরিষ্টৈঃ।
সমুদ্রং ন সঞ্চরণে মনিষ্যবো ঘর্মস্বরসো নদ্যো অপব্রন্॥ [৩২]

[হে দাব্যা পৃথিবীদ্বয়! যেমন ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সমুদ্র মধ্যে গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে সেরূপ অভিলষিত কার্যলাভের জন্য অহিবুধ্ন্য নামক দেবতার সাথে তোমাদের স্তুতি করি।]

সামবেদেও বাণিজ্য যাত্রার কথা রয়েছে। অথর্ববেদের তৃতীয় কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের পঞ্চম সূক্তে বাণিজ্যে লাভ নিমিত্ত হোমের উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের এই সমৃদ্ধ নৌবাণিজ্য প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "Rigveda contains several references to sea voyages undertaken from commercial and other purposes. One passage represents 'varuna' having full knowledge of the ocean routes along which vassels sail." [৩৩]
>
> (Indian Shipping)

পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যেও সমুদ্রযাত্রার তথা নৌবাণিজ্যের পর্যাপ্ত উল্লেখ রয়েছে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে বণিক ধনমিত্রের কাহিনী, শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকে কৌশাম্বী নগরের বণিকদের কথা, 'দশকুমার চরিত'এ বণিক রত্নোদ্ভবের কাহিনী, সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'এ পুষ্করাবতীর বণিক ব্রহ্মদত্ত, চিত্রকূটের সওদাগর রত্নবর্মণ, হর্ষপুরার শ্রেষ্ঠী সমুদ্রশূরের সমূদ্র অভিযানের কাহিনী, ভর্তৃহরির 'নীতিশতক'এ সমুদ্রগামী জাহাজের জয়গান—এসব কিছুই প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ নৌবাণিজ্যের ঐতিহ্যের দ্যোতক।

বিভিন্ন জাতক কাহিনীতেও সমুদ্র যাত্রা ও নৌবাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতকে একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, বাণিজ্যগামী বণিকদের সঙ্গে নাগদের সংঘাত। 'উবকদপান জাতক'এ দেখা যায়, বণিকেরা কূপ খননের মাধ্যমে প্রভূত মণি মাণিক্য লাভ করার পর অতিরিক্ত খনন জনিত কারণে নাগরাজের বিমান ধ্বংস হওয়ায় নাগরাজ বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য বণিকদের হত্যা করেন।[৩৪] 'মহাবাণিজ জাতক'এও লোভী বণিকেরা যখন আরও ধন লাভের আশায় ন্যগ্রোধ বৃক্ষটিকে সমূলে ছেদন করতে উদ্যত হল তখন নাগরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলেন পর্যাপ্ত পরিচর্যার পর বণিকদের এহেন আচরণ তাদের লোভেরই পরিচায়ক, অতএব এই বণিকেরা দণ্ডার্হ। নাগরাজ তখন সেনা সমবেত করে সার্থবাহ ব্যতীত অন্য বণিকদের হত্যা করেন।[৩৫]

বৈদিক সাহিত্যের স্থিতিকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১২৫০ থেকে ৬০০ অব্দ। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দে তক্ষশীলার নিকট শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন পাণিনি। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের মাধ্যমে লৌকিক সংস্কৃতের জন্ম হয়। পালি ভাষার উৎপত্তি ঠিক কোন সময়ে হয়েছিল বলা না গেলেও এটুকু অনুমান করা যায় খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে ৮০০ অব্দের মধ্যে কোন

এক সময়ে পালি ভাষার জন্ম হয়। অর্থাৎ বৈদিক, সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে যে নৌবাণিজ্যেব কথা আছে তা খ্রীঃ পূঃ কাল থেকে খ্রীষ্টীয় কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক ইতিহাস। এই ধারাবাহিকতাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পালি সাহিত্যে বণিকদের সঙ্গে নাগদেব সংঘাতেব বিববণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নৌবাণিজ্যে যাতায়াতকারী বণিকদেব প্রধান শত্রু ছিল দ্বীপবাসী নাগেরা;— 'জরুদপান জাতক' ও 'মহাবণিজ জাতক'এর কাহিনী দুটি এরই ইঙ্গিতবাহী।

বৈদিক-সংস্কৃত সাহিত্যে নৌবাণিজ্যেব পর্যাপ্ত উল্লেখদৃষ্টে মনে হয়, সমুদ্রগামী বণিকদের পরিচিতি আর্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং জাতকে নাগ বণিক সংঘাতের যে বিববণ তা অতীতেব আর্য-নাগ সংঘাতেরই বেশ। এক সময়ে আর্যদেব দ্বারা নিপীড়িত নাগেরা আর্য সংস্কৃতিভুক্ত ব্যক্তিদের যে বিদ্বেষেব চোখে দেখবে এবং শত্রুরূপে গণ্য কববে এটাই তো স্বাভাবিক।

শুধু নৌবাণিজ্যই নয়,— নৌকা নির্মাণেও ভারতবর্ষেব বাস্তুবিদেবা যে পর্যাপ্ত দক্ষ ছিলেন নৌনির্মাণ বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ 'যুক্তি-কল্প-তরু'ই তার প্রমাণ।

> "The very first book written on the subject of shipbuilding was the Sanskrit work, Yukti-Kalpa-Taru, authored by Bhoj Narapati, in first century A.D. The author says that the type of wood required for the construction of a particular type of ship is to be selected according to the directions given in another work, Briksha-Ayurveda (botany)."[৩৬]

'যুক্তি-কল্প-তরু' অনুযায়ী নৌকা দ্বিবিধ— 'সামান্য' ও 'বিশেষ'। 'বিশেষ' নৌকাই সমুদ্র গমনের উপযোগী। 'বিশেষ' নৌকাব প্রকাবভেদ সম্পর্কেও ভোজ নবপতি আলোচনা কবেছেন।

দীর্ঘা চৈবোন্নতা চেতি বিশেষে দ্বিবিধা ভিদা।।
বাজহস্তদ্বয়াযামা অষ্টাংশপবিণাহিনী।
নৌকেয়ং দীর্ঘিকা নাম দশাঙ্গে (দশাংশে) নোন্নতাপিচঃ।।
দীর্ঘিকা তবণির্লোলা গত্ববা গামিনী তবিঃ।
জঙ্ঘালা প্লাবিনী চৈব ধাবিণী বেগিনী তথা।
বাজহস্তৈকৈকবৃদ্ধ্যা নৌকা নামানি বৈ দশ।
উন্নতি পবিণাহশ্চ দশাষ্টাংশমিতৌ ক্রমাৎ।। [৩৭]

[বিশেষ নৌকার দীর্ঘা ও উন্নতা এই দুই প্রকাব ভেদ আছে। রাজহস্তদ্বয দৈর্ঘ্য, তাহার অষ্টমাংশ বিস্তার এবং ইহার দশমাংশ উন্নতি, এই অনুপাতে পবিমাণানুসাবে নৌকা দীর্ঘিকা নামে অভিহিত। উহার এক হস্ত পবিমাণ বৃদ্ধি করিলে দীর্ঘিকা, লোলা, গত্ববা, গামিনী, তরী, জঙ্ঘালা, প্লাবিনী, ধাবিণী ও বেগিনী— দীর্ঘা নামক বিশেষ নৌকাব এই দশ প্রকাব নাম হইয়া থাকে। ইহাদেব বিস্তাব ও উন্নতি যথাক্রমে দৈর্ঘ্যেব অষ্টমাংশ এবং দশমাংশ।]

'শঙ্খ জাতক'এর কাহিনীতে একটি সমুদ্রগামী নৌকার বিবরণ রয়েছে। শঙ্খ নামক এক আঢ্য ব্রাহ্মণ তার মহাদান ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য ধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পোতারোহণে সুবর্ণ ভূমির দিকে রওয়ানা হলেন। শঙ্খের পোত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হলে সাতদিন ভাসমান থাকার পর সমুদ্ররক্ষিণী দেবী মণিমেখলা শঙ্খকে উদ্ধার করেন এবং সপ্তরত্নময় এক পোত নির্মাণ করে সপ্তরত্নে তা পূর্ণ করে দেন।

> "উহার দৈর্ঘ্য আট উসভ (১৪০ × ৮ হাত), বিস্তার চারি উসভ, এবং বেধ ২০ ষষ্ঠিক (২০ × ৭ হাত) ছিল। উহার মাস্তল তিনটী ইন্দ্রনীল মণিময়, তৎসংলগ্ন রজ্জুগুলি সুবর্ণময়, বাতপট্টগুলি রজতময় এবং অরিত্রগুলিও সুবর্ণময়।" [৩৮]

এসব উল্লেখের পাশাপাশি চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরণীর বিবরণ অংশটুকু মিলিয়ে দেখলে মনসামঙ্গলকে ঐতিহাসিক কাব্য বলেই মনে হয়।

প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সেই নাএ চলিল লক্ষের সদাগর॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজুসিজু।
গাঙ্গের দুই কূল ভাঙ্গিয়া বেকা করে উজু॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা দেখি॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা ভাড়ার পাটুয়া।
যেই নাএ উঠাইয়া লইল তাম্বিলের নাটুয়া॥
তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে শঙ্খচূড়।
সমুদ্রের দুইকূল ভাঙ্গে পাতালে ঠেকে মুড়্॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা অজয় শেল পাট।
যাহার উপরে মিলিয়াছে শ্রীফলার হাট॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
অনেক নাএ ঝড়বৃষ্টি অনেক নাএ খরা॥ [৩৯]

৫.

মনসামঙ্গল যেহেতু বাংলার দেশজ কাব্য এক্ষেত্রে তাই পূর্ব ভারতীয় এই অঞ্চলে নৌবাণিজ্যের কোন ঐতিহ্য ছিল কি না এ প্রশ্ন সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ রণতরীর উল্লেখ রয়েছে। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে রঘু

বঙ্গানুৎ খায় তরসা নেতা নৌসাধনোদন্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ॥ [৪০]

[অধিনায়ক রঘু রণতরী সহ সংগ্রামে উদ্যত বঙ্গদেশের রাজাদের সবলে উৎখাত করে গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্তী দ্বীপগুলিতে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন।]

শুধু নৌযুদ্ধেই নয়, — বাণিজ্যেও বাঙ্গালীরা ছিল যথেষ্ট পারদর্শী। বাংলার নৌবাণিজ্যের ঐতিহ্যের পরিচিতি প্রসঙ্গে রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

> "Curiously enough, we have more positive evidence of foreign trade of Bengal. This is mainly due to the fact that the overseas trade of a large part of North India passed through Bengal and its well-known parts at the mouth of the Ganges. Strabo, the great Greek Geographer and historian, who wrote his famous 'Geography' between A.D. 17 and 23, refers to the 'ascent of vessels from the sea by the Ganges to Palibothra, and his information is probably derived from Megasthenes (fourth century B.C.). We learn from a number of jataka stories that merchant and businessmen took ships at Benaras, or lower down to Champā (modern Bhagalpur), and then either made coasting voyage to Ceylon or crossed the Bay of Bengal to Suvarnabhumi being "for many days without sight of land."[৪১]

বাংলার লোককথায় ও পূর্ববঙ্গীয় গাথাকাব্যে সওদাগর ও নৌবাণিজ্যের পর্যাপ্ত উল্লেখ রয়েছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য অনুযায়ী উত্তর ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটা বড় অংশই বঙ্গদেশ হয়ে বিদেশে যেত। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর ভারতে আর্যপ্রাধান্য সূচিত হয়েছিল আগে আর বাংলাদেশেও খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই আর্যীকরণ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্তব্য নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয় যে, তাম্রলিপ্তি বন্দর দিয়ে যে সব বণিকেরা যাতায়াত করতেন তাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি ছিল আর্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ঐতিহ্যগত কারণেই তারা ছিলেন নাগবিরোধী।

মূল ভূমি থেকে প্রব্রজন করে যে সব নাগেরা 'সূর্য্যাভিমুখে' অর্থাৎ পূর্বাঞ্চল স্পর্শ করে রমণক দ্বীপে চলে গিয়েছিলেন, আর্য প্রভাবের কালে বর্ণাশ্রম এর প্রকোপে এবং পূর্বতন বিবাদের সূত্রে তারা যে ব্রাত্য শূদ্র বলে গণ্য হয়েছিলেন এটাই স্বাভাবিক। অন্যত্রও শূদ্র করণের ইঙ্গিত রয়েছে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'এ সর্প শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে 'হরিবংশের' একটি কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে। সর্পেরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। সগররাজ এঁদের বধ করতে উদ্যত হলে তারা বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হন। সগর বশিষ্ঠের আদেশে এদের বেদধর্ম বহিষ্কৃত করেন।

লক্ষণীয় যে নৌবাণিজ্যে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার জন্য বণিকেরা মাঝি-মাল্লারূপে শূদ্রদেরই নিযুক্ত করতেন।

> "The merchants and adventurers required company of a large number of people to take with them for assistance and manning various jobs. Majority of the people thus recruited consisted of the poor of lower castes or shudras."[৪২]

অতএব এ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, বিঘ্ন সংকুল সমুদ্রযাত্রায় মাঝি-মাল্লারা তাদের রক্ষাকারিণী দেবীর পূজা করতে চাইবে, কিন্তু পূর্ব শত্রুতা বশতঃ আর্য বণিকদের তরফে বাধা আসবে। চাঁদ সওদাগর যাত্রাপথে মনসার মন্দির দেখে তা ভেঙ্গে ফেলেছেন ;

প্রবেশ করিল চাঁদ কালীদহ জলে।
বাতালি চাপিয়া চাঁদ উঠে গিয়া কূলে॥
মনসার ঘটে মারে হেতালের বাড়ি।
ভাঙ্গিয়া পদ্মার ঘট যায় গড়াগড়ি॥
কুবুদ্ধি লাগিল রাজা ভাঙ্গিয়া দেহারা।
মন্দিরের যত ধনে ডিঙ্গা কৈল ভরা।[৪৩]

অনিশ্চিত সমুদ্রযাত্রায় মাঝি মাল্লাদের মনে সংস্কারের প্রাবল্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। সেই সংস্কারের বশেই চাঁদ সওদাগরের যাত্রাসঙ্গী অভিজ্ঞ কর্ণধার তাকে বলেছিল,

অই কালীদহেতে মনসার অধিকার।
ঝড়বৃষ্টি নহে শুন নাগ অ[ব]তার॥
অই ত দেউল ধবজা দেখহে, রাজন।
নাগের প্রতাপে রক্ষা নাহিক জীবন॥
মনসার পূজা তুমি কর এক মনে।
তবে ধন প্রাণ লৈয়া বা যাই পাটনে॥
যদি দম্ভ দোষে নাহি পূজ মনসায।
ধনপ্রাণ বুহিত্র মজিল কালীদয়॥[৪৪]

বোঝা যায় পাটনে যাবার সময় নিরুপদ্রব যাত্রার কামনায় নাগদেবী মনসাকে পূজা করার একটা রেওয়াজ মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। শেষ পর্যন্ত সমুদ্র পথের সুখ দুঃখের সঙ্গীদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য চাঁদ সওদাগরকে মনসাপূজা করতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে একটা চাপ যে তার উপর ছিল এমন ইঙ্গিতও রয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যে।

ব্রাহ্মণে হাতে ধরে শূদ্রে ধরে পাএ।
পাত্রগণে চান্দের আগে কহিয়া বোঝায়॥
একদিন পূজ সাধু জয় বিষহরী।
ধনে পুত্রে ঘর লহ চম্পক অধিকারী॥[৪৫]

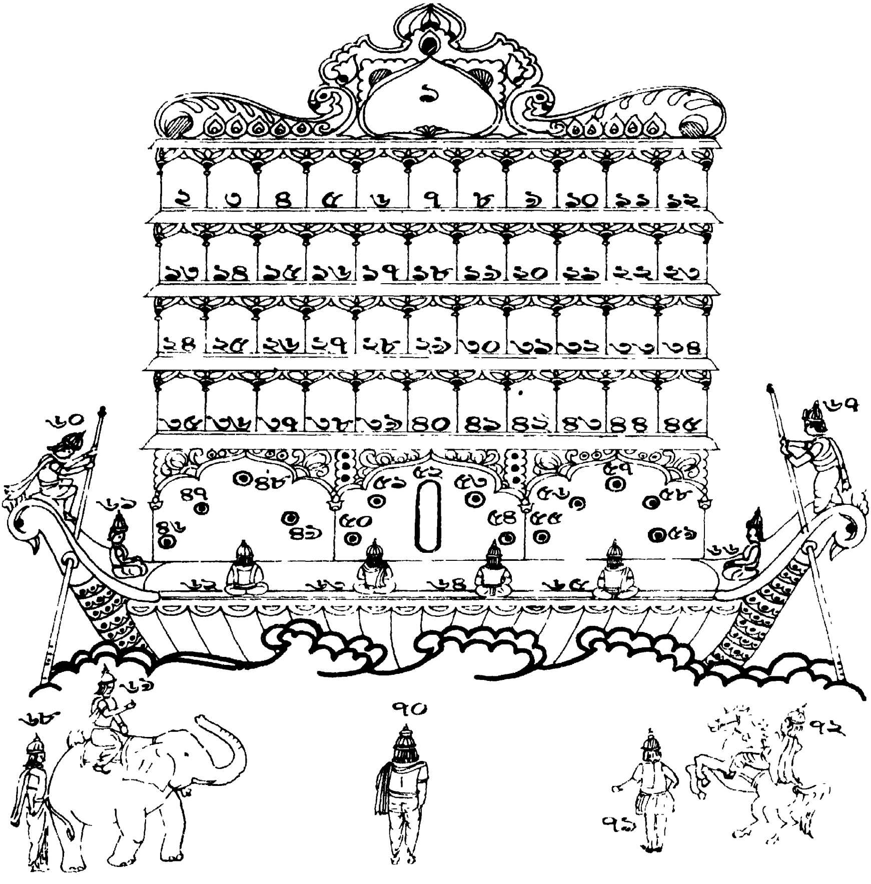
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৬০
৪৮
৫১
৫২
৫৩
৫৭
৬৭
৪৭
৫৬
৫৮
৬১
৪৬
৪৯
৫০
৫৪
৫৫
৫৯
৬৬
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৯
৬৮
৭০
৭২
৭১

নৌকাপূজা : মূর্তি পরিচিতি

১. যুগল কৃষ্ণ ২. ব্রহ্মা ৩. বিষ্ণু ৪. দক্ষরাজ ৫. মহাকাল ভৈরব ৬. নন্দী ৭. মহাদেব
৮. ভৃঙ্গী ৯. উমানন্দ ভৈরব ১০. হরিহর ১১. হরগৌরী ১২. পঞ্চানন ১৩. অগ্নি
১৪. ঈশান ১৫. নৈঋত ১৬. বায়ু ১৭. ইন্দ্র ১৮. ধর্মরাজ ১৯. চিত্রগুপ্ত
২০. আস্তিকমুনি ২১. নারদমুনি ২২. জরৎকারু মুনি ২৩. কুবের ২৪. মৎস্য
২৫. কূর্ম ২৬. বরাহ ২৭. নরসিংহ ২৮. বামন ২৯. পরশুরাম ৩০. শ্রীরাম
৩১. বলরাম ৩২. লক্ষ্মীনারায়ণ ৩৩. বুদ্ধ ৩৪. কল্কি ৩৫. চন্দ্র ৩৬. সূর্য
৩৭. মঙ্গল ৩৮. বুধ ৩৯. বৃহস্পতি ৪০. শুক্র ৪১. শনি ৪২. রাহু
৪৩. কেতু ৪৪. ষষ্ঠী ৪৫. রূপসী ৪৬. কাত্যায়নী ৪৭. জয়া ৪৮. গঙ্গা
৪৯. বিজয়া ৫০. সোমেশ্বরী ৫১. নেতা ৫২. বিষহরি ৫৩. সুগন্ধা
৫৪. ভুবনেশ্বরী ৫৫. গণেশ ৫৬. সরস্বতী ৫৭. দুর্গা ৫৮. লক্ষ্মী ৫৯. কার্ত্তিক
৬০. লীলাই মাঝি ৬১. শ্রীধর ৬২. গদাধর ৬৩. জটাধর ৬৪. ষষ্ঠীধর
৬৫. বিদ্যাধর ৬৬. শ্রীধর পণ্ডিত ৬৭. দোলাই মাঝি ৬৮. সুনুকা
৬৯. চাঁদ সওদাগর ৭০. ধন্বন্তরি ওঝা ৭১. বেহুলা ৭২. লখীন্দর

স্কেচ : শ্রী বাচ্চু দাস

মনসামঙ্গল কাব্য যে নিম্নবর্ণের সমাজ থেকে উদ্ভূত কাব্য দেহেই সে পরিচয় সংলগ্ন রয়েছে। মনসার বিশ্বস্ত সঙ্গিণী নেতা রজক সম্প্রদায়ভুক্ত।

মহাদেব বলে, "মাতা, কি বলিব আমি।
মনসাব প্রিয় পাত্র হইয়া থাক তুমি॥ . . .
নেত্রে জন্ম হইল না গেলাম দেবপুবী।
সকলে বলিবে মোরে রজক কুমারী॥. . ."
হাসিয়া বলিল তখন দেবী পদ্মাবতী।
ইহারে দোসর মোবে দিলা পশুপতি॥ [৪৬]

কেতকাদাসকে মনসা দেখা দিয়েছেন মুচিকন্যা রূপে,

একেশ্বর হৈলু যদি খড় না মিলায বিধি
কপালে লিখিল এই লাগি।
আচম্বিতে আইল ঝড় পগার-গোড়ায খড়
সমুখে দাঁড়ায মুচি মাগী॥
সেই গ্রামে কর্ম্মকাব পগাব-গোডায তাব
খড কাটিবাবে রহি আমি।
মুচিনীব মূর্তি ধবি বলে জয বিষহবি
সত্য কহ, কোথা আছ তুমি॥ [৪৭]

স্বামীকে পুনর্জীবিত করে বেহুলা ডোমেব মেয়ের ছদ্মবেশে চাঁদ সওদাগবেব পুরীতে এসেছিলেন।

বেনোলি বলেন বাণী শুন শুন গুণমণি
শুন, শুন প্রাণের ঈশ্বব।
ডোম্‌নী মূরতি ধরি বিচনি হস্তেত কবি
দেখি যাযা চাঁপালি নগর॥". . .
অধরে করিল ছটা ললাটে সিন্দুবের ফোঁটা
গলাত পরে জবাব মালা।
বুকেত কাঁচুলি চলিলেক ডোম নারী
মনরঙ্গে চলিল বেহুলা॥ [৪৮]

চাঁদ সওদাগর বাব বার মনসাকে 'লঘু জাতি' বলে গালি দিয়েছেন।

আশ্বিন মাসের দিন নবদুর্গার পূজা।
সবায়ে পূজিল চান্দ রাজা॥
মোবে গালি পাড়ে চান্দে— লঘু জাতি কনী গো॥ [৪৯]

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা দেশে মনসা পূজার উদ্ভবের একটি সময়কাল নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে। মনসামঙ্গল কাব্য পাঠে এটুকু বোঝা যায় সমাজে শ্রেষ্ঠী প্রাধান্যের যুগে মনসার উদ্ভব হয়েছিল। খ্রীঃ পূঃ কাল না হলেও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে যে তাম্রলিপ্তির অস্তিত্ব ছিল এ সম্পর্কে ইতিহাসবিদেরা একমত। এ সময় থেকেই মোটামুটিভাবে শ্রেষ্ঠীদের প্রাধান্যের সূচনা হয় এবং সমাজে তাদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেন-এর সভাকবি গোবর্ধন আচার্যের সাত শত শ্লোকে লেখা প্রেমকাব্য 'আর্যাসপ্তশতী'তে এমন দুটি শ্লোক রয়েছে যাতে স্পষ্টই বোঝা যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় সমাজে বণিক প্রাধান্য প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শ্লোক দুটি হল, —

তে শ্রেষ্ঠিনঃ ক্ক সম্প্রতি শক্রধ্বজ যৈ কৃতস্তবোচ্ছ্রায়ঃ।
ঈষাং বা মেঢ়িং বাধুনাস্তনা ত্বাং বিধিৎসন্তি।। [৫০]

[হে শক্রধ্বজ (ইন্দ্র পূজার জন্য প্রোথিত দণ্ড), সম্প্রতি কোথায় সেই বৈশ্য দল, যাহারা মর্যাদা দিবার জন্য তোমার পূজা-আর্চা করিত; এখনকার লোকেরা তোমাকে লাঙ্গলদণ্ড বা গোবন্ধন স্তম্ভরূপে ব্যবহার কবিবে।]

বলমতিবসতি ময়ীতি শ্রেষ্ঠিনি গুরুগর্বগদ্গদং বদতি।
তজ্জায়য়া জনানাং মুখমীক্ষিতমাবৃত স্মিতয়া।। [৫১]

['আমার অনেক বল আছে'— অতি গর্বে গদ্গদ্ বচনে শ্রেষ্ঠী এই কথা বলিলে, তাহার জায়া সঙ্কুচিত স্মিত হাস্যে উপস্থিত মানুষগুলির দিকে তাকাইল।]

এক সময়ে বৈশ্যেরা যে দণ্ডে সমারোহের সঙ্গে ইন্দ্রেব পূজা করত এখন তা গরু বাঁধার খুঁটিতে পরিণত হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠী-জায়া স্বামীব বল সম্পর্কে উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ সামাজিক ক্ষেত্রে তো বটেই পাবিবারিক ক্ষেত্রেও বণিকদেব সেই সমৃদ্ধি আব অবশিষ্ট ছিল না। এ সব তথ্যসূত্র থেকে মনে হয়, বঙ্গদেশে মনসা পূজাব উদ্ভব হয়েছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী কালে। তাও এই সময় সীমার শেষেব দিকে নয়, প্রথম দিকে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে আরও দুটো যুক্তি উপস্থাপিত করা যেতে পারে। মহাভারতে জরৎকারুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনীতে 'মনসা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

স ঊর্দ্ধরেতাস্তপসি প্রসক্তঃ স্বাধ্যায়বান্ বীতভয়ঃ কৃতাত্মা।
চচার সর্ব্বাং পৃথিবীং মহাত্মা ন চাপি দারান্ মনসাপ্যকাঙ্ক্ষতা।। [৫২]

[তিনি ঊর্দ্ধরেতা, তপস্যায় প্রবৃত্ত, বেদপাঠে নিরত, নির্ভয় চিত্ত এবং ধর্ম্ম নিবিষ্ট বুদ্ধি হইয়া, সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মনে মনেও স্ত্রী কামনা কবিলেন না।]

মনসার 'বিষহরী' নামটিও খুবই জনপ্রিয়। মহাভারতে এই শব্দটিও পাওয়া যায় তবে 'বিষহরী' এখানে একটি বিদ্যার নাম, বিষ চিকিৎসা সংক্রান্ত এই বিদ্যাটি ব্রহ্মা কশ্যপকে শিখিয়েছিলেন।

ইত্যুক্ত্বা সৃষ্টি কৃদ্দেবস্তং প্রসাদ্য প্রজাপতিম্।
প্রাদাদ্বিষহরীং বিদ্যাং কশ্যপায় মহাত্মনে।। [৫৩]

[এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা কশ্যপকে আশ্বস্ত করিয়া, তাঁহাকে বিষহরী বিদ্যা দান করিলেন।]

এক্ষেত্রে অবশ্য মনসার সঙ্গে শিবের সম্পর্কটি অমীমাংসিত থেকে যায়। উত্তরে বলা যায়, চাঁদ সওদাগর মনসাকে পূজা করবার পর মনসা ধীরে ধীরে উচ্চতর সমাজে প্রাধান্য লাভ করতে থাকেন। অনার্যস্তর থেকে যে সব দেবতারা আর্যস্তরে উন্নীত হয়েছেন তাদের অধিকাংশের পিতৃ পরিচয়ের সঙ্গে শিবকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মনসা ছাড়াও এরকম একজন জনপ্রিয় দেবতা কার্তিক। শিবের ঔরসজাত হলেও কোন দেবীর গর্ভে এদের জন্ম হয়নি। শিবের স্খলিত বীর্য থেকেই মনসা ও কার্তিকের জন্ম। এছাড়াও শিব-মনসা কাহিনী লৌকিক স্তর থেকে উদ্ভূত। মনসার আর্যীকরণের অন্যবিধ ইঙ্গিতগুলো হল— কৃষ্ণ মনসার পূজা করেছেন, ইন্দ্র মনসার পূজা প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন, মনসাকে সামবেদ পড়ানো হয়েছে।

উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে মনসার উদ্ভব হয়ে থাকলে মনসামঙ্গল কাব্য রচনায় এত দেরী হল কেন? খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের আগে লেখা কোন মনসামঙ্গল পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে এরকম অনুমান করা যেতে পারে— নিম্নবর্ণের মানুষদের এই সাংস্কৃতিক উত্তরণের কাহিনী প্রথমে মুখে মুখে গড়ে উঠেছিল। এবং সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে মাঝি-মাল্লারা এই নাট্যধর্মী কাহিনীটি গান করত। এজন্যই হয়ত মনসামঙ্গল কাব্যের লোকায়ত পরিচিতি 'ভাসান যাত্রা' (ভাসানে যাত্রা করবার উপলক্ষ্যে গীত গান), 'রয়ানী গান' (রওযানা হবার সময়কালের গান) ইত্যাদি। মনসা পূজার সঙ্গে যে নৌকার একটি সংযোগ আছে তা বোঝা যায় স্থানীয় একটি আচারে।

> "কাল সন্ধ্যার সময় ও অপরাহ্নে কয়েকটী নৌকায় মনসা প্রতিমা নিয়া গান বাজনা করিয়া বিসর্জন করিতে বাহির হইয়াছিল। এখানকার এই রীতি। নৌকায় মূর্তি নিয়া ঝাঁজ করতাল বাজাইয়া গান গাহিয়া পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া মূর্তি বিসর্জন করে।
>
> সংক্রান্তি দিন প্রত্যেকেই নৌকায় পাঁচটি করিয়া সিন্দূরের ফোঁটা দিয়াছে। যার যত নৌকা আছে প্রত্যেক নৌকাতেই পাঁচ পাঁচটী সিন্দুরের ফোঁটা দিবে।" [৫৪]

পরবর্তীকালে মনসাপূজা যখন আরও জনপ্রিয় হল এবং উচ্চবর্ণের লোকেরাও এ পূজায় আগ্রহী হলেন তখনই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে মৌখিক ঐতিহ্যাশ্রিত মনসা কাহিনীকে কবিরা লিপিবদ্ধ করতে উদ্যোগী হলেন। এছাড়া অন্যবিধ কারণও থাকতে পারে। সুরমা-বরাক উপত্যকায় মনসামঙ্গল গানের অন্য পরিচিতি 'গুরমার গান' অর্থাৎ নপুংসক গায়ক কর্তৃক গীত গান। এখন স্বাভাবিক নারী পুরুষেরা এ গান গাইলেও এক সময় শুধু নপুংসকেরাই এই গান করতেন। ফলে এসব গানের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষেরা ছিলেন উন্নাসিক। মনসামঙ্গলের আদি কবি কানা হরিদত্তের কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু হরিদত্ত সম্পর্কে তাঁর

পরবর্তী কবি বিজয়গুপ্তের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পূর্বসূরীকে উদ্দেশ্য কবে তিনি মন্তব্য করেছেন 'মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য'। হয়ত হরিদত্তের কাব্যে এমন কোন উল্লেখ ছিল যাতে আর্য অহংবোধে আঘাত লেগেছিল। বর্ণাশ্রম প্রথার প্রেক্ষাপটে যাদের মানসিক বিকাশ সেই সমাজেব প্রতিনিধি বিজয় গুপ্ত পূর্বসূরীর এই ঔদ্ধত্য সুনজবে দেখেননি,— এজন্যই হয়ত তার এই রূঢ় মন্তব্য। হরিদত্তের কোন পুঁথি না পাওয়ার এটাও হয়ত একটা কারণ। আদিকবির এই কাব্য ক্রমেই সমাজে অনাদৃত হয়ে পড়েছিল। ফলে পুঁথিরও কোন প্রতিলিপি হয়নি।

৬.

মনসার উৎপত্তির এই প্রেক্ষাপটে সুরমা-বরাক উপত্যকাব নৌকাপূজার উৎস নিহিত রয়েছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'এ উল্লিখিত চাঁদ সওদাগবেব 'বহিত্র পূজা'ই বর্তমান নৌকাপূজা। এই সমারোহ পূর্ণ পূজা এক সময় সমগ্র বাংলা দেশেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি কালে বণিক প্রাধান্য লুপ্ত হবাব ফলে এই ব্যয় বহুল পূজা ধীরে ধীরে বঙ্গদেশের অন্য অঞ্চল থেকে অবলুপ্ত হযে যায। সুরমা-বরাক উপত্যকায় ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক কারণেই এখনও নৌকাপূজা টিঁকে আছে। ইতিহাসবিদ্‌দের অনুমান বর্তমান শ্রীহট্ট পর্যন্ত একসময় বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত ছিল।

> "It is however, certain that in ancient times a large part on of Srihatta were included in a large sea, in all probability the Bay of Bengal. In Cachar. Karimganj and Sylhet districts there are large lakes that are locally called hāor which is believed to be a corruption of Sāgar (or sea). Hüentsang (7th century A.D.) described Sylhet as Shi-Li-Cha-talo which was to the north east of Samatata among the hills near sea."[৫৫]

অতীতে সমুদ্রতীরে অবস্থিত শ্রীহট্ট একটি সমৃদ্ধ বন্দব ছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। পরবর্তী সময়েও শ্রীহট্টের নৌবন্দরের উল্লেখ পাওযা যায়। দশম শতাব্দীতে শ্রীচন্দ্রের তাম্রলিপিতে 'ইন্দ্রেশ্বরনৌবন্ধ' অর্থাৎ ইন্দ্রেশ্বর বন্দরের উল্লেখ রয়েছে। এই বন্দরের বিস্তৃতি ছিল ৫২ পাটক।[৫৬] নৌকা নির্মাণেও শ্রীহট্টের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সিলেট জেলা গেজেটিয়ারেও নৌকা নির্মাণে স্থানীয় ঐতিহ্যের কথা আলোচিত হয়েছে।[৫৭] নৌকা শুধু এ অঞ্চলে প্রয়োজনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত নয়,— নৌকা কেন্দ্রিক ক্রীড়া, সারিগান, ভাটিয়ালী গান সুরমা বরাক উপত্যকার নিজস্ব ঐতিহ্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে 'বাঙ্গাল' মাঝিদের উল্লেখ আছে। কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বাঙ্গাল মাঝির খেদোক্তি আছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য হল—

> "মুকুন্দরামের বর্ণনা পাঠ করলে বুঝা যায়, সমুদ্রগামী নৌকা চালনার কার্য পূর্ববঙ্গীয় মাঝিদিগেরই একচেটিয়া বৃত্তি ছিল। 'কান্দে যত বাঙ্গাল হৈনু কাঙ্গাল'— কেতকাদাস। ইহাব সঙ্গে মুকুন্দরামের এই অংশ তুলনীয়—
>
> এইরূপে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল।
> জনমের মত সবে হইলুঁ কাঙ্গাল।।
>
> বলা বাহুল্য, কেতকাদাসের রচনা মুকুন্দরামেরই প্রত্যক্ষ অনুকরণজাত। বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) + আল, বঙ্গাল, বাঙ্গাল; সর্ব্বানন্দের টীকাসর্বস্ব, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থেও পূর্ববঙ্গবাসী অর্থে 'বাঙ্গাল' শব্দেব ব্যবহার আছে। আধুনিক বাংলায় বাঙ্গালী শব্দ পূর্ব পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গবাসীদিকেব উপর প্রযোজ্য, কিন্তু প্রাচীনতব শব্দ 'বাঙ্গাল' পূর্ববঙ্গবাসীর প্রতি তাচ্ছিল্যার্থে ব্যবহৃত হয়।" [৫৮]

এই পূর্ববঙ্গীয় মাঝিদের একটা বড় অংশই সুবমা-বরাক উপত্যকার মানুষ এবং তারাই ছিলেন মনসাপূজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক— এই অনুমান সত্য হলে নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে মনসাপূজা তথা নৌকাপূজাব জনপ্রিয়তার কারণ সম্পর্কে একটি যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা যায়।

বঙ্গীয় সংস্কৃতিব একেবারে পূর্বপ্রান্তবর্তী এই অঞ্চলে পবিবর্তনের ছোঁয়া এখানকার জনজীবনকে খুব একটা স্পর্শ করেনি। ফলে বঙ্গীয় সংস্কৃতির বহু সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এখানে এখনও আদিম অবস্থায রয়ে গেছে। এজন্যই অন্য অঞ্চলে নৌকাপূজা লুপ্ত হয়ে গেলেও এ অঞ্চলে নৌকাপূজা এখনও রযে গেছে।

৭.

নৌকাপূজার আলোচনায় 'বাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী' পুঁথির কথাটিও অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত এই পুঁথিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। এই পুঁথি প্রসঙ্গে সুকুমার সেন লিখেছেন,

> "বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া একটি মনসাপূজাবিধান পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। . . .
>
> "বিদ্যাপতি মনসাপূজার যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তা দুর্গোৎসবেব মতই বিরাট ব্যাপার। বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ হইতে মনে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর উপান্তে বাঙ্গালা দেশে— পশ্চিমবঙ্গে— বিষহরির পূজা খুব ধুমধামেই হইত। পূজার প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি লৌকিক ঔষধ মন্ত্রের সঙ্গে 'বিষহরি মঙ্গলচাণ্ডিকাগীতাদয়শ্চ' উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "তে চ প্রসিদ্ধা লোকবাদাঃ"। তাহার পব প্রমাণ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।
>
> লক্ষ্মীধরেণ নৌর্দত্তা যস্মিন্ মধুকরাভিষা।
> তস্মান্ মনোরমাং নাবং কৃত্বা তত্র প্রপূজায়েৎ।।

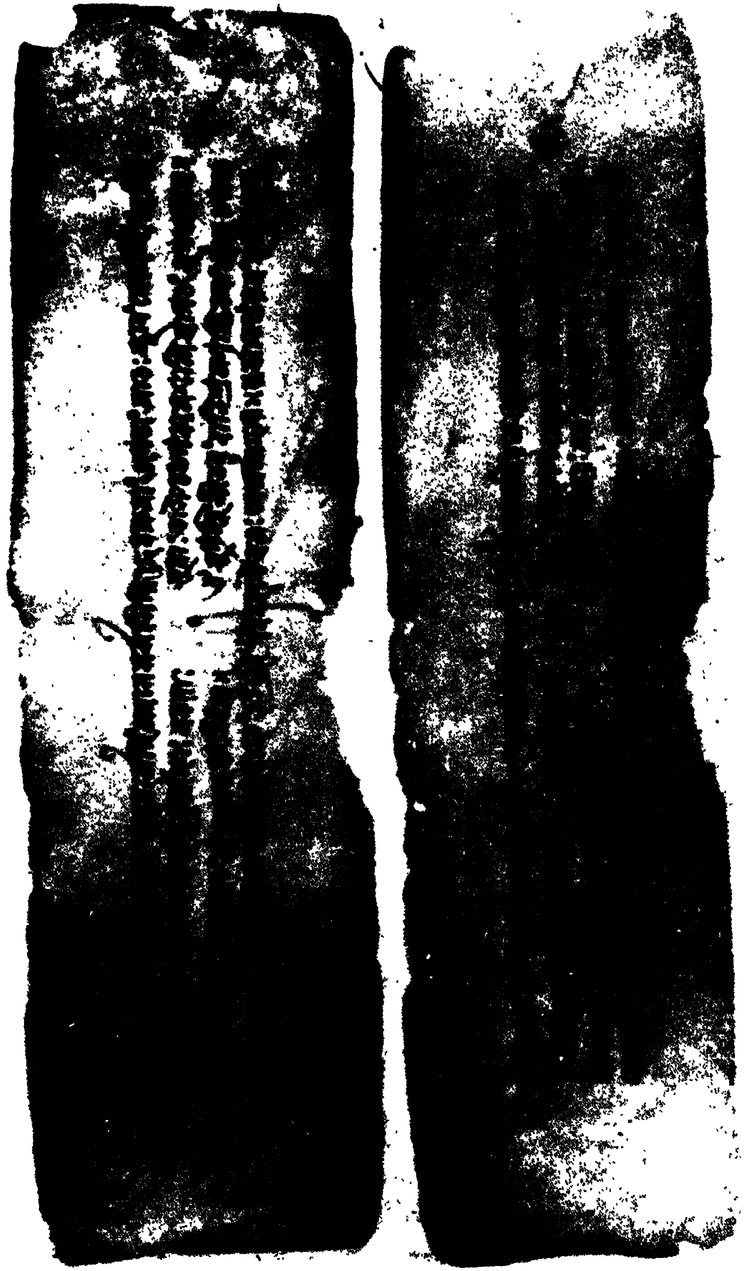

বরাক উপত্যকায় প্রাপ্ত নৌকাপূজা বিধি পুঁথির দুটি পৃষ্ঠা

মৃন্ময়ীং প্রতিমাং কৃত্বা দেবতাদ্যোঃ সমাবতাম্।
ঘট্টয়িত্বা বিচিত্রাং চ পূজয়েন গীত নর্তনৈঃ॥ . . .
সন্নিধৌ ভূতনাথস্য বিপুলায়াশ্চ নর্তনে।
যে যে সমাগতা দ্রষ্টুং তাংস্ত তৎস্থান্ প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মাণং মাধবং রুদ্রংবাণীং লক্ষ্মীং চ পার্বতীম্।
কার্তিকেয়ং গণেশঞ্চ কালীয়ং পন্নগাষ্টকম্॥
জরৎকারুমাস্তীকঞ্চ মর্ত্যে চন্দ্রধরং তথা।
তৎপত্নীং বিপুলাঞ্চাপি শ্রীধরাখ্যং দ্বিজং তথা॥
যশোধরং চ দৈবজ্ঞং কর্ণধারঞ্চ দুর্লভম্।
অগ্রে গণেশং নৌকায়াঃ পত্তীনষ্টৌ মনোহরান্॥
ভাণ্ডারিপঞ্চাস্ত্রধরান্ মধ্যেহগ্রে মূলকে তথা।
লেখ্যাং [তু] বাজকীশ্চৈব সুগন্ধাংশ্চ তথাপরাম্॥
সুরেশ্বরীং তথা দুর্গাং দেবীং দিক্ষু সমন্ততঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ মায়ুধান সম্ববাহনান্॥ ৫৯

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পুঁথিটি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত কবতে গিয়ে লিখেছেন,

> "সম্প্রতি উত্তর বিহারের অন্তর্গত মিথিলার কবি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার নাম 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'। ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং বিদ্যাপতির নামে আরোপিত হইলেও একমাত্র পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ জেলা হইতে ইহার একমাত্র পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। . . . এই গ্রন্থখানিতে বাংলাদেশে প্রচলিত মনসাপূজার একটি বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে মনসাদেবীর নাম ব্যাড়ী বলিয়া উল্লিখিত আছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, গ্রন্থখানি বাংলাদেশেব বাহিরে মিথিলাতেই রচিত হওয়া সম্ভব— কোন উপায়ে তাহা মৈমনসিংহের এক বিদ্যোৎসাহী ভূস্বামীর পাঠাগারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সুতবাং ইহা হইতেও উত্তব বিহারে যে মনসা পূজাব ব্যাপক প্রচার ছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।" ৬০

এই পুঁথিটিকে এই বিষয়ক একমাত্র পুঁথি বলে ধবে নেবার ফলে পববর্তী আলোচনায কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হযেছে। সুরমা-বরাক উপত্যকাব নৌকাপূজা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিযে ডঃ সুজিৎ চৌধুরী 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "ব্যাড়ীভক্তিতবঙ্গিণীর একমাত্র পুঁথিটি পাওযা গেছে মৈমনসিংহ জেলায়। তাতে বিশদ বর্ণনা আছে শ্রীহট্ট অঞ্চলের বিশিষ্ট একটি লৌকিক পূজানুষ্ঠানের আর উল্লেখ রয়েছে বরিশালের রইয়ানি পূজার। এতে মনে হয়, শ্রীহট্ট অথবা পূর্ববঙ্গে সন্নিহিত অঞ্চলের কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুঁথিখানি বচনা করেছিলেন সামাজিক সমন্বয় সাধনেব উদ্দেশ্যে আব পুঁথিখানির মর্যাদা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যই 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র

নৌকাপূজা : আলোকচিত্র

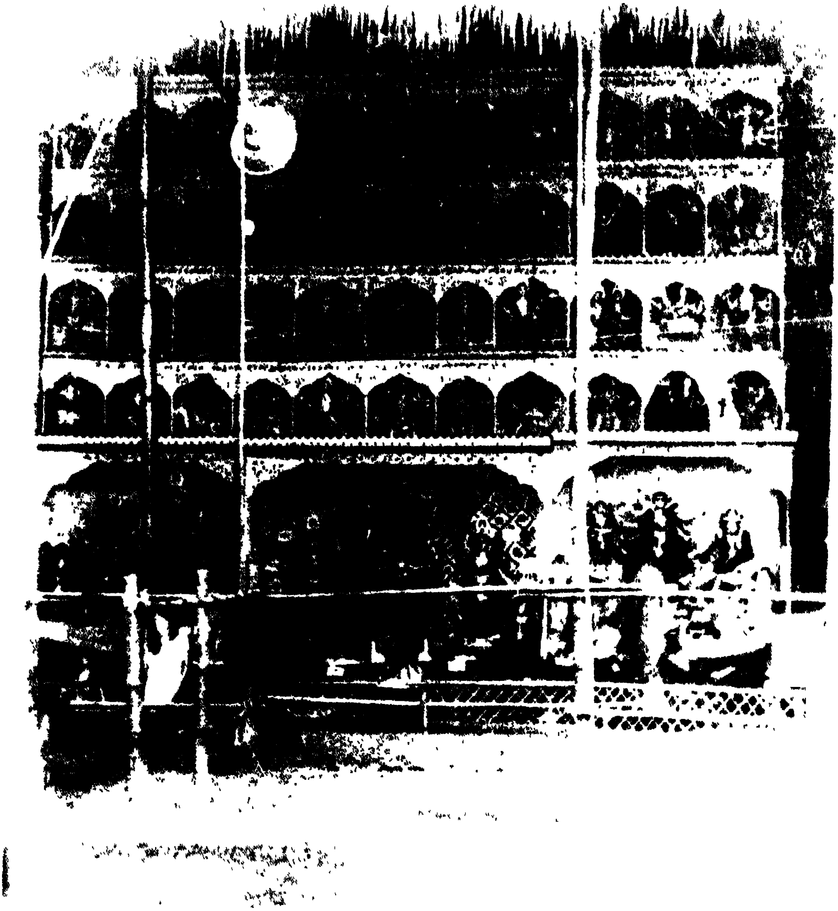

ছবিটি যথেষ্ট পরিস্ফুট নয়। আমাদের হাতে ভাল ছবি না থাকায়, এই ছবিটি ছাপতে হচ্ছে, নৌকাপূজায় কি রকম প্রতিমা গড়া হয় সে সম্বন্ধে পাঠকদের একটা ধারণা দেবার জন্য।

— *সম্পাদক*

> সুপ্রসিদ্ধ রচয়িতার নাম তাতে ব্যবহার করা হযেছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে।" [৬১]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের কবি। তাঁর কাব্যে উল্লিখিত বহিত্র পূজা এক সময় বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সমূহে প্রচলিত ছিল। এমতাবস্থায় বিদ্যাপতি এ ধরনেব একটা পূজা বিধি রচনা কবতে পাবেন— এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। উল্লেখ্য যে, বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' অনুযায়ী এখনও সুরমা-ববাক উপত্যকায় দুর্গাপূজা হয়।"[৬২] তখন পুঁথি সাহিত্যের যুগ। কাজেই পূজা লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুরমা-বরাক উপত্যকায় যেহেতু নৌকা পূজা প্রচলিত আছে কাজেই এখানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে বরাক উপত্যকায ব্যক্তি বিশেষের সংগ্রহে এ বিষয়ক একাধিক পুঁথি রযেছে। সামান্য পাঠভেদ থাকলেও এ অঞ্চলের নৌকাপূজাবিধি পুঁথির সঙ্গে 'ব্যাড়ীভক্তিতবঙ্গিণী'ব পাঠেব যথেষ্ট মিল বয়েছে। এখানকার হাতে লেখা একটি নৌকাপূজাবিধি পুঁথির অংশ বিশেষেব পাঠ নিম্নরূপ ;

লক্ষ্মীধবেণ নৌর্দ্ধত্তা যস্মানমধুকরাভিধা।
তস্মান মধুকরং নাবং কৃত্বা তত্র প্রপূজযেৎ॥
মৃন্ময়ীং প্রতিমাং কৃত্বা দেবতাদৈঃ সমাবৃতাং।
গঠিত্বা সুবিচিত্রাঞ্চ পূজয়েদ্ভক্তিনর্ত্তনৈঃ॥
অধমা বিংশহস্তানৌ শ্চত্বাবিশচ্চ মধ্যমা।
উত্তমা ষষ্ঠী হস্তাচ শতহস্তোত্তমোত্তমা॥. . .
জবৎকারু মুনিঞ্চৈব মর্ত্যো চন্দ্রধরস্তথা।
স্বর্ণরেখাঞ্চ তৎপত্নীং পুত্রং লক্ষ্মীধবস্তথা॥
তৎপত্নীং বিপুলাঞ্চৈব শ্রীধবাখ্যং দ্বিজস্তথা।
যশোধরঞ্চ দৈবগ্যং কর্ণধারঞ্চ দুর্লভং॥
অগ্রে কুলেশং নৌকাযাঃ পত্তীনষ্টৌ তথৈবচ।
ভাণ্ডারিণংসন্দ্রধবং মধ্যেহগ্রে মুলকে তথা॥
নেত্রাঞ্চ রাজকীং দেব্যাঃ সুগন্ধাঞ্চ তথা পবাং।
সোমেশ্বরীং তথা দুর্গাং দেব্যা পার্শ্বে বিনির্ম্মিতাং॥
সবাহনান্ সায়ুধাংশ্চ সর্ব্বান দেবান প্রপূজয়েৎ॥ [৬৩]

এই বিবরণ 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণীব' বিবরণের অনুরূপ। প্রাপ্ত পুঁথিটিতে কোন পুষ্পিকা না থাকায় পুঁথি বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কাছাড় জেলাব বিহাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত দ্বিতীয় পুঁথিটি খণ্ডিত। একই বিষয়ক একাধিক পুঁথি আবিষ্কৃত হবাব পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্ষিত পুঁথিটিকে গুরুত্বহীন বলা যায় না এবং এটা মনে হয় না যে, এখানকার কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পুঁথিটির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজে পুঁথিটি বচনা করে তাতে বিদ্যাপতিব নাম যুক্ত করেছেন। শ্রীহট্টের সঙ্গে মিথিলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা সুবিদিত সেই সাংস্কৃতিক সংযোগের সূত্রেই বিদ্যাপতির

পুঁথি এখানে এসেছিল। এতকাল লোকচক্ষুর অগোচবে থাকা বরাক উপত্যকাব এই নূতন পুঁথিগুলো মনসা উপাসনা তথা মনসামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে নূতন আলোচনার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। যা ভবিষ্যতে শুধু সুরমা-ববাক উপত্যকাতেই নয়, সামগ্রিক ভাবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নূতন আলো ফেলতে পাবে।

: উল্লেখপঞ্জী :

১. Assam District Gazetteers, Vol.II, Sylhet: B. C Allen. Shillong: 1905: Page 101
Assam District Gazetteers, Vol.I, Cachar: B. C. Allen: Shillong· 1905 Page 56

২. কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল: শ্রী সুবেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস (সম্পাদিত): কলিকাতা: ১৯৬০: পৃঃ- ৩০৯

৩. মনসামঙ্গল: শ্রী বিজন বিহাবী ভট্টাচার্য (সম্পাদিত): সাহিত্য অকাদেমি: ১৯৭৭: পৃঃ- ১১০

৪. "A beautiful bronze figure of Manasā, probably belonging to the Pāla period, is now in the Indian Museum"— History of Ancient Bengal: R. C. Majumdar, Calcutta 1971. Page 556.

৫. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল: অক্ষয় কুমার কযাল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত: কলিকাতা: ১৩৪৮: প্রাক্‌কথন পৃঃ ১৯

৬. শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্: আর্য্যশাস্ত্র সংস্কবণ: কলিকাতা: ১৩৯১ বঙ্গাব্দ: প্রকৃতিখণ্ড ৪৫/২: পৃঃ- ৪২৬

৭. — ঐ —: ৪৫/১০ পৃঃ- ৪২৭

৮. — ঐ —: ৪৬/১৪ পৃঃ- ৪২৯

৯. — ঐ —: ৪৬/১৬ পৃঃ- ৪২৯

১০. — ঐ —: ৪৬/১৩১ পৃঃ- ৪৩৮

১১. — ঐ —: ৪৬/১৩৩ পৃঃ- ৪৩৮

১২. মহাভারতম্: শ্রীমদ্‌হবিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত: কলিকাতা: ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ: আদিপর্ব: ৪২/১২, ১৩: পৃঃ ৫৪৪

১৩. — ঐ —: ৪৩/১৫ পৃঃ- ৫৫৫

১৪. বাংলা মঙ্গলকাব্যেব ইতিহাস: শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য: কলিকাতা: ১৯৭৫: পৃঃ- ২৫০ থেকে উদ্ধৃত।

১৫. মহাভারতম্: আদিপর্ব ৩/১৪৬ পৃঃ- ২৩৬

১৬. — ঐ —: ৩/১৪৯ পৃঃ- ২৩৭

১৭. — ঐ —: ৩/১৪২ পৃঃ ২৩৫

১৮. ইতিহাস অভিধান (ভাবত): যোগনাথ মুখোপাধ্যায: কলিকাতা: ১৯৯০: পৃঃ- ১৮৮

১৯. "বামায়ণ মহাভারতেব ন্যায এই পদ্মপুরাণ গ্রন্থখানিও বাঙালীর বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গেব হিন্দু অধিবাসীদের ঘবে ঘরে সমাদৃত ও পঠিত হইত"— পদ্মাপুরাণ: বাধানাথ রায় চৌধুবী: কলিকাতা: ১৯৭৮: তৃতীয সংস্করণেব ভূমিকা: পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই।

২০. মহাভারতম্: আদিপর্ব: ৩/১১৭ পৃঃ ২২৯

২১. — ঐ —: ৮/২৫ পৃঃ- ২৯২

২২. — ঐ —: ৩৯/৪ পৃঃ- ৫২৩

২৩. শ্রীমদ্ভাগবত (গদ্যানুবাদ): ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী: কলিকাতা: ১৯৭৭: পৃঃ- ৫৬৬

২৪. মহাভারতম্: আদিপর্ব ২১/৪ পৃঃ- ৩৭৮

২৫. শ্রীমদ্ভাগবতঃ ৫৬৬

২৬. Legends in the Mahabharata: Dr Sadashiv Ambadas Dange: Delhi: 1969: Introduction XXIX

২৭. বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা: ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত: কলিকাতা: ১৯৬২: পৃঃ- ১৫৩

২৮. — ঐ —: পৃঃ- ৩৪২

২৯. বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড): রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: কলিকাতা: ১৯৮৭: পৃঃ- ২৫

৩০. ঋগ্বেদ সংহিতা: প্রথম খণ্ড: হরফ প্রকাশনী: কলকাতা: ১৯৭৬: ১/৪৮/৩· পৃঃ- ১৪১

৩১. — ঐ —: ১/১১৬/৩: পৃঃ- ২৩০

৩২. — ঐ —: ৪/৫৫/৬: পৃঃ- ৫৩০

৩৩. বাণিজ্যে বাঙালী একাল ও সেকাল· সুভাষ সমাজদার: কলিকাতা ১৩৮২: পৃঃ ৩ থেকে উদ্ধৃত।

৩৪. জাতক (দ্বিতীয় খণ্ড): ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত: কলিকাতা: ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ· পৃঃ- ১৮৬-১৮৭

৩৫. — ঐ —: (চতুর্থ খণ্ড): ১৩৮৫: পৃঃ· ২৩৭—২৪০

৩৬. Hindu Kingdoms of South East Asia: R. K. Kanchan: Delhi: 1990: Page 117

৩৭. প্রাচীন শিল্প পরিচয়: গিরীশ চন্দ্র বেদান্ত তীর্থ: কলিকাতা: ১৩৭৯: পৃঃ ১৬১ থেকে উদ্ধৃত।

৩৮. জাতক (চতুর্থ খণ্ড): পৃঃ ১৪

৩৯. লোক সাহিত্য (প্রথম খণ্ড): ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী: ঢাকা: ১৯৭৭: পৃঃ ১০২ থেকে উদ্ধৃত।

৪০. রঘুবংশ: কালিদাস: চতুর্থ সর্গ, শ্লোক- ৩৬

৪১. History of Ancient Bengal: Page- 344

৪২. Hindu Kingdoms of South East Asia: Page 128

৪৩. বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা: পৃঃ ১৫১—১৫২

৪৪. — ঐ —: পৃঃ- ১৫১

৪৫. — ঐ —: পৃঃ- ২৫৬

৪৬. — ঐ —: পৃঃ- ৫৫

৪৭. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল: পৃঃ- ৬—৭

৪৮. বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা: পৃঃ ২৪৬

৪৯. — ঐ —: পৃঃ- ২৩৬

৫০. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ: শ্রী জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী: কলিকাতা: ১৩৭৮: শ্লোক নং- ২৬৯: পৃঃ ২০৭

৫১. — ঐ —: শ্লোক নং- ৪০৫ : পৃঃ- ২৩৭

৫২. মহাভারতম্: আদিপর্ব ৩৫/৯ : পৃঃ ৪৮৫

৫৩. — ঐ —: ১৬/১৬ : পৃঃ- ৩৫৫

৫৪. শিলচর শহরের গৃহবধূ সুপ্রভা দত্তের অপ্রকাশিত ডায়েরী। ২রা ভাদ্র, ১৩৩৮: বুধবার: অপরাহ্নে লিখিত দিনপঞ্জী।

৫৫. Land-grants, Land Management and the Nature of Social Formation in Srihatta during the 7th to 11th century A.D.: J. B Bhattacharjee: The North Eastern Hill University Journal of Social Sciences and Humanities: Vol. V, No. 2: Apr June, 1988 (Reprint). Page 2.

৫৬. Copper Plates of Sylhet: Kamala Kanta Gupta: Sylhet: 1967: Page 99

৫৭. Sylhet District Gazatteer: Page 155—156

৫৮. বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা : পৃঃ ৩৪৭

৫৯. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) : সুকুমার সেন : কলিকাতা : ১৯৯১ : পৃঃ ১৯২—১৯৩

৬০. বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ২৯৭

৬১. বিদ্যাপতির ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী: শ্রী সুজিৎ চৌধুরী: সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা: ৮৭ বর্ষ: ২য় সংখ্যা: শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৭ : কলিকাতা : পৃঃ- ২৪

৬২. শ্রীশ্রীদুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী : শ্রীঈশান চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত : শ্রীহট্ট : ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

৬৩. তুলট কাগজের উপর হাতে লেখা নৌকা পূজা বিধি পুঁথি। আসামের স্বাস্থ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত জয়েন্ট ডিরেক্টর ডাক্তার বিদ্যুৎ কুমার ভট্টাচার্যের (তারাপুর, শিলচর- ৩) সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীহট্টের মেয়েলি ব্রতাচারের উৎস সন্ধানে

গৌরী সেন

লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে স্মরণাতীত কালের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনটিকে বুঝে ও চিনে নেওয়া যায়। বিস্মৃতির যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগের ক্রমবিবর্তনের ধারায় সমাজ জীবনের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের লোক-জীবনের চর্যার মধ্য দিয়ে সেই সময়ের মানুষের চেতনা উন্মোচনের মধ্যে বিশ্ব-মানব-চেতনারও উন্মোচন ঘটে। তাই লোক-সংস্কৃতিকে তন্নিষ্ঠ হয়ে অনুধাবন করলে মানুষের জীবনধারা বিকাশের সন্ধান সূত্র যেমন মেলে, তেমনি মেলে আমাদের আদি প্রপিতামহ ও প্রপিতামহীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস-কামনা ও ইচ্ছাপূরণের অভিব্যক্তির ইতিহাস। লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ তাদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান থেকে বলছেন— মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রথার উৎস মূল তাদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার মধ্যেই রয়েছে। কালের প্রবাহে ও আর্থসামাজিক বিবর্তনের ধারায় হয়তো উৎসমূলটি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়েছে তবুও একেবারে নিচের তলের গভীরেও একটি বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তিতল রয়ে গিয়েছে। সেই স্মরণাতীত কালের ভিত্তিতলটি চিনে ও বুঝে নিতে পারলেই আমাদের পূর্বজ মানুষের সমাজজীবনের ধারাটিকে চিনে ও বুঝে নেওয়া সম্পূর্ণ হয়। সে কারণেই আজকের লোক-সংস্কৃতির গবেষকগণ অতীত মানুষের জীবনচর্যাকে জীবনমানসকে বুঝে নেবার জন্য চিনে নেবার জন্য লোকাচার, লোককথা ও লোকশিল্প ও লোকসাহিত্যকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে চিহ্নিত করছেন। কেননা বিশ্বমানব-জীবনের ইতিহাস পাঠ করা যায় লোক-সংস্কৃতির সঠিক অনুধাবনে।

লোক সংস্কৃতির একটি ধারা লোক-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা বিশ্বাস-সংস্কার আচার আচরণ ও তাকে ঘিরে নানা লোককথা। লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই বিশ্বাস সংস্কার আচার-আচরণ থেকেই ব্রতাচারে আচার-অনুষ্ঠান এসেছে। স্মরণাতীত কালের মানুষেরা যে কামনা-বিশ্বাস থেকে আচার-আচরণ পালন করতেন তাকেই ব্রতাচারের আদি উৎস বলা যেতে পারে। বিভিন্ন আর্থসামাজিক স্তরে বিভিন্ন কামনা বিশ্বাস ও আচার-আচরণ সৃষ্টি হয়েছে। স্মরণাতীত মানব জীবনের বাস্তব কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস, প্রথা ও সংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার পরিচয় যেমন পাওয়া যায় ওই ব্রতাচার ও ব্রতকথাগুলিতে তেমনি মানুষের একান্ত কামনার ধনকেও চিনে ও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। স্মরণাতীত কাল থেকে ঐতিহাসিক কালের মানুষের জীবনযাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস-সংস্কার, জীবনের চিন্তাভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি সমস্তই ব্রতাচারের মধ্যে ধরা পড়ে। সর্বোপরি বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরে মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিহাসও জানা যায় ব্রতাচার ও ব্রতকথার

মধ্যে। মেয়েলি ব্রতাচার ও ব্রতকথাগুলিতে নারী জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নারী জীবনের আনন্দবেদনা, জীবন সংগ্রামের প্রতিফলন যেমন ঘটেছে তেমনি একটি বিশেষ যুগের একটি বিশেষ স্থানেব জনজীবনের সমবেত কর্মপন্থা ও চিন্তাপন্থার সন্ধানসূত্রের হদিস মেলে। বাংলার নারীর অন্তরের কামনা-বাসনা ও একান্ত ভাবনা বোঝার জন্য বাংলার ব্রতাচারগুলির সঙ্গে পরিচিতি যেমন প্রয়োজন তেমনি আর্থ-সামাজিক স্তরে বাংলার নারীর ভূমিকা ও মূল্যায়নেও মেয়েলি ব্রতাচার ও ব্রতকথাগুলিব গুরুত্ব অপরিসীম।

সব কালেব সব দেশের মানুষই তাদের নিজস্ব জীবনধারায় জীবনব্রত উদ্‌যাপন করতেন এবং এখনও করেন। এই জীবনব্রত তাদের জীবনচর্যারই অংশ। 'ব্রত' শব্দটির আভিধানিক অর্থটি স্পষ্ট করে নিলে সামগ্রিক আলোচনায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব। বৃ-ধাতু থেকে বৃত, এবং মূলে গেলে প্রার্থনা করা। বৃ + অত = বৃত; যার মানে প্রার্থনা, নিয়ম, সংযম।[১] কিসের প্রার্থনা— কিছু পাওয়ার প্রার্থনা, কিসের নিযম— জীবন-ধারণ ও জীবনযাপনের নিয়ম, কিসের সংযম— জীবনযাত্রার সংযম। কিছুর উদ্দেশ্যে কিছু কামনা করে নিয়ম সংযম মেনে জীবনধর্ম ও জীবনকর্ম পালন, পরে যা ধর্মকর্ম পালনে রূপ পেয়েছে। আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠী ও অন্‌আর্য ভাষাভাষীরা উভয়েই নিজস্বধারায় জীবনব্রত পালন করতেন। আর্যরা স্থানীয়দের বলতেন 'অন্যব্রত আকর্সাদস্যু দাস'। কেননা আর্যরা বহিবাগত ও বেদব্রত সংস্কাবাচ্ছন্ন আর ভারতের স্থানীযরা বেদব্রতচ্যুত, তাই তারা ব্রাত্য।[২] আর্যসমাজের কাছে এরা ছিলেন বেদ-সংস্কারহীন দস্যু, দাস, পতিত। তবুও বেদসংস্কারাপন্ন আর্যগোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল থেকে অন্‌আর্য 'অন্যব্রত' সংস্কাবাপন্ন নারীদের জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। অন্‌আর্য লোকজ কোম ও গোষ্ঠীর মেয়েরা আর্যগোষ্ঠীর পুরুষদের অন্তঃপুরে ঠাঁই নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বেদ-ব্রতধারীদের অন্তঃপুরে 'অন্যব্রত' নারীরা তাদের নিজস্ব জীবনব্রতধারাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দুই ভিন্ন ব্রতধারী দলের জীবনব্রতধারার মিলনে মিশ্রণে যে ব্রতধাবা গড়ে উঠেছিল সেই ধারাই কালেব যাত্রায় একান্ত মেয়েলি ব্রতাচারে পরিণত হয়েছে। বাংলায় নারীর নানা পালনীয় অপালনীয় আচার-আচরণ, সংস্কার বিশ্বাস ও ব্রতাচারে অষ্ট্রিকভাষী, দ্রাবিড়ভাষী, ভোটব্রহ্মভাষী ও আর্যভাষী জনসমষ্টির সংস্কার-সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ব্রতপার্বণ ও নানা সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে এইসব জনগোষ্ঠীর কৌম সমাজের আচার রীতি ও মননরীতির প্রভাব খুব বেশী। বেদের সুক্তগুলিতে যেমন সমগ্র আর্যজাতির চিন্তা উদ্যম ও উৎসাহের চিত্র ফুটে ওঠে তেমনি 'অন্য-ব্রত'ধারীদের চিন্তা উদ্যম ও জীবনধারণের উৎসাহের ছাপ ফুটে ওঠে বাংলার ব্রতাচারের মধ্যে যা পরে সম্পূর্ণভাবে মেয়েলি ব্রতাচারে পরিণত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রত' বইতে বলছেন—

"বাংলার ব্রতগুলি বাংলার ঘরের জিনিষ..... শাস্ত্রব্রত ভেঙে এই মেয়েলি ব্রতগুলির সৃষ্টি হয়েছে একথা একেবারেই বলা যায় না। ..... প্রবাসী আর্য এবং নিবাসী (স্থানীয়) এই দুই দলের মধ্যে রয়েছে হিন্দু জাতি, যারা বেদের দেবতাদের দেখছে বিরাট সব মূর্তিতে এবং

তারি বিরাট অনুষ্ঠানের ভার চালাতে চাচ্ছে আদিম যারা তাদের মনের উপরে, কর্মের উপরে, তাদের সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তার স্বাধীনতা ও স্ফূর্তি সবলে নিষ্পেষিত করে দিয়ে। বেদপুরাণ এবং পুরাণের চেয়েও যা পুরানো এই সব লৌকিক ব্রত-অনুষ্ঠান, এদের ইতিহাস এইটেই প্রমাণ করছে— দুদিকে দুটো বড় জাতির প্রাণের কথা, মাঝে একটি দল বিশেষের স্বপ্ন।"[৩] বাংলার মেয়েলি ব্রতাচারগুলি বিশ্লেষণ করলে পুরাণের চেয়েও পুরানো এই দল বিশেষের স্বপ্নই ফুটে ওঠে। ব্রতের প্রধান কথা কামনা। মানুষের প্রথম কামনা অন্ন ও সন্তান পরে শস্য ও সন্তান। যে সময়ে মানুষের মনের প্রধান কামনা ছিল সন্তান ও শস্য নিয়ে ভাল থাকা সেই সময়ই ব্রতাচারগুলির সৃষ্টি হয়েছে। শিকারজীবী, উদ্ভিদ সংগ্রহকারী আর্থসামাজিক স্তরের নানা আচার-আচরণ কামনা বিশ্বাস ও উদ্ভিদ উৎপাদনকারী কৃষিজীবী আর্থসামাজিক স্তরের কামনা বিশ্বাস-সংস্কার মিলে মিশে শিকারজীবী থেকে কৃষিজীবী সমাজের সন্ধিক্ষণে ব্রতাচারগুলি সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়। শস্য ফলনে নারীর প্রথম ভূমিকা প্রায় সব গবেষকরাই স্বীকার করে নিয়েছেন; সন্তানও নারীর শরীব থেকেই পৃথিবীতে আসে। তাই ভূমির শস্যদান ক্ষমতা ও নারীর জন্মদানের ক্ষমতা এক করে দেখার প্রবণতার যুগেই ব্রতাচারগুলির জন্ম হয়েছে। মেয়েলি ব্রতের কামনায় অন্ন ও সন্তান, শস্য ও সন্তান, শস্য ফলনের জন্য জলের কামনা, বৃষ্টির কামনা, শত্রুর হাত থেকে সন্তান ও শস্য রক্ষার জন্য শত্রুপরাভবের কামনা, পিতৃপ্রাধান্যের যুগে পুত্রসন্তানের কামনা, পিতা-ভ্রাতা-স্বামী-পুত্রের শুভাশুভ কামনায় সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আদিতে যা ছিল দলবিশেষের আদি কামনা তাই রূপ পালটে মেয়েদের অন্দরমহলে ঢুকে একান্ত মেয়েলি ব্রতাচারে মেয়েদের কামনায় পরিণত হয়েছে।

"বাংলার ব্রত অনুষ্ঠানগুলি 'অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির' ধারায় বিকশিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবগোষ্ঠীর অত্যন্ত অনিশ্চিত জীবনযাত্রায় লোকবলের প্রয়োজন ভীষণভাবে অনুভূত হয়েছিল। জনবৃদ্ধিই ছিল সেদিনের মানুষের অন্যতম লক্ষ্য। তাই দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। ... উর্বরতা-জনিত সংস্কৃতির এই উষাকালীন ধারণা নানা পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে যুগের পর যুগ ধবে বয়ে চলেছে।"[৩] অধিকাংশ ব্রত অনুষ্ঠানই উর্বরতা প্রতীকজাত এবং এগুলির উদ্‌যাপন জনবৃদ্ধি ও শস্যবৃদ্ধি জনিত আগ্রহের ধারক ও বাহক। উৎপাদনকারী কৃষিজীবী সমাজে মানুষের জন্মদানের বিশেষত মেয়েদের জন্মদানের শক্তি ও ভূমির শস্য-জন্মদানের শক্তিকে (fertility cult) এক করে দেখার প্রবণতার যুগেই এই লৌকিক ব্রতগুলির সৃষ্টি হয়েছে।[৪]

বাংলার অন্যান্য জায়গার মত শ্রীহট্টের মেয়েরাও সন্তান কামনা, শস্য কামনা, সন্তানের মঙ্গল কামনা, শত্রু পরাভবের কামনা, সমস্ত সংকট থেকে মুক্তি পাবার কামনা, ধনে জনে মানে সুখে সম্পদে থাকার কামনা, ভাল স্বামী পাওয়ার কামনা, পুত্রসন্তান পাবার কামনা ও বাপ ভাই পুত্রের মঙ্গল কামনায় নানা ব্রত পালন করেন। শ্রীহট্টের মেয়েলি ব্রতগুলি তিথি, মাস ও বার অনুসারে করে থাকেন মেয়েরা। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে অক্ষয় তৃতীয়া

ব্রত; জৈষ্ঠে শুক্লাষষ্ঠীতে অরণ্য ষষ্ঠী ব্রত, কৃষ্ণা চতুর্দশীতে শুরু করে অমাবস্যা পর্যন্ত সাবিত্রি ব্রত; শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বিষহরিব্রত, কৃষ্ণা পঞ্চমীতে নাগপঞ্চমীব ব্রত; ভাদ্রের শুক্লা অষ্টমীতে দুর্বাষ্টমী ও রাধাষ্টমী ব্রত, শুক্লা পঞ্চমীতে অনন্তচতুর্দশী ব্রত ও কর্মাদিত্যের ব্রত, কৃষ্ণা অষ্টমীতে জন্মাষ্টমীর ব্রত; আশ্বিনেব প্রধান মেয়েলি ব্রত লক্ষ্মী পূর্ণিমাতে লক্ষ্মীব্রত, শুক্লাব দ্বিতীয়ার্ধে ভাতৃ দ্বিতীয়াব ব্রত, শারদীয় দুর্গাপূজার অষ্টমীতে বীরাষ্টমী ব্রত; কার্তিক মাসের কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিক ব্রত ও শুক্লা অষ্টমীতে গোষ্ঠাষ্টমী ব্রত; অগ্রহায়ণে নবান্নপার্বণ ব্রত; পৌষেব সংক্রান্তি থেকে শুরু কুমারীদের মাঘ ব্রত ও পৌষ পার্বণ ব্রত, শুক্লা অষ্টমীতে শীতলষষ্ঠীর ব্রত, শ্রী পঞ্চমীতে শ্রীপঞ্চমী ব্রত। ফাল্গুনেব কৃষ্ণা চতুর্দশীতে শিবরাত্রি ব্রত; চৈত্রের শুক্লা নবমীতে রামনবমীর ব্রত; চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন সন্ন্যাসীদের শিবব্রত। শ্রীহট্টেব মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে রূপসীব্রত, সূর্যব্রত বা কালাঠাকুরেব ব্রত, সাবিত্রি ব্রত, বিভিন্ন মাসে লক্ষ্মীব্রত, মঙ্গলচণ্ডীব ব্রত, সংকটার ব্রত, কার্তিক ব্রত, ষষ্ঠীব্রত, মাঘব্রত ও অম্বুবাচী ব্রতই বিশিষ্টতাব দাবি রাখে। এই ব্রতগুলির মধ্যে মাঘব্রত কবেন কেবল কুমারী মেয়েরা, অম্বুবাচীব ব্রত কবেন বিধবা রমণীরা, আব অন্য ব্রতগুলি সাধাবণত সধবা নারীবাই করে থাকেন। কোন কোন ব্রতাচাবে মেয়েরা গীত সহযোগে 'ধামাইল নাচ' (ধামালী নৃত্য) করে থাকেন। গুরুসদয় দত্ত ধামাইল নাচকে ব্রতনৃত্য বলেছেন। বাংলাব খুব কম জায়গায়ই ব্রতাচাবে মেয়েদেব নাচ কবতে দেখা যায়। মেয়েদেব মিলিত ব্রতনৃত্য 'ধামাইল নাচ' ও গান শ্রীহট্টেব মেয়েলি ব্রতাচাবে একটি নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। শ্রীহট্টেব প্রধান মেয়েলি ব্রতগুলি বিশ্লেষণ কবে এই প্রবন্ধে ব্রতাচাবগুলিব উৎসমূলে পৌঁছবার চেষ্টা কবা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বাংলাব আর্থসামাজিক স্তরে বাংলা ও শ্রীহট্টেব মহিলাদেব ভূমিকা ও মূল্যায়নেরও চেষ্টা রয়েছে।

সূর্যব্রত বা কালাঠাকুরের ব্রত

শ্রীহট্টের মেয়েলি ব্রতাচাবগুলির মধ্যে সব থেকে নৃত্য ও গীত পূর্ণ ব্রতাচার হিসেবে সূর্যব্রত বা কালাঠাকুরেব ব্রতটি বৈশিষ্ট্যেব দাবি রাখে। সধবা মেয়েরা বিশেষ কবে বন্ধ্যা মেয়েবা সন্তান কামনায় ও সন্তানেব মঙ্গল কামনায় ও পুত্র সন্তান কামনায় এই ব্রতাচারটি কবে থাকেন। সূর্যের কৃপায় বন্ধ্যানারীর বন্ধ্যাত্ব কেটে যাবে ও সে হবে সন্তানবতী ও পুত্রবতী এই কামনা ও বিশ্বাস থেকেই শ্রীহট্টের সধবা মেয়েবা এই ব্রতাচারটি পালন কবেন।

শীতকালের মাঘ মাসেব যে কোন ববিবারে এই ব্রতাচাবটি কবেন সধবা মেয়েবা। বেজোড় সংখ্যার সধবা মহিলারা একসঙ্গে এই ব্রতটি কবেন। তিনজন বা পাঁচজন বা সাতজন মহিলা মিলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা দাঁড়িয়ে থেকে এই ব্রতটি কবেন। ব্রতের আগের দিন বাড়িব আঙিনাটি ভাল করে নিকিয়ে দুটি ছোট পুকুর কেটে বাখেন ব্রতী মেয়েরা। একটি গোলাকাব ও অন্যটি চারকোণা করে পুকুর কাটা হয়। পুকুবেব পাড়ে কলাগাছ পুঁতে কাঠি দিয়ে গাঁদা ফুল গেঁথে কলাগাছের সারা গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। ব্রতের সকালে সূর্যোদয়ের

আগে স্নান সেরে উপোষী সধবারা গোলপুকুরে কাঁচা দুধ ও চারকোণা কাটা পুকুরে হলুদগোলা জল ঢেলে দিয়ে ব্রতাচারটি পালন করার জন্য তৈরী হন। উঠোনে আগের দিন মাটি দিয়েই একটি বেদীও তৈরী করে রাখেন সধবা মেয়েরা। বেদীর সামনে পাঁচ রঙের গুঁড়ো দিয়ে সূর্যের ছবি আঁকা হয়। বেদীর সামনে পুকুর ও চারা কলাগাছ থাকে। কলাগাছের গায়ে কাঠি দিয়ে গেঁথে গাঁদা ফুলও লাগিয়ে দেওয়া হয়। সূর্যোদয়ের আগে চান করে শুদ্ধ হয়ে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুজোর বেদী পুকুর ও কলাগাছকে পাঁচবার বা তিনবার ঘিরে ঘিরে সূর্যকে আরতি করে বরণ করেন ব্রতী মেয়েরা। সূর্যের বরণ সেরে এমন জায়গায় প্রদীপগুলি রেখে দেবেন যাতে প্রদীপ নিবে না যায়। প্রদীপের বদলে কোথাও কোথাও ধুনুচীরও ব্যবহার দেখা যায়। যতজন মহিলা ব্রতী ততটি প্রদীপ জ্বালান হয় ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রদীপগুলিকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সে কারণে বেতের বা বাঁশের ঝুড়ি বা ঢাকনি দিয়ে প্রদীপগুলিকে ঢেকেও রাখা যায়। প্রদীপ নিয়ে প্রদক্ষিণ করে সূর্য বরণের মাঝে মাঝে ব্রতী মেয়েরা হলুদগোলা চৌকোনা পুকুরের জল ও দুধ ঢালা গোলপুকুরের দুধ মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে চারিদিকে ছিটিয়ে দিয়ে থাকেন। প্রভাতী সূর্য বন্দনা ও জল ছেটানোর পরে ব্রতী মহিলারা ব্রতের জায়গায় চারদিকে গোলাকার গণ্ডী কেটে সেই গণ্ডির মধ্যে থেকে ব্রতের জায়গা ও বেদী প্রদক্ষিণ করে নাচ শুরু করেন গান সহযোগে। এই নাচটিকে শ্রীহট্টের ভাষায় 'ধামাইল নাচ' (ধামালী নৃত্য) বলা হয়। গণ্ডির বাইরে না গিয়ে ব্রতী মহিলারা বিশেষ ধরনের পদ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে হাতে তালি বাজিয়ে ব্রতের জায়গা গোল হয়ে ঘিরে ঘিরে ধামাইল নাচ ও গান শুরু করেন। গানের বিষয় কৃষ্ণের জীবনলীলা। প্রথমে পৃথিবীর সৃষ্টিপত্তনের গান গেয়ে তারপরে কৃষ্ণের জাগনীর গান ও নাচ শুরু হয়।—

তোমি উঠবে গোপাল,
প্রভাতে চাঁদমুখ দেখিয়ে তোমার।
চন্দ্র জাগইন সূর্য জাগইন জাগইন তারাগণ,
প্রভাত সময়ে জাগইন তরুলতাগণ।
রাধা জাগইন কৃষ্ণ জাগইন জাগইনরে রুক্মিণী,
তার পাছে জাগইন দেখ দেবচূড়ামণী।

কোথাও কোথাও মেয়েরা হাতে বড় বড় করতাল বাজিয়েও ধামাইল নাচ ও গান করেন। সারিদিন ধরে এই নাচগান চলে। সারাদিন না বসে আড়াল দেওয়া জায়গায় আর একবার স্নান সেরে নিতে পারেন ব্রতী মেয়েরা। স্নান সেরে আবার কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান গেয়ে ধামাইল নাচ শুরু হয়। সারাদিন ধামাইল নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে কেটে গিয়ে সূর্যাস্তের সময় এসে যায়। সূর্যের অস্ত যাবার আগে বেতের ঢাকনি খুলে আবার ঘিয়ের প্রদীপ নিয়ে ব্রতের স্থান ও বেদী ঘিরে সূর্যের আরতি ও বন্দনা করেন মেয়েরা। তারপর কলাগাছের গোড়ায় ফুল দিয়ে অঞ্জলি অর্পণ করেন। প্রত্যেক ব্রতী মহিলা তিল, যব, আরো তিনটি স্থানীয় ফুল

ও দূর্বা দিয়ে আটবার, আঠাশবার বা একশো আটবার আগুনে আহুতি দেন। সূর্যাস্তের ঠিক আগে আরতি সেরে ধামাইল গান গাইতে গাইতে প্রদীপগুলি নিয়ে ঘরে ঢুকে যাবেন ব্রতী মহিলারা। কৃষ্ণলীলা বন্দনার শেষ গানটি এই রকম—

তোম্‌রা জুকার দেওরে কৃষ্ণ ঘরে আইছন রে।
কৃষ্ণের ঐ যে মাথার চূড়া ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করেরে।
কৃষ্ণের ঐ যে গলার মালা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়েরে।
কৃষ্ণের ঐ যে পায়ের নপুর ঝুনুর ঝুনুর বাজেরে।
তোমরা জয় দেওরে, বিজয় দেওরে।

প্রদীপগুলি নিয়ে ঘরে ঢুকে প্রদীপগুলি ঠাকুর ঘরে রেখে দেবেন ও প্রদীপগুলি আপনা থেকেই নিবে যাবে। কলাগাছকে যত্ন করে তুলে বাড়ির পুকুর পাড়ে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং এর থেকে নতুন কলাগাছও জন্মায়। এই ব্রতটিতে পুরোহিতেরও কিছু করণীয় থাকে। সূর্যোদয়ের আগে পুরোহিত কলাগাছ পুকুর ও বেদীর সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে অর্ক ও অন্যান্য ফল দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে পুজো করেন। (ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাবে এই পুরোহিত কর্ম পরে এসেছে) ব্রতের শেষে ব্রতনারীরা বসতে পারেন কিন্তু ব্রতের ফলমূল ও নৈবেদ্য খেতে পারেন না; রাতে পায়েস খেয়ে উপোষ ভাঙেন। ফল ও নৈবেদ্য পুরোহিতের ভোগে লাগে বা বাড়ির অন্যরা খেতে পারে।

মাঘ মাসের প্রতি রবিবারে প্রায় পাঁচ বছর ধরে একটানা এই ব্রতাচারটি করে থাকেন শ্রীহট্টের সধবা ও বন্ধ্যা মেয়েরা। এই ব্রতটির কামনা সন্তান কামনা ও সন্তানের মঙ্গল কামনা। সূর্যকে আরতি ও বন্দনা করে এই ব্রতাচারটির মধ্য দিয়ে শ্রীহট্টের মেয়েরা সূর্যকে প্রসন্ন করতে চাইছেন। সূর্য প্রসন্ন হলে বন্ধ্যানারী সন্তান লাভ করবে এই বিশ্বাস থেকেই শ্রীহট্টের মেয়েরা সূর্যব্রত করেন। এই ব্রতটিতে সূর্যকে উর্বরতা শক্তির উৎস হিসাবে দেখছেন শ্রীহট্টের মহিলারা। আবার সূর্যকে আরতি করে প্রসন্ন করার বাসনার সঙ্গে পুকুর কেটে পুকুরের জল ছিটিয়ে বৃষ্টির অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাসও রয়েছে। ছোট দুটি কাটা পুকুরের সামনে পোঁতা কলাগাছটিকে আবার লাগিয়ে গাছ ফলানোর মধ্যে শস্য ফলানোর অনুকরণমূলক যাদুরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সূর্য উপাসনার রীতি আদিকাল থেকে পৃথিবীব্যাপী নানা ধারায় বয়ে চলেছে। সূর্য সমস্ত প্রাণের উৎস ও সূর্যকে তুষ্ট করলে সন্তান, শস্য, বৃষ্টি সমস্তই পাওয়া যাবে এমন ধারণাটি পৃথিবীর সব জায়গায় সব মানুষেরই আদি চিন্তাপ্রসূত ধারণা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রত'তে বলছেন—

"সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাসে দেখা যায় আদিম মানুষের মধ্যে বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, তারা এরা উপাসিত হচ্ছেন— ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট, মেক্সিকোতে" (পৃঃ ৪)। শ্রীহট্টের মেয়েরাও সূর্য ব্রতাচারের মধ্য দিয়ে সেই আদিম উপাসনার ধারাটিকে বজায় রেখেছেন। যে সময়ে নারীর সন্তান ধারণের শক্তি ও ভূমির শস্য ফলনের উর্বরতা শক্তির কোন যুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা

দেওয়া সম্ভব ছিল না সেই সময়ই নারীর উর্বরতা ও ভূমির উর্বরতা, নারীর সন্তান দানের ক্ষমতা ও ভূমির শস্য দানের ক্ষমতাকে এক করে দেখার প্রবণতা এলো মানুষের মনে।" আমেরিকার হুইচর জাতি বৃষ্টি কামনায় এক ব্রত পালন করেন। মাটির সরার এক পিঠে আলপনার চিহ্নের মত একে সূর্যের গতিবিধি আঁকেন; তার মধ্যে লাল গোল ফোটা সূর্যের মত, কিনারায় পর্বতের চূড়া, চূড়ার ধারে ধারে লাল-হলুদ বিন্দু ধানক্ষেত বোঝাবার জন্যে লাল ও হলুদের সব বিন্দু; তারি ধারে বৃষ্টি বুঝিয়ে কতকগুলি বাঁকা বাঁকা টান। সরার অন্য পিঠে লাল, নীল, হলদে রঙের রেখে ঘেরা চক্রাকার সূর্যমূর্তির আলপনা লিখে পূজাবাড়িতে রেখে ব্রত করা। হয়তো এই আলপনা দিয়েই ব্রত শেষ, হয়তো বা ছড়াও কিছু বলা হয়।"[৫] সূর্য উপাসনার বিভিন্ন রীতি পশ্চিমবঙ্গের নানা জনজাতির মধ্যেও রয়েছে। ধর্মঠাকুরের পূজা, সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের সিংবোঙ্গা, ওঁরাওদের ধর্মেশ, ভূমিজদের বড়াম, খাড়িয়াদের গিরিঙদুবা, মালদের ধর্মের গোঁসাই, চামারদের সুরজ নারায়ণ, খন্দদের বুড়াপেনু, ইতু, মিত্র, রা, রাল, ছট্‌ সব ব্রত ও উপাসনা পদ্ধতিই সূর্যের কাছে কিছু কামনা-- মূলত সন্তান, শস্য ও বৃষ্টির কামনা।[৬] কালের প্রবাহে সূর্য উপাসনার রীতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু ব্রতাচারটির আদি উৎস মূলে কৃষিআচার ভিত্তিক উর্বরতা-সংক্রান্ত যাদুক্রিয়া ও অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাস রয়েছে।

সূর্য-ব্রতাচারে শ্রীহট্টের মেয়েদের 'ধামাইল' নাচ ও গান ব্রতাচারটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর নানা জায়গায় সূর্য-উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে নাচও একটি আনুষ্ঠানিক আচারকর্ম। উত্তর আমেরিকার সমতলের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে 'সূর্যনৃত্য' সূর্য-উপাসনার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া।[৭] ব্রাজিলের কারাজা জনজাতিদের মধ্যে যুবতী মেয়েরা প্রথম রজঃ দর্শণের পর তাদের সন্তান-জন্ম-সংক্রান্ত উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য "perform a traditional dance in honour of the Sun."[৮] বাংলার অস্ট্রিক জনজাতিদেরও সূর্য-উপাসনার বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে নাচ ও গান তাদের অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গ। পৃথিবীব্যাপী নাচগানের আচারভিত্তিক আনুষ্ঠানিক রীতিটি 'ব্রতনৃত্য'[৯] ধামাইলের মধ্য দিয়ে শ্রীহট্টের মেয়েরা বজায় রেখেছেন তাদের সূর্য ব্রতাচারের মধ্যে।

রূপসী ব্রত

সন্তানের জন্মের পরে ও সন্তানের বিয়ের আগে বিশেষ করে পুত্র সন্তানের জন্ম ও বিয়ের আগে শ্রীহট্টের সধবা মহিলারা রূপসী ব্রতাচারটি করে থাকেন। সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই ব্রতটি করেন সন্তানবতী ও পুত্রবতী মেয়েরা। সন্তানের মঙ্গল কামনা এই ব্রতটির মূল উদ্দেশ্য হলেও রূপসী ব্রতাচারটির মধ্যে আদি বৃক্ষ উপাসনার ধারাটি বহমান রয়েছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর প্রথম মানুষেরা তাদের সংগ্রহকারী আর্থসামাজিক জীবন পর্বে বৃক্ষের উপরই নির্ভর করতেন। বৃক্ষ ফল দেয়, ফুল দেয়, ছায়া দেয়, বাসস্থান দেয়। বৃক্ষ অন্নদাতা, বৃক্ষ জীবনদাতা এই উপলব্ধি থেকে বৃক্ষাত্মার উপাসনার শুরু। শ্রীহট্টের সন্তানবতী ও পুত্রবতী নারীরা বিশ্বের বৃক্ষাত্মা উপাসনার রীতিটিকে স্থানীয় রূপসী ব্রতাচারের মধ্যে বজায় রেখেছেন।

একজন বা পাঁচজন বা সাতজন বা আরো বেশি বেজোড় সংখ্যার সধবা সন্তানবতী ও পুত্রবতী মেয়েরা এই ব্রতাচাবটি করেন। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সব মহিলারাই সন্তানের শুভ কামনায় এই ব্রতাচারটি করেন। ছেলের জন্মের একুশ দিনের দিন ও মেয়ের জন্মের একত্রিশ দিনের দিন মা অন্য সধবা নারীদের সঙ্গে করেন। সন্তানের বিয়েব আগে বিশেষ করে পুত্র সন্তানের বিয়ের আগেও এই ব্রতটি অন্যান্য সধবা নারীদের নিয়ে পালন করেন সন্তানের মা। ব্রতী মহিলাবা ব্রতের দিন স্নান কবে কলাগাছেব ভিতরেব অংশ বা ডোঙ্গা দিয়ে একটি ভেলার মত তৈবী করেন, যাকে শ্রীহট্টের স্থানীয় ভাষায 'ভেড়ুয়া' বলে। কলাগাছের কাণ্ডের খোসা পবতে পরতে খুলে নিয়ে ভেতরের যে মোটা অংশ বেব হয তাই দিয়ে সাতটি টুকরো পর পর কাঠি দিয়ে গেঁথে এই 'ভেড়ুয়া' তৈবী কবা হয়। কলাগাছের কাণ্ডের গায়ের ছাড়ানো মোটা খোল ভেড়ুয়ার মাপে কেটে নিয়ে চারদিকে চাবটি কাঠি দিযে গেঁথে দিয়ে পাটাতনের মত জুড়ে দিতে হয় যাতে পরস্পব বিচ্ছিন্ন না হযে যায। মাঝখানে একটি কাঠি গেঁথে চাবদিকে চারটি কাঠি গেঁথে দিতে হয়। প্রত্যেক কাঠির মাথায় ফুল গেঁথে দেওয়া হয়। কলাব আগ পাতার অংশ কেটে নিয়ে তাতে চাল বা চিড়ে, কলা, খই, দই, দুধ, চিনি, বাতাসা দিয়ে ফলার সাজিয়ে ভেড়ুয়াব মধ্যে রাখা হয়। আব একটি এই সব দ্রব্য দিয়ে সাজানো কলাব আগপাতাব নৈবেদ্য শ্যাওডা গাছেব তলায় গিয়ে গাছকে উৎসর্গ করা হয। মাঝখানে পুরুত এসে 'ভেড়ুয়াকে' চণ্ডীজ্ঞানে পুজো করেন চণ্ডীমন্ত্র উচ্চাবণ কবে। পুরুতের পুজোব পবে ভেড়ুয়াকে মাথায় নিয়ে সন্তানেব মা, বর বা কনের মা অন্য সব ব্রতী মহিলাব সঙ্গে গীত গাইতে গাইতে শ্যাওড়া গাছের তলায় যাবেন----

চল চল এগো সকি তবিএ করিয়া,
অরণ্যে রূপসী মাঠাই চল দেখি গিয়া।
চল চল এগো সকি বেলা গইয়া যায়,
অরণ্যে রূপসী ব্রতের সময় গইয়া যায়।
কেহ লইলায় নৈবিদ্য প্রদীপ কেহই পানের খিলা,
কেহ লইলায় চুয়া চন্দন কেহই ফুলেব মালা।
পুষ্পের ভেড়ুয়া তুলিযা লইলা পুত্রেব মা সুন্দবীরে
অরণ্যেতে পূজে আজি হরেব মনমোহিনীবে।

শ্যাওডা গাছের তলা আগে থেকে নিকিযে বাখেন ব্রতী মেয়েরা। শ্যাওডা গাছের নিচে ভেড়ুয়া বেখে সব ব্রতী মেয়েরা জল ও দুধ দিযে গাছেব গোডা ধুইযে তেল ও সিঁদুর দিয়ে গাছকে বরণ করেন। নৈবেদ্য ফলমূল কলার পাতায করে এনে গাছেব গোডায় বেখে দুটি পানের খিলিও তার সঙ্গে দেওয়া হয। সঙ্গে কবে আনা ডিম বা আটার মণ্ড গাছেব গোডায রেখে গাছটিকে সাত প্যাঁচ সুতো দিয়ে জডিয়ে সন্তানেব মা গাছেব সঙ্গে কোলাকুলি কবে 'সই-আলা' মিতালী পাতাবেন। পান দুটি গাছেব গোড়ায় দিযে শ্যাওড়া গাছকে উৎসর্গ করে

একটি পান আঁচলে বেঁধে মা ঘরে নিয়ে খাবেন। তারপরে সন্তানের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করে গাছের পাতায় তেল সিঁদুর মাখিয়ে সেই সিঁদুর আঙ্গুলে করে সিঁথিতে দেবেন। রূপসী-রূপী শ্যাওডা গাছকে বরণ ও নিমন্ত্রণ করে ব্রতী মেযেরা গান কবেন—

তরা দেওবে জুগাব,
রূপসীর নিমন্ত্রণ মঞ্চে আসিবার।
কর জুড়ে রূপসীদের কবি নিমন্ত্রণ,
আসিবায় রূপসী মাঠাই এই্ নিমন্ত্রণ।
পান সুপারী দিযা আমি নিমন্ত্রণ জানাই,
বর্তি (ব্রতী) সকলের আকিঞ্চন পুবাইবায়।
স্বর্গ মর্ত পাতালেতে নিমন্ত্রণ জানাই্
সকলে মিলিয়া আইস কাঙ্গালের দবজায।
ধূপদীপ নৈবিদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছি,
রূপসী মাঠাই আসিবাবে বাস্তায় দাবাই্যাছি।

শ্যাওডা গাছের সঙ্গে ‘সইয়ালা’ পাতিয়ে রূপসীদেবীকে শুভ কাজে নিমন্ত্রণ কবে ব্রতী মহিলাবা গীত গাইতে গাইতে গাছ্তলা থেকে ঘবে ফিবে আসেন।

বই্নাবীর গলায দবি প্রাণ বইনাবী এ কান্দে
সিন্দুর বদল দিয়া বই্নগ বিদায দাও আমাবে
কুলের ছাবাল বইনগ কান্দে উচ্চৈস্বরে
গিরস্তিব জঞ্জালে বইনগ ছাবে না আমারে।
কেমনে আমি ছারাল পাইমু বই্নাবীবে কই,
তুমার ব্রত রাখিতে আমি কোলের ছাবাল থুই।
কোলের ছাবালবে তুমি দেও গো শ্রীচরণ
সইথালা পাতাইয়া আমি কবি গো নিমন্ত্রণ।

ব্রতেব আগের দিন ‘সংযম’ পালন কবে ব্রতের দিন ব্রতাচার শেষ করে ব্রতী মেয়েবা কলাপাতায় বাখা ফল খেয়ে উপোষ ভাঙেন। সেদিন দুপুরে ব্রতান্তে মাছ্ভাত খেতে পারেন। রাত্রিবেলা দুধ ফল এই সব খেয়ে থাকেন। সন্ধ্যেবেলা ব্রতী মহিলাবা মিলে ধামাইল নাচ গান করে থাকেন। এই্ ব্রতের ধামাই্ল নাচের গান ব্রতী মহিলাবা মুখে মুখেই রচনা করেন বা আগে থেকে গ্রাম্য কবিদের তৈরী গান ধামাই্ল নাচের সঙ্গে সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত কবে থাকেন।

বৃক্ষ-আত্মা উপাসনার ধারা আদিকাল থেকে মানুষেব মধ্যে প্রচলিত। প্রথম মানুষ চোখ মেলেই দেখতে পেয়েছে তাব চারপাশের পরিবেশ ভূমি, জল, জন্তু ও বৃক্ষে পবিব্যাপ্ত। “Man's instinct was, perhaps to venerate the trees, and once his need for more or less identifiable to deities had crystallized, it was a short step to identify tree with God, that trees in general, and some trees in particular, were very wildly venerated among early people."[৯] আদি জনজাতির আচার অনুষ্ঠানে পবিত্র বৃক্ষাত্মার উপাসনার মধ্য দিয়ে আদিম যাদু-বিশ্বাসের প্রকাশও ঘটেছে। "Representations of sacred tree are to be found on Chaldean and Assyriam engraved cylinders and, from slightly later periods, on temples. The tree seems to have been an essential symbol of Chaldean religion... the ancient Egypt, the numerous deites were frequently supposed to inhabit trees."[১০] "ভারতের আদিবাসীরাও অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের মতো বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। বাংলা দেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে গাছপূজা এখনও বহুল প্রচলিত; বিশেষত তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বটগাছ।"[১১] শ্রীহট্টের মেয়েরা রূপসীব্রতের মধ্যে আদিবাসী কৌম সমাজের বৃক্ষ উপাসনার রীতিটিকেই স্থানীয়রূপে বজায় রেখেছেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে রূপসী ব্রতদেবীর সঙ্গে দেবী-চণ্ডী অভিন্ন করে দেখা হয়েছে। তাই রূপসী ব্রতাচারে চণ্ডীমন্ত্র উচ্চারণ করে পুরোহিত এসে পুজোও করেন। কিন্তু রূপসী ব্রতাচারটির উৎস মূলে যেতে হলে বহু বিস্মৃতির যুগকে পেরিয়ে যেতে হবে। বৃক্ষ সর্বজীবনের রক্ষাকারী শুভকারী তাই পবিত্র বৃক্ষাত্মা সন্তানের শুভকারী ও রক্ষাকর্ত্রী রূপে শ্যাওড়া গাছ শ্রীহট্টের মেয়েলি ব্রতাচারে রূপসী দেবীরূপে পরিণত হয়েছে। শ্রীহট্টের মেয়েরা সন্তানের বিশেষ করে পুত্রসন্তানের সবরকম শুভ কামনায এই ব্রতাচারটি করে থাকেন। শ্রীহট্টের রূপসী ব্রতাচারটির সঙ্গে বীরভূমের অখ্যাত গ্রামের শ্যাওড়া গাছের ঝোপে সর্বমঙ্গলার ব্রতের মিল আছে। বীরভূমের সধবা সন্তানবতী মেয়েরা সন্তানের সর্বাঙ্গিন শুভ কামনায় করছেন সর্বমঙ্গলারূপী শ্যাওড়া গাছের উপাসনা আর শ্রীহট্টের মেয়েরা সন্তানের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল কামনায় সন্তানের জন্মের পরে ও সন্তানের বিয়ের আগে বিশেষ করে পুত্রসন্তানের জন্মের পরে ও বিয়ের আগে স্থানীয় আচারে করছেন রূপসীরূপী শ্যাওড়া গাছের ব্রতাচার যার মধ্যে বৃক্ষপ্রাণ উপাসনার বিশ্বব্যাপী ধারাটি বজায় রয়েছে।

সাবিত্রী ব্রত

শ্রীহট্টের সধবা মেয়েরা স্বামীর মঙ্গল কামনা ও সন্তান কামনায় এই ব্রতাচারটি পালন করেন। স্বামীর আয়ুবৃদ্ধি ও স্বামীর সবরকম মঙ্গল ও শুভ কামনার জন্যও এই ব্রতটি পালিত হয়। সন্তান কামনা, পুত্রসন্তান কামনাও এই ব্রতটির কামনার আর একটি দিক। প্রতি বছর জৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথি থেকে অমাবস্যা তিথি পর্যন্ত স্বামীর মঙ্গল কামনায়

শ্রীহট্টের মেয়েরা এই ব্রতাচারটি করেন। একটানা তিনদিন ধরে এই ব্রতাচারটি চলে। এই ব্রতাচারটি পালনের পেছনে কোন জাতবিচার নেই। শ্রীহট্টের সব জাতের মেয়েরাই এই ব্রতটি করে থাকেন। বিয়ের এক বছরের মধ্যে নতুন বৌটি স্বামীর আয়ু ও সর্বাঙ্গিন মঙ্গল কামনা ও সন্তান কামনা বিশেষ করে পুত্র সন্তান কামনায় এই ব্রতাচারটি করে থাকেন। নববধূর এই ব্রতাচারটি একান্ত পালনীয় এবং সধবা মেয়েরা একটানা চোদ্দ বছর বা সারা জীবন ধরে এই ব্রতাচারটি পালন করেন। শ্রীহট্টের মেয়েদের কাছে এই ব্রতাচার পালন করার গুরুত্ব এর থেকেই অনুমান করা যায়।

বাড়ির প্রাঙ্গণই হচ্ছে সব ব্রতাচার পালন করার ভূমিস্থল। সাবিত্রী ব্রতাচারেও প্রথমে ব্রতী মেয়েরা বাড়ির উঠোনে একটি মাটির বেদী বানিয়ে বেদীর চারকোণে চারটি কচি বাঁশের কঞ্চি বা চারকোণায় চারটি বটগাছের ডাল পুঁতে দিয়ে লাল সুতো বা সুতো দিয়ে বটের ডাল বা বাঁশের কঞ্চিগুলি তিনবার বা পাঁচবার পেঁচিয়ে দেন। বেদীর ডান দিকে সাদা চালের গুড়ি দিয়ে বট বা অশ্চথ গাছ ও তার নিচে মৃত স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে সাবিত্রীর ছবি আঁকা হয়। আর বেদীর বাঁ দিকে 'কালাগুড়ি' দিয়ে যমের মূর্তি আঁকতে হয়। ধানের তুষ পুড়িয়ে নিয়ে গুড়ো করলেই কালো রং-এর গুড়ি পাওয়া যায়। একটি বটের পাতাতে সিঁদুর দিয়ে সাবিত্রী ও চালের গুড়োর পিটুলি দিয়ে আর একটি বটের পাতায় সত্যবান এঁকে পাতাদুটি মাটির বেদীর দুপাশে রেখে কালো রঙ দিয়ে বা কয়লা দিয়ে যমরাজের ছবি আঁকেন ব্রতী মেয়েরা। বেদীর সামনে অশ্বত্থ গাছের ডালও পুঁতে দেন এবং তার সঙ্গে গেঁথে বট অশ্বত্থ পাতা ঝুলিয়েও দেন। বেদীর সামনে তামার থালায় ১০৮টি জুম চাষের চাল একটি নতুন কাপড়ে বেঁধে পুটলী করে রাখা হয়। তাছাড়া ১০৮টি কাঠির (খইড়কা) এক সঙ্গে বাঁধা, সাবিত্রী ফুল, ১০৮টি দূর্বা, তালপাতা দিয়ে তৈরী ঝুরি ও কোদাল, বট পাতায় ও তাল পাতায় আঁকা সাবিত্রী ও সত্যবানের ছবি— এই সব কিছু এক সঙ্গে বেঁধে তামার থালায় রাখতে হয়। তিন দিন ধরে ব্রতী মহিলারা ঐ তামার থালার সব জিনিষ এই ভাবেই রেখে দেবেন ও প্রতিদিন ব্রতের সময় একটি করে ফল ঐ থালায় রাখবেন। ত্রয়োদশীতে ব্রতাচার পালন শুরু করেন মেয়েরা, পুরুত এসে ঐ বেদীর সামনে পুজো করেন। ব্রতী মেয়েরা মন্ত্র উচ্চারণ করে পুরুতের পুজোর পরে একটি করে ফল তামার থালায় রাখেন। তিনদিনে তিন রকম ফল জমিয়ে রাখেন। ব্রতের তিনদিনের একই রকম ভাবে ব্রতাচার করে চার দিনের দিন অমাবশ্যার পরের দিন খুব ভোরে স্নান করে ব্রতী মহিলা স্বামীকে বেদীর সামনে দাঁড় করিয়ে বরণ করেন। তামার থালায় কাপড়ে বাঁধা জুম চাষের ১০৮টি চাল ধুয়ে স্বামীকে খেতে দেবেন। তামার থালায় জমা হওয়া তিনটি ফলও স্বামীকে খেতে হয়। অশ্বত্থ পাতার বা বট পাতার গোলা সিঁদুর দিয়ে নিজে টিপ পরে স্বামীকে চন্দনের টিপ দেন। এরপর স্বামীর পা ধুইয়ে চুল দিয়ে ও ভিজে আঁচলে মুছিয়ে দেন। এমন কি স্বামীর পা ধোয়া জল খাওয়ার পর ব্রতী মেয়েরা ফল ও দুধ খেয়ে উপোষ ভাঙেন। সেদিন ব্রতী মেয়েরা ভাতও খেতে

পারেন কিন্তু হাল চাষের কোন জিনিষ, চাল বা ফল কিছুই খাবেন না। উপোষ ভাঙার পব বলদ এনে ধানদূর্বো দিয়ে বরণ করে বলদকে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে ফল খেতে দিয়ে ব্রতাচার শেষ করেন। সেদিন মাছ দিয়ে ভাত খেতে পারেন। কাছাড়ে কোথাও কোথাও চার দিনের দিন জোয়াল বাঁধা জোড়া বলদ কোন চাষীকে দিয়ে আনিয়ে ব্রতীনি ঐ বলদের জোয়ালের বাঁধন সাত বার করে খুলে দেবেন। স্বামীকে বরণ করার পরে মাছ ভাত খেয়ে ব্রতী মহিলা ব্রত ভঙ্গ করেন। প্রতিদিন ব্রতের শেষে ব্রতী ব্রত কথা বলেন ও অন্যান্য মেয়েরা শোনেন। সাবিত্রী মৃত স্বামী সত্যবানের প্রাণ কি ভাবে যমরাজের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনলেন ও যমবাজ তাকে একশত পুত্র লাভের বর দিলেন সেই মহাভারতের কাহিনীই স্থানীয় ব্রতকথার মধ্য দিয়ে ব্রতী মহিলা অন্য মহিলাদেব শোনান। স্বামীব শুভ কামনা ও পুত্রলাভেব কামনা স্বামীপুত্রের সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা ও স্বামীপুত্রের দীর্ঘায়ু কামনাই এই ব্রতাচাবটির উদ্দেশ্য।

সাবিত্রী ব্রতাচারটিকে বিশ্লেষণ করলে সন্তান ও শস্য কামনার মিলিত মিশ্রিত রূপই এর মধ্যে দেখতে পাব। উর্বরতা বৃদ্ধিব যাদুভিত্তিক অনুষ্ঠানই এই ব্রতাচারটির মূল উৎস। সংগ্রহকারী শিকারজীবী আর্থসামাজিক স্তর থেকে কৃষিজীবী আর্থসামাজিক স্তবের লোকেবা সন্তান ও শস্য কামনায় যে উর্বরতামূলক যাদুক্রিয়া করতেন (Fertility cult) সেই আদি যাদুক্রিয়াটিই প্রচ্ছন্নভাবে কালের প্রবাহে পরিবর্তিত হতে হতে বাংলার ও শ্রীহট্টেব মেয়েলি সাবিত্রী ব্রতাচাবে রূপ নিয়েছে। সন্তান ও শস্য কামনা পরে পিতৃকেন্দ্রিক সমাজে স্বামীর মঙ্গল কামনা ও সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তান কামনায় পবিণতি লাভ কবেছে। বিবর্তনেব ধারায় বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী প্রকৃতিব জগতের মধ্যে ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রকৃতির পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে খাদ্য সংগ্রহেব যুগ থেকে কৃষিযুগের উত্তরণের পর্বে উদ্ভিদ-প্রাণ উপাসনার বীতি ও শস্য-প্রাণ উপাসনার রীতির আনুষ্ঠানিক আচারভিত্তিক যাদুক্রিয়া থেকেই মেয়েলি ব্রতাচারগুলির সৃষ্টি হযেছে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে এই ব্রতাচারে মন্ত্র ও উপাচারের পরিবর্তন ঘটলেও উর্ববতাভিত্তিক যাদু বিশ্বাস এই ব্রতাচারটির মূলে রয়েছে। আর্থসামাজিক স্তরে নারীর অবমূল্যায়নের চিত্রটি এই ব্রতাচারটিতে মেলে। ব্রতাচারটিব প্রধান কামনা স্বামী ও পুত্র সন্তানের আয়ু ও মঙ্গল কামনা। নাবীকে পুরুষের দাসী বলে দেখার প্রবণতাও এই ব্রতাচাবটির মধ্যে রয়েছে। ব্রতাচারের শেষের অনুষ্ঠানটি লক্ষ্য করার মত। স্বামীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে স্বামীকে ১০৮টি চাল খাইয়ে পা ধুইয়ে চুল ও আঁচল দিয়ে পা মুছিয়ে ব্রতের ফল খাইয়ে ব্রতী ব্রত ভঙ্গ কবেন ও তিন দিনের উপবাস ভঙ্গ করে মাছ দিয়ে ভাত খান। যে আচাবটি ছিল একেবারে মেয়েদের কৃষিভিত্তিক শস্য ও প্রজননমূলক উর্বরতার কামনা সেটিই কেন্দ্রীভূত হোল স্বামীতোষণ ও পুত্রসন্তানের কামনার মধ্যে; কেননা পুরুষকেন্দ্রিক সমাজে নারীর কামনাগুলি স্বামী পুত্র বাপ ভাই-এর অর্থাৎ পুরুষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। শ্রীহট্টের সাবিত্রী ব্রতটি তাই স্বামীব আয়ু ও মঙ্গল কামনা ও পুত্র সন্তান লাভ ও পুত্র সন্তানের মঙ্গল কামনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে একান্ত মেয়েলি ব্রতাচারে পবিণত হয়েছে।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত

শ্রীহট্টের মেয়েলি ব্রতাচারের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডীব ব্রত একটি উল্লেখযোগ্য ব্রতাচার। বিবাহিত সধবা মেয়েরা এই ব্রতাচারটি করেন বিভিন্ন মাসের মঙ্গলবাবে। সংসারের সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে এই ব্রতাচারটি করা হয়। নারীর ব্যক্তিগত কামনা হল স্বামী সন্তান পিতা পুত্র ও ভাইকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে পরিবার জীবন যাপন কবা। তাই এই ব্রতটির উদ্দেশ্য সংসারের মঙ্গলের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত মঙ্গল।

বৈশাখ মাসের মঙ্গলবাবে হরষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতাচারটি পালন করেন শ্রীহট্টেব মেয়েবা। ব্রতাচারেব প্রধান ও লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল 'ঘট' স্থাপন। আগের দিন নিরামিষ খেয়ে ব্রতের দিন সকালে স্নানান্তে 'ঘট' স্থাপন করেন ব্রতী মেযেরা। ঘটেব সামনে সিঁদুব গুলে রাখেন। ঘটের সামনে চিড়ে দই ও পাঁচ রকমের ফল দিয়ে ভোগ দেওযা হয়। তারপর একজন ব্রতী ব্রতকথা বলেন বা পাঠ করেন অন্যান্য ব্রতী মেয়েরা শোনেন। ব্রতকথা শোনা শেষ হলে ঘট রূপ হবষমঙ্গলচণ্ডীর সামনে ফুল দিয়ে অঞ্জলি দেবেন ব্রতী মেয়েরা। সকাল থেকে না খেয়ে হবষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতাচার শেষ হলে ব্রতের ঘটের সামনে দেওয়া উপাচার চিড়ে দই কলা ও ফল দিয়ে ব্রতী মেয়েরা ফলাহার করেন। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে হরষ মঙ্গলচণ্ডীর ঘট স্থাপন করে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত হাতে লেখা পুঁথি থেকে ব্রতকথা পাঠ শোনেন ব্রতী মেয়েরা। ব্রতকথার বিষয়বস্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী এবং লহনা খুল্লনা ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী। সারা রাত জেগে ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণ করেন ব্রতী মহিলারা। এই ব্রতাচাবটির মধ্য দিয়ে চণ্ডীকে হরষিত করা, আনন্দিত করা, প্রীত করাই ব্রতী নারীদের উদ্দেশ্য।

কুলকর মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত

অগ্রহায়ণ মাসের যে কোন মঙ্গলবারে একদিনের এই ব্রত কবেন সধবা মেয়েরা। ব্রতের দিন স্নান করে ব্রতী মেযেরা ঘট স্থাপন করে ঘটের সামনে চাল কলা বাতাসা ও স্থানীয় ফল রাখেন। তাছাড়া পান সুপারী, বেল, গোলা সিঁদুর, ফুল, ধূপ, দীপ লাগে। ন'টি চাল ও ন'টি দূর্বা ও ন'টি কাঁঠাল পাতাও লাগে ওই ব্রতাচারে। ঘটেব সামনে আলপনা দেয় ব্রতী মেয়েরা। একটি চাল একটি দূর্বা একটি কাঁঠাল পাতাকে দু'ভাজ করে তার মধ্যে দিয়ে পানের খিলির মত তৈরী করে কাঠি দিয়ে গেথে ন'টি এই রকম কাঁঠাল পাতার খিলি তৈরী কবে ঘটের সামনে বাখেন ব্রতী মেয়েরা। একটি কাঁঠাল পাতার খিলি ও স্থানীয় ফুল দিয়ে ঘটের সামনে অঞ্জলি দিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা বলে ও শুনে এই ব্রতাচার শেষ করেন। পুজোর চাল কলা দই ও ফল খেয়ে উপোষ ভাঙেন ব্রতী মেয়েরা। রাতেও কলা চিড়া দই ফল খেয়ে থাকেন। ব্রতের দিন সন্ধ্যেবেলাও একটি ব্রতাচার করে থাকেন মেয়েরা। গোয়াল ঘরের সামনের মাটি ও জমি ভাল করে লেপে পুছে পিটুলী (গোলা চালের গুড়ো) দিয়ে গরু, লাঙল, ধানের

ছড়া ও রাখাল মানুষ আঁকেন। ফুল ও জল ছিটিয়ে মুখে ছড়া বলে ফুলকর মঙ্গলচণ্ডীর কাছে কৃষি ও গরুর উন্নতির জন্য কামনা জানান ব্রতী মেয়েরা। ব্রতীরা সুব দিয়ে ছড়া বলতে থাকেন—

ফুলকব ঠাকুর ফুলফুলা (তবতাজা)
দানে (ধানে) চাউলে গরবরা (ঘবভবা)
গরু বাউছুরে (বাছুরে, গরবরা।

ফুলকব মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতাচাবটিতে মেয়েদেব প্রধান কামনা শস্যে ধানে চালে গরু বাছুবে ঘর ভর্তি হওয়ার কামনা যা একটি কৃষিজীবী সমাজের কামনা। তাই বলা যায় কৃষি সম্পর্কিত যাদুক্রিয়া এই ব্রতাচারটির মধ্য দিযে প্রকাশ পেয়েছে। চালের গুড়ো গরু, গোযাল, বাখাল, ধানেব ছড়া, এই সবের আলপনা অনুকরণমূলক কৃষি সংক্রান্ত যাদুক্রিয়াকেই মনে করিযে দেয।

উদয় মঙ্গলচণ্ডী

অগ্রহায়ণ মাসে শুরু কবে চৈত্রমাস পর্যন্ত পাঁচটি মঙ্গলবারে বা সাতটি মঙ্গলবাবে এই ব্রতাচার কবেন শ্রীহট্টেব মেয়েরা। গৃহস্থের মঙ্গলেব ও ভরভবন্ত সংসার লাভেব কামনা কবে এই ব্রতাচাবটি পালন কবেন ব্রতী নাবীবা। ব্রতী মহিলাবা প্রত্যেকটি ব্রতেব জন্য আলাদা পাত্রে ন' মুঠি ও ন' চিমটি চাল নেবেন ভাত বাঁধাব জন্য। ঐ ভাত এবং সব্জি, শাক, ডালেব বড়া, ঝোল, ঘি, দুধ, দই ব্রতেব সামনে বাখবেন। চাল কলা ফল দিয়েও নৈবেদ্য দেওযা হয। ন'টি আম পাতার প্রত্যেকটিতে একটি কবে চাল ও দূর্বা দিযে খিলি বানিযে ব্রতেব জায়গায় রাখা হয়। প্রত্যেক মঙ্গলবাবের ব্রতে নতুন কবে ঐ রকম আম পাতাব খিলি বানাতে হয়। সমস্ত ব্রতাচারের উপকবণ ব্রতের জায়গায রেখে ব্রতী ব্রতকথা শুনে একটি পদ দিয়ে ভাত খাবেন। প্রতি মঙ্গলবাবেব ব্রতে একাট কবে পদ ন'মুঠি ও ন'চিমটি চালেব ভাতেব সঙ্গে দিতে হয ও ব্রতী মহিলাকে ঐ একপদ দিয়ে সমস্ত ভাত একটুও না ফেলে খেতে হয়। প্রথম মঙ্গলবারে শুধু ঘি ভাত, দ্বিতীয় মঙ্গলবারে শাক ভাত, তৃতীয় মঙ্গলবাবে তবকারি দিযে বান্না ঝোল ভাত, চতুর্থ মঙ্গলবারে ডাল ভাত, পঞ্চম মঙ্গলবারে বড়া ভাত, ষষ্ঠ মঙ্গলবারে দই ভাত ও সপ্তম মঙ্গলবাবে দুধ ভাত খাবেন ব্রতী মেয়েবা।

এই ব্রতাচার পালনের মধ্য দিয়ে শ্রীহট্টের মেযেবা সমস্ত কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যে যাতে ঘর ভবা থাকে এই কামনাই করেন। প্রতিদিনের বকমারি খাদ্যেব তালিকা দেখে মনে হয় চিরদিন অন্ন ও অন্যান্য কৃষিজ বস্তু দিয়ে ঘর ভরে থাকুক এই কামনাতেই নানা বস্তু দিয়ে এই ব্রতাচারটি পালনের মধ্যে ব্রতেব মূল উদ্দেশ্য সমস্ত কৃষিজ দ্রব্যের উন্নতি বিধান। ঘর শস্য সম্পদে ভরে উঠুক এই কামনাতেই অগ্রহায়ণ মাস থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত মঙ্গলবারের সাতদিনে সাতবার এই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতাচার পালন করেন মেয়েরা। ব্রতটির মূল উদ্দেশ্য কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতিবিধান।

ভদ্রচণ্ডীর ব্রত

এই ব্রতটি ভাদ্রমাসের সক্রান্তিতে এক দিনের জন্যই করে থাকেন শ্রীহট্টের সধবা মেয়েরা। ব্রতের প্রধান উপকরণ নতুন গজানো ধানের চারা। এক মাস আগে থেকে ঘরের উঠোনে ব্রতের জায়গায় ধানকে ভিজিয়ে 'গেজ' বা অঙ্কুর বের করে পাঁকাল মাটি দিয়ে ঐ 'গেজ' বার করা ধানের অঙ্কুর লাগিয়ে দেওয়া হয়। এমন সময় হিসেব করে লাগানো হয় যাতে ঐ ধানের অঙ্কুর থেকে ভাদ্রমাসের সক্রান্তির আগে চারা ধানগাছ বেরিয়ে যায়। ধানের চারাকে লক্ষ্মী কল্পনা করে ঐ চারা ধানগাছের আবাহনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্মীকেই আবাহন করেন শ্রীহট্টের ব্রতী মেয়েরা। ভেজানো চিড়ে, ঘি, নুন, আদা, কাঁচা লঙ্কা ও চাল কলা ফলমূল দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে ব্রতের জায়গায় দেওয়া হয়। মেয়েরা ব্রতের দিন ঐ সব খেয়েই থাকেন। এই ব্রতাচারটির ধানের চারা গাছ লক্ষ্মীর প্রতীক ধরে নিয়ে ধনে ধান্যে ঘর সংসার ভরে উঠুক এই কামনাই করেন ব্রতী মহিলারা। কৃষি সংক্রান্ত আচারই ওই ব্রতটিতে করা হয়।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে কৃষির উন্নতির চেষ্টা ও কামনাই ফুটে ওঠে। যদিও বাংলার গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন নামে তিনি পূজিত হন— যেমন উড়োনচণ্ডী, শুভচণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, অবাকচণ্ডী, [illegible]লাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী। এই যে 'চণ্ডী' ইনি কাদের দেবতা? "বাংলার আদি অকৃত্রিম মাটির মানুষের সম্পূর্ণ নিজেদের পরিকল্পিত এই চণ্ডী দেবতা।"[১১]

বিনয় ঘোষের মতে চণ্ডী আর্যপূর্ব লোক সমাজের দেবতা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওঁরাওদের মধ্যে 'চণ্ডী' দেবীর প্রাধান্য আছে। 'চণ্ডী' শিকারের ও বন্য পশুর দেবী। চণ্ডীদেবীর প্রতীক একখণ্ড পাথর। ওঁরাও যুবকেরা এই 'চণ্ডী শিলা' নিয়ে শিকারে যান কারণ তাদের বিশ্বাস এতে শিকারে সাফল্য লাভ হবে। মুক্ত জায়গায় গাছের তলায় চণ্ডীর উপাসনার ব্রতাচারটি করেন।

"চণ্ডীদেবী আর্যপূর্ব কোন দ্রাবিড় ভাষাভাষী বা অস্ট্রিক ভাষাভাষীর আরাধ্য দেবী বলা যেতে পারে।[১২] চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ও ব্রতকথার পুঁথিতেও কালকেতু পূজিত চণ্ডী শিকারীর, বন্যপশুর ও বনের দেবী। ধনপতি সদাগরের কাহিনীতেও চণ্ডী হলেন গৃহপালিত পশুর দেবতা, ঘট, দূর্বা, ধান হল দেবীচণ্ডীর প্রতীক। "সভ্যতার দুটি স্তরে একই চণ্ডী দেবতার রূপান্তরের ইঙ্গিত এখানে বেশ স্পষ্ট। যাযাবর শিকারীদের স্তর থেকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে চণ্ডীদেবী রূপান্তরিত হয়েছেন।"[১৩] শ্রীহট্টের মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতাচারের উৎস মূলে যেতে হলে যাযাবর শিকারজীবী আর্থ সামাজিক স্তর থেকে পশুপালন ও কৃষিজীবী আর্থসামাজিক স্তরেই যেতে হবে। শিকারজীবী আর্থসামাজিক স্তরের পাথুরে চণ্ডী পশুপালন ও কৃষিজীবী আর্থসামাজিক স্তরে কৃষির দেবী মঙ্গলচণ্ডীতে রূপান্তরিত হলেন। ওঁরাওদের শিকারের শিলারূপ চণ্ডীদেবী বাঙালী ব্রতাচারে মঙ্গলচণ্ডীতে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়। তবে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতাচারের উপকরণগুলি দেখে মনে হয় যে এই ব্রতাচারটি কৃষি সমাজের সঙ্গেই জড়িত। শ্রীহট্টের মেয়েরা

ভাত, শাকসব্জি ও ঘরের পালিত পশুর দুধ দই ঘি প্রভৃতি দিয়ে এই যে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতাচারটি করেন তার মধ্যে শস্য ও ফসল বৃদ্ধির কামনা ও এই সব কৃষিজাত দ্রব্য দিয়ে ঘর ভরে ওঠার কামনাই যেন ফুটে ওঠে। শ্রীহট্টের মেয়েরা এই ব্রতাচারটির মধ্যে কৃষির উন্নতি সংক্রান্ত যাদুক্রিয়াই যেন পালন করেন যা পরবর্তী কালে শ্রীহট্টের একান্ত মেয়েলি ব্রতাচারে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে অঙ্কুর থেকে চারা গাছ দিয়ে ধান ক্ষেত তৈরী করার রীতি (Adonis garden) পৃথিবীর সব জায়গায়ই দেখা যায়। বটপাতা আমপাতা দিয়ে চাল দূর্বা গুঁজে ত্রিকোণ আকারের খিলিগুলি মেয়েদের যোনির আকৃতিকেও মনে করিয়ে দেয়। এই সমস্ত উপকরণগুলিকে সামনে রেখে এই যে শ্রীহট্টের মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতাচার তা একান্তই কৃষিভিত্তিক সমাজের ব্রতাচার বলেই মনে হয়।

আটআনাজ ব্রত

আশ্বিনের সংক্রান্তিতে দুদিন ধরে এই ব্রত করেন শ্রীহট্টের সধবা মেয়েরা। আট রকম আনাজ বা সব্জি দিয়ে ডালনা হচ্ছে এই ব্রতাচারের প্রধান উপকরণ। শনের ফুল, চালতাপাতা, বেলপাতা ও 'সুন্দা'মেথির গুঁড়ো ওই ব্রতাচারে লাগে। ব্রতী মহিলারা দু'দিনের ব্রতের জন্য দু'টো চালতা পাতায় শনের ফুল ও বেলপাতা পুরে দিয়ে দু'ভাজ করে কাঠি দিয়ে আটকে রাখেন। ছোট বাটিতে সুন্দা মেথির গুঁড়ো তেল দিয়ে গুলে ব্রতের জায়গায় রাখেন। ভাজ করা চালতাপাতার গায়ে সুন্দামেথির গোলার ফোঁটা দিতে হয়। ব্রতীমেয়েরা ব্রতের ঘট স্থাপন করে লক্ষ্মীদেবীকে স্মরণ করেন। ঐ ঘটের সামনে আগের রান্না করা আট আনাজের ডালনা ও ফল চাল কলা মিষ্টি দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া হয়। পরে লক্ষ্মীমন্ত্র উচ্চারণ করে লক্ষ্মীর পুজোই করেন মেয়েরা। এটিকে পশ্চিমবঙ্গের ঘটলক্ষ্মীর ব্রতেরই মত বলা যায়। বিকেলে ধানের গোলায় ও ঢেঁকিঘরে ব্রতের চালতাপাতার খিলিগুলি ছড়িয়ে দিতে দিতে ছড়া উচ্চারণ করেন ব্রতী মেয়েরা—

সুন্দা মেতি বেলের ফাত (পাত),
হিজা (শিষ) মেলে আড়াই আত (হাত)।
চাইলতা পাতায় দরব (ধরবে) কাড়াব,
একেক খেতে নয় নয় বাডাব (ভাঁড়ার)।

ব্রতটির ছড়ার মধ্য দিয়ে ধান ও শস্য ফলানোকে কি ভাবে বাড়ানো যায় তারই কামনা। শনের ফুল ও বেলের পাতা ভরা চালতা পাতা ছড়িয়ে দিতে দিতে ব্রতী মহিলারা কামনা করেন— প্রতি বছর হিজা অর্থাৎ ধানের শিষ আড়াই হাত সমান উঁচু হয় এবং সেই ধান দিয়ে ন'টি ধানের গোলা পূর্ণ করা যায়। ব্রতের ঘটের সামনে দেওয়া আট আনাজের তরকারী ব্রতের পরের দিন দুপুরে বাড়ির সবাই স্নান করে একসঙ্গে খাবেন। এই তরকারী খেলে সব মনস্কামনা সিদ্ধ হয় এই বিশ্বাস থেকেই আট আনাজ ব্রতাচার পালন করেন শ্রীহট্টের মেয়েরা—

আশ্বিনে বাইন্দা খার্তিকে খায়,
যে বর মাগে সেই বর পায়।

এই ব্রতাচারটি স্পষ্টতই কৃষি সংক্রান্ত। ঘটরূপী লক্ষ্মী আসলে কৃষিদেবী যাব পুজা প্রতি ঘরে ঘরে বাংলার কৃষিজীবীরা করে থাকেন। ঘটকে সামনে বেখে লক্ষ্মীব্রতই কবেন শ্রীহট্টের মেয়েবা এই ব্রতাচারটির মধ্য দিয়ে।

সঙ্কটার ব্রত

এই ব্রতাচারটি বিবাহিত ও কুমারী মেয়েবা করতে পাবেন। বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসের শুক্রবারে এই ব্রত করেন মেয়েবা। এক দিনেব এই ব্রতাচারের উদ্দেশ্য হল যে কোন সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ। আত্মীয় ও প্রিয়জনেব সঙ্কট মুক্তিব কামনা করে এই ব্রতাচারটি করা হয়।

পান, সুপারী, তিল, তুলসীপাতা, জবা ও অন্যান্য ফুল ও ফলমূল চালকলা দিযে সাজানো নৈবেদ্য ব্রতের উপকরণ। খিঁচুড়ি ও পায়েস দিযে ব্রতের ভোগ দেওয়া হয়। স্নান করে দেবী সঙ্কটার নামে ঘট স্থাপন করে ফুল দিয়ে অঞ্জলি দেন ব্রতী মেয়েরা। তারপর ব্রতকথা বলে ও শুনে প্রত্যেক এয়ো ব্রতীরা পরস্পরকে সিঁদুব পবিযে দেন। সমস্ত ভোগ ও প্রসাদ ব্রতী মেয়েবা মিলে খান। প্রসাদ খাওয়াব আগে সকাল থেকে ব্রতী মেয়েবা জলও খাবেন না। একটুও প্রসাদ না ফেলে কথা না বলে সমস্ত ভোগ প্রসাদ ব্রতী মেয়েদেবই খেতে হয়। সঙ্কটাব ব্রতাচাবটি পালন করলে মেয়েদেব মনের সব কামনা পূর্ণ হয় ও সর্ব সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এই বিশ্বাস থেকেই এই ব্রতাচারটি পালন করেন শ্রীহট্টের মেয়েরা। ব্রতেব পরের দিন স্নান কবে ঘট জলে বিসর্জন দেবেন। এই ব্রতটি সঙ্কটমঙ্গলচণ্ডীর ব্রত নামেও পরিচিত।

লক্ষ্মী ব্রত

প্রতি বৃহস্পতিবার এই ব্রত করেন শ্রীহট্টের মেযেরা। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে স্নান কবে অথবা গঙ্গাজল স্পর্শ করে শুদ্ধ হযে ধূপধুনা ও দীপ জ্বালিযে ঘট স্থাপন করে এই ব্রতটি করা হয। পান, সুপাবী, গোলা সিঁদুব লাগে ও ফল, মিষ্টান্ন, আতপ চাল দিয়ে নৈবেদ্য সাজান। ব্রতকথা পাঠ করে ব্রত শেষ হয়। এয়োরা সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে প্রসাদ বাড়ির সবাইকে খেতে দেন ও নিজেও খান। বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কববে না এবং স্বামীপুত্র পবিজন নিয়ে সুখে সংসার জীবনযাপন করবেন— এই বিশ্বাস থেকেই এই ব্রতাচাব পালন কবেন শ্রীহট্টেব মেয়েরা। স্বামীপুত্র ও পরিবারের সুখ সম্পদ কামনাই এই ব্রতেব প্রধান কামনা।

তব স্তব যেই জন কায মনে কয়,
ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ তার সুনিশ্চয়।

লক্ষ্মীর ব্রতকথাগুলিতে কিভাবে লক্ষ্মীর কৃপা লাভ ধনে জনে সুখে থাকতে পারা যায তারই কাহিনী। 'বাংলার ব্রত'তে অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কি ভাবে শস্য উৎসবই লক্ষ্মীব্রততে পরিণত হয়েছে। শ্রীহট্টের লক্ষ্মীব্রতটিও ধান্য লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মীরই আচারভিত্তিক উৎসব।

মাঘ ব্রত

শ্রীহট্টের কুমারী মেয়েদের সব থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্রত এবং কুমারী মেয়েরা পাঁচ বছর বয়স থেকে এই ব্রতাচারটি করতে শুরু করেন ও প্রথম রজঃ দর্শনের আগেই ব্রত শেষ করেন। মাঘ মাসের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত একটানা পাঁচ বছর ধরে এই ব্রতাচারটি করতে হয়। কুমারী মেয়েরা ভাল স্বামী পাওয়ার কামনায়, বাপভাই-এর শুভ কামনায ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুভ ও মঙ্গল কামনায এই ব্রতাচারটি করে থাকেন। এই ব্রতটির সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সেঁজুতিব্রত ও মাঘ মণ্ডলের ব্রতের মিল আছে।

মাঘ ব্রতে অনেক উপকরণ লাগে। কালো, সাদা, লাল, হলুদ ও সবুজ ওই পাঁচ রঙ দিয়ে নানা চিত্র ব্রতের জাযগায় আঁকেন কুমারী মেয়েরা। ধানের তুষ পুড়িয়ে কালো গুঁড়ি, চালের গুড়ো দিয়ে সাদা গুঁড়ি, লাল ইট ও হলুদ ইট গুঁড়ো করে লাল ও হলুদ গুঁড়ি, উরি (শিম) পাতা পুড়িয়ে সবুজ গুঁড়ি আগে থেকে বানিয়ে মাটির পাত্রে ভরে রাখেন ব্রতী কুমারী মেয়েরা। উঠোনে ব্রতের নির্দিষ্ট স্থানে এই পাঁচ রঙের গুঁড়ি দিয়ে নানা বিচিত্র আলপনা আঁকেন কুমারীরা। আর এই ব্রতের জন্য মাটি দিয়ে মাঝখানটা ঢোলকের মত ও দুই দিক সরু পেট মোটা মাটির গুলিও তৈরী করেন। যার নাম 'দেউল'। মাঘ মাস ধরে ব্রতের সময় প্রতিদিন পাঁচটি করে 'দেউল' কুমারী মেয়েদের ব্রতাচারে লাগে। দনাই-মনাই নামে এক রকমের স্থানীয় ফুলসহ ফুলগাছও এই ব্রতে দরকার হয়।

ব্রতের দিন খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে নিয়ে ব্রতী কুমারী মেয়েরা আগে থেকে নিকোনো বাড়ির উঠোনে গিয়ে জড়ো হন। আগে থেকেই কুমারীরা মাটি দিয়ে বেদী তৈরী করে দু'টি ছোট পুকুর কেটে তাতে জল ঢেলে রাখেন। দু'টি পুকুরের মাঝে আলের মত উঁচু করে মাটি দিয়ে পুকুরপাড়ের মতও বানানো হয়। পুকুরের পারে বানানো বেদীতে প্রতিদিন ব্রতাচার রূপে মেয়েরা আগের মাটির তৈরী দেউল স্থাপন করে। এই মাটির বেদীর সামনে ব্রতী মেয়েরা আসন গ্রহণ করে। ব্রতী মেয়েরা তাদের ব্রতাসনের পেছনে পাঁচ রঙের গুঁড়ি দিয়ে 'আটপাত মণ্ডল'-এর আলপনা আঁকেন। বসার আসনের দু'পাশ ঘিরে বাঁ দিক থেকে সূর্য, চাঁদ, থালা, ভৃঙ্গার ভেতরে মানুষ সহ ইনাগাছ, এবং ডান দিক থেকে আঁকবেন মাঘ মণ্ডল ও দেব দুয়ার (ভেতরে মানুষ), তিন কুণ্ডলী, পঞ্চসতীর নামে সতী মণ্ডল, দুলা (পাল্কী) ইত্যাদি। নানা রঙের যেমন লাল গুঁড়ি দিয়ে সূর্য, হলুদ গুঁড়ি দিয়ে তারা, সাদা গুঁড়ি দিয়ে চাঁদ, সবজ গুঁড়ি দিয়ে গাছ ও চালের গুঁড়ি দিয়ে দেবদুয়ার, মাঘ মণ্ডল, সতী মণ্ডল, তিন কুণ্ডলী, পাল্কী, থালা এই সব আঁকেন। প্রতি আলপনার সঙ্গে ব্রতের কামনা বলে আঁকা শেষ করে

পাঁচটি মাটির তৈরী দেউল বেদীর উপরে রেখে আবার ব্রতটি সিদ্ধির পেছনে মনের যে কামনা তা সুর করে বলবেন। সূর্যকে বিদায় জানিয়ে একদিনের ব্রত শেষ হয়। মাটির বেদীর উপরে পাঁচটি দেউল রেখে মেয়েরা সুর করে মন্ত্রের মত নিচের ছড়াটি বলতে থাকেন—

দেউল পূজি দেউলেশ্বর
বাপ বাই (ভাই) লক্ষেশ্বর
দেউল পূজি দেউলেশ্বর
ইন্দ্ররাজা মএশ্বর (মহেশ্বর)
কানায় মুণ্ডল মাথায় বাব (ভাব)
দেউল পূজি শতেক বার।

এই ছড়া উচ্চারণে বার বার 'পূজি' শব্দটি লক্ষ্য করার মত। মনে হয় এই লৌকিক ব্রতাচারটির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির 'পূজা' শব্দটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। সূর্য এঁকে সূর্যের ছড়া বলেন কুমারী মেয়েরা—

উঠ উঠ হুরজাই জকমক দিয়া
তোমারে পূজি মুই, কি কি ফুল দিয়া
তোমারে পূজি মুই দনাই মানাই দিয়া।

এই ব্রতাচারের ছড়া দু'টির সঙ্গে তুলনা করা যায় বীরভূম জেলার মেয়েদের ভাদুলী ব্রতের ছড়া—

ভাদুলীব্রত করতে কি কি ফুল লাগে
ইতল বেতল সকুয়া মকুয়া দু'টি ফুল লাগে।

মাঘ মণ্ডলের ব্রততেও মেয়েরা উচ্চারণ করে—

উঠ উঠ সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।

সাদাগুঁড়ি দিয়ে চাঁদ এঁকে শ্রীহট্টের ব্রতী মেয়েরা বলেন—

চান্দ আইলা চান্দনে
সূর্য আইলা বন্দনে

তারা এঁকে বলেন—

তারা পূজি গোরী
তারা পূজি স্বর্গের দুয়ারী

পৃথিবী এঁকে বলেন—

পিরতিবি আইলা আসিয়া (হাসিয়া)
আমি মাঘ বরত করি

সিংআসনে বসিয়া
পিরতিম পূজি ত্রিকুণ
মাগ্ পূজি সর্বগুণ
পিরতিম্ পূজি পাইলাম বব
বিষ্ণু পুরে ঘর গর।

থালা এঁকে বলেন—

থাল্ বাত (ভাত) বুঙ্গার (ভৃঙ্গার) পানি
জন্মে জন্মে আযবানী (এয়োস্ত্রী)

আটঘাট এঁকে ছড়া বলেন—

আটঘাট পূজি মুই সিরিসিরি বাইযা।

তিনটি পিটুলি দিয়ে গোল গোল এঁকে বলেন—

তিন কুণ্ডলী পূজি মুই
তিন বাজ ভূজি মুই
আগে পূজি বাপ'র রাজ (বাপের বাজ্য)
দুদে বাতে খাইযা (দুধে ভাতে)
তেউ পূজি স্বামীর রাজ
মাচ্ছে মাংসে খাইয়া
তেও পূজি পুতেব বাজ
গৃতে (ঘৃতে) বাতে খাইয়া।

ইনাগাছকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

ইনাগাছ কিনা জাগে
বাইগ্য (ভাগ্য) মতে কইন্যা জাগে
জাগে কইন্যা মাগে বর
মাগিয়া লইলা স্বামীব ঘর
জাগে কইন্যা মাগে বর
মাগিয়া লইলা দনের (ধনেব) বর।

এরপবে উপবে হাত তোলা দুটি মানুষের মত (মাঘমণ্ডল) এঁকে বলেন-

মাঘমণ্ডল সুনার কুন্ডল
বাপবাজা ভাই প্রজা
আফনে (আপনি) বিদ্যাদবী
মাই পাটেশ্বরী

পাট, পাট আ, পাট'র শাড়ি
পাকড়া চুলে সিন্দুর পিন্দি।

ভেতরে মানুষ-এর প্রতিকৃতি সহ দেবদুয়ার এঁকে বলেন—

আটঘাট দেবদুয়ার
পূজি উঠি স্বর্গদুয়ার,

এরপর পাল্কি এঁকে ব্রতী মেয়েরা বলেন—

দুলায় (পাল্কি) আই দুলায় যাই
মা বাপর বাড়ি গিয়া গি বাত খাই।

এরপর পাঁচসতী অহল্যা, মন্দোদরী, সীতা, কুন্তী ও দ্রৌপদীকে স্মরণ করে সতীমণ্ডল এঁকে ছড়া বলেন—

সীতা যেমন সতী, রাম যেমন পতি
কুন্তী যেমন পুত্রবতী, দ্রৌপদী যেমন সুহাগী
দুর্গা যেমন সতী, শিব তার পতি।

এইভাবে ছবি এঁকে ও ছড়া বলে ব্রতানুষ্ঠান শেষ হয়। ব্রতের শেষে মেয়েরা এক দিনের ব্রতের আঁকা মুছে ফেলে ব্রতের জায়গা পরিষ্কার করেন। একদিনের ব্রতের বেদীতে রাখা পাঁচটি দেউল তুলে রাখেন এবং এইভাবে ১৫ দিনের ব্রতের দেউল একসঙ্গে জলে বিসর্জন দেন। প্রতি ব্রতের দিন নতুন করে সমস্ত আলপনা আঁকেন ও পাঁচটি দেউল বেদীতে রাখেন। মাঘ মাসের ওই ব্রতানুষ্ঠানে চারদিনের রবিবারে 'ছাতি ফিরাণী' নামে একটি অনুষ্ঠান করেন। একটি সাজানো ছাতি ব্রতী মেয়ে মাথার উপর ঘোরাতে থাকে ও অন্য মেয়েরা ঘুরানো ছাতার ওপরে চিড়ে মুড়ি খই, নারকেল নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, বাতাসা, তিলুয়া, কলা, কমলা দিতে থাকেন। সব জিনিষ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও ছোটবড় সবাই মিলে সেগুলি কুড়িয়ে খায়। এই অনুষ্ঠানে মেয়েরা মিলে গানও করেন—

পতি পাইতে নারায়ণ
হয়ে পুলকিত মন।
পৌষের শেষে মাঘের প্রথম
হইল যেন উত্তরণ।

ব্রতাচারটির একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল— সকাল বেলা ব্রতাচার শুরু হবার আগে দনাইমনাই ফুল ও দূর্বা হাতে নিয়ে আগে থেকে কাটা পুকুরের জল নাড়তে নাড়তে সূর্যের বন্দনা। শ্রীহট্টের স্থানীয় ভাষায় সুর করে ছড়া বলতে থাকেন—

উঠ উঠ হুরজাই (সূর্য) পূর্বে ঝলক দিয়া
তুমারে পূজিমু মুই জবা ফুল দিয়া

আবানজুলা (আভাঙ্গুলা) নাতিদুটি ভুবনজুবে
মা বাপেব রাজখিনি পূজুরে (পূজিবে)
মা বাপে দিয়া পাঠাইলা চাম্পাফুলের ডালি
তারে খাইয়া খাইয়া মুকখিনি পাকালি
মুখখিনি পাখালিবে জলে না স্থলে
মাবাপ'ব বাজখিনি লক্ষ্মীব চলে (চলায)
ল ল হুরুজাই ল ল (নাও) পানি
লেখিয়া যুখিয়া হাত কুবা (সাতকোস) পানি
হাতকুবা পানি ম'ব (মোব) হাত জলে যায়
একখুবা পানি ম'ব ভাইচালি খেলায
ভাইচালি খেলাইতেবে ফুটি আইল কাটা
ঘাইল কিলা বাট'বে হুরুজাই'ব বেটা
এক হাতে খাইল খিলা রৈ হাতে তেল
হেনকালে হুরুজাই নাইবাব গেল
নাইয়া দুইয়া বইদে দিলা পিট্
তাওনে (সেইক্ষণে) পবিগেলা বব্মাব ডিট (নজব)
ববমাব হাত ভাই (সাত) পানিবে আইতে
কুরুয়াব ডাক হুনি (শুনি) পাব (পাড়ে) উঠি বইতে
থাক থাক কুরুযা (কাউয়া) ভাইঙ্মু (ভাঙব) ত'ব বাস
কাইল কেন আইলে না সুপ্তমীব (সপ্তমীব) দশা
হপ্তমী অষ্টমীব নালে পবে খুযা (কুযাশা)
মাগ মাস দরিয়া মাগাইব (মাঘদেবতা) সেবা।
দিয়া রত্ন মাগাইবে দিলা রত্ন বব
বাবণ (ব্রাহ্মণ) ঘরেব পুবিখিনি (মেয়ে গুলো) বিয়া কর
বাবণ জিযে (ব্রাহ্মণ মেয়ে) বান্ধে বারে হা'থ লাগে কালি
হেই হাত চুল বান্দে চম্পাফুল'র ডালি
চম্পাফুলব ডালিগুলি লরে না পবে
বাবণ জিয়ে দেখিযা খসিয়া পবে
হুরুজাইয়ে বাত্ (ভাত) খাইতা কি কি 'ধন' আছে?
আড়ির (হাড়ির) চাউলগুলি কাড়িল আছে
কবলি (কপিলি) গাইব দুদ্ (দুধ) ফুটি আউটল আছে।
মাগমাইয়া (মাঘমাসেব) গি খিনি গটিত (ঘটিতে) আছে
হুরুজাই বাত খাও আইয়া

কাপড বঙ্গাইযা দিমু বংগুবি দিয়া
চন্দনী গেঁলাসি বান্দনীবে লইযা
সতী জি (ঝি) গেলাগি' সতী পিঠা খাইযা
যাউক যাউক সতী জি ছাবে খাবে
আব'ক জি আছে ম'ব বাজাব গবে
বাজগব'র পক্কীগুলি (পক্ষী) কি কাম কবে
আগডাল বইয়া বেত কাম কবে
বেতকাম নায় ভালা ষুল্ল ষুল্ল (ষোল) কাটা
দেওবে আনিয়া দিল তুলসীর ভেটা
বেতকাম ভালা না খেত কাম কবে
ফুলুসেব গুটা (জটা) গুলি তুলুসে লডে।

মাঘ ব্রতাচারটি বিশ্লেষণ করলে পৃথিবীর বিভিন্ন আর্থসামাজিক স্তরের বিভিন্ন লোক বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে উপাসনারীতি গড়ে উঠেছে পৃথিবী জুড়ে তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ব্রতাচারটিতে সূর্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী, ইনাগাছ, আটঘাট মাগমণ্ডল, তিন কুণ্ডলী এই সব এঁকে ও ছড়া বলে কুমারী মেয়েরা এই যে ব্রতাচারটি পালন করেন তার মধ্যে আদিকালের বিভিন্ন আর্থসামাজিক স্তরের উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্ন উপকরণ মিলিত মিশ্রিত রূপে এসেছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে আদি বৃক্ষ উপাসনা, সূর্য উপাসনা ও পৃথিবী ও শস্য উপাসনার ধারাটি এই ব্রতটিতে বহমান। সংগ্রহকারী, পশুপালক যাযাবর ও কৃষিজীবী আর্থসামাজিক স্তরের উর্বরতা সংক্রান্ত অনুকরণ মূল যাদু-প্রকরণ ও তৎসংক্রান্ত উপাসনা পদ্ধতির মিলিত রূপ শ্রীহট্টের কুমারী মেয়েদের মাঘ ব্রতাচারটি। প্রথম পর্বে কৃষি ভিত্তিক শস্য সংক্রান্ত যাদুক্রিয়া মেয়েরাই জানতেন বলে বিশ্বাস যদিও সেই সময় নারীতন্ত্র ছিল কিনা সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু ঐ সমাজের প্রথম স্তরে নারীরা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতেন সে কথা সবাই স্বীকার করেন। লাঙলের আবিষ্কারে মেয়েদের হাতের কৃষিকাজ চলে যায় পুরুষের হাতে ও পুরুষ প্রাধান্যের সমাজ শুরু হয়। কালের পরিক্রমণে শ্রীহট্টের কুমারী মেয়েদের এই ব্রতাচারটির (ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাবে) সমস্ত কামনাই স্বামী পুত্র বাপ ভাইকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ভাল স্বামী পাওয়ার কামনা, পুত্র পাওয়ার কামনা, বাপ ভাই পুত্র স্বামীর লক্ষেশ্বর হওয়ার কামনা এবং বাপভাই-এর ঘরের ভাত খেয়ে, স্বামীর ঘরের মাছ ভাত খেয়ে, পুত্রের ঘরের ঘি ভাত খেয়ে, 'পাক্ না চুলে' সিঁদুর পরে এয়োস্ত্রী থেকে নারীজীবন কাটিয়ে দেবার কামনাই এই ব্রতাচারটি মূল উদ্দেশ্য। আরো গভীরে গেলে কুমারী মেয়েকে পাঁচ বয়সের শিশু কাল থেকেই এই ব্রতচারটি করিয়ে শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে তোমার মেয়ে হিসেবে নিজস্ব কিছু চাওয়া ও পাওয়া নেই। সব কুমারী মেয়ের চাওয়া পাওয়া পুরুষকেন্দ্রিক সমাজের পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্রের আয়ু ও সম্পদ বৃদ্ধির কামনার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করবে। কুমারী মেয়ের ব্যক্তিগত নিজস্ব কোন চাওয়া পাওয়া ও কামনা নেই।

ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে মেয়েরা গৃহের প্রাঙ্গনের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ জীবন যাপন করে এই যে মেয়েলি ব্রতগুলি করেন তার উৎস মূলে পৃথিবীর সমস্ত আর্থসামাজিক স্তরের উপাসনা রীতির পরিচয় মিললেও বিভিন্ন আর্থসামাজিক স্তরে নারীর ভূমিকা ও অবমূল্যায়নের সামাজিক সত্যটিও প্রকাশিত হয়।

বাংলার তথা শ্রীহট্টের ব্রতাচারগুলি আরো ভাল করে অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। এই ব্রতাচারগুলির আলপনা, ব্রত উপাচার ও বিশ্বাস ও কামনা আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনার দরকার। এক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে সে চেষ্টা করা গেলেও অনেক অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। অনেক ব্রতাচারের আলোচনাই করা গেল না। তবে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক স্তরে নারীর অবমূল্যায়নের চিত্রটি বাংলার ব্রতাচার তথা শ্রীহট্টের মেয়েলি ব্রতাচারের মধ্যে যে নানাভাবে অনুভব করা যায় এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। জন্মদান, পুত্র সন্তান, বাপ ভাই, স্বামীর পুত্রের সম্পদ কামনা ও শুভ কামনার মধ্যেই বাংলার মেয়েদের জীবনের চরম প্রাপ্তি--- বাংলা ও শ্রীহট্টের প্রতিটি মেয়েলি ব্রতাচার ও ব্রতের ছড়ার মধ্যে তারই ইঙ্গিত মেলে। রূপসী ব্রতে তাই শ্রীহট্টের ব্রতী নারী বলতে বাধ্য হন--- “সংসারের জঞ্জাল ছাবে না আমারে’ / আর বাংলার মেয়েদের পৃথিবীর ব্রতে মেয়েদের কামনা---

বসুমাতা দেবী গো, করি নমস্কার
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।[১৪]

মেয়েদের এই যে সংসার জীবনকে জঞ্জাল ভাবা, সংসারের প্রতি অনীহা ও মরণের পরে পৃথিবীতে আর না জন্মাবার কামনা--- এর পেছনে এমন একটি আর্থসামাজিক স্তরের নারীর জীবনযাপন যন্ত্রণার ছবি ফুটে ওঠে যেখানে পুত্রের জন্মদাত্রী সতী ও দাসী রূপেই তার পরিচয়, বাপভাই স্বামীপুত্রকে কেন্দ্র করেই নারীর সমস্ত কামনা আবর্তিত এবং ব্যক্তিনারী সেখানে উপেক্ষিত। বাংলার তথা শ্রীহট্টের ব্রতাচার ও ব্রতের ছড়াগুলিতে নারীর অবমূল্যায়নের সমাজ সত্যটি ধরা পড়ে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। জ্ঞানমোহন দাস : বাংলা ভাষার অভিধান
২। লোকসংস্কৃতি গবেষণা--- মেয়েলি ব্রত পর্যালোচনা, পৃঃ ৩৬০
৩। বাংলার ব্রত : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩
৪। Man Myth and Magic, Vol. 10 P. 2718
৫। বাংলার ব্রত : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প: ৯
৬। লোকসংস্কৃতি গবেষণা--- মেয়েলি ব্রত পর্যালোচনা পৃঃ ৩৭৪
৭। Man Myth and Magic Vol 10, . 2720
৮। Man Myth and Magic. Vol 10 p. 2722

৯। — ঐ — , পৃঃ ২৮৭৪
১০। — ঐ — , পৃঃ ২৮৭৪
১১। বিনয় ঘোষ— - বাংলার লোক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, পৃঃ ১৪৭
১২। — ঐ — , পৃঃ ১৪৯
১৩। লোকসংস্কৃতি : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৭, পৃঃ ৭
১৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার ব্রত : পৃঃ ৫

কথক—

১। শ্রীমতী সুষমা চৌধুরী, আদি নিবাস হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট বর্তমান শিলং, কুইনটন রোড
২। শ্রীমতী পারুলবালা গুপ্ত, আদি নিবাস দুলালী, শ্রীহট্ট বর্তমান শিলং, থানা রোড
৩। শ্রীমতী অনুপমা দাশগুপ্ত, আদি নিবাস দুলালী, শ্রীহট্ট বর্তমান শিলং, থানা রোড
৪। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ধর, আদি নিবাস সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট বর্তমান মালুগ্রাম, শিলচর

গীত সংগ্রহ—

শ্রীমতী দীপালী চট্টোপাধ্যায়, আদি নিবাস মৌলবী বাজার, শ্রীহট্ট বর্তমান শিলং, লাবান
শ্রীমতী স্মৃতিরেখা দাস, আদি নিবাস মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট বর্তমান শিলচর
শ্রীমতী বাণী ভট্টাচার্য, আদি নিবাস হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট বর্তমান লাবান, শিলং

বাউল কবি রাধারমণ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী

[এই রচনা বস্তুত অনুলিখন। এই নিবন্ধে লেখকের সহপাঠী বন্ধু প্রয়াত বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'বাউল কবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ' গ্রন্থে সন্নিবেশিত তথ্য, উপস্থাপনা, স্বরধ্বনিপরিবর্ত্তন সূত্র ইত্যাদি যথাযথ অনুসৃত হয়েছে। কেবল লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি বর্ত্তমান লেখকের সংযোজন।

এই রচনা প্রসঙ্গে লেখকের কিছু ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ এসে পড়ায় লেখক পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। কিছুটা বা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে লেখক নিবেদন করছেন যে দেশ-বিভাগ পূর্ব তাঁর দেশ-গ্রামের একান্নবর্ত্তী পরিবারের বড় বধূ (লেখকের সম্পর্কিত বৌদি), দুর্গেশনন্দিনী, ছিলেন রাধারমণের একমাত্র জীবিত পুত্র বিপিনবিহারী দত্তের অন্যতমা কন্যা। দুর্গেশনন্দিনীর স্বামী মহেন্দ্রনাথ চৌধুরীর (লেখকের পিতৃদেবের খুড়তুতো ভাইয়ের দিকে ভাইপো) হেপাজতে রাধারমণের কিছু গানের সংকলন হস্তাক্ষরে তিনটি বাঁধানো খাতায় বিধৃত ছিল। এই সংবাদ পেয়ে প্রখ্যাত গবেষক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য লেখকের গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে মহেন্দ্রনাথের নিকট থেকে তিনটি বাঁধানো খাতা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। এই খাতাগুলো পরে অবশ্য আর ফেরৎ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এ বিষয়ের কোনো স্বীকৃতি কোথাও আছে কিনা লেখকের জানা নেই। এই তথ্য বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীর উল্লেখিত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি। সম্ভবত এই তথ্য তাঁর অজানা ছিল।]

এই নিবন্ধের প্রারম্ভে লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক বা অবাস্তব মনে নাও হতে পারে। একটা সময় ছিল যখন মনে করা হত লোকসাহিত্য, যথা রূপকথা, মিথ, ব্রতকথা, ছড়া, পাঁচালী, লোকসঙ্গীত, লোককাব্য ইত্যাদি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির নামাঙ্কিত হতে পারে না। লোক জীবন ও লোকমানসের ঐতিহ্যাশ্রয়ী অভিব্যক্তিরূপে লোকসংস্কৃতির প্রকাশ ও প্রসার। তাই লোকসংস্কৃতি স্বরূপত: anonymous. এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে লোকজীবনের অভিব্যক্তি বলে লোকসংস্কৃতি হচ্ছে 'way of life of the common (preliterate or illiterate) Folk' এ ধারণা বর্ত্তমানে বর্জিত হয়েছে। বিশেষতঃ এই পরিপ্রেক্ষিতেই লোকসংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের প্রাণপুরুষ লোককবি ও লোকগীতিকার রাধারমণের প্রতিটি গানের শেষে অবধারিতরূপে নানাভাবে গীতিকারের নামোচ্চারণ আছে। কিছু উদাহরণঃ 'ভাইরে রাধারমণ বলে', 'ভাবিয়া রাধারমণ বলে,' 'বাইরে রাধারমণ বলে', 'শ্রীরাধারমণ কয়', 'রাধারমণ বাউল বলে', 'গোঁসাই রাধারমণ' ইত্যাদি। তবে বেশীরভাগ গানের শেষচরণে আছে

'ভাইবে রাধারমণ বলে'। এখানে মনে রাখা দরকার যে, শ্রীহট্ট ও সন্নিহিত অঞ্চলে, যথা কাছাড়, বৈষ্ণব পদাবলীর গীত, আগমনী গীত, রামপ্রসাদী, মালসী (শ্যামা সংগীত), পাঁচালী ইত্যাদি বঙ্গদেশের প্রচলিত লোকসংগীত গীত হলেও, হাটে, ঘাটে, মাঠে, নৌকার মাঝির কণ্ঠে, সাধারণ মানুষের লোকউৎসবে যাঁর গান সর্বত্র গীত হয় তিনি ভাই রাধারমণ। শ্রীহট্ট / কাছাড়ের নানা পারিবারিক উৎসব, যেমন বিবাহ, অন্নপ্রাশন, সূর্যব্রত ইত্যাদিতে ধামাইল নৃত্যের তালে তালে মেয়েরা যাঁর গান বিশেষ প্রীতির সঙ্গে গেয়ে থাকে, তাঁর নাম রাধারমণ। এই সুবাদে রাধারমণের অবিসংবাদিত পরিচয়, তিনি লোককবি। এখানে তাঁর শিক্ষাগত মানের প্রশ্ন হতে পারে। কিঞ্চিদধিক একশত ষাট বৎসর আগে বাংলার পল্লীগ্রামে শিক্ষার যে আয়োজন ছিল, সে শিক্ষা তিনি অবশ্য পেয়েছিলেন, তাছাড়া ঐতিহ্যসূত্রে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবতের কাহিনী, বিশেষতঃ বৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ছিল। তবে তিনি আলাদা করে কাব্যানুশীলন করেছিলেন, এমন কোনো নজীর নেই। রাধারমণ মূলতঃ ছিলেন সহজিয়া বৈষ্ণবধারার সাধক। তাঁর গীত রচনা এই সাধকজীবনেরই ফলশ্রুতি বলা যায়। অর্থাৎ, তাঁর কাব্যগীতির উৎকর্ষ চেষ্টাকৃত ছিল না, তা ছিল স্বভাব কবির স্বতঃস্ফূর্ত আত্মনিবেদন। শোনা যায় 'ধ্যানমগ্ন পরিবেশেই তাঁর গীতসমূহ রচিত হতে থাকে'। তিনি নিজে স্বহস্তে গান বড় লেখেননি, তিনি মুখে মুখে গান রচনা করে গেয়ে যেতেন, ভক্তবৃন্দরা সে গান মুখস্থ করে বা স্মৃতিতে ধরে রেখেছে বা লিপিবদ্ধ করেছে। এখানে আমাদের একটাই বলার কথা, রাধারমণ preliterate বা illiterate সমাজের প্রতিভূ অবশ্যই ছিলেন না। বিশেষতঃ তাঁর পিতা, রাধামাধব ছিলেন পরম পণ্ডিত, সংস্কৃত ভাষাও তাঁর অধিগত ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দের সছন্দ টিকা তিনি রচনা করেছিলেন। তাছাড়া বাংলা ভাষায় কৃষ্ণলীলা কাব্য, পদ্মপুরাণ, সূর্যব্রতের গীত ইত্যাদিও তিনি রচনা করেছিলেন। রাধারমণের কৈশোরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। সম্ভবতঃ সে কারণেই রাধারমণের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশী অগ্রসর হতে পারে নি।

লোকসংস্কৃতি পরিচিতি ও বিষয়

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট পরিভাষা তৈরি হয়নি, সাধারণভাবে ইংলণ্ডে লোকসংস্কৃতি বোঝাতে 'popular antiquities' কথাটি চালু ছিল। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন থমস সর্বপ্রথম 'Folklore' শব্দটি চয়ন করেন। কিন্তু তারও আগে দুইজন জার্মান Brentano ও Von Arnim তাঁদের লোকসংগীত সংকলন গ্রন্থে 'ভল্‌ক্‌সকুন্দে' (Volkskunde) শব্দটি ব্যবহার করেন। ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, 'Folklore' শব্দটি 'ভল্‌ক্‌সকুন্দে' শব্দেরই ইংরেজী ভাষায় তর্জমা। পরে লণ্ডনে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে — 'ফোকলোর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা হবার পর 'ফোকলোর' শব্দটি বিশ্বপরিভাষার রূপ নেয়। তার আগে ল্যাটিন আঞ্চলিক ভাষায় নানা শব্দের প্রচলন হয়েছিল, যথা 'demologia', 'demotica', 'demologie' ইত্যাদি। কালক্রমে আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রে 'ফোকলোর' শব্দটি সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। 'ফোকলোর' শব্দটির বিবর্ত্তনের নাতিদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, সে ইতিহাস সন্ধানের প্রয়োজন এখানে আমাদের নেই।

বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষায় 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজী 'ফোকলোর' শব্দের সরাসরি অনুবাদ। পরিভাষা নির্মাণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে স্মরতব্য :

'বারবার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দ বিশেষের অর্থ আপনিই পাকা হইয়া ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে।'

'লোকসংস্কৃতি' শব্দটিও সহজে সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ করেনি। পরিভাষা নির্মাণে পণ্ডিতবর্গের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। নানা প্রতিশব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তার ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'লোকসংস্কৃতি' পরিভাষা সৃষ্টি হলেও, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে বিতর্ক সম্ভবত এখনও শেষ হয়নি। 'লোক' এবং 'সংস্কৃতি' এই দুটি পৃথক শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে মতদ্বৈধ ছিল এবং আছে। বিশেষ বিশেষ প্রবণতা অনুসারে উপরোক্ত সংজ্ঞার বিভিন্ন চরিত্রের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেমন 'লোক' (Folk) শব্দের অর্থ নির্ণয়ে নানা অভিমত প্রকাশ পেয়েছে, যথা প্রাচীন জনগোষ্ঠী, কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য জনগোষ্ঠী, নিরক্ষর জনগোষ্ঠী, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, বৈদগ্ধহীন জনগোষ্ঠী, অনালোকিত জনগোষ্ঠী ইত্যাদি। তেমনি 'সংস্কৃতি' (Lore) শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থনির্ণয়ে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যথা ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচরণ, লোকসাহিত্য, উৎসব, অনুষ্ঠান ক্রিয়াদি। ক্রমান্বয়ে নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে 'লোকসংস্কৃতি' ব্যাপক অর্থের দ্যোতক হয়ে উঠতে সমর্থ হয়, যার পরিধিতে লোকসাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, ক্রীড়া, কৌতুক, বিশ্বাসসংস্কার, ধর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমাদের বর্তমান নিবন্ধের প্রয়োজনে লোকসংস্কৃতির তত্ত্বগত বিতর্কের গভীরে প্রবেশ করবার দরকার নেই। পরিশেষে আমরা ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত মত গ্রহণ করতে আগ্রহী :

'গ্রামীণ বা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বা কৃষিভিত্তিক লোকসমাজে লোকসংস্কৃতির সজীব অবস্থান ও সতেজ অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, তথাপি অগ্রবর্তী সমাজের বাতাবরণেও তার প্রকাশ অসম্ভব নয়।'

এই প্রাক্‌কথনের গোঁড়াতে আমরা যে প্রশ্নের অবতারণা করেছিলাম, তার আরও একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে, বোধ করি। প্রশ্নটি ছিল : কোনো বিশেষ ব্যক্তির নামাঙ্কিত গীত, কবিতা কী লোকসাহিত্যের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়! এক সময় এই ধারণা ছিল যে, সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতি নিরক্ষর জনসমষ্টির সংস্কৃতি। একজন লোকসংস্কৃতি গবেষক, হেনরি কোহেন, স্পষ্টতই বলেছেন :

'Where literacy thrives the folk decay'.

এক শ্রেণীর সামাজিক নৃবিজ্ঞানী লোকসংস্কৃতিকে প্রধানত অশিক্ষিত ও নিরক্ষর জনসমষ্টির মৌখিক ধারার অলিখিত সাহিত্য বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের অভিমত অনুসারে লোকসংস্কৃতিমাত্রই— 'verbal art'. এখানে মনে রাখা দরকার যে লোকসমাজের গঠন ও চরিত্র চিরকালই অপরিবর্তিত থাকবে, এমন ভাবা অযৌক্তিক। শিক্ষার কমবেশী প্রসার গ্রামীনসমাজেও সম্ভব, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। পাশ্চাত্য দেশে শিল্পসভ্যতার, তথা জনশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে, লোকসংস্কৃতির চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ অলিখিত ধারারও অবসান ঘটতে চলেছে, অথবা অলিখিত ধারার সমান্তরালে, লিখিত ধারার বিকাশ হচ্ছে। আমাদের দেশে এই পরিবর্তন দ্রুত না হলেও, একেবারে অলক্ষণীয় নয়। অতীতেও আমাদের দেশে গ্রামীণ সমাজে সাধারণ শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্তরভেদ ছিল এবং আছে। কিন্তু লোকসমাজের পরম্পরাগত সংস্কৃতি মোটামোটি অপরিবর্তিত ছিল, এবং সম্ভবত বলা যেতে পারে এখনও তার সামূহিক পরিবর্তন হয়নি। অধিকন্তু, গ্রামীণ সমাজ চিরকালই নিরক্ষর থাকবে, এমন দাবি অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। আমাদের দেশেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন হবে: তবে কী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির অপসরণ ঘটবে? এ প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে শহরভিত্তিক ও গ্রামীন সমাজের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিকতা বর্ত্তমান, তা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করে থাকেন, পল্লীসমাজই লোকসংস্কৃতির আদর্শভূমি। তাঁদের অভিমত অনুসারে পরিবর্তনের ঢেউ পল্লীসমাজকে গ্রাস করলে লোকসংস্কৃতি তার মৌলিকতা থেকে বিচ্যুত হবে এবং লোকসংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটবে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি প্রবণতার সূত্র নির্দেশ করেছেন:

১। সমপ্রাণতা বা সহানুভূতি
২। সমবেত আবেগ বা সমষ্টিগত চেতনা
৩। সর্বজনীন স্বীকৃতি বা সর্বজন গ্রাহ্যতা

এখানে এই তিনটি প্রবণতার প্রত্যেকটির আলাদা সমীক্ষা সম্ভব নয় এবং এই নিবন্ধের প্রয়োজনে আবশ্যিক নয়। পরিবর্তিত সমাজেও, অথবা নাগরিক পরিবেশেও, সংহতি বা সমপ্রাণতা কোনো ও না কোনোভাবে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে গড়ে উঠতেই পারে। সুতরাং পরিবর্তিত পরিবেশে সমষ্টি চেতনার অবলুপ্তি অবধারিত, এমন আশঙ্কার কারণ নেই। বরং এটাই আশা করা যায়, নগরায়নের পরিবর্তিত পরিবেশেও নতুন লোকায়ত ঐতিহ্য গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতির ধারাকে সঞ্জীবিত রাখতে সমর্থ হবে। শিল্পসমৃদ্ধ নাগরিক সমাজেও একটা লোকায়ত স্তর সবসময়ই ক্রিয়াশীল থাকবে। লোকসংস্কৃতিবিদ জর্জ হেরজগের (George Herzog) কথাই ঠিক মনে হয়:

'There is always the tendency to feel that folklore is something that comes out of the country districts. But there is a good deal of folklore that is urban'.

আমাদের মূল প্রশ্নে আবার আমরা ফিরে যাবো। লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্য মাত্রই anonymous এমন ধারণা ভুল, এবং আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয়। লোকসংস্কৃতিকে যদি anonymous ভাবতে হয়, তবে রামপ্রসাদ, দাসরথি রায়, কুবীর গোঁসাই, লালনফকিরের গীতিকাব্যকে লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা থেকে বাদ দিতে হয়। উপরে যে তিনটি প্রবণতার কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে সর্বজনীন স্বীকৃতি বা সর্বজন গ্রাহ্যতার নিরিখে, এঁরা সবাই লোকসাহিত্য ও লোক গীতিকাব্য ধারার সার্থক প্রতিনিধি, একই নিরিখে ভাই রাধারমণের গীতিকাব্য তাঁর নামাঙ্কিত হলেও, নিঃসন্দেহে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত এবং রাধারমণ সার্থক লোককবি। তিনি তাঁর কোনো কোনো গানে নিজেকে বাউল, গোঁসাই, ইত্যাদি অভিজ্ঞানে ভূষিত করেছেন। বলা বাহুল্য, এ সবই তাঁর লৌকিক পরিচয়ের স্বাক্ষর বহন করছে। পরিশেষে বক্তব্য, রাজনৈতিক বিভাজন অগ্রাহ্য করে রাধারমণের গান শ্রীহট্ট (অধুনা বাংলাদেশ) এবং অবশিষ্ট শ্রীহট্টকাছাড়ের লোকায়ত সমাজে আজও সমানভাবে সমাদৃত এবং বহুল গীত হয়ে থাকে। ধামাইল নৃত্যের সঙ্গে কাছাড়ে মেয়েদের গাইতে শুনেছি:

‘কুঞ্জ সাজাও গিয়া গো রাই
কুঞ্জ সাজাও গিয়া,
আজ নীশিথে আসবে কানাই
বাঁশরী বাজাইয়া।’

আরও একটি কথা, বর্তমান বাংলাদেশে রাধারমণের গানের লোকপ্রিয়তা শুধু অক্ষুণ্ণ আছে তাই নয়, তাঁর গানের সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্রতী অনেক গবেষণা সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং গবেষকদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম-ধর্মী। এই নিবন্ধের যথাস্থানে এ সব তথ্যের উল্লেখ করা হবে।

রাধারমণ জীবনকথা

(১২৪০-১৩২২ বঙ্গাব্দ, ১৮৩৪-১৯১৬)

রাধারমণের জন্ম হয়েছিল ভিষগাচার্য চক্রপাণি দত্তের বংশধারায় শ্রীহট্টের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে। এই গ্রন্থের অন্যত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ চক্রপাণি দত্তের শ্রীহট্ট - সম্পর্ক বিষয়ে একটি নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বংশধারায় প্রভাকর দত্ত ও কেশব দত্ত দু'টি স্মরণীয় নাম। কেশব দত্তের নামাঙ্কিত সুনামগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত একটি পূর্ণ জেলা) জগন্নাথপুর থানার অধীন (পরগণা আতুয়াজান) কেশবপুর গ্রামে ১২৪০ বঙ্গাব্দে রাধারমণের জন্ম। পিতা রাধামাধব দত্ত, মাতা সুবর্ণা দেবী। রাধারমণ পূর্বোক্ত প্রভাকর দত্তের দ্বাদশ উত্তরপুরুষ। পিতৃদেব রাধামাধব পণ্ডিত ব্যক্তি, সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ছিল, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কিছু পুঁথি রচনা করেছিলেন। কিছু গীতও রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সূর্যব্রতের গীত। সূর্যব্রতের অনুষ্ঠানে, ধামাইল নৃত্যের সঙ্গে, এইসব গান গীত হয়ে থাকে। বৈষ্ণব সহজিয়া

ধর্মের প্রতি রাধামাধবের অনুরাগ ছিল। পরবর্তীকালে জন্মসূত্রে রাধারমণ সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, এটা প্রত্যাশিত ছিল। রাধারমণের কৈশোরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। সম্ভবত এই ঘটনা তাঁকে অন্তর্মুখী করতে সাহায্য করেছিল এবং প্রথম জীবনেই তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে পড়েছিলেন। শোনা যায়, রাধারমণ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সব মতেরই চর্চা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে স্থিত হন। পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত, এই সহজিয়া ধর্ম বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের 'যুগোচিত বিবর্তন'। রাগানুগা সাধনা এই ধর্মের অপর বৈশিষ্ট্য। কীর্তন, ভজন এই সাধনার অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এই নিবন্ধের স্বল্পপরিসরে সহজিয়া ধর্মের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও হয়ত নেই। এখানে শুধু উল্লেখ করা যেতে পারে, খ্রীষ্টীয় দশম / একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত 'চর্যাগীতিতে' সহজিয়া সাধন মার্গের প্রথম প্রকাশ সম্ভবত লক্ষ্য করা যায়। সেন রাজত্বে বৌদ্ধধর্মালম্বীদের ওপর নিপীড়ন হয়েছিল, তা ইতিহাস সম্মত। পণ্ডিত প্রবর গোপীনাথ কবিরাজ এই প্রসঙ্গে লিখছেন, 'মৎস্যন্যায়ের কিছুদিন পরই আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর কুলপ্লাবিনী বৈষ্ণব ধর্মের ধারায় প্রভাবিত হয় সারা বাংলাদেশ ও সন্নিকট অঞ্চল। ওদিকে বৌদ্ধ, শাক্ত ও শৈব ধর্মের বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বৈষ্ণব দেহবাদী সহজিয়া ধর্ম ক্রমশ প্রকট হয়।' রাধারমণের গীতসংগ্রহে এই সহজ ভাবেরই রসমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি।

রাধারমণের জীবন কথার পরবর্তী ইতিহাস যতটুকু রচিত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, ১২৭৫ বঙ্গাব্দে, শ্রীহট্টের মৌলবীবাজার মহকুমার সদর থানার অন্তর্গত আদপাশা গ্রামের নন্দকুমার সেন অধিকারী মহাশয়ের কন্যা গুণময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। রাধারমণের চার পুত্রের মধ্যে তিনজন অকালে প্রয়াত হন। রাধারমণের স্ত্রী গুণময়ী দেবীরও অকাল মৃত্যু হয়। এই শোকের ধারা রাধারমণের চিন্তায় বৈরাগ্যের ছায়াপাত করে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে রাধারমণ মৌলবী বাজারের অন্তর্গত ঢেউপাশা গ্রামের সাধক রঘুনাথ ভট্টাচার্য গোস্বামীর প্রসিদ্ধির সংবাদ পেয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেই থেকেই তাঁর সাধক জীবনের শুরু। সাংসারিক জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ অনেক আগেই অবসিত হয়েছিল। নির্জনে সাধনার উদ্দেশে তিনি গৃহত্যাগী হয়ে তাঁর বসতবাড়ির সংলগ্ন নলুয়া হাওর প্রান্তরে সাধন কুটি নির্মাণ করে সেখানেই বাস করতে থাকেন। তাঁর একটি গানে এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় :

'অরণ্য জঙ্গলার মাঝে বাধিয়াছি ঘর,
ভাই নাই বান্ধব নাই কে লইব খবর।

রাধারমণের রচিত গানের সংখ্যার বিষয়ে বিতর্ক আছে, কারোকারোর মতে তা 'সহস্রাধিক'। সম্ভবত এই সংখ্যা আরও অনেক বেশী। তাঁর ভক্তদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে গানের সংখ্যা আজও নিরূপিত হয়নি। সংগ্রহের চেষ্টা আজও চলেছে। তাঁর নিজের গ্রাম কেশবপুরেই লোকমুখে ও ভক্তদের সংগ্রহে গানের সংখ্যা অগণিত। কিছু গান হয়ত বা প্রক্ষিপ্ত। দেশ বিভাগের ফলে তাঁর ভক্তদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা এবং অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছেন।

তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কত গান রয়েছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। ঢাকার অধ্যক্ষ দেওয়ান আজরফ জানিয়েছেন সুনামগঞ্জের জনৈক সতীশ রায়ের সংগ্রহেই সহস্রাধিক গানের অস্তিত্ব জানা যায়। ইনি সম্প্রতি শিলচর শহরে লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁর পরিবারস্থ পরিজন এসব গানের সংগ্রহ বা অস্তিত্বের বিষয়ে অবহিত নন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রাধারমণের গানের ঐতিহ্য অধুনা বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্টের গ্রামে গঞ্জে আজও সমানভাবে লোকায়ত সমাজে আদৃত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণ মুসলমান জনগণের মধ্যেও এসব গান সমান জনপ্রিয় এবং এই ঐতিহ্য বজায় রাখতে তাঁরাও বদ্ধপরিকর। আগেই বলা হয়েছে, কিছু কিছু গবেষণা সংস্থা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এ সব সংস্থার অধ্যক্ষতায় আছেন মুসলমান গবেষকবৃন্দ। রাধারমণের গীতিসংগ্রহ এযাবৎ যে তিনটি প্রকাশিত হয়েছে, সেই সবকটিরই সংগ্রাহক, সংকলন ও সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন গুণগ্রাহী মুসলমান গবেষকরা। তাঁরা অবশ্যই আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন। প্রথমটির শিরোনাম ‘রাধারমণ সংগীত’, সম্পাদনা করেছেন মোহাম্মদ আসারফ হোসেন, সাহিত্যরত্ন, ভানুগাছ, শ্রীহট্ট। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম ‘ভাইরে রাধারমণ বলে’ (১৯৭৭), সম্পাদনায় হাসন পছন্দ মুহম্মদ আবদুল হাই, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট। তৃতীয় গ্রন্থ ‘রাধারমণ সংগীত’ (১৯৮১), সংগ্রাহক চৌধুরী গোলাম আকবর, সাহিত্যভূষণ। এই গ্রন্থের প্রকাশক মদনমোহন কলেজ প্রকাশন সংস্থা, শ্রীহট্ট। জনশ্রুতি এই যে, শ্রীহট্টের অন্যতম লোককবি (যাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন) হাছন রাজা (গ্রন্থ: হাছন উদাস) রাধারমণের সমসাময়িক। হাছন রাজার একটি গানে রাধারমণের প্রসঙ্গ আছে: ‘রাধারমণ কেমন আছইন্ (আছেন) হাছন রাজা জানতে চায়’।

কেশবপুর গ্রামে রাধারমণের আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ এখনো বসবাস করছেন। রাধারমণের একমাত্র পুত্র যিনি কালগ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, বিপিন বিহারী, পিতৃহীন অবস্থায় মাতুল গৃহে, মৌলবীবাজার সন্নিকটে, ভুজবল গ্রামে, আশ্রয় পেয়েছিলেন। সেইখেকে বিপিনবিহারী ও তাঁর পরবর্তী, জ্যেষ্ঠপুত্র নিকুঞ্জবিহারী ও দ্বিতীয় পুত্র রাধারঞ্জন দত্ত পুরকায়স্থ ভুজবলেই স্থিত হন। নিকুঞ্জ বিহারীর পুত্ররা কেউ কেউ বর্তমানে মৌলবীবাজার শহরে বসবাস করছেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দে, ২৬শে কার্তিক, শুক্রবার, শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে, রাধারমণের দেহান্ত হয়। আশার এবং আনন্দের কথা, সাধককবি রাধারমণের সমাধিতে আজও প্রদীপ জ্বেলে তাঁর ভক্তরা সন্ধ্যারতি ও রাধারমণের ভজন-কীর্তন করে থাকেন। কেশবপুর গ্রামেই একটি স্মৃতিরক্ষা সমিতি কবির রচনাবলীর সংগ্রহ ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

রাধারমণের গীতরচনায় বাংলাভাষার সার্বিকরূপ প্রধানত অনুসৃত হয়েছে, আঞ্চলিক শব্দের মিশ্রণ অর্থাগমে বাধার সৃষ্টি করে না। প্রয়াত বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী আঞ্চলিক শব্দের রূপভেদের কিছু কিছু সূত্র দিয়েছেন। সবকটি না হলেও রূপান্তরের কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হল:

(ক) অপনিহিতি : সারি > সাইর, জানিয়া > জাইনা > জাইনে, ভাবিয়া > ভাইবা > ভাইবে

(খ) বিপ্রকর্ষ : আগুন > আগুইন, আন্ধার > আন্ধাইর, উল্টা > উলুটা, জাগিলে > জাগুইলে, মার > মাইর, লহর > লওহর

(গ) স্বরসংকোচন/স্বরলোপ : ডুবিলে > ডুবলে, তনু > তন, থুইয়া > থইয়া, ধৈর্য > ধর্য, ধুইয়া > ধইয়া, ননদে > নন্দে, নিরালা > নিরাল, বিশাখা > বিশখা, মাস্তুল > মস্তুল, যুবতী > যৌবত, শুইয়া > শইয়া

(ঘ) স্বরবৃদ্ধি : অনল > আনল, ঝম্প > ঝাম্পু, দেহ > দেহা, পর > পরা

(ঙ) স্বরসংগতি : নিভিয়াছিল > নিবিছিল, সুক্না > শুকুনা

(চ) স্বরবিপর্যাস : সমুদ্র > সমদুর

(ছ) স্বরবিকার : অ > উ — মনুষ্য > মুনিষ্য, বিদরে > বিদুরে,
অ > এ — কেন > কেনে
উ > আ — শুধু > সুধা > হুদা,
উ > ই — ভাবুক > ভাবিক, উ > ও — কেউ > কেও, তুমি > তোমি, ভুলিযাছ > ভোইলাছ
ঋ > অ — দৃঢ় > দড়
ঋ > ই — কৃষ্ণ > কিষ্ণ, গৃহ > গির
ঋ > রে — বৃথা > ব্রেথা
এ > অ — আসবে > আইসবে > আইসব, নিতে — নিত
এ > আয — ফেলে > ফালায়, নাড়ে > নাড়ায়
ও > অ — ও নিতাই > অ নিতাই
ও > আয — ওরে > অয়রে
ও > উ — চোর > চুর, তোমার > তুমার
ও > এ — ওগো > এগো
ও > এও — ভোরা > ভেওরা
ঔ > ঐ — যৌবন > যৈবন

ব্যঞ্জন ধ্বনিব রূপান্তব :

(ক) সমীভবন : দুর্লভ > দুল্লভ, দুশ্চারিণী > দুচ্চারিণী, ভবার্নবে > ভবান্নবে

(খ) বিপর্যাস : অনর্পিত > অনপৃত

(গ) নাসিক্যীভবন : আঁখি > আঙ্খি, ধোঁয়া > ধুমা

(ঘ) স্বতোনাসিক্যীভবন : কক্ষেব > কাংখের, দিব > দিমু, বাত > মাত, বানায > মানায

(ঙ) হকাবীভবন : প্রেমময়ী > প্রেমমহী, সামাইল > হামাইল

(চ) অল্পপ্রাণের মহাপ্রাণতা : অপবাধে > অফরাধে, গাগবি > গাগুবি > ঘাঘুরী

(ছ) মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণতা : অর্ঘে > অর্গে, খোটাখান > খোটাকান, ভাইবে > বাইবে, মূঢ > মুড়, সাথে > সাতে

(জ) বর্ণদ্বিত্ব : অনাথ > অন্নাথ, ত্রিনাথ > তিন্নাথ

(ঝ) বর্ণলোপ : কোথায় > কুআই > কই, জয়ন্ত্রী > জন্ত্রী

(ঞ) বর্ণবিকাব : ননী > লনী, নাগাল > লাগাল, কাটাবি > কাট্যালি, মুবলী > মুবরী

সর্বনাম পদেব বিশিষ্টতা

কর্তৃকাবকে : আমি, মুই, আমবা ; তুমি, তুই, তুইন ; তুমবা, তবা, তুবা, তুমিতাইন, তুইতাইন ; আপনে, আপনি ; আপনেবা, আপনাইন, আপনাবা ; সে, হে, তাই (স্ত্রী তুচ্ছার্থে), তাইন (সম্মানার্থে) ; তারা, হেবা, তাইনতাইন (সম্মানাথে বহুবচন)

কর্মসম্প্রদানে : মোবে, মরে, আমাবে, আমবারে ; তবে (তুচ্ছার্থে), তুমারে, তবাবে, তুমবারে ; আপনাবে, আপনেবে, আপনাইনরে, আপনাবাবে ; তারে, হেরে, তাইরে (স্ত্রী তুচ্ছার্থে), তাইনবে (সম্মানার্থে), তাইনেবে, তাবারে, তাইন, তাইনবে, তাইনবাবে ;

অন্যান্য সর্বনাম : ও, অউ, অটা, হটা ; অনির্দেশক — কেউ, কেও, কিছু, কুনু কিছু ; প্রশ্নবাচক— কে, কেনে, কুন, কারা, কুবাই, কিয়ানো, কেমনে

ক্রিয়াবিশেষণ : যেখানো, য়েম্নে, যেমন ইত্যাদি।

অন্যান্য আঞ্চলিক বাংলা ভাষাবমতই শ্রীহট্টেব ভাষায়ও প্রচুর তৎসম, তদভব এবং দেশী বিদেশী শব্দ পাওয়া যায়। বিদেশী শব্দেব মধ্যে আছে আরবি-ফাবসী মিশ্রিতঃ যথা, আইন, আদালত, তমসুক, তহবিল, দববার, দস্তখত, নাজারত. মোহব, নালিশ, বেগার, দরদী, লোকসান, সাজা, হাজির, হিসাব, শেইনসার (শাহেনশাহ) ইত্যাদি।

ইংরাজী পর্তুগীজ মিশ্রশব্দ: যথা, ইন্স্পেক্টব, এসিস্টেন্ট, গিল্টি, জেলখানা, টাইম, মাজেষ্টব, মেনেজারি, সাবডিভিশন, ষ্টেশন মাস্টব. হাইকুট (হাইকোর্ট) ইত্যাদি।

গানের ছন্দ :

বলা বাহুল্য, রাধাবমণেব বচিত গানেব ভাষা ও ছন্দ সবসময় অবিকৃত থাকেনি। আগেই বলা হয়েছে সাধক কবি ভাবের ঘোরে গান রচনা কবেছেন, ভক্তরা সে গান স্মৃতিতে ধরে বেখেছেন, পববর্তীকালে সেসব গান কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ অবস্থায় মূল ছন্দ ও ভাষাব কিছু কিছু পরিবর্তন পবিবর্দ্ধন অবশ্যম্ভবী ছিল। তবু গানের ভাব, ভাষা, ও ছন্দ মোটামোটি তাব স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছে, গানেব সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যেব প্রতি লক্ষ্য কবলে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এটাও বোঝা যায়, বচয়িতাব সহজাত ছন্দজ্ঞান তাঁব সব গানে প্রতিভাত হয়েছে এবং ছন্দেব প্রতি তাঁর নিবিষ্টতা সর্বত্রই পরিস্ফুট। পয়াব, ত্রিপদী, চৌপদী সব ছন্দেই গীত বচিত হয়েছে, তবু বাংলা লোকগীতিব বীতি অনুসবণ কবে সে সব গান ছন্দোবদ্ধ স্বববৃত্ত, কখনো বা অক্ষরমাত্রিকায নিষ্পন্ন হযেছে। বিবিধ ছন্দ ব্যবহারের কিছু দৃষ্টান্ত নিচে দেওযা হল :

(ক) **চোদ্দমাত্রার পয়ার**, ৮/৬

সবনাবী প্রিয়াসনে। সুখে করে কেলি
মুই নারী প্রিয়া বিনে। তাপিত কেবলি
প্রিয়া পন্থ নিরখিয়া। তনু হইল ক্ষীণ
বেহুশ হুতাশে যাপি। রাত্রি কিবা দিন।

(খ) **কুড়িমাত্রার লঘুত্রিপদী**, ৬/৬/৮

পহিলহি বাগ। নয়নের কোণে
কালা সে নয়ন তারা।
নয়নে নয়নে। বাণ বরিষণে
হেয়েছি পিবিতে মবা।

(গ) **চৌত্রিশ মাত্রার চতুষ্পদী** ৮/৮/৮/১০

যে অধরে বংশী ধরে
মনে লয় পাইতে তারে
যত্ন করি রাখতেম ভৈবে
রসরাজকে হিয়ার মাঝে।

(ঘ) **স্বরবৃত্ত,** ২৬ মাত্রার চতুষ্পদী—

বংশী বাজায়। কেরে সখী
বংশী বাজায়। কে
মাথার বেণী। বদল দিব
তারে আনিয়া দে

(ঙ) **স্বরবৃত্ত,** ৩০ মাত্রাব চতুষ্পদী

ভাইবে রাধা। বমণ বলে
আলসে দিন। যাপোনা
জমিদাবেব। খাজনা কড়ি
সময় থাকতে। খুঁজো না।

(চ) **স্বরবৃত্ত,** ৩০ মাত্রা পৃথক ছাঁদের চতুষ্পদী

রাধা নামে। বাদাম দিযা
কৃষ্ণ নামেব। সারি গাইযা
চলছে বাইয়া। রসিক নাইয়া
রমণ বলি। যাছে

রাধারমণের গীত রচনায় বিচিত্র ভাবের সমাবেশ দেখা গেলেও তাঁর সব রচনায়ই মূল সহজিয়া ভাবেব প্রকাশ দুর্নিবীক্ষ্য নয। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সহজিয়া পন্থাব মূল তত্ত্ব এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন: 'নরনারীর দৈহিক রূপের মধ্যেই তাহাদেব স্বরূপ লুক্কাযিত আছে। নররূপে নর, স্বরূপে কৃষ্ণ, তেমনি নারীরূপে নাবী, স্বরূপে রাধা।' রাধাবমণ তাঁর সহজ সাধনায় কিন্তু সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেননি। সবভাবেরই এক সহজ সমন্বয তাঁর গানে পাওযা যায়। তিনি মাতৃসঙ্গীতও রচনা করে গেছেন। তবে শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রধান বৈষ্ণব ভাবধারার অনুসবণে বিশেষত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বৈষ্ণব গানে, বৈষ্ণব পদাবলীর পদবিভাগ, যেমন গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিসার, বিরহ, মিলন অনুসৃত হয়েছে। গৌবলীলা, গৌরবন্দনা, গৌরপূর্বরাগ, গৌর বিচ্ছেদ

তাঁর অনেক গানের বিষয়বস্তু। তাঁর রচিত শ্যামা সঙ্গীত মালসী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাছাড়া রয়েছে বিচিত্র বিষয়ে রচিত গান, যেমন ত্রিনাথ বন্দনা (শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোকায়ত সমাজের তিন্‌নাথ), বিবাহ অনুষ্ঠানে গীত সঙ্গীত, এমন কী সমসাময়িক ঘটনা বিষয়ে গীতও বাদ পড়েনি। যখনই কোনো ভাব, বা বিষয়, বা ঘটনা মনকে নাড়া দিয়েছে, তখনই তা গানের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাঁর গ্রামীণ পরিবেশে জলাভূমি, হাওর, নদীর প্রাধান্য তাঁর গানের বৃহত অংশ জুড়ে আছে। 'ভবনদীর পার' রাধারমণের গানে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। তেমনি আছে মাঝির উপমা। তাঁর একটি গান এই রকম :

'সন্ধ্যাকালে ডাকি বসি খেওয়া ঘাটে গাঙ্গের কুল
পার কইরো দয়াল গুরু তাতে যেন না হয় ভুল॥
ভাও জানে না মন বেধুয়া কেম্‌নে দিতাম ভবে পাড়ি
পাইনা কুল দিশামুল।'

নিসর্গ, যেমন ফুল, লতা, নদীনালা, হাওয়া, পাখি, গাছগাছালি, সবই তাঁর গানে উপস্থিত। শ্রীহট্টের বহু স্থান নাম, তীর্থস্থানের নাম, বঙ্গদেশের উল্লেখ্য শহরের নাম তাঁর গানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমন কী, রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ, স্টেশন মাস্টার, টিকেট চেকার, লালপাগড়ি (পুলিশ), কাবুলি, নাগরিক প্রসঙ্গ তাঁর গান থেকে বাদ পড়ে নি। রাজনীতি, স্বদেশ চেতনা তাঁর গানের বিষয়বস্তু হতে বাধা নেই। একটি গানে আছে :

"ইংরেজের কর্ত্রা জিনি মন হইবি স্বাধীন
মনরে হবিগঞ্জ নবিগঞ্জ কালিকাতা তেলিগঞ্জরে
আশুগঞ্জের লাইনের ভিতরে মন আমার
ঘোরাবি কতদিন"।

রাধারমণের গানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ যেমন আছে, তেমনি আছে অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধঃপতনের কথাও : 'দেখলাম দেশের এই দুর্দশা, ঘরে ঘরে চুরের (চোর) বাসা'। সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনা তাঁর গানের মূল সুর হলেও, লৌকিক জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা আকাঙ্খা, বিবাহ, উৎসব অনুষ্ঠান, জাগতিক ঘটনা সবই তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে। সর্বদিক থেকেই তিনি যথার্থ লোককবি।

আমরা প্রথমে রাধারমণের সহজিয়া ভাবের কিছু গানের উদাহরণ নিচে তুলে দিলাম :

১

নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভ্রমরা॥
নয় দরজা করে বন্ধ লইওরে ফুলের গন্ধ
নিরলে বসিয়া রে মন ভ্রমরা॥
· একটি গাছের ডালপাতা নাই তার কোনো কাল

বেঁটু ছাড়া ধরছে ফুলের কলিরে মন ভ্রমরা ।।
ডাল আছে পাতা নাই এ ফুল ফুটিয়াছে সই
পদ্ম যেন ভাসে গঙ্গার জলেরে ভ্রমরা ।।
ভাইরে রাধারমণ বলে ঢেউ উঠিল আপন মনে
সে গান ভাবিক ছাড়া বুঝবে না পণ্ডিতেরে ।।

২

আমার যেমনের বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না ।
আমি সিনানে যাবো সিনান করিব না
আমি খাইতে যাব খাইতে পারব গেলাস নিব না ।
শুইতে যাব শয়ন করব বিছানা করব না ।
আমি শুইতে যাব শয়ন করব ঘুমাইব না ।
মশায় খাবে গা মুছিব মশারী টাঙ্গাইব না ।
গুরু ধরব নাম বিচারবো পন্থ ছাড়ব না ।
ভাইরে রাধারমণ বলে ইহাই আমার কল্পনা ।।

৩

বসে ভাবছ কিরে মন বেপারী ।
সামাল সামাল ডুবল তরী, আরে সামাল সামাল ডুবল তরী ।।
মনরে প্রবঞ্চনের জিনিষ ভরি নৌকা করলাম ভারী
সারাদিন ঘাটে বসি সন্ধ্যাবেলা ধরছি পাড়ি ।।
মনরে ভবনদীর তরঙ্গ পালায় দশজন দাড়ি
দয়াল গুরু হয় যদি কাণ্ডারী
আমি পাড়ি দিতে ভয় কি করি ।।
ভাইরে রাধারমণ বলে শুনরে মনবেপারী
জয় রাধা নামের বাদাম কৃষ্ণের নামে গাওরে সারি ।।

৪

যারে দেখলে নয়ন যায় ভুলে,
ভাবের মধু কে দিল ঢেলে ।।
ভাবের মানুষ রূপে চিনা যায়
ছয় জন গো দাড়ে বইয়া নয়জনে দাড় বায় ।
তার উল্টা কুরা, উল্টা জোড়া, উল্টা বাদাম যায় ঠেলে ।
একখানা চরকার ষোলখানা পাতি

দুই ধারে বসাইয়া দিছে প্রধান দুই খুটি
তালে মানে এক হইলে ঘুরব চরকার সামালে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
ভাব ছাড়া হইলে তারে মানুষ কেটা বলে
ভাব ছাড়া মড়া কাষ্ঠ ভাসাই দেওনি গভীর জলে।।

রাধারমণের পরিচিত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের নাম এবং স্থাননাম কিভাবে তাঁর গানে এসেছে তার একটা উদাহরণ নিচে দেওয়া হোলো :

৫

ধরবে যদি রসের মানুষ নেহারে
সহজ ভাবেরি ঘরে
ভাবের গুরু কল্পতরু মনপ্রাণ যে হরে।
দেহরতি কর শূন্য গুরুরতি কর পুণ্য
কামশূন্য শুদ্ধ নির্বিকারে
মরা হয়ে অধর মরা চিন্তমণি পুরে।
অধর মানুষ সহজ রসে বিরাজ করে ঢাকার শ'রে।
সে মানুষ ত্রিপুন্নীর নীরে
অধর চান্দের রসের খেলা মদনগঞ্জের চক্‌বাজারে
চলবে মন মুসুদাবাদ
খিল জমির কর আবাদ উদয়চান্দ শ্রীরূপনগরে।
গোঁসাই শ্রীরাধারমণের আশ' পুরে কিনা পুরে।।

রাধারমণের গানে রেলের ইঞ্জিন, ষ্টেশনমাষ্টার, টিকেট ইত্যাদি কী ভাবে এসেছে তারও একটা উদাহরণ দেওয়া গেল। এটিও একটি সহজিয়া অঙ্গের গান :

৬

চৈড়ে মনোহারী ভবের গাড়ি আয় যাবে কে বৃন্দাবন।।

* * * * * * * *

কাম কলেতে টিপনি দিয়ে চালায় প্রেমের ইঞ্জিন
হাওয়ার আগে চলে তিলে পলে ঘুইবে আসে
প্রথম টিকেট ব্রজপুরি ষ্টেশনমাষ্টার বংশীধারী
সব সখিগণ সহায়কারী ভাব গাড়ির মহাজন

* * * * * * *

তিছরা টিকেট গোবর্ধনগিরি ষ্টেশন মাষ্টার রাইকিশোরী

রসের কুঠায় রূপমঞ্জরী অষ্টাদশদণ্ড টাইম নিরূপণ
উদ্দীপন বংশীধ্বনি প্রেম সেবা অবলম্বন
শ্রীরাধারমণে ভনে প্রেমের কথা রেইখ গোপন ॥

বাধারমণ রচিত পূর্বরাগ অঙ্গের একটি গান এই রকম

৭

শুন মনোচোরের বাঁশি করিবে মানা
মোহন মধুব স্বরে বে বাঁশি আব বেইজনা ॥
শাশুড়ী ননদী বৈরী গুরু গঞ্জনা ॥
জ্বালাব উপর জ্বালা রে বাঁশী পবাণে সহেনা ॥
কঠিন হৃদয় বাঁশি লাজভয় বাখনা
অবলা বধিবার লাগিবে বাঁশি বিধাতার সৃজনা ॥
যাব হাতে পড় বাঁশি কর তাব সাধনা
শ্রীরাধাবমণে ভণেরে বাঁশি আর বাইজনা ॥

রাধারমণের বিরহ অঙ্গেব একটি গান :

৮

কে বলে পিরিতি   ভালো গো সজনী
কে বলে পিবিতি ভালা।
কালার পিবিতি   অতি বিপবিত
অন্তরে দ্বিগুণ জ্বালা ॥
শুনগো সজনী   কি বলিব আমি
হইয়ে অবলা বালা
করিয়ে পিবিতি   গেল কুল জাতি
মাথায কলঙ্ক ডালা ॥
সুখের লাগিয়া   পিরিতি করিয়া
অন্তরে বাহিরে জ্বালা
এ ব্রজনগবে   কে না কি কহে
রাধাব কলঙ্ক কালা
প্রেম সরোবরে   ছিল কমলিনী
না সহে রাধাব জ্বালা ॥
শ্যামচান্দ বিনি   বাচিনা পরাণে
সহে না বিচ্ছেদ জ্বালা ॥
শ্রীরাধাবমণে   প্রবোধ না মানে
না বুঝি কালাব ছলা ॥

মিলন অঙ্গের একটি গান এই রকম :

৯

মধুর মধুর অতি সুমধুর মোহন মুরলী বাজে
দেয় করতালি, ব্রজের নাগরী মঙ্গল আরতি মাঝে ।।
শঙ্খ ঝাঞ্জরী পাখোয়াজ খঞ্জরী কেহ কেহ বীণ বাজে
তা ধৃক তা ধৃক তা - তাতা থৈয়া মধুর মৃদঙ্গ বাজে।
ধূপ দীপ লইয়া মধুর আনন্দে ললিতা বিশাখা সাজে
ময়ূরা ময়ূরী নাচে ঘুরি ঘুরি রাইকানু থইয়া মাঝে।
কহে প্রেমানন্দে মনের আনন্দে আর কি এমন হবে
শ্রীরাধারমণ যুগল চরণ কবে সে দেখিতে পাবে।।

এবারে গৌরবন্দনার একটি গান :

১০

রাধার প্রেম পাথারে সাঁতার দিয়ে কালাচন্দ হইলেন গৌরাঙ্গ
রাধার ভাবকান্তি অভিলাষে দুই অঙ্গ হইয়ে এক অঙ্গ।।
রাইপ্রেমেতে হইয়ে ঋণী কালাচান নবীন সন্ন্যাসী
ত্যেজে চূড়া দড়া বাঁশি ধরিলেন কোপীন করঙ্গ।।
রাই প্রেমে হইয়া উদাসী প্রেমরসে ভাসায় অবনী
কলির জীবের ভাগ্যে হইয়ে উদয় ব্রজলীলা কৈল সাঙ্গ।।
প্রেমময়ী রাধার আশ্রয় রসের রাজা শ্যামরসময়
প্রভু রঘুনাথ প্রেমের ধনে ধনি
গোসাই রাধারমণের নাই প্রসঙ্গ।।

রাধারমণের মালসী অঙ্গের একটি গান দিয়ে এই নিবন্ধের শেষ হচ্ছে :

১১

এস মা জগজ্জননী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
ভব ভয় বিপদ নাশিনী।
কলি ভৈরবীবাসা সাবদা নিভা শিবানী
মা কাত্যায়নী কার্যরূপিনী।।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক শ্রী গণপতি
এসো গো মা মৃগেন্দ্রবাহিনী
তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ ক্ষিতিতেজ মরুৎব্যোম
তুমি গঙ্গে পতিত পাবনী।।

তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি মা জগৎ আর্য
দেবদেব হরেব ঘবণী।
তুমি মা ব্রহ্ম সাবিত্রী তুমি মা বেদ গায়ত্রী
স্বাহা সদা প্রণবরূপিণী।।
তুমি দিবা নিশা কাল তুমি নক্ষত্র মণ্ডল
তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।
শ্রীরাধারমণেব আশা মা না করিও নিবাশা
অন্তে দিও চরণ দুখানি।।

হাছনরাজা ও তাঁর গানের দর্শন ও অধ্যাত্মবাদ

আবুল হোসেন মজুমদার

।। এক ।।

লালন বলেছেন: 'অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই, শুনি মানবের উত্তর কিছুই নাই।' সত্যিই মানুষ অনেকান্ত। বহুরূপী। এরকম একজন মানুষ ছিলেন হাছন রাজা। তিনি রঙ্গে রঙ্গিলা। বাইরে তিনি লক্ষনছিরি আর রাম পাশার জমিদার। ভোগবিলাসী অভিজাত মানুষ। অনেকটা স্বেচ্ছাচারী। অনেকটা অত্যাচারী। কিন্তু ভেতরে তিনি উদাস। সুফি সাধক। বাউল। বৈষ্ণব। তাঁর ২০৬টি গানের সংকলনের নিজেই তিনি নামকরণ করেছিলেন 'হাছন উদাস'। 'হাছন উদাস' ভাবের খনি। রূপে-রসে ভাবে গানগুলো অনবদ্য। এ গানগুলো সমগ্র বাংলা সাহিত্যের সম্পদ, বরাক উপত্যকার তো বটেই। সুফি-বাউল সাহিত্যে এ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আমাদের অধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শন চিন্তার খোরাক তো রয়েছেই হাছন রাজার গানে, আমাদের সংস্কৃতি সমন্বয়েরও এ গানগুলো প্রকৃষ্ট নিদর্শন। হাছন রাজা যদি অনেকান্ত মানুষের একজন সার্থক প্রতিভূ না হতেন, তাহলে হয়ত উপহার দিতে পারতেন না এমন অমূল্য সম্পদ।

।। দুই ।।

হাছন রাজার প্রপিতামহ বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বাবুখান নাম নেন। রামপাশার জমিদার এই বাবুখানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আনোয়ার খানের দুই পুত্র ছিলেন আলম রাজা ও আলি রাজা। লক্ষ্মণ ছিরির জমিদার আমির চৌধুরীর বিধবা পত্নী হুমরুজাহানকে বিয়ে করেন আলিরাজা। এভাবেই তাঁর অধিকারে আসে রামপাশার সঙ্গে লক্ষ্মনছিরিরও জমিদারি। আলিরাজার প্রথম বিয়ের কন্যা ছিলেন ছহিফা বানু, যাঁকে সিলেটের প্রথম মহিলা কবির সম্মান দেয়া হয়। হাছন রাজা ছহিফা বানুরই বৈমাত্রেয় ভাই। জন্ম ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে।

বাল্যকালে হাছন ছিলেন খুবই ডানপিঠে। শিক্ষা বলতে গৃহশিক্ষকের কাছে শেখা কোরআন আর কিছু ফারসী বয়েত ছাড়া আর কোন শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেননি। কৈশোরে হয়ে ওঠেন ছন্নছাড়া। ইয়ার বখশি নিয়ে আমোদ-আয়েশে কাটতে থাকে তাঁর সময়। পনের বছর বয়সে মাত্র চল্লিশ দিনের ব্যবধানে পিতা ও ভাইকে হারিয়ে হয়ে যান জমিদারিতে অধিষ্ঠিত। পূর্ণ উদ্যমে সুরু হয় তাঁর ইচ্ছাপূরণ। কুড়া পাখি শিকার ছিল তাঁর অন্যতম শখ। একেকটা পাখির পেছনে নাকি অনেক টাকা খরচ করতেন। হাতীর খেদা করাতেন এবং হাতী কিনতেন প্রচুর টাকা দিয়ে। আর ঘোড়ার রেসের তো কথাই নেই। তাঁর উদাই জমাদারকে নিয়ে ঘোড়া কেনা আর ঘোড়দৌড় করানো প্রবাদ হয়ে আছে সিলেটে:

চান্দ মুশকি ঘোড়া জান সবার সর্দার
তাহার সওয়ার জান উদাই জমাদাব।

শুধু কি তাই? কামিনী কাঞ্চনের লোভও হাছনরাজার কম ছিল না।

এদিক থেকে তাঁর মন ফেরানোর জন্যে অল্পবয়সে বিয়ে দিয়েও মা হুরমত জাহান স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলাব সুযোগ পাননি। কত সঙ্গিনীকে নিয়ে যে হাছন রাজা আমোদ-ফুর্তি করেছেন, নৌকাবিলাস করেছেন, তাব হিসেব নেই। তিনি যেন ছিলেন কলির কৃষ্ণ। এবকম স্বীকারোক্তি তো তাঁর গানেই আছে:

কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে।
রঙ্গে বঙ্গিলা কানাই—
হাছন রাজায় জিজ্ঞাস কবে কানাই বা কোন জন
ভাবনা চিন্তা কইরা দেখি কানাই যে হাছন।

অবশ্য এ গানের অন্যরকম তাৎপর্যও আছে। সে বিষয়ে আলোচনা পরে কবা যাবে। শোনা যায় যে হাছনরাজার হাতে তাঁর অনেক লীলাসঙ্গিনী নানাভাবে লাঞ্ছিতা ও অত্যাচারিতাও হয়েছেন। তবে পরে কোন এক বিশেষ ঘটনায় তাঁব ভাবান্তর ঘটে এবং তিনি হয়ে ওঠেন সতিকাবেব 'হাছন উদাস'।

হাছন রাজা সম্বন্ধে সৈয়দ মুস্তাফা আলী লিখেছেন: 'সুনামগঞ্জের তৎকালীন মুকুট বিহীন বাজা ছিলেন হাছন রাজা। যেমন রাজা বংশ উপাধি ছিল তেমনি তাঁকে রাজার মত দেখাত। তিনি দীর্ঘকায় পুরুষ সিংহ-ছিলেন। তাঁর বর্ণ ছিল তপ্ত কাঞ্চনবৎ। উন্নত নাসা, ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল, মানানসই গোঁফ তাঁব আভিজাত্যের পরিচয় বহন করত। আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁব কেশে ঘন কাল আভা। তিনি মখমলেব পাজামা চোগা-চাপকান ও জবির পাগড়ি ছাড়া বেব হতেন না।' হাছনবাজা চাকরের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে সুনামগঞ্জে ভ্রমণ কবতেন। দারুণ দাবাড়ু ছিলেন। ছুটিব দিন সকালে খাবাব সঙ্গে নিয়ে সহরে যেতেন। এবং কেবল আহাবেব বিরতি ছাড়া সমস্ত দিন মগ্ন থাকতেন দাবাব মধ্যে।

অদ্ভুত এই মানুষ। যে লোকটির শুধু মানব সেবাই নয়, পশু পাখিব সেবাও ছিল সুবিদিত, সেই লোকটি ভ্রমণ করত মানুষের কাঁধে সওয়ার হয়ে, প্রাণ ও নিয়েছে কত মানুষের। হাছনরাজার দিদি ছহিফা বানু ভাইয়ের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন একটি উর্দু কবিতায়:

'হাজন রাজা নে এয়সা জুলুম কিয়া
এতিমকো কসকে লেকে আতশ মেঁ ডাল দিয়া।'

হাছন বাজা এমন অত্যাচাব কবছে যে, অনাথ শিশুকে বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। আবার এই ছহিফা বানুই ভাইয়ের দান-খয়রাত ও উদারতাব প্রশংসা করে লিখেছেন:

সুনামগঞ্জে হাছন রাজা আলী রাজার নন্দন
টাকা কড়ি অন্নবস্ত্র সদাই করে বিতরণ।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয় এই বিচিত্র মানুষটির।

॥ তিন ॥

হাছন রাজা গভীর ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মবোধে ছিল না কোন গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতা। সিলেটের অন্যতম বৈষ্ণব সাধক রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ ছিলেন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে তিনি অনেক সময় অর্থসাহায্যও করেছেন। আসলে দুজনেই যে ছিলেন ভাবের বাউল। তাই তাঁরা ছিলেন ভাবের বন্ধনে আবদ্ধ। হাছন রাজার গানেও পাওয়া যায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের সুর। বাঙালী, বিশেষতঃ সিলেটের সুফি সাধক আর বাউল-বৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য করা খুবই দুষ্কর। ভাবে যেমন তাঁরা একাত্ম, তেমনি তাঁদের গানে এসেও হয়ে গেছে ত্রিবেণীসংগম। হাছন রাজার অসংখ্য গানে এর উদাহরণ বর্তমান। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কটি গানের কলি এরকমঃ 'কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে,' 'জলে গিয়াছিলাম সই', 'কালা কাজলের বাঁশি দেইখ্যা আইলাম সই', 'আমার বন্ধু আইনা দে, প্রাণ ললিতে,' 'মন দিলাম রে বাঁশী প্রাণ দিলাম' ইত্যাদি। পরে আরো বিশদ আলোচনা হবে হাছন রাজার গানের ত্রবেণী সংগম নিয়ে। এখানে রাধারমণ প্রসঙ্গে একথা বলে রাখা বোধহয় অন্যায় হবে না যে হাছন রাজার কোন কোন গানের সুর ও রাধারমণের গানের অনুরূপ। যেমন 'কুঞ্জ সাজাও গিয়া' আর 'কানাই খেইড় খেলাও কেনে'।'

হাছন রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে সুফিবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তাঁর গানে মুর্শিদের উল্লেখ আছে, তবে এ মুর্শিদই তো সুফিগুরু নন। এতো তাঁর মনের মানুষ। হাছন বলেছেন 'মুর্শিদ আমি খুজিনা গো বনজঙ্গলে যাইয়া। আমার মাঝে আমার মুর্শিদ আছেরে পথ চাইয়া।'

সে যাই হোক আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত না হয়ে থাকলেও সুফি ভাবধারা যে হাছন রাজার অস্থি মজ্জায় মিশে গিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ' গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান লিখেছেন : 'তিনি ছিলেন আল্লা প্রেমে দীওয়ানা। প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের আকাঙ্খা তাঁর গানে মূর্ত। ভোগ বিলাসের মধ্যে থেকেও তিনি সংসারের কালিমা থেকে নিজের মনকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। কঠিন ছিল এই সাধনা। তাই তিনি বলেন—

স্ত্রী হইল পায়ের বেড়ি, পুত্র হইল খিল
কেমনে করিবায় হাছন বন্দের সাথে মিল।

মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য প্রেম। জীব প্রেম, সংসার প্রেম, পরমাত্মার প্রেম— যাই হোক না কেন। বেঁচে থাকার একমাত্র পুঁজিই প্রেম। প্রেমহীন জীবন অসার। আর যখনই উপলব্ধি হয় যে, জাগতিক প্রেম অর্থহীন, তখনই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

ছাড় ছাড় হাছন রাজা এই ভবের আশ
একমনে চিন্তা করিয়া হও তার দাস।'

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে অসার নয়। এই উদ্ধৃতির মধ্যেই নিহিত আছে সুফিবাদের মূলকথা। মাটির দেহ, স্ত্রীপুত্র, ধনদৌলত, জগৎ সংসারের অসারতা ও অনিত্যতার উপলব্ধি, পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভের সাধনা আর শেষাবস্থায় আল্লাতে নিমগ্ন হয়ে নিজেকে বিস্মৃত হওয়াই সুফি সাধনার মূলকথা। হাছন রাজার অসংখ্য গানে পাই এই উপলব্ধির নিদর্শন। উদাহরণস্বরূপ তাঁর বিখ্যাত গানগুলোর উল্লেখ করা যায়— 'লোকে বলে ও বলেরে ঘর বাড়ী ভালা নায় আমার', 'মাটির পিঞ্জিরার মাঝে শুয়া বন্দী হইয়ারে, কান্দে হাছন রাজার মন মনিযায় রে, 'মরণ কালেরে,' আমি না লইলাম আল্লার নাম,' 'আমি বন্দার কি হইব উপায়' ইত্যাদি।

সুফি সাধকদের পরমাত্মার সঙ্গে পরিচয় ও মিলনের আকুতি। বিচ্ছেদের জ্বালা সুফি গান ও কবিতাকে করেছে অনির্বচনীয়। হাছন রাজার গানেও দেখি এই আকুতি আর জ্বালা ভাষা পেয়েছে বিচিত্র রূপে, বিচিত্র সুরে।

এ হচ্ছে সাধন মার্গের দ্বিতীয় স্তর। পরবর্তী স্তরে আসে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতার বোধ। সাধক তখন আর কাউকে দেখেনা এক প্রেমাস্পদ ছাড়া। হাছনরাজাও বলেনঃ 'অন্তরে বাহিরে দেখি তুমি দয়াময়, হাছন রাজায় কয়, আমি কিছু নয় রে আমি কিছু নয়''। ভাবের ঘোরে সাধক তখন নৃত্য করে ওঠেন। এই মত্ততার কথা হাছনের অনেক গানে পাইঃ 'উন্মত্ত হইয়া হাছন নাচন করয,' 'আল্লারে দেইখা হাছন হইযাছে কানা। নাচিয়া নাচিয়া হাছন গাহিতেছে গানা', 'ওগো মওলা, তোমার লাগি হাছনরাজা বাউলা', 'নাচতে নাচতে হাছন রাজা অইলা এমন আউলা,' অথবা 'নাচে নাচে হাছন রাজা হইয়া ফানাফিল্লা।'

এখানে একথা স্মর্তব্য যে, সুফিবাদেও আছে একধরনের অদ্বৈতবাদ। তবে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের সঙ্গে তার রয়েছে তফাৎ। সুফিবাদে দুটো মত প্রচলিত। একটার নাম ওহদাতুল ওজুদ, এর সাথে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের মিল ঘনিষ্ঠ। অন্য মতের নাম ওহদাতুশ্ শহুদ— অস্তিত্বের আপাত দৃষ্ট অদ্বৈততা। মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী, মনসুর হাল্লাজ এরা ছিলেন অদ্বৈতবাদ বা ওহদাতুল ওজুদপন্থী। ওহদাতুশ শহুদের প্রবক্তা ছিলেন ভারতের মুজাদ্দেদে আলফেসানী। এই দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে অদ্বৈতবাদ হচ্ছে সাধনার একটা স্তর মাত্র। এই স্তরে সাধক ফানাফিল্লা অবস্থা লাভ করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বের মধ্যে লীন করে দেন নিজের অস্তিত্ব। জগৎ সংসারের অস্তিত্বও মুছে যায় তাঁর কাছে। ঈশ্বর ছাড়া আর কোন অস্তিত্বই তিনি অনুধাবন করতে পারেন না। মনসুর হাল্লাজ এই অবস্থায় পৌঁছেই বলেছিলেন 'আনাল হক'— আমিই সত্য। এ যেন সোহহম্ এরই প্রতিধ্বনি। এর পরের স্তরে অনেকেই যেতে পারেন না। যারা যান, তাঁরা বুঝতে পারেন সিন্ধুর অস্তিত্বে তাঁরা মেশে গেছেন সত্যিই, তবে তাঁরা হারিয়ে যান নি। বিন্দু এখন পেয়েছে তার আসল শক্তি, তার স্থায়িত্ব, তার স্থিতি— এখন তাই সাধক আর ফানাফিল্লা বা আল্লাতে লীন নয়। বাকী বিল্লাহ্ আল্লার সঙ্গে স্থিতিশীল। এই

স্তরে এসে অস্তিত্বের মধ্যে জন্মলাভ করে সৃষ্টিশীলতা, ঈশ্বর হয় না সে, ঐশ্বরিক গুণাবলী অর্জন করে হয় ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী। আমার মনে হয় হাছন রাজা এই স্তরের সন্ধান লাভ করেছিলেন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—

রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।

ওহদাতুল ওজুদ পন্থীরাও কিন্তু খাঁটি অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। কোন কোন আলোচক অদ্বৈতবাদকে বলেছেন Existential Monism আর ওহদাতুল ওজুদকে Existential Monothiesm। আসলে একেশ্বর বাদী সুফিবাদের পক্ষে খাঁটি অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এ কারণেই দেখি মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী বলেছেন 'তিনি আমার প্রকাশ আর আমি তাঁর প্রকাশ।' R. A. Nicholson এর ভাষ্য করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, এই বক্তব্যের মধ্যে অস্তিত্বের দ্বৈতভাব স্বীকৃতি স্পষ্ট। আমার মতে এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে/ আমারি মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।' হাছনরাজার উদ্ধৃত গানের কলিতেও অনুরূপ লীলার সন্ধান পাওয়া যায়। দুইনা হলে লীলা হয় না। লীলা না হলে জীবনে, সাধনায় মাধুর্য থাকে না। বিদ্যাপতির 'ভাবোল্লাস' শীর্ষক বৈষ্ণবপদে যে ভাবের পরিচয় পাই হাছনরাজার যেসব গানে প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনানন্দের উল্লাস দেখি, তাও এই ভাবেরই অন্যরূপ। 'আমি যাইমুগো, যাইমু আল্লার সঙ্গে' গানটি একটি ভাবোল্লাসের গান। এই মিলন, এই বিরহ, এই অন্বেষণ— এই পাওয়া ধনকে হারিয়ে ফেলার আশংকা— সুফি আর বৈষ্ণবের এই মনোভাবের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য খুঁজে পাই না। বিশেষত, হাছন রাজা যখন বলে 'স্বামীর সেবা না করিলে তরাইব কোন লাঙ্গে' অথবা 'স্বামীর সেবা না করিলাম দিন গেল গইয়া'— অর্থাৎ স্বামীরূপে পরিচয় দেন আল্লার, তখন যেন রাধারই কাছাকাছি চলে যান। হয়ত বা এই রাধাকৃষ্ণ ভাব থেকেই বেরিয়ে এসেছে হাছনরাজার কণ্ঠ থেকে 'জলে গিয়াছিলাম সই,' 'আমার বন্ধু আইনাদে', 'মন দিলাম রে বাঁশী প্রাণ দিলাম' প্রভৃতি বৈষ্ণবভাবের গান।

পূর্ণদাস বাউলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হাছন রাজাকে কি আপনারা বাউল মনে করেন? উত্তরে বলেছিলেন 'কেন নয়? আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পীর সাহেবকে স্মরণ করি।' আমিও মনে করি হাছন রাজা ছিলেন খাঁটি বাউল। তাঁর অসংখ্য গানে বাউলতত্ত্ব খুবই স্পষ্ট। 'রূপ দেখিলাম রে, নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে' গানটিতে তো বাউলতত্ত্ব আছেই। তাছাড়াও হাছন রাজা আরো স্পষ্ট করে বলেন মনের মানুষের কথা—

আমার আপন সাধন হইল নারে সাধন হইল না
আমার মাঝে হইয়া তারে খুঁজি বেফানা
ঠাকুর চান্দ যে ঘরের মাঝে তারে দেখ না।

মুর্শিদের উল্লেখের কথা আগেই উত্থাপন করেছি। হাছন রাজা বলেছেন:

মুর্শিদ আমি খুঁজবনা গো বন জঙ্গলে যাইয়া
আমার মাঝে আমার মুর্শিদ আছে রে পথ চাইয়া।
দুধের মত রং যদি না হইল সফেদ
কি হবেরে আন্ধাইর ঘরে ভাবের তরী বাইয়া।

অর্থাৎ, সাধক যাঁকে খুঁজবেন তিনি বনে জঙ্গলে কোথাও নেই, তিনি তাঁরই দেহের মধ্যে। তাঁর রঙে নিজে রঞ্জিত না হতে পাবলে সকল সাধনাই আঁধার ঘরে ভাবের তরী বাওয়া অর্থাৎ অসার।

আবাব মজার কথা যে হাছনরাজা অন্য গানের দ্বারা এই বাউলতত্ত্বকে নিয়ে গেছেন সুফিতত্ত্বে :

আল্লা রূপ, আল্লা রং, আল্লা রং খুবি
নুরের বাগান আল্লা কি কব তাব খুবি।

এই আল্লাই কখনো মুর্শিদ, কখনো হাছন রাজা নিজে, আবাব কখনো প্রেমাস্পদ, কানাই, স্বামী। এভাবেই হাছন রাজর গানে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ঘটে গেছে সুফি-বৈষ্ণব বাউল তত্ত্বের ত্রিবেণীসংগম। এসব কোন তত্ত্বকে কোন তত্ত্ব থেকে আলাদা কবা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ হাছন রাজার দুটো গানের দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার একটি 'রূপ দেখিলামরে' আগেও কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে। এ গানেব তত্ত্বের সঙ্গে কবিগুরু দেখতে পেয়েছিলেন বৈদিক ঋষির উপলব্ধিব মিল— পুরুষ তাঁব মধ্যে, তিনি আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

অন্য গানটিতে হাছন রাজা বলেছেন 'আমি হতে সর্বোৎপত্তি হাছন রাজা কয়।' এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'পূর্ববঙ্গেব এক অখ্যাত কবিব গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই, সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরূপেব সাথে সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্বসত্য।' দার্শনিক ফিশতেও অনুরূপ মত পোষণ কবতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখেছেন· 'আমাবি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ।

চূণী উঠল বাঙা হয়ে'।

ইকবাল বলেছেন— 'ইঁ জাহাঁ চিস্ত? — সনম কদায়ে আসবারে মশস্ত্'। এই জগৎ কি? — আমারি রহস্যের সৃষ্টি মূর্তি দেউল। পূর্ববঙ্গেব অখ্যাত কবি হাছন রাজা তো এই কথাই বলেছেন— আমি হতে সর্বোৎপত্তি। অথচ তিনি কেম্ব্রিজের ডিগ্রিধারী ছিলেন না, কোন নামজাদা দার্শনিকও ছিলেন না। সুফি বাউল-সাধনা আব অন্তবেব স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল এই বিরাট উপলব্ধিতে।

শেষ করাব আগে আরেকটি বিষয় উত্থাপন করা জরুবি মনে করি। ফারসি সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ সুফিবাদী কবি মওলানা রুমিব 'মসনবি শরীফে'র মুখবন্ধে একটা কবিতা আছে। কবিতায় একজন শেখের কথা বলা হয়েছে যিনি প্রদীপ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। লোকে কারণ জিজ্ঞেস

করলে উত্তর দেন, 'যাঁকে পাওয়া যায় না, তাঁকেই খুজছি আমি।' কথিত আছে যে, হাছন রাজাও অনুরূপ একটা লণ্ঠন বাঁশের মধ্যে ঝুলিয়ে নিয়ে দিনে রাতে ঘুরে বেড়াতেন। কাকে খুঁজতেন তিনি? কি খুঁজতেন? কবি শেলি বলেছেন:

We look before and after
 And pine for what is not

এই যে yearning for unattainable বা অপ্রাপনীয়ের আকাঙ্খা ও অন্বেষণ— মানুষের মধ্যে এ এক শাশ্বত প্রবণতা। রুমির ব্যাখ্যায় ইকবাল বলেছেন, তাঁর অন্বেষিত পুরুষ ছিলেন আল ইনসানুল কামিল বা পূর্ণ মানুষ। ইকবাল এই পূর্ণমানুষকে পেয়েছিলেন হজরত মোহাম্মদের মধ্যে। নিৎসে কল্পনা করেছিলেন Superman বা অতি মানুষের। রবীন্দ্রনাথও এক ধরনের পূর্ণমানুষকে পৃথিবীতে আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'শিশুতীর্থ' কবিতায় আছে তারই সন্ধান। 'ওই মহামানব আসে' গানেও তারই কথা। The Religion of Man এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থদু'খানাতেও আছে এই মানুষের পরিচয়। হাছন রাজা কোন অপ্রাপনীয়কে খুঁজতেন? স্পষ্টভাবে হয়ত এর উত্তর দেয়া যাবে না। আমার মনে হয়, এ সেই যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সে শুধু পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।' অথবা 'ধরা দিয়েও দাওনা ধরা। এসে কাছে পালাও ত্বরা।' এর অন্য নাম 'অস্তিত্ব বিরহ'— নিজের অস্তিত্ব থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্নতাবোধ, যা সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা। 'প্রদীপ' নিয়ে বাইরে সে খুঁজে আসলে নিজেকেই। কখনো অন্য অনেক কিছুর মধ্যে, যেমন হাছনরাজা খুঁজেছিলেন সঙ্গিনীদের মধ্যে, নিরাশ হয়ে, অতৃপ্ত হয়ে, আবার তাদেরকে করেছেন প্রত্যাখ্যান! পরবর্তী জীবনে আল্লা, মুর্শিদি ইত্যাদি নানারূপে তাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। শেষটায় উপলব্ধি করেছেন 'আমার মাঝে থইয়া তারে খুঁজি বেফানায়।' কিন্তু অস্থিরতা তাঁর কাটেনি। তাই 'আন্ধাইর ঘর' মনে হয়েছে তাঁর নিজের অস্তিত্বকে। লণ্ঠন নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছেন বাইরে। পথে পথে।

ফিরে যাই আবার এ প্রবন্ধের সূচনা পর্বের কথায়— হাছন রাজার মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ছিল। আর এই পরস্পর বিরোধিতার জন্যই তিনি আমাদেরকে উপহার দিতে পেরেছেন বিচিত্ররূপ রস আর ভাবের গান। অনেকান্ত মানুষ হিসেবেই তিনি প্রতিভাত হন আমাদের কাছে। Whitman এর মত তিনিও গর্ব করে বলতে পারেন, Yes I Contain multitude! এই multitudeই হাছন রাজাকে করেছে মহান, করেছে আউল-বাউল, সুফি বৈষ্ণব থেকে শুরু করে প্রতিটি বাঙালির আপনজন।

বারমাসী গান :
প্রেমসঙ্গীত না বৃষ্টির ইন্দ্রজালের গান ?

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

লোকসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা হল বারমাসী গান। বৎসরের বারোটি মাসের উল্লেখ করে নায়িকার দুঃখ (কদাচিৎ সুখ) বর্ণনাই বারমাসী গানের বিষয়বস্তু। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'ফুল্লরার বারমাসী' দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারের 'বারমাসী' দুঃখ বর্ণনা। আবার ঐ একই কাব্যের 'বণিকখণ্ডে' 'সুশীলার বারমাসী' সুখের কথায় পূর্ণ। নায়িকার দুঃখ বেদনা ছাড়াও বাৎসল্য স্নেহও কখনো কখনো এ জাতীয় গানের বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষা অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাতেও বারমাসী গান রচিত হয়েছে। মধ্যযুগই সাহিত্যিক বারমাসী গানের বিকাশের সময়। বারমাসী গানগুলি আয়তনে দীর্ঘ। একমাত্র গীতিকা ছাড়া আর কোন লোকসঙ্গীত এত দীর্ঘ নয়। এককভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে দুরকম রীতিতেই বারমাসী গান গাওয়া হয়।

বারমাসী গানগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়— লোকায়ত বারমাসী ও সাহিত্যিক বারমাসী। লোকায়ত বারমাসীগুলি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, মৌখিক ঐতিহ্যাশ্রিত। অন্যদিকে সাহিত্যিক বারমাসীগুলি মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যিক ধারায় বিশেষ কোন একক কবিপ্রতিভাজাত রচনা। লোকায়ত বারমাসীগানগুলি হল— শান্তির বারমাসী, কমলার বারমাসী, কালার বারমাসী, কুকিলা কইন্যার বারমাসী, নারীর বারমাসী, সীতার বারমাসী, রামের বারমাসী, নিমাইর বারমাসী, মেনকার বারমাসী ইত্যাদি। বারমাসী গানের বিশিষ্টতা বোঝাবার জন্য একটি বারমাসী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল। বারমাসীটি সুরমা-বরাক উপত্যকার মৌখিক ঐতিহ্যাশ্রিত 'মঙ্গলচণ্ডীর জাগরণ'এর অন্তর্গত।

শুন মম দুক্ষের কাহিনী অ হে প্রাণনাথ॥ ধু॥
জৈষ্টেতে বিবাহ পরে তুমি গেলায় গৌড়পুরে
ভালবাসে জৈষ্টেতে সতিনী।
আষাড়েতে জালপত্র দেখাইয়া কয়েক ছত্র
সতিনীয়ে মারিল আমারে।
সেই পত্র অনুসারে ছাগী রাখিতে দিল মোরে
রৌদ্রে মেঘে পাতা দেই শিরে।
শাড়ি আবরণ নিয়া খুঞ্জা বস্ত্র পরাইয়া

গৃহে না আসিতে সুদ পাই।
দিবসেতে ছাগী রাখি   রাত্রে ঢেকিশালে থাকি
কচুপাতে তুষ অন্ন খাই।
আসিল দুষ্ট শ্রাবণ   ঘন বৃষ্টি বরিষণ
কচু পাতা মাথে দিয়া থাকি।
ভাদ্রেতে বিষম জল   খাল বিল হইল তল
ছাগ, ছাগী কুলে নিয়া রাখি।
আশ্বিনেতে ঘরে ঘরে   মহোৎসব সবে করে
আমি নারী রহিলু জঙ্গলে।
কার্ত্তিকে হৈল সে রূপ   অগ্রাযনে শীত ভুগ।
শীতে আমি কাপি থরে থরে।
পৌষের দারুণ শীতে   কাপে প্রাণী দিনে রাইতে
শীত বস্ত্র গায দিতে নারি।
সেই রূপে মাঘ গেল   ফাল্গুন আসি দেখা দিল
প্রভুহীনা অভাগিনী নারী।
বহিল বসন্ত বাও   হাটিতে না চলে পাও
সদা কাল প্রাণনাথ স্মরি।
দুরন্ত চৈত্রের খরা   তাতে প্রায় হৈনু মরা
শেষ ভাগে ঘাটিল জঞ্জাল।
ঠাঠা বিজুলি মেঘে   প্রাণ মোর সদা কাপে
ঝড়ে মো করিল বেহাল।
আসিল বৈশাখ যদি   হারিল সকল ছাগী
তে কারণে ব্রত কৈলু বনে।
তুমি আসিবায় শুনি   সতিনী গৃহেতে আনি
ভালবাসে পূর্বের সমান।
পেযে তব দরশন   সর্ব দুক্ষ বিস্মরণ
হৈয়াছে শুন প্রাণ পতি।
আসিতে তোমার ঘরে   নিষেধে সতীনে মোরে
কি আর বলিব দুক্ষ অতি।
খুল্লনার দুক্ষ শুনি   ধনপতি সাধুমণি
নিরন্তরে কাপিতে লাগিল।
হরিষে বিষাদ যুগে   হাসি কান্না দুই লাগে
খুল্লনাকে কুলে তুলি লৈলা।

ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলিত এই বারমাসী গান সম্পর্কে গবেষকেরা বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনায় মূলতঃ বারমাসী গানের সাহিত্যিক সৌন্দর্যই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু শুধুই কি সাহিত্যিক সৌন্দর্যের জন্য বারমাসী গান সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল ? এই জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে বারমাসী গানের উৎস সন্ধানের প্রচেষ্টাই বক্ষ্যমান আলোচনার উদ্দেশ্য।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বারমাসী গানকে বর্ণনামূলক প্রেম সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করে লিখেছেন, “সমগ্র বৎসর বা বারমাসব্যাপী প্রাকৃতিক পটভূমিকায় প্রধানতঃ প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার মনোভাবের অভিব্যক্তিই বারমাসীর বর্ণনামূলক সঙ্গীতের মধ্যদিয়া প্রকাশ পায়। প্রেমে নৈরাশ্যের ভাবটিই ইহার মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকে। সেই জন্য ইহা বিরহ বিচ্ছেদের গান ; তথাপি বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনা ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীতের মত ইহাদের মধ্যে ভাবগভীরতা নাই।”[১] চিত্তরঞ্জন দেব বারমাসী গান প্রসঙ্গে লিখেছেন, “যে গানের ভিতর বছরের বারমাসের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্খার কথা বর্ণিত হয়েছে তাকেই আখ্যা দেওয়া চলে বারমাসী গান বলে।”[২] ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য ‘বাংলা গাথাকাব্য’ গ্রন্থে বারমাসী গাথা আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, “বারমাসী গাথা প্রাচীন বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বৎসরের বারটি মাস অথবা ছয়টি ঋতুর বর্ণনার মাধ্যমে নায়িকার অন্তরের বিরহ অথবা মিলনের ভাব প্রকাশ করাই এই রচনার উদ্দেশ্য। বারমাসী গাথা একান্তই নারী জীবনাশ্রিত সঙ্গীত। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পরিবর্তন ও তাহার সহিত মনুষ্য জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক সম্বন্ধে পল্লীকবিগণ কিরূপ সচেতন ছিলেন এই সকল বারমাসী গাথার ভিতর দিয়া আমরা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করি। এই শ্রেণীর গাথা সর্বপ্রথম কবে কোথায় রচিত হয় আজ তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।”[৩] বারমাসী গাথাকে আখ্যানমূলক ও বর্ণনামূলক এই দুটো ভাগে ভাগ করে তিনি লিখেছেন, “পল্লীকবি রচিত এই সকল বারমাসী গাথাগুলি মানব হৃদয়ের শোক, দুঃখ ও আনন্দের ভাষা বহন করিয়া কালক্রমে মানবমনে গভীর প্রত্যয় বিস্তার করিয়াছিল এবং সুশিক্ষিত কবিগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া তাঁহাদের রচনার ভিতর আপন আপন স্থান করিয়া নিয়াছিল।”[৪]

এসব আলোচনায় বারমাসী গানকে মূলতঃ নারীর বিরহ বেদনামূলক সঙ্গীত হিসেবে চিহ্নিত করে বারমাসীর সাহিত্যিক সৌন্দর্য নিয়েই বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সারাদেশ জুড়ে একটি বিশেষ আঙ্গিক অবলম্বন করে এ জাতীয় গান রচিত হল কেন ? মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে আবেগের মধ্যে কোন তারতম্য নেই— বারমাসী গানের সর্বভারতীয় বিস্তৃতির কারণ হিসেবে এই যুক্তি উপস্থাপিত করা যেতে পারে। কিন্তু এতে বারমাসীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে উত্তর পাওয়া গেলেও বিশেষ আঙ্গিকটি সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষ শ্রেণীর রচনা যখন বিশেষ কোন সার্বজনীন আচারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে তখনই সেই রচনা অপরিবর্তিত ভাবে বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। বারমাসী গানেও এরকম একটি সার্বজনীন আচার জড়িত

ছিল এবং আমাদেব অনুমান দূর অতীতে আচার সঙ্গীত হিসেবেই বারমাসী গানের উদ্ভব হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর বারমাসী-সংক্রান্ত আলোচনাটিব কথা স্মবণ করা যেতে পারে। তাঁর ধারণা বারমাসী গানগুলি ‘এ দেশের নিজস্ব সম্পদ’। “কাবণ ইউরোপীয় সঙ্গীতে মাস হিসাবে নাবীর এইরূপ বিবহ বর্ণনার কোন নজীর পাওযা যায না। অনেক স্থলেই দেখা যায় বাবমাসীগুলি গীতিকার ‘terminus antiequem’ বা আগে আসে। কাজেই বারমাসীগুলি মনে হয় গীতিকার চেয়েও প্রাচীন। এই বারমাসীগুলি আমাদের গীতিকাগুলিকে প্রভাবান্বিত করেছে বলেও মনে হয়।”[৫] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও বারমাসীগানকে বহু প্রাচীন বচনা বলেই চিহ্নিত করেছেন। “The earliest poetic tradition of the country, was that a Bengali poem could not be complete without a baromasi or an account of the twelve months.... We have found baromasis even from the days of aphorisms of Dak and Khana, composed probably in the ninth century.”[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ যে কোন কোন গবেষকের অনুমান লোকায়ত বাবমাসীব আদলেই কালিদাস ‘ঋতুসংহার’ রচনা করেছিলেন।

প্রাচীন বারমাসীগুলি যে উদ্ভবেব লগ্নে আচার-সংশ্লিষ্ট রচনা ছিল তার প্রমাণ বয়েছে ‘শূন্য পুরাণ’এ। শূন্যপুবাণের গদ্য বারমাসীটিতে প্রতি মাসের রাশি পূজা কবে ‘দাতাব দানপতির’ বিঘ্ননাশেব কামনা ব্যক্ত করা হয়েছে।

“কোন মাসে কোন রাসি।
চৈত্র মাসে মীন রাসি।
হে কালিন্দি জল বার ভাই বার আদিও।
হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি।
সেবক হব সুখি আর্মানি ধামাৎকন্নি।
গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি।
সাংসুর ভোক্তা আমনি।
সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাত্রন বাএন দুআরি দুআর পাল
ভাণ্ডারী ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে
সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার।
দাতার দানপতির বিঘ্ন জাব নাস।
কোন মাসে কোন রাসি
বৈশাখ মাসে মেস রাসি।.....”[৭]

‘শূন্যপুরাণের’ সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রামাই পণ্ডিত দশম শতকের লোক। অবশ্য রামাই পণ্ডিতের কাল নিয়ে মতভেদ আছে। রচনাকাল যাই হোক এই বারমাসীটি যে আচারমূলক রচনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সূচনায় দ্বাদশ আদিত্যকে সম্বোধন কবে

সেবকেব 'পুষ্পপানি'র অর্ঘ্য নিবেদন এবং বায়েন গায়েন দুয়ারি দুয়ারপাল ভাণ্ডারী কোটাল প্রভৃতির সমৃদ্ধি কামনা ও দেঁউলে জয় জয়কার পড়ার আশা প্রকাশ করা— এ সবই আচারমূলক রচনাব ইঙ্গিতবাহী। অন্যত্রও বারমাসীগানের আচারমূলকতার পরিচয় রয়েছে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগানগুলিকে মহুয়ার বারমাসী, লীলার বারমাসী, কমলার বাবমাসী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রামাণিক সংগ্রহ ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-য় সম্পাদক এমন কিছু তথ্যের উল্লেখ করেছেন যা স্পষ্টতঃই বারমাসী গানের আচারগত দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে। 'কাঞ্চন কন্যা পালা'-র ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন, "এককালে অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি নামাইবার জন্য পূর্ববঙ্গের 'গায়েন' সম্প্রদায় বিশেষ শ্রদ্ধা যত্ন সহকারে এই পালাটি গাহিতেন।"[৮] 'কমলা কন্যার পালার' ভূমিকায় সম্পাদক এ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। "এককালে পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান কৃষক সমাজে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অভিজ্ঞ গায়েন এই সব পালাগান গাহিয়া অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি নামাইতে পাবেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ মে মাসে টাঙ্গাইলের উত্তব-পূর্ব পনেরো মাইল দূরে বল্লারতনগঞ্জ বাজারে ও ১৯৪৪ খ্রীঃ মার্চ মাসে ঢাকাব দশ মাইল পশ্চিমে ভাকুর্তা গ্রামে গায়েনের এই আশ্চর্য ক্ষমতা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেখিয়াছি এই উদ্দেশ্যে পালা গাহিতে হিন্দু ও মুসলমান গায়েন তাঁহাদের নিজস্ব ওস্তাদ গুরু পরম্পরা কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করেন। যে নিয়মগুলির মধ্যে একবেলা হবিষ্যান্ন আহার ও আসরে গান গাহিবার সময় ছাড়া অন্য সময়ে মৌন থাকা, হিন্দু ও মুসলমান গায়েনদেব একই প্রকার বিধান। দুই জায়গায়ই দেখিয়াছি গানের দ্বিতীয় রাত্রের শেষে বৃষ্টি নামিয়াছিল।"[৯] 'কাঞ্চন কন্যা পালা'কে সোজাসুজি বারমাসী বলা না হলেও গানের শেষে বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত রয়েছে:

হায়রে, ডুইবা গেল কাঞ্চনমালা
জল হইল থির।
দেওয়ার ডাকে আকাশ ফাইট্যা
হইল রে চৌচির॥[১০]

'কমলা কন্যার পালা'-র বন্দনা অংশেই বৃষ্টি নামানোর উল্লেখ বয়েছে:

দেশে নাইরে বিষ্টি পানি ক্ষেতের মাটি ফাটা।
পিত্‌লা ঘট ভইরা দিলে লাগ্‌ব মেঘের ঘটা॥
ঘটের উপরে আমি শাড়ী একখান পাই।
দেওয়ার মেঘ দয়া কইরর আর ভাবনা নাই॥[১১]

'বন্দনার' শেষাংশে বারমাসী গান হিসেবেই পালাটিব পরিচিতি দেওয়া হয়েছে:

দ্বিজ ঈশান রচিল এই না কমলার বারমাসী।
যে গান শুনিয়া কান্দে আশ্‌মানে মেঘ আসি॥[১২]

পালা সমাপ্তি অংশেও গানটিকে বারমাসী বলা হয়েছে :

এইখানে করিলাম শেষ বারমাসী গান।
বাটা ভইর‍্যা জামাইর মা দেও গোয়া পান॥
আমরা সবে দিয়া যাই ধনে পুত্রে বর।
ধন দৌলত যত সব বারুক নিরন্তর॥[১৩]

বারমাসী গানের সঙ্গে যে বৃষ্টি নামানোর যোগ আছে অসমীয়া বারমাসী গানেও একথার সমর্থন পাওয়া যায় :

ঢোল বাজে ডগৰ বাজে আৰ বাজে কাঁশি।
এই গান তিনদিন গাইলে দেৱাৰ আসে পানী॥[১৪]

সুরমা-বরাক উপত্যকার লোক সমাজবারমাসী গানকে আচারমূলক গান বলেই মনে করেন। বারমাসী গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় লোকবিশ্বাসগুলি হল—

ক. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি নামানোর উদ্দেশ্যেই বারমাসী গান গাওয়া হয়।

খ. খরার সময় কোন যুবক যদি কোন গাছের ডালে বসে বাঁশীতে এক নাগাড়ে বারোটি বারমাসী গানের সুর বাজাতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি নামে।

অর্থাৎ স্থানীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বারমাসী গান বৃষ্টির ইন্দ্রজালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ প্রসঙ্গে রাজমোহন নাথ উল্লিখিত বারমাসী গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি আচারের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। আচারটি বিশ্লেষণ করলে বৃষ্টি নামানোর ইন্দ্রজালের সূত্রটিই বড় হয়ে উঠে। রাজমোহন নাথ লিখেছেন, "শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে নবমীর রাত্রে ও দশমীর দিনে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় নৌকা টানার যে স্ত্রী আচার প্রচলিত আছে, তাহাতে ধামালি নৃত্য সহকারে বারমাসীগুলি এখনও গীত হয়।"[১৫] নৌকাটানা আচারটি এরকম। কলাগাছের বাকলা দিয়ে একটি নৌকা তৈরী করে এর উপর ধান, চাল ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যবহার্য সমস্ত জিনিস রাখা হয়। দুর্গামূর্তির পাশে রাখা নৌকাটির একপ্রান্ত নূতন একটি গামছায় বেঁধে নৌকাটি টেনে মণ্ডপের বাইরে আনা হয়। সেই সঙ্গে চলে নৌকাটানার গান।[১৬] নৌকা টেনে নিয়ে যাবার সময় প্রায়ই বলা হয় নৌকা চড়ায় আটকে গেছে আর যাবে না। তখন সমবেত নারী পুরুষ নৌকাটিকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে ধামাইল নৃত্য সহ বারমাসী গান গেয়ে থাকেন। গান শেষ হলে আবার শুরু হয় নৌকাটানা। এভাবে সারারাত একের পর এক বারমাসী গান গেয়ে নৌকাটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় ভাঁড়ারের সামনে এবং নৌকার জিনিসপত্র সযত্নে ভাঁড়ারে তুলে রাখা হয়। স্পষ্টতঃই অনুষ্ঠানটি অতীতের নৌ বাণিজ্যের প্রতীকী রূপ। নৌবাণিজ্যকে সহজ ও সুগম রাখতে পর্যাপ্ত বৃষ্টির কামনা খুবই সঙ্গত। কারণ পরিপূর্ণা নদীবক্ষে বাণিজ্য তরণীর যাত্রা হবে সাবলীল। জলের অভাবে যাতে নৌকার গতি ব্যহত না হয় সে

জন্যই বারমাসী গানের অবতারণা। কারণ বারমাসী গান করলেই বৃষ্টি হবে, নৌকা হবে বিপন্মুক্ত। কাজেই দেখা যাচ্ছে বারমাসী গানের সঙ্গে বৃষ্টি কামনার যোগ রয়েছে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলেও দেখা যাবে বারমাসী গানের সঙ্গে বৃষ্টির যোগ রয়েছে। বারমাসী গানগুলো একান্তভাবেই নারী জীবনাশ্রিত সঙ্গীত। দয়িতের আগমন প্রতীক্ষায় বিরহিণী দয়িতার আক্ষেপই বেশীরভাগ বারমাসীর বিষয়বস্তু। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এ দিকটির উল্লেখ করে লিখেছেন, “বারমাস্যা গীতির সর্বত্রই দেখা যায় মেঘ সন্দর্শনে বা বর্ষাধারার আবির্ভাবে নারীচিত্তে জাগে বিরহ বেদনা। বাইরে মেঘ ও মৃত্তিকার দাম্পত্য জীবনের লীলা সন্দর্শনে সমপ্রাণতার প্রভাবে গৃহমধ্যে নারী হৃদয়েও স্বামী সংসর্গের বাসনা স্বতঃই উৎসাবিত হয়ে উঠত। মাটির সঙ্গে মানুষের, মেঘ ও বর্ষার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সম্পর্কেব এই মানবিকতাব জন্যই বারমাস্যার সর্বত্রই মেঘ অথবা বাবিধারা পতিত্বেব প্রতীকরূপে বিধৃত।”[১৭] বিবাহ মন্ত্রেও দেখি পুরুষ এবং নারীকে মেঘ ও পৃথিবীরূপে কল্পনা কবা হয়েছে:

অমোহমস্মি সা ত্বং
        সা ত্বমস্যমোহম্,
সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং,
        দৌরহং পৃথিবী ত্বম্।
তাবেহি বিবহাবহৈ
        মহবেতে দধাবহৈ,
প্রজাং প্রজনয়াবহৈ
        পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূন্,
তে সন্তু জরদ্রষ্টয়ঃ সংপ্রিয়ৌ
        রোচিষ্ণু সুমনসামানৌ।
পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং
        শৃণুয়াম শরদঃ শতম্॥

[**অনুবাদ:** আমি ‘অম’ এবং তুমি ‘সা’; তুমি ‘সা’ এবং আমি ‘অম’। আমি সাম ও তুমি ঋক, আমি আকাশ ও তুমি পৃথিবী— এইরূপ আমরা দুজনে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছি, যেন আমাদের রেতঃ সম্মিলিত হয়ে সন্তান উৎপন্ন হয়। আমরা যেন বহু পুত্র লাভ করতে পারি এবং তারা যেন জরাপ্রাপ্তি পর্যন্ত জীবিত থাকে। আমরা যেন একে অন্যের প্রিয়, রুচিকর ও মনোরঞ্জনকারী হই। আমরা উভয়ে যেন একত্রে শত শবৎ দেখতে পাই, শত শবৎ যেন আনন্দে জীবিত থাকি এবং শত শবতের বার্তা যেন শ্রবণ করতে পারি।][১৮]

নাবী ও পুরুষের সঙ্গে পৃথিবী ও মেঘের কল্পনা বহু প্রাচীন। বিভিন্ন লোকায়ত সমাজে বৃষ্টির ইন্দ্রজালের যে সব আচাব প্রচলিত আছে সেগুলোতে দেখা যায়, নারীরা তাদের দেহের প্রলোভন দেখিয়ে পুরুষ মেঘকে পৃথিবীতে আসার আহ্বান জানাচ্ছে। এ সব অনুষ্ঠানে যে সব গান

গাওয়া হয় তাতে যৌনতার প্রাচুর্যও লক্ষণীয়ভাবে নজরে পড়ে। সম্ভবতঃ বারমাসী গানও প্রথম অবস্থায় এরকম কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল, পরবর্তীকালে গানগুলোতে পরিমার্জন এসেছে। লক্ষণীয় যে সুরমা-বরাক উপত্যকার কোন কোন বারমাসী গানে এখনও যৌনতার ইঙ্গিত রয়েছে :

অরে বৈশাগ মাসেতে শন্তি ধানের বান্দে নেরা।
তুমার অঙ্গে আছে শন্তি ঐ নারান কমলা॥

অথবা—

অরে জৈষ্ট মাসেতে শন্তি গাছে পাকনা আম।
তুমার অঙ্গে মারমু শন্তি কামেব পইন্‌চ বাণ।
(শান্তির বারমাসী)

লক্ষণীয় ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে গুজরাট থেকে আসাম পর্যন্ত বারমাসী গান পাওয়া যাচ্ছে। কোন একটি বিশেষ সার্বজনীন আচারের সঙ্গে যুক্ত না হলে একই ধরণের একই রীতির গান রচিত হত না। অন্য আর একটি দিকও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মানবিক উর্বরতা শক্তির সঙ্গেও বাবমাসী গানগুলির যোগ আছে। গোয়াল পাড়াব একটি বারমাসী গানে আছে—

গর্ভবতী নাৰী যদি এক মনে শুনে।
তাৰ ঘৰে জন্ম নেয় শ্রীৰাম লক্ষণে॥[১৯]

মানুষ এবং প্রকৃতির উর্বরতাকে প্রাচীনকালে একই দৃষ্টিতে দেখা হত বলেই বারমাসী গানে মানবিক উর্বরতার প্রসঙ্গ এসেছে। এছাড়া বারমাসী গায়কদের মধ্যেও নানাধরনের বিধি-নিষেধ রয়েছে। পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে বারমাসী গায়কেরা গান গাওয়ার আগের দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। গোয়ালপাড়ার বারমাসী গায়কদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কার হল— "যদি কোনো বাৰমাহী গায়কে মৃত্যুৰ সময়ত এটা বাৰমাহী সম্পূর্ণকৈ নুশুনে তেনে হলে তেওঁৰ আত্মাই মুক্তি না পায়।"[২০] অর্থাৎ যদি কোন বারমাসী গানের গায়ক মৃত্যুর সময় একটি সম্পূর্ণ বারমাসী গান শুনতে না পারেন তাহলে তাঁর আত্মার মুক্তি হয় না। সাধারণ প্রেমসঙ্গীত কোন সময়েই আচারের বেড়াজালে বাঁধা থাকে না। এটি ঘটে আচারমূলক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে।

স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন উঠবে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বারমাসী সংযোজিত হবার যৌক্তিকতা কি? এ সম্পর্কে আপাততঃ এটুকু বলা যায় মনসা ও চণ্ডী উপাসনার সঙ্গে বাণিজ্যের সুস্পষ্ট যোগ রয়েছে। মনসা উপাসনার পশ্চাৎপটে বৈদিক ঐতিহ্য বর্তমান — একথা বলেছেন স্বামী শঙ্করানন্দ ও সুকুমার সেন। স্বামী শঙ্করানন্দ বৈদিক জল কল্পনার সঙ্গে মনসার সংযোগের কথা বলেছেন।[১২] হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য মনসার সঙ্গে গজলক্ষ্মীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলে অনুমান করেছেন। নীহাররঞ্জন রায় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা থেকে মনসা পূজার উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) মৈমনসিংহ থেকে প্রাপ্ত

বিদ্যাপতির 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী' পুঁথিটির কথা উল্লেখযোগ্য। এই পুঁথিতে বর্ণিত মনসাপূজা 'দুর্গোৎসবের মতই বিরাট ব্যাপার'[২২]। সুকুমার সেন এ ধরনের বড়মাপের মনসাপূজাকে মিথিলা অঞ্চলের বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এই বড়মাপের মনসা পূজা আসলে সুরমা-বরাক উপত্যকায় প্রচলিত নৌকা পূজা। মনসা উপাসনাকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, বাণিজ্য সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে একটি কৌম গোষ্ঠীর দেবীরই বিবর্তিত রূপ বর্তমান মনসা।

চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। সুরমা-বরাক উপত্যকায় দু'ধরনের মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত প্রচলিত— নিয়ত্ মঙ্গলচণ্ডী ও উদয় মঙ্গলচণ্ডী। নিয়ত্মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের খিলি এখনও কোথাও যাত্রাকালে নিরাপদ ভ্রমণের জন্য সঙ্গে রাখা হয়। অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র— এই পাঁচমাস, প্রতিমাসে একটি করে 'উদয় মঙ্গলচণ্ডীর' ব্রত করা হয়। ব্রতকথাটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এক সওদাগর। কিন্তু বাণিজ্যে যাবার তার মন নেই। সংসারের অভাব আব ঘোচে না। একদিন সওদাগরের বাড়ীর দাসী বাদাই প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে আগুন আনতে গিয়ে দেখলো সেই বাড়ীতে সেদিন আগুন জ্বালানো হয়নি, সবাই উদয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করছে। বাদাই জানতে চাইল— এ ব্রত কবলে কি হয়? ব্রতিনীরা বলল, যার যা মনোবাসনা তা পূর্ণ হয়। বাদাই বাড়ীতে এসে সওদাগরের স্ত্রীকে নিয়ে ব্রত শুরু করতেই সওদাগরের মনে বাণিজ্যে যাবার ইচ্ছে জাগলো। পৌষ মাসের ব্রত শেষ হবার পর সওদাগর নৌকা বানানোর ফরমাশ দিল। চৈত্র মাসের ব্রত শেষ হতে না হতেই সওদাগব নৌকা ভাসিয়ে দিল। সওদাগরের স্ত্রী পরের বছর আর ব্রত করল না। সওদাগরও আর দেশে আসে না। তৃতীয় বছব সওদাগরের স্ত্রী আবার ব্রত শুরু করতেই প্রবাসী সওদাগরের দেশে ফেরার ইচ্ছে হল। চৈত্র মাসের এক মঙ্গলবারে যখন বাদাই আর সওদাগরের স্ত্রী ব্রত করছে তখন ঘাটে এসে নৌকা লাগলো; এ খবর শুনেই ব্রতের আচার অসমাপ্ত রেখে সওদাগরের স্ত্রী দৌড়ে ঘাটে চলে এল কিন্তু নৌকা তৎক্ষণাৎ দূরে সরে গেল। বাদাই সব আচার অনুষ্ঠান শেষ করে ঘাটে আসতেই নৌকা আবার এসে ঘাটে ভিড়ল। এ ঘটনায় সওদাগর তার স্ত্রীকে অসতী ভেবে বাদাই এর বাড়ী গিয়ে উঠল। মনের দুঃখে এবং ঈর্ষায় কাতর সওদাগরের স্ত্রী বাদাই-এর মৃত্যু কামনা করে পরের বছর আবার ব্রত শুরু করল। অগ্রহায়ণ মাসের ব্রত শেষ হতেই বাদাই অসুস্থ হয়ে পড়ল, — চৈত্র মাসের ব্রত শেষ হবার সাথে সাথেই বাদাই মরে গেল। সওদাগর বাদাই দাসীর হাড় দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পরে 'হায় বাদাই!' 'হায় বাদাই'! করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সওদাগরের স্ত্রী পরের বছর সওদাগরের সংসারে প্রত্যাবর্তন কামনা করে ব্রত শুরু করল। অগ্রহায়ণ মাসের ব্রত শেষ হবার পর সওদাগর গলার মালা খুলে কোমরে বাঁধল, এভাবে এক এক মাসের ব্রত শেষ হয় আর হাড়ের মালা ও কোমর থেকে হাত, হাত থেকে পা এবং চৈত্র মাসের ব্রত শেষ হবার পর সওদাগর মালা খুলে জলে ফেলে দিয়ে বাড়ীতে এসে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

ব্রতকথাটি স্পষ্টতঃই নৌবাণিজ্যের সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর সংযোগের ইঙ্গিতবাহী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নিয়ে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল গবেষণা করার পর সুকুমার সেন মঙ্গলচণ্ডী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়; "যারা জলপথে বাণিজ্য করেন এ দেবী তাঁদের রক্ষয়িত্রী"[২৩]। এর পর মঙ্গলচণ্ডীকে আব বাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট দেবী বলতে দ্বিধা থাকে না। মঙ্গলচণ্ডী উপাসনার প্রাচীনত্বও ব্রতকথাটিতে বিধৃত হয়েছে। বাদাই-এর দুঃখে তাব হাড়ের মালা গলায় পরে সওদাগরের ঘুরে বেড়ানো চর্যাপদের সমকালীন জীবনকে মনে করিয়ে দেয। ১০নং চর্যায় কাহ্নপাদ ডোম্বীর জন্য গলায় হাড়ের মালা পবার কথা বলেছেন। এ থেকে মনে হয আদি যুগেই মৌখিক ঐতিহ্যে মঙ্গলচণ্ডীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। আদি মধ্যযুগে মঙ্গলচণ্ডী যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।[২৪] এই সূত্রেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বারমাসী গান যুক্ত হয়েছিল। তবে সূচনালগ্নেব বারমাসী গানগুলি মঙ্গলকাব্যের যুগে এসে পরিশীলিত কাব্যরূপ পেযে উৎকৃষ্ট সাহিত্যেব মর্যাদা লাভ করেছিল। এ ভাবেই বৃষ্টি কামনার ইন্দ্রজালেব সঙ্গে যুক্ত এই গানগুলি ক্রম-উত্তবণেব মাধ্যমে আদিমতা পবিহার করে সাহিত্যিক বারমাসীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। বাংলাব লোকসাহিত্য (৩য খণ্ড) : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : ১৯৬৫ : কলিকাতা : পৃঃ ৫৪৫

২। বাংলার পল্লীগীতি : চিত্তরঞ্জন দেব : ১৯৬৬ : কলিকাতা : পৃঃ ২৬২

৩। বাংলা গাথাকাব্য : ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য : ১৯৬২ : কলিকাতা : পৃঃ ২৪৮

৪। ঐ : পৃঃ ২৪৯

৫। লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড) : ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী : ১৯৮০ : ঢাকা : পৃঃ ১৮৭

৬। লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড) : [আঁশবাফ সিদ্দিকী] থেকে উদ্ধৃত: পৃঃ ১৮৮

৭। শূন্যপুরাণ : শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : ১৩৩৬ : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা : পৃঃ ১২৬

৮। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (দ্বিতীয় খণ্ড) : শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত : ১৯৭১ : কলিকাতা : কাঞ্চন কন্যা পালার ভূমিকা : পৃঃ ৩

৯। ঐ (তৃতীয় খণ্ড) : কমলা কন্যার পালার ভূমিকা : পৃ ১৭৬

১০। ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড) : পৃঃ ৬৫

১১। ঐ (তৃতীয় খণ্ড :) পৃঃ ১৭৭

১২। ঐ (তৃতীয় খণ্ড) : পৃঃ ১৭৮

১৩। ঐ (তৃতীয় খণ্ড) : পৃঃ ২৫৪

১৪। গোৱালপৰীয়া লোকগীত সংগ্রহঃ সম্পাদক ডঃ বীৰেন্দ্রনাথ দত্ত : ১৯৭৪ : যোৰহাট : পিয়া বাৰমাসী : পৃঃ ২৭৪

১৫। শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত : গুরুসদয় দত্ত এবং ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত : ১৯৬৬ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :

১৬। **নৌকাটানার গান :**

নাও যায় রে নাও যায় বাইয়া
আপনে সে দুর্গা মাইয়ে কাড়ার ধরিলা।
হিরে হয় হয় হইয়া। ধু।
প্রথমে ভাসাইলা ডিঙ্গা নামে মধুকব
আগে কবে থইল চান্দে চণ্ডী মাণ্ডব ঘর
চন্দ্রধরের আগে চলে দুলাই কাড়াবী
ঝমকে ঝমকে চান্দের ডিঙ্গায় উঠে পানি
ও ভাই বাইয়া চল যে চম্পক নগর
হস্তেতে লাল বৈঠা গলায় চাদব
আর দ্বিতীয়ে সাজিল নৌকা নামে শঙ্খচূড়
তার পরে তুলল চান্দে চণ্ডী মাণ্ডব ঘর
আব তৃতীয়ে সাজিল নৌকা নামে মধুকর
তার উপরে তুলল চান্দে পূজার সামগ্রী
তুমি কুন গুন্ করে ছাবাল মাঝিরে
কুন চরে বাইয়া যাও নাও
হস্তেরই চন্দন দিমু মাঝি তরে রে
(.... বাবুব) ঘাটে লাগাও নাও।

১৭। ভারতীয় সাহিত্যে বাবমাস্যা : ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : ১৯৫৯ কলিকাতা : পৃঃ ২৬

১৮। বিবাহমঙ্গল : আচার্য রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : ১৩৫৯ : কলিকাতা : পৃঃ ৫৮-৫৯

১৯। গোয়ালপৰীয়া লোকগীত সংগ্রহ : পিয়া বাৰমাসী : পৃঃ ২৭৪

২০। ঐ পৃঃ ২৭০

২১। মনসাচরিত : স্বামী শঙ্কবানন্দ : ১৯৫৭ : কলিকাতা

২২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) পূর্বার্ধ : ডঃ সুকুমাব সেন : ১৯৭৮ : কলিকাতা : পৃঃ ২২২-২২৩

২৩। মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল : শ্রী সুনীল কুমার ওঝা সম্পাদিত : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় : ১৩৮৪ : "চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে দুচার কথা অংশ"

২৪। 'বাধাবিবহ' অংশে বডাই এব উক্তি :

বড যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে॥

ঐতিহ্যময় শ্রীহট্ট ও তার লোকসংস্কৃতিতে প্রবাদ

অজিতকুমার চক্রবর্তী

"মমতা বিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে
নির্বাসিতা তুমি / সুন্দরী শ্রীভূমি।"

— রবীন্দ্রনাথের এই মমতাময়ী বাণীতেই বর্ণিত হয়েছে শ্রীভূমি শ্রীহট্টের, তথা সুরমা-বরাক উপত্যকার বাঙলার বুক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার বিষাদময় ইতিহাসের ইংগিতটি। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে মাত্র তিনদিন সিলেটে থেকেই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন— এই অঞ্চলটি বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ এক জনপদ। অথচ তার রাষ্ট্রীয় পরিচয় আসামপ্রদেশের একটি জেলারূপে। বাঙলার সঙ্গে সে যেন সম্পর্কহীন। এই অঞ্চলের এ বেদনা স্পর্শ করেছিল কবির অন্তরের অন্তঃস্থলটি।

বিচ্ছিন্নতার জন্যই বোধহয় লোকসংস্কৃতির বিচিত্র নানা উপকরণে ভরপুর এই শ্রীভূমির লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়েনি বাঙালি গবেষকদের। এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীত, ব্রতকথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ ও সংকলন বা আলোচনার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না হয়তো সেই কারণেই।

দীর্ঘকাল থেকে বহু বিশিষ্ট বাঙালিই এসেছেন এই অঞ্চল থেকে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে আছে 'সুরমস-জনপদের' উল্লেখ। বর্তমান সুরমা-বরাক বিধৌত এই শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলকেই 'সুরমস জনপদ' বলে মনে করেন পণ্ডিতজনেরা। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা তো মেঘনা উপত্যকারই (যেমন মৈমনসিংহ ত্রিপুরা প্রভৃতি) উত্তরাংশ। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নেই বললেই হয়। এবং এই কারণেই প্রাচিন ও মধ্যযুগে পূর্ববাঙলার এই কয়টি জেলার . . . সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে বিস্তার লাভ করেছিল।" বস্তুত শ্রীহট্ট ও কাছাড় সংস্কার ও সংস্কৃতিতে এক ও অভিন্ন এবং বাঙলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অথচ শাসকগণ রাজনৈতিক স্বার্থে এই সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ অঞ্চলটিকে বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন সেই ১৮৭৪ সাল থেকে।

শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণ গ্রাম থেকেই জগন্নাথ মিশ্র আসেন সংস্কৃত চর্চাকেন্দ্র গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপে, সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নমানসে। শ্রীহট্টেরই জয়পুর নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠাকন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন জগন্নাথ মিশ্র। এঁদেরই সন্তানরূপে আবির্ভূত হন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

(১৪৮৫/৮৬), যাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একদিন বাঙালির সংস্কৃতি ও সাহিত্য-সমৃদ্ধ এক পরিমণ্ডল।

এই জেলারই লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী কুবের আচার্য ও নাভাদেবীর সন্তান শ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভু (পূর্ণনাম শ্রীকমলাক্ষ আচার্য) জন্মগ্রহণ করেন (১৪৩৩) শ্রীহট্টেরই পবিত্রভূমিতে। মহাপ্রভুর পদরজধন্য এই শ্রীভূমিরই সন্তান ছিলেন শ্রীবাস, মুরারীগুপ্ত প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্শ্ব-পরিকরগণ; বৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, নৈয়াকরণ বাণীনাথ বিদ্যাসাগর প্রমুখ গুণীগণ।

এই অঞ্চলই প্রাচীন হরিকেল বা হরিকোলা রাজ্য বলে পরিচিত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত 'রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য' ও 'রূপচিন্তামণি' পুথিদুটিতে (আঃ পঞ্চদশ শতক) সিলেট ও হরিকেলকে সমার্থক বা অভিন্ন বলা হয়েছে।

হিউ-এন্‌ৎ-সাঙ্‌-এর ভ্রমণকাহিনী 'সি-যু-কি' (Si-Yu-Ki)-তে 'শি-লি-চ-ট-ল' নামে পূর্বপ্রান্তের একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। সেটাই প্রাচীন শ্রীহট্ট বা সিলেট এমন মনে করা হয়।

শ্রীহট্টের প্রাচীন নাম বোধহয় ছিল শিলহট্ট (> শিলহাট > সিলেট)। শিল শব্দের অর্থ 'ক্ষেত্র হতে শষ্য নিয়ে যাবার পর জমিতে পড়ে থাকা অবশিষ্ট ধান্যাদি শস্য খুটে নেওয়া'— বলেছেন ডঃ সুকুমার সেন। তাই যেখানকার হাটে কেনাবেচার পর হাটের ধূলিকণাতেও পাওয়া যেত পর্যাপ্ত শস্যকণা, সেই হাটেরই নাম শিলহট্ট বা শিলহাট। এই বিশেষ নামটিও এ অঞ্চলের সমৃদ্ধির ব্যঞ্জনাবাহী। শিলহট্ট থেকেই এসেছে শ্রীহট্ট অর্থাৎ লক্ষ্মীর কৃপাধন্য যে হাট— এমন ধারণা নিশ্চয়ই অমূলক নয়।

যাই হোক, বাঙলার ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির ভাণ্ডারে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের অবদান প্রাচীন কাল থেকেই যেমন নগণ্য হয়, তেমনই নগণ্য নয় লোকসংস্কৃতির (folk-lore) ক্ষেত্রেও। আর এজন্যই এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনার প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকার মতোই শ্রীহট্টের প্রাচীন ঐতিহ্যের সামান্য আলোচনা করা হল।

এ অঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত অজস্র প্রবাদ, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'দিঠান' বা দিতান (< দৃষ্টান্ত), লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের তা এক অমূল্য সম্পদ।

—(দুই)—

"গ্রাম্যসাহিত্য বাঙলার গ্রামের ছবি, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে। সেইজন্যই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।" বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বস্তুত লোকসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অঙ্গ এই গ্রাম্যসাহিত্য বা লোকসাহিত্য। আর এই লোকসাহিত্যের ভুবনে 'প্রবাদ' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

লোকসাহিত্যের ভিত হ'ল লোকভাষা। কিন্তু লোকভাষা বা আঞ্চলিক উপভাষাই রসগ্রহণে প্রাথমিক বাধারূপে দেখা দিতে পারে অপর অঞ্চলবাসীর পক্ষে। তাই প্রাচীন প্রবাদ প্রভৃতি লোকসাহিত্যের উপকরণগুলির রসগ্রহণে আমাদের অবশ্যই আঞ্চলিক উপভাষা (regional dialect) সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হতে হবে। বিশিষ্ট ইংরেজি অভিধানেও পাই লোকভাষা বা folk-speech হলো "the dialect of the common people of a country, in which ancient idioms are embedded"। আমরা অবশ্য এখানে ভাষা, উপভাষা, লোকভাষা প্রভৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় বা তাত্ত্বিক আলোচনায় যেতে চাই না।

ভাষার যথার্থ অস্তিত্ব যে দৃষ্টি ও পাঠে নয়; উচ্চারণ ও শ্রুতিতে— এ সত্যটি দীর্ঘকাল উপেক্ষিত থাকলেও আজ আর উপেক্ষিত নেই ভাষাবিজ্ঞানীদেব কাছে। উপভাষার বৈশিষ্ট্যও মূলত এই শ্রুতি আর উচ্চারণেই।

এ প্রসঙ্গে মনে বাখতে হবে অল্প দূরত্বেই মানুষের মৌখিক ভাষা এবং উচ্চারণে কিছু পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং একটি ভাষার যেমন উপভাষা, সেই উপভাষাতেও দেখা দিতে পাবে কিছু পৃথকতা। এছাড়া দুটি ভাষা বা উপভাষার মধ্যে থাকে transitional বা সংযোগমাত্রিক বিভেদ। সিলেটি উপভাষাতেও এই বিভেদ বর্তমান।

কৌতুকজনক ব্যাপার হচ্ছে এক অঞ্চলের উপভাষার প্রতি অন্য অঞ্চলবাসীরা চিরদিনই ব্যঙ্গ বা অবজ্ঞাপ্রকাশ করে থাকেন। সকল দেশ বা সকল কালেই পাওয়া যাবে এর উদাহরণ। মহা ভাষ্যকার পতঞ্জলি পূর্বাঞ্চলের ভাষাকে নিন্দা করেছেন। বোধায়ন পূর্বাঞ্চলে যাওয়াই নিষেধ করেছেন। 'অন্যে পরে কা কথা'— শ্রীহট্টের সন্তান নবদ্বীপবাসী চৈতন্যদেবও—

"বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া॥" (চৈতন্য ভাগবত)

কোনো উপভাষার বিকৃতি বা বিভেদকেই অশ্রদ্ধা করার কারণ নেই। কোন বিশেষকারণে যখন একটি অঞ্চল শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে, তখন সেই অঞ্চলের উপভাষাই মান্যতা পায় শিষ্টভাষা (standard coloquel) রূপে। কিন্তু শুধুমাত্র একটি মান্য বা শিষ্টভাষা নিয়ে পরিপূর্ণতা পেতে পারে না কোন ভাষা বা জাতি। চিনতে হবে, জানতে হবে সে ভাষাকে সামগ্রিক ভাবে। সমভাষাগুলিকে উপেক্ষা করলে তো পূর্ণ হবে না সেই চেনা বা জানা। ইংরেজিতে একটি প্রচলন আছে— "He knows not England, who only knows England"— ভাষার ক্ষেত্রেও তাই।

উপভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে Max Müller বলেছেন, " . . dialect may well exist by the side of a national speech, nay, as they, form a constant supply of life, a vigor. . .". জাতীয়তাবোধ গ'ড়ে ওঠে এই ভাষাকে কেন্দ্র করে— "The ideas of race and nationality founded on language"। সুতরাং সমস্ত উপভাষা নিয়েই গড়ে ওঠা যে ভাষা, তাকে জানতে হবে, ভালবাসতে হবে হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভাষার ইঙ্গিত প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন সবিস্তারে। এই প্রেক্ষিতেই সিলেটি উপভাষা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অন্তত তার লোকসাহিত্য বুঝতে হ'লে।

শ্রীহট্টের, তথা সমগ্র সুরমা-বরাক উপত্যকার উপভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে উপাভাষাটির ভৌগলিক অবস্থিতি সম্পর্কেও কিছু জানা প্রয়োজন। শ্রীহট্ট জেলা ছিল পাঁচটি মহকুমায বিভক্ত। সেগুলি— শ্রীহট্ট উত্তর, শ্রীহট্ট দক্ষিণ, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ। দেশভাগে করিমগঞ্জ মহকুমার করিমগঞ্জ সদর-সহ সাড়ে তিনটি থানামাত্র (করিমগঞ্জ, বাতাবাড়ি, পাথরকান্দি, বদরপুর ও জলঢুপ থানার অংশবিশেষ) এসেছে ভাবতে। বর্তমানে সমগ্র বরাক উপত্যকা ও ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর অঞ্চলেও বিস্তার ঘটেছে এই উপভাষার।

সিলেটি বা শ্রীহট্টিয়া উপভাষাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা চলে। শ্রীহট্ট উত্তর, শ্রীহট্ট দক্ষিণ এবং করিমগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ— এই দুই অঞ্চলের উপভাষায় রয়েছে লক্ষণীয় পার্থক্য। আবার মৌলবী বাজার ও সুনামগঞ্জের ভাষা উজানী ও ভাটি অঞ্চলের ভাষা নামেও পবিচিত। এই 'উজানী' ও 'ভাটি'— উভয় অঞ্চলের ভাষীরা পরস্পরের ভাষাকে উপহাস কবে। দেশভাগের পর অবশ্য এই আঞ্চলিক পার্থক্য অনেকটাই লোপ পেয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। উপভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। উপভাষার প্রবাদগুলি বুঝতে হলে যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু মাত্রই আলোচনা কবা হবে।

গ্রীয়ার্সন সাহেব (Sir G. A. Grienson) শ্রীহট্টের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, "There are some peculiarities of pronunciation which tend to render it unintelligible to strangers. The inflections also differ from those of regular Bengali. . ."

"The vowel **a** is sometimes pronounced as in 'ball', and is then transliterated **â** . This is most noticeable when the vowel is followed by a liquid, as in **mānushâr** , of a man ; **nâl** a rod ; **mān** a maund, **ghâr** , a house. **Ē** is always pronounced correctly and never as the **ä** in hat. As regards consonants, the first point that strikes one is the guttural pronunciation of ক k, like the German **ch**. Then চ **ch** is pronounced like English **S** , and there is no difference between চ **ch** and ছ **chh**. Thirdly প **p** is frequently pronounced like ফ **ph** (not **f** but perhaps **pf**) — thus **pāp** , sin, does not become **phāph** . In fact, very little distinction is heard between any of the aspirated letters and their unaspirated originals, thus ঘর **ghâr** is almost pronounced gär, and ভাবী **bhārī** very much like bārī. Sometimes **p** has the sound of **w** , as **supārī** , pronounced **suwārī** .

"The sibilant is often, but not inveriably, changed to h. Thus **hāph** for **sāp** , a snake, - - - The letter **h** is often dropped, thus **āte** for **hāte** , an elephant,- - -.

The Umlaut or epenthesis, is noticeable in Sylhettia. A coming **i** (ee) sound influences a present vowal, if there is a consonant between; eg, কন্যা **kanyā** is sounded **kainyā** - - - Similarly চার (< চারি) **Chār** (**chāri**) is চাইর **sāir** - - - and so on."

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য অনেকটাই এখানে পাওয়া যাবে। এভাবেই শ, ষ > শ, আবার স > হ (যেমন সাপ > হাপ > হাব, এখানে অনেকটা ব'-এর উচ্চারণের কাছাকাছি)। চন্দ্রবিন্দু (ঁ)-এর ব্যবহার এই উপভাষায় নেই। বহিরাগত (হিন্দি, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি) শব্দে 'স' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়।

ও > উ-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন লোক > লুক, গোসা > গুসা, চোর > চুর। আবার উ > ও-তে রূপান্তরিত — যেমন মুলা > মোলা প্রভৃতি।

ধ্বনি পরিবর্তন ব্যাপকভাবে লক্ষিত হয় এই উপভাষায়। এই উপভাষায় সাধারণ বাঙলা থেকে বিভক্তির বৈশিষ্ট্য যেমন আছে, তেমনই আছে লিঙ্গ, বচন প্রভৃতিতেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য। কিন্তু এখানে ধ্বনিতাত্ত্বিক বা রূপতাত্ত্বিক আলোচনার সুযোগ নেই।

প্রবাদের প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক ধারণার আভাসমাত্র দেওয়া হলো। এবার আমরা শ্রীহট্ট-কাছাড় তথা সুরমা-বরাক উপত্যকার প্রবাদের আলোচনায় প্রবেশ করব।

—(তিন)—

প্রবাদ লোকপ্রজ্ঞার এক অমূল্য সম্পদ। কবে কোন সুদূর অতীতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা আন্তর-অনুভূতি আপন রসবোধের সংযোগে স্বতোৎসারিত হয়েছিল এই সকল প্রবাদের মণিমুক্তার মালা। এর কোনো ইতিহাস নেই। সব দেশেই আছে সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রবাদের প্রচলন। কালের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে যেমন আবদ্ধ নয়, তেমনি নয় কোনো ব্যক্তিক-সম্পদ এই প্রবাদগুলি। একটা জাতির আচার, আচরণ এবং বহুকালার্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছড়া, বাক্য বা বাক্যাংশে বিধৃত — যাকে বলা হয়েছে— 'a short sentence drawn from long experience. স্বল্প পরিসরে অধিক ব্যঞ্জনার দ্যোতনাই প্রবাদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন মিশরের 'Book of Dead'-এই নাকি রয়েছে প্রবাদের প্রথম উষার প্রকাশ (খ্রিঃ

পৃঃ ৩৭০০), কারও মতে বাইবেলের সামুয়েল-এব প্রথম ভাগেই (1. Sam. 24.13) নাকি পাওয়া যায় পৃথিবীব প্রথম প্রবাদ বাক্যেব নিদর্শন। কিন্তু লক্ষ করলেই প্রবাদের অধিকতর প্রাচীন উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে ঋগ্‌বেদে। ঋগ্‌বেদের 'সংবাদ সূক্তে' রাজা পুরুরবা উর্বশীর বিরহে ব্যাকুলিত হৃদয়ে যখন কামনা করছেন মৃত্যুকে, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে উর্বশী বলছে, নারীর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায়— "ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি. সন্তি সলাবৃকানাং হৃদয়ান্যেতা"। (১০/৯৫/১৫)। অর্থাৎ "সখ্য নাই নাবীর সঙ্গে, তাদের অন্তর হচ্ছে সলাবৃক বা নেকড়ের ন্যায়।" (ঋক সংহিতা পৃ. (২/৫৮১- হরফ)। অথবা 'আশ্বিন-সূক্তে' কক্ষিবৎ কন্যা ঘোষার উক্তি, "কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং" ইত্যাদি, অর্থাৎ "বিধবা রমণী যেমন শয়নকালে দেবরকে শয্যায় সমাদর করে' (ঐ- পৃ. ২/৪৯৫): রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত অনুবাদ)। এখানেও প্রবাদের প্রকাশ নারীর উক্তিতেই। প্রাচীন বাংলার 'চর্যাগীতি', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে শুরু করে বর্তমান শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত ছিল প্রবাদের প্রাচুর্য।

একটা জাতির অন্তরেব পরিচয় বহন করে চলেছে এই গ্রাম্য প্রবাদগুলি। বেকন (Bacon) যথার্থই বলেছেন, "The genius, wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs."

প্রভাতী সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত শরতের শিশির বিন্দুর মতোই প্রবাদকণা প্রকীর্ণ বয়েছে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও সাহিত্যে। প্রবাদ হচ্ছে— Wit of one and Wisdom of many. (অথবা ভাষার একটু রূপান্তরে "One man's wit is another man's wisdom) । একজনের রসনিসিক্ত সহজবুদ্ধিতে প্রতিফলিত বহুজনের জ্ঞান, ক্ষিপ্র প্রয়োগে সার্থক হয়ে ওঠা উত্তরাধিকাবার্জিত রিকৃথবিশেষ। বাঙলা ভাষায় প্রবাদের পরিণাহী অস্তিত্বের মধ্যে পরিকীর্ণ রয়েছে বাঙালির যে বসবোধ, আজ আমরা তা হারাতে বসেছি। কোন রসস্নিগ্ধ তীক্ষ্ণ প্রবাদের ব্যাখ্যা না করলে অনেকের কাছেই তার মর্মার্থটি হয় না বোধগম্য। এই প্রসঙ্গে একটি ইংরেজি প্রবাদ— "When a fool is told a proverb, the meaning of it has to be explained to him"— স্বতই মনে আসে। তবে আজ সেই মূর্খ বা fool-টি 'বাছতে গা উজাড়'। লোকসংস্কৃতির এই অমূল্য সম্পদ আজ অবলুপ্তির পথে।

ইংরেজি ভাষায় W.G. Smith সম্পাদিত Oxford Dictionary of English Proverbs (1936)-এর মতো কোনো 'প্রবাদ-অভিধান' বাংলা ভাষায় নেই, বা নেই কোনো বিশেষ চর্চা Proverbology, তথা প্রবাদতত্ত্ব বাঙলা ভাষায়। অবশ্য ডঃ সুশীলকুমার দে 'বাংলা প্রবাদ অভিধান'-কল্প 'বাঙলা প্রবাদ' গ্রন্থটি (১ম সং-১৩৫৫) রচনা (বা সংকলিত) করে নিশ্চিতভাবেই এ অভাব অনেকাংশে মোচন করেছেন। তাঁর গ্রন্থে ন' হাজারেরও বেশি প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। তবে 'নিছক প্রাদেশিক প্রবাদগুলি' তিনি স্থান দেননি তাঁর সংগ্রহে— 'স্থানীয় ভাষাভঙ্গি' অথবা 'বৈশিষ্ট্যের' কারণে। কিন্তু আমাদের ধারণা, স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষা-বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রয়োজন এগুলির সংকলন। সামান্য ব্যাখ্যা সংযোগেই অতিক্রান্ত হওয়া সম্ভব এ বাধা এবং পথ পাওয়া যায় বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিব সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের, সহজ সংযোগ সাধনের।

১৯৩৬ সালে সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর 'সরল বাঙলা অভিধান'-এ ৩২০১টি এবং ১৩৩০ সালে 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় ইন্দুবিকাশ বসু প্রকাশ করেন ৭০০টি প্রবাদ। এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকজনের নাম ও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ পাওয়া যাবে সুশীল কুমার দে মহাশযেব গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে।

আঞ্চলিক-প্রবাদ সংগ্রহে এগিয়ে এসেছিলেন ডঃ এনামুল হক। তিনি ১৯৩৫ সালে সংগ্রহ ও প্রকাশ কবেছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রায় এক হাজার প্রবাদ। রংপুর, মৈমনসিং, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের কিছু কিছু প্রবাদ এ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিক্ষিপ্ত ভাবে সংগৃহীত বা প্রকাশিত হলেও শ্রীহট্ট বা সিলেট অঞ্চলের প্রবাদ সংগ্রহ বা সংকলনের কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি এখন পর্যন্ত। 'বাংলা একাডেমী' ঢাকা থেকে মোহাম্মদ হানীফ পাঠান সংকলিত 'বাংলা প্রবাদ পরিচিতি' প্রকাশিত হয়েছে তিন খণ্ডে (১৯৭৬, ১৯৮২ এবং ১৯৮৫) সালে)। সেখানেও সিলেটেব প্রবাদগুলি হয়েছে অবহেলিত। অথচ ভাষাব সম্পদ হিসাবে, তুলনামূলক আঞ্চলিক ভাষা ও চিন্তাধারার আলোচনা বা পবিচিতিব প্রয়োজনেও সংগত গুরুত্ব সহকাবে এগুলির সংগ্রহ ও গ্রন্থন। বাঙলাদেশ থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকাই হয়তো এই উপেক্ষা ও অবহেলার কারণ।

প্রবাদ সীমাবদ্ধ নয় কোনো কালের বা অঞ্চলের গণ্ডিতে। এ সর্বকালেব, সর্বত্রেব। যেমন একটি এস্তোনীয়া (Estonian) প্রবাদ— A woman has long hair and a short brain. সমার্থক জাপানি প্রবাদ— A woman's wisdom is monkey-wisdom, ভাবতে— "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী", বা "বারো হাত কাপড়ে মেয়েদেব কাছা আটে না"। ভাষার বিভেদ সত্ত্বেও ভাবে ও বক্তব্যে অভেদ।

একই প্রবাদ অনেক সময় চলে এসেছে যুগ হতে যুগে, রূপ হতে রূপে, কালের গণ্ডি অতিক্রম করে। যেমন একটি প্রবাদ সংস্কৃতে— "বরং শূন্যশালা ন চ খলু দুষ্ট বৃষভেঃ।" চর্যাপদে— "বর শূন গোহালী কি সো দুট্ঠো বলন্দে" (সবহ)। একই প্রবাদ আধুনিক বাঙলায়— "দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।" প্রবাদটি সিলেটি উপভাষায় রূপ পেয়েছে— "কানা গরুর তা'কি খালি আখাইল্ বা'লা।"

বাঙলা প্রবাদ সংকলনের প্রথম সূচনা করেন সম্ভবত রেভা. উইলিয়ম মর্টন নামে এক বিদেশী ধর্মযাজক। তাঁর 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' গ্রন্থের আখ্যাপত্রে তাঁর পরিচয় দিতে যেয়ে বলা হয়েছে— Senior Missionary of the Incorporated Society for Propagating the Gospel in Foreign Parts. । এই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই মর্টন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন এদেশের ভাষা ও লোক সাহিত্যের সঙ্গে এবং সংগ্রহ করতে আগ্রহী হন বাঙালা প্রবাদ।

এ প্রসঙ্গে বাবু নীলবত্ন হালদার-এর 'কবিতা রত্নাকর' (১৮২৫) নামে সংস্কৃত প্রবাদ সংকলনটিরও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংকলনটি প্রকাশেব পাঁচ বছরের মধ্যেই দ্বিতীয়

সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হয়। (১৮৩০)। সংকলনটিতে ছিল ২০৩টি প্রবাদ। ভূমিকা লেখেন মার্শম্যান, ইংরেজিতে। প্রবাদগুলির ইংরেজি অনুবাদও করেন তিনি। আখ্যাপত্রে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, I have inserted a translation of them in to English...। যাই হোক, বাঙলা প্রবাদ সংকলনের পথিকৃতের সম্মান কিন্তু রেভা. মর্টনেরই প্রাপ্য, কারণ নীলরতন (বা নীলরত্ন) হালদার-এর 'কবিতা রত্নাকর' ছিল সংস্কৃত প্রবাদের সংগ্রহ। বাঙলা প্রবাদের স্থান ছিল না এ গ্রন্থে।

'দৃষ্টান্ত কাব্য সংগ্রহে' (১৮৩২) প্রবাদের সংখ্যা ছিল ৮০৩টি বাঙলা এবং ৭০টি সংস্কৃত। প্রতিটি প্রবাদের সঙ্গেই ছিল ইংরেজি অনুবাদ। বিষয়ানুযায়ী অথবা বর্ণানুক্রমিক ভাবেও সাজানো হয়নি প্রবাদগুলি। প্রবাদের সঠিক মর্মার্থ গ্রহণেও সর্বত্র সমর্থ হননি তিনি— এমন উদাহরণও বিরল নয়। কিছু ধাঁধাকেও গ্রহণ করা হয়েছে প্রবাদ বলে। যেমন, "মনে করি করি করি, হয় হয় হয়না' (৬৫ সংখ্যক)। এটি একটি অতি প্রচলিত ধাঁধা। এই সব ছোটখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও একজন বিদেশীর পক্ষে এ সংকলনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

রেভারেন্ড মর্টন ওই প্রবাদগুলিতে পেয়েছেন ব্যবহারকারীদের রুচির স্থূলতা, নিম্ন-মানসিকতা প্রভৃতি। গ্রন্থের মুখবন্ধে (preface) তিনি স্পষ্টই বলেছেন— "The estimates formed of this collection may be various. Some may deem a large portion of its contents mean ; and current among an illiterate people, the style is of course often low and incorrect, yet as the actual expression, in customary language, of the national character and motions, it is only the more valuable. Avarice and cunning. selfishness and apathy, everywhere show themselves ; the sordidness of worldly aims, and indifference to higher, are seen to flow naturally from a base idolatry that confers neither elevation of mind nor purity of heart." এই উক্তিতে কিছুটা তাঁর পাদ্রিসুলভ মনোভাবের প্রকাশ পেলেও, মূলে রয়েছে বাঙালির ভাষা, ভাব, রসবোধ ও রসিকতা সম্পর্কে পরিচিতির অভাব ও মর্মগ্রাহিতার দৈন্য। গ্রামীণ সমাজজাত বলে বহু প্রবাদেই এক ধরনের রাখালিয়া রসিকতা, ইংরেজিতে যাকে বলে bucolic wit, তার প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। সকল দেশের প্রবাদেই রয়েছে এর অস্তিত্ব। এর ভাষা দৈনন্দিন জীবনের ভাষা, জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভব, সুতরাং একে জীবনচিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া চলে না বা চলে না এর কোনো সংশোধন। শ্রীহট্টের প্রবাদগুলিতেও আমরা লক্ষ করব এই স্বাভাবিক গুণটি।

রেভা. মর্টন আরো ১৫৬টি প্রবাদ সংগ্রহও প্রকাশ করেন ১৮৩৫ সালে 'Calcutta Christian Observer' পত্রিকার এপ্রিল, জুন, অক্টোবর ও নভেম্বর সংখ্যায়। যাই হোক, উইলিয়ম মর্টনের 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ'ই বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা।

এরপর একাজে এগিয়ে আসেন আর এক বিদেশী ধর্মযাজক, যাঁর নাম বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ-ইতিহাসে উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত রয়েছে। তিনি রেভা. জেম্স লঙ (১৮১৪-১৮৮৭)। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোপাল হালদার বলেছেন, "জেম্স্ লঙের পরিচয় শুধু নীলকর প্রপীড়িত এদেশের জনসমাজের বন্ধু বলে নয়, পৃথিবীর জ্ঞানী ও মনস্বী সমাজের একজন অক্লান্ত পথিক হিসাবেও, আর কোনো দেশের মানুষকে— শাদা হোক কালো হোক তিনি অবজ্ঞা করেননি— জানতে চেয়েছেন তার জীবনচর্যা ও মানুষের সকল পরিচয়।" অধ্যাপক হালদার আরো বলেছেন, "প্রবাদ বিষয়ে (Proverbology) গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নে (bibliography) যে আধুনিক বিদ্যা গঠিত হয়ে উঠেছে তার মধ্যে জেম্স্ লঙ্ পৃথিবীরই অন্যতম পৃথিকৃৎ। (ভূমিকা— রেভা. জেম্স্ লঙ্ 'প্রবাদ মালা' ১ম খণ্ড; ১৯৮০)।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের অপরাধে লঙের হয় একমাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা। সমসাময়িক কবি প্যারীমোহন কবিরত্ন ঘটনাটিকে ছন্দোবদ্ধ করে বলেছেন,

'নীল বানরে সোনার বাঙলা ক'রলে ছারখার,
অকালে হরিশ ম'লে, লঙের হল কারাগার।"

—এ উক্তিটিও এককালে গ্রাম-বাংলায় 'প্রবাদ বাক্যে'র মতোই ফিরেছে লোকমুখে।

সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জানতে চাওয়া থেকেই হয়ত এসেছিল তাঁর প্রবাদ সংগ্রহের প্রেরণা। তাঁর সংগৃহীত প্রবাদের সংখ্যা প্রায় ছ'হাজার। পূর্ব বাংলা, বিশেষ করে শ্রীহট্টের প্রবাদ তাঁর সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল একথা কিন্তু বলা যাবে না। কারণ কোনো প্রবাদেই নেই সেই আঞ্চলিক ভাষা-রূপের বৈশিষ্ট্যটি। তবুও তাঁর সংগ্রহটির গুরুত্ব অসাধারণ। ডঃ সুশীল কুমার দে-র 'বাংলা প্রবাদ' বা ডঃ সুকুমার সেনের 'Women's Dialect' রচনার প্রণোদনাও এসেছে লঙের সংকলিত 'প্রবাদমালা' থেকেই, এ কথা বলা হয়ত খুব অসঙ্গত হবে না।

রেভা. লঙ্ ১৮৫১ থেকে শুরু করেন প্রবাদ সংগ্রহ করতে, এ কাজ চলে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত। ১৮৫১ সালে তিনি মাত্র ২১ পৃষ্ঠার 'Bengali Proverbs' পুস্তিকায় প্রকাশ করেন ১৮৬ টি প্রবাদ। অতঃপর 'Popular Bengali Proverbs' নামে আরেকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন ১৮৬৯ সালে। একই বৎসরে ২৩৫৮টি নিয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর 'প্রবাদমালা' পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থটি। পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে প্রকাশ করেন 'ইয়োরোপ ও এস্যাখণ্ডের প্রবাদমালা' বা 'Proberbs of Europe and Asia'— পর্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ড, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ সহ। 'প্রবাদমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে ৩১৪২টি প্রবাদ সহ।

দ্বিতীয় খণ্ড = 'ইয়োরোপ ও এস্যাখণ্ডের প্রবাদমালা' প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া ও ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতির চিন্তায় প্রতিফলিত বৈশিষ্ট্য যা প্রবাদে প্রতিফলিত তা তুলে ধরা এবং তুলনামূলক প্রবাদ-অধ্যয়নের সূচনা করা। এই খণ্ডের মুখবন্ধে (Preface) গ্রন্থকার এ সম্পর্কে বলেছেন,— "The following contains a free translation in Bengali by Babu Rangalal Banerjee, of proverbs selected by me from German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, French, Badagar, Malayalam, Tamil, Chinese, Panjabi, Mahratta, Hindi, Orissa, and Russian languages.

"The object is to introduce to the notice of Bengali people the wit and wisdom of peasants and women of other parts of the world..."— এই ভূমিকাটুকু থেকেই তাঁর কর্মের ব্যাপকতা, উদার চিন্তাধারা ও বঙ্গবাসীদের প্রতি অন্তরের যোগের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

'প্রবাদমালা'তে সমস্ত প্রবাদই সাজানো হয়েছে বর্ণানুক্রমানুসারে মাঝে মাঝে পাদটীকায় অর্থ-পরিচিতির প্রচেষ্টাও আছে। 'প্রবাদমালা'র তৃতীয় খণ্ডে বেশ কিছু আঞ্চলিক প্রবাদ, বিশেষ করে ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চল থেকে যে গৃহীত হয়েছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায় সংকলনের বিভিন্ন উক্তি থেকে কিংবা প্রবাদের ভাষা-চরিত্র থেকে। বেশ কিছু সংস্কৃত শ্লোক বা বাক্যও স্থান পেয়েছে সংকলনে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই বিদেশী ধর্মযাজক বুঝতে পেরেছিলেন যে, সব দেশেই গ্রামের কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ ও মুখ্যত মেয়েদের মধ্যেই রয়েছে প্রবাদের মণিমণ্ডপটি, এবং তাদের মুখে মুখেই এর প্রচলন। প্রবাদ সংগ্রহেও তাই তিনি বিশেষ করে সাহায্য নিয়েছিলেন মেয়ে সংগ্রাহকদের।

ঋগ্বেদের কাল থেকেই প্রবাদ বাক্যগুলি মুখ্যত মেয়েদের মুখ থেকেই উৎসারিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সার্থক প্রয়োগও তাদেরই মুখে! লঙ্ একথা জানতেন বলেই নিয়োগ করেছিলেন নারী-সংগ্রাহিকাদের অন্দর মহলের (women's quarter) মেয়েদের কাছ থেকে প্রবাদ সংগ্রহে।

ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে, লোকসাহিত্যের চর্চা প্রভৃতিতে এই লোকপ্রবাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সামাজিক রীতি ও ব্যবহারিক-বিশ্বের অভিজ্ঞতাপুষ্ট সাংসারিক জ্ঞান ফটোগ্রাফের মতোই যেন প্রকাশ পায় প্রবাদবাক্যগুলির মাধ্যমে। আর সেখানেই রয়েছে গুরুত্ব আঞ্চলিক ভাষার প্রবাদ সংগ্রহের। উপভাষার বাধা এ-বিষয়ে এমন কিছু দুরতিক্রম্য বা দুর্ভেদ্য প্রাকার নিশ্চয়ই নয়। আঞ্চলিক ভাষা, অঞ্চল বিশেষের রীতি-নীতি, আচার-আচরণের সঙ্গে পরিচিত না হতে পারলে দেশের এক বিরাট অংশের সঙ্গেই অপরিচিত থাকতে হয়। গড়ে ওঠে এক অপরিচয়ের দূরত্ব। শতবর্ষ পূর্বেও রেভা. লঙ বুঝেছিলেন এই আঞ্চলিক ভাষার প্রবাদগুলির

(local sayings) গুরুত্ব। তাই তাঁর প্রবাদমালার ভূমিকায় লিখেছিলেন : "The series consists of about 6000 proverbs, but there are many local sayings, unpublished, and I hope some Native Gentlemen will continue the work in this direction." (Calcutta 11th March, 1872)।

প্রবাদগুলি 'নিরর্থক না হইলেও, যদৃচ্ছাকৃত খণ্ডতুচ্ছকৃত বাক্যগুলি কবিতা নয়, তত্ত্বকথা নয়, নীতি প্রচারও নয়, অথচ লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে'— (ডঃ সুশীলকুমার দে, ভূমিকা 'বাংলা প্রবাদ' পৃ. ১)। প্রত্যেক জাতির মনের মণিকোঠায় পৌঁছতে প্রবাদগুলির মূল্য অপরিসীম। এর ভাষা যেমন জোরাল, তেমনি স্পষ্ট, জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাজাত। তথাপি "It is not enough to know proverbs, one must know how to apply them to specific situation'।

গত শতকে শুধু সাহিত্যে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও ছিল প্রবাদের অবাধ ব্যবহার। লোকে কথায় কথায় ব্যবহার করত ছড়া আর প্রবাদ। শ্রীহট্ট বা সিলেট অঞ্চলে এখনও লোকে বলে— "প্রাচীন লুক ডিটান দিতায় 'ক'তায়' 'ক'তায়'। অর্থাৎ বৃদ্ধরা এখনও কথায় কথায় প্রবাদ ডিটান / দিতান < দৃষ্টান্ত বলে। (সিলেটে প্রবাদকে বলে 'ডিটান', ঢাকায় 'তানিছ', মৈমনসিং-এ 'ঠোলক তমিছিলা', দিনাজপুরে 'ঢেকিয়াকথা', রাজসাহী 'হট্টকী' এবং চাকমারা বলে 'দামর কদা'।) শ্রীহট্টের গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে বহুপ্রবাদ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে চলেছে বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে— ভাষার এই অমূল্য সম্পদ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রয়োজন।

এই আঞ্চলিক ভাষার প্রবাদ সংগ্রহ থেকে এখানে ৩০০টি প্রবাদ দেওয়া হল। কিছু সংস্কৃত বাক্য, শ্লোক বা শ্লোকাংশও আছে এর মধ্যে। তবে সে সংস্কৃত অনেক সময়ই রূপ পেয়েছে 'পিজন ইংরেজির (Pidgin English) মতো। কোথাও ভাষা সংশোধনের কোনো চেষ্টা করা হয়নি। চেষ্টা করা হয়েছে রক্ষা করতে আঞ্চলিক ভাষার অবয়বটি এবং তার অন্তর্নিহিত রসরূপটি।

প্রবাদগুলিতে নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে ওই অঞ্চলের সমাজ পরিবার বা ব্যক্তিমানসের চিত্র। পাওয়া যাবে সমাজ-জীবনের মর্মের সন্ধান। একটি স্কচ প্রবাদ যথার্থই বলে, "As the proverbs so the people": প্রবাদ পরিচয় দেয় স্থানীয় লোকচরিত্রের। সাংসারিক অভিজ্ঞতাজাত প্রবাদগুলি প্রকাশ পায়— কখনও তীক্ষ্ণ, কটু, তিক্তরূপে, কখনও শ্লেষ, কখনও তা হয়ে উঠেছে পরিহাস বিজড়িত। যেমন পল্লীসমাজে গৃহবধূর চাল-চলনের বর্ণনা :

১) 'হারাদিন তা'কে (থাকে) বেটি আনে আর বানে।
হাই-দেওর 'গব' আইলে বারাকুনি বানে।।'

অর্থাৎ বউ সারাদিন এখানে সেখানে কাটিয়ে স্বামী (> হাই) দেওর প্রভৃতি কাজ থেকে বাড়ি ফিরবার সময় হলেই ব্যস্ততা দেখায় ঢেঁকিশালে।

অথবা—

২) ‘ই গ’রর বৌ হি গ’র জা’য়,
টাপুর টুপুর গুয়াকানি কা’য় (খায়)।’

— বউ সুযোগ পেলেই অন্যের ঘরে (এঘরের বউ সে ঘরে) যেয়ে সুপারি প্রভৃতি খায়। এখানে কটাক্ষ করা হয়েছে তার চরিত্রের প্রতি। একটি সম্ভবত এটি ধাঁধা, যার উত্তর হল ‘জাঁতি’।

স্ত্রীর প্রতি আদরের বা প্রীতিরও অভাব নেই— তারও পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন:

৩) ‘মা’য়ে রান্দইন্ যেমন-তেমন, বইনে রান্দইন্ পা’নি।
পাপিষ্ঠায় (স্ত্রী-আদরে) রান্দইন্ যেন কা’ইতে লাগে চেনি।’

— এমনি সুখে দুঃখে গৃহবধূর জীবন চলে, কিন্তু দুঃসহ হয় যখন একই বাড়িতে দুই বোন দুই জা’ হয়ে আসে।

৪) ‘হিম তিতা, নিম তিতা, তিতা বাখরর ছাল।
তার তা’কি অদি’ক তিতা বইনে বইনে জা’ল (= জা)।।’

আবার শাশুড়ি-বউ-এর সম্পর্ক প্রায় সর্বত্রই অ-মধুর। তাই বউ-এর মুখে শুনতে পাই:

৫) ‘হোউল মা’চ’র লেজ কালা। কু’ন মুলুক’ হউরী বা’লা।’

— শোল মাছের লেজ যেমন সর্বত্রই কালো, শাশুড়িও তেমনি কোথাও হয়না ভালো। (কোন্ মুলুকে শাশুড়ি ভালো)!

মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েড যাই বলুন, বাস্তব সত্য, মেয়েরা সর্বত্রই এবং সর্বদাই মায়েরই অনুগত। সে গ’ড়ে ওঠে মায়েরই স্বভাবের অনুকরণে। সিলেটের প্রবাদ সেই সত্যটিকে তুলে ধরে। যেমন:

৬) গুয়া (সুপারি) নাটা (< নষ্ট) পুয়া (< পৌষ) বায়।
পুরী (< পুত্রী) নাটা কর্‌লা মায়।”

— পৌষের বাতাসে যেমন সুপারি নষ্ট হয়, মায়ের স্বভাবে তেমনি মেয়েও নষ্ট হয়। আবার—

৭) ‘বাপ বা’লা জা’র (যার) বেটা বা’লা, মা বা’লা তার ঝি।
গাই বালা তার বাচুর (বাছুর) বা’লা, দুদ (দুধ) বালা’ তার গি’ (< ঘি)।’

— গ্রাম-জগতের দৈনন্দিনতার মধ্যেই গড়ে উঠেছে এমনি অভিজ্ঞতালব্ধ প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রবাদগুলি। জীবনের হাসি-অশ্রু, আনন্দ-বেদনার শুক্তি অভিজ্ঞতার স্পর্শে পরিণত হয়েছে প্রবাদের মুক্তায়। সিলেট (শ্রীহট্ট) অঞ্চলের এমনই কয়েকটি প্রবাদ ব্যাখ্যা সহ উপরে দেখানো হল। আরো কিছু প্রবাদ পরে দেখানো হচ্ছে। প্রবাদগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।

—(চার)—

অ, আ

১. অগুরে যদি বৌ কও, বেটি কয় কাবে।

২. অনুষ্কারং বিসর্গং যুক্তে যদি সংস্কৃত ভবেৎ — তবে আমি কেন চকির তলত রই! (তুঃ অনুস্বর দিলে যদি সংস্কৃত হয়, তবে কেন রামসুন্দর মচার তলায় রয়। লঙ্ (৩/৪০)।

৩. আইত' (শব্দের শেষে উর্ধ্বকমা স্থলে 'অ' স্বরধনি উচ্চারণ করতে হবে। অন্যত্র তা মহাপ্রাণতার ভগ্নাবশেষ) চাইলে মানা দিও না। [এর সাথে একটি ছোট গল্প আছে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের আমিষ ভোজন সম্পর্কে]।

৪. আইল্‌গু' পা'রইতে পেলেগু দ'র্। (পেলে / পেলুন = মাছ ধবিবার যন্ত্রবিশেষ)।

৫. আইত জাইত' বাপীব বাপ। আম পা'ক্‌লে মউয়া (< মেসো)।

৬. আইল পানি, গেল পানি, যাইকল পানি নিগার উনি। (নিগার < নির্গলন : অবস্থা)।

৭. আইলারে বসন্তকাল, যুবা বেটির উবা (< উর্ধ্ব) ফাল।

৮. আউগাবে বা'ই (ভাই) পিছা। (বিপদে / লড়াইয়ে অন্যকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পশ্চাদপসবণ)।

৯. আউবতব্ মক্কর, গুবার্ (< ঘোড়ার) টক্কব, দরিয়ার চক্কব্। [এগুলি থেকে সাবধান থাকতে হবে] (তুঃ স্ত্রীজালে কাহাব রক্ষা— Who escapes from the net of women. ম / 757)

১০. আউয়া চা'রালর্ খু'দ খা'ওয়া। (বোকা চাড়াল নিমন্ত্রণ বাড়িতে খুদ খেয়েই উদর পূর্তি করে)।

১০(ক) আওরর (= হাওড়ে চরা মালিকহীন) গরু মামাহউবে দান, মামাহডরে ক'ন - কইল্যান্, কইন্যাল (মামাশ্বশুব)।

১১. আওরর্ (< হাওড়) মাঝ হিয়াল (< শিয়াল) রাজা। (তুঃ কচুরনে খাটাস রাজা। লঙ্ / ৩, ম / ৭।

১২. আকালে হকাল (< সকাল), পথত্' বউ (বন্ধু) দূব। (জীবন সম্পর্কে)।

১৩. আগ' আট্‌লে (হাটলে) চুর্' (চোরে) পথ পায় না।

১৪. আগ' গুরা (ঘোড়া) দর্, ত'গী (গিয়ে) গুরা চর্।

১৫. আগ বয়সে করলে বিয়া, বাইয়র কাম দেয় পু'ত' (প = f) আইয়া।

১৬. আগুনে পুড়ে না, পা'নিয়ে ভিজে না।

১৭. আচাভুয়ার (< অচ্চভুথে, প্রা < অত্যদ্ভুত = অর্থবিকারে বোকা) ছা'ও, কাইট্তত' আছিল নাড়িগু, কাটি-লাইচে নোনাইগু (শিশুর পুরুষাঙ্গ)।

১৮. আছলাম্ ধুপাব বাবন (ব্রাহ্মণ), পড়িয়া আলাম ব'ট্ (ভট / ভট্টাচার্য!)। পুত্র পাইলাম বিশারদ, পুত্রবধূ নট্ (< নট্ট / নাটক = ছলনা / ভণ্ডামি বা ভণ্ড বা নষ্ট)।

১৯. আছে রাখ, নাই আন।

২০. আজ মইলে রাত পুয়াইলে দুইদিন।

২১. আজ তিতা কাল মিটা (মিঠা)।

২২. আজাব (< হাজার) ছেদে নাও, এক্কই ছেদে চেলি, (অর্থাৎ গড়া কঠিন, ভাঙা সহজ)।

২৩. আড়ি কোনায় দিচে ডাক, পুয়াপুরী হা'মলি রাখ্ (সামলে রাখ)।

২৪. আম কা'ইও আন্দার', কথা কইও বান্দাব'।

২৫. আমাব অইছে গ'র, অকুন (এখন) তুর' গর কব।

২৬. আমার লাগি যে পা'ত্-পানিত্ নামে। তার লাগি আমি গলা পানিত্ নামি।

২৭. আমাব আত' (< হাত) উলিয়ে কা'ইচেনা।

২৮. আমারে যে বুজাইতে পাবে, আ'লব (হালেব) বলদ দিমু তারে।

২৯. আত্তি (< হাতি) খায়, আন্মান লেদে। (তু! হাতি যেমন খায় তেমনি নাদে (দে / ৮৬৯৪)

৩০. আত্তির লগে পাত্তি খেলা (আতির লগে সঙ্গ পাতি, খেলতায় গেছিলা কেনে ?)

৩১. আত্তির লগে সঙ্গপাতি খেলা।

৩২. আত্তিব পা'ও হিলে; সুবন্নর (সুবর্ণর) বরাউ ডুবে। (তুঃ হাতিব পা টলে [ল/ত, ম/৮৬], তুঃ [হাতীও হাবড়ে পড়ে। দে/৮৬৮০]

৩৩. আদা (= সমস্ত) খাইয়া নিবামিষ্য, তারে কয় আবিষ্য (হবিষ্য)।[শ্লেষার্থে]

৩৪. আধাইলকার্ (< আদাইল্হা, < অ + √ দেখ + ইল + আ) গ'র আইল পুয়া (পুত্র), নাম থইচন্ আচাভূয়া।

৩৫. 'আনুয়া'র (কল্পিত ধনী ব্যক্তির মতে মত মিলানো) পানি কাইত্। (তুঃ মূর্খ ধমকায় পণ্ডিতেরে, যদি কড়ি থাকে। ম/614) (মূল : আনুয়া, মরা নদী ; < আন্ + বওয়া √ বহ্)

৩৬. আনে পড়া বানে পড়া, পা'লাই দেওনি বাবন পাড়া।

৩৭. আন্দার রাতর গু' তিন থান'অয় (< হয়)।

৩৮. আপনা তাকি বেগ্না (পর, বেগানা) বা'লা। পেক্ (পাঁক) তাকি পানি বা'লা॥

৩৯. আম কাইও, জাম কাইও (< খাইও) কাটল্ কাইও না।
কাটল কাইলে পেট পু'লব (ফুলবে), বৈদ্য পাইবা না॥
(নারীর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা সম্পর্কে সাবধানবাণী)

৪০. আম কাইট্লে তুণ্ডা। কাটল্ কাইট্লে গুণ্ডা। (আম-কাঠালের গাছ সম্পর্কে)

৪১. আমানু (অমানুষ) মানু (মানুষ) অইতরা (হচ্ছে) / তেলাচুরা (তেলাপোকা) অইতরা পাখ্খি ;

৪২. আর' (এখনও) অরাই (< আরা = রামধনু। এখানে সন্তান) পে'ট।
খারু গরাই দে জেঠ (জ্যাঠা)। (তুঃ রাম না হতে রামায়ণ, দে / ৭৬৩৯॥ রাম না হতে রামের মা। দে / ৭৬৪০॥

৪৩. আলানি কা'য (< খায়), খের' হোয় (< শোয়), মান-লাগি তিন করা থয় (সঞ্চয় করে)॥

৪৪. আল (হাল) নাই বেটায় ভুজুড়ে।
দাত নাই বেটায় হুকাইন (শুটকী মাছ) পুড়ে॥

৪৫. আলর (হালের) মিট্টা (< মিঠা) দামা (বলদ / দামড়া)।
কুটুমর মিট্টা মামা॥

৪৬. আল্লার নাম' দিত নাই।
পে'ইদা (< পিয়াদা) আইলে মা'র হাই (< স্বামী অর্থাৎ বাবা)।

৪৭. আসে (< হাসে) উনা, পা'রয় (পায়রায়) দুনা।
চা'গলে পিন্দায় কান' হুনা (< সোনা)॥

৪৮. আহেও না, আইলে চা'রেও না।

৪৯. আয়না রে আয়না হতীন যেন অয়না (তুঃ সতীনের বাটিতে বিষ্ঠা গুলিয়া খায়। ম / ৪১ নঙ্ / ৩-১৪১॥ ঋগ্বেদ— ১০/১৪৫/৬॥ পৃ. ১/১৪ হরফ-সংস্করণ)॥

ই, ঈ

৫০. ই গরর বৌ হি গর' জায় (< যায়)।
টাপুর টুপর গুয়াকানি কায় (খায়)॥ [বউ-এর চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ]
পাঠান্তর— 'অবিপরিজায়' (প্রতিবেশীর ঘরে যায়)।

উ, ঊ

৫১. উচা গর' তুফান লাগে।

৫২. উচা জেগা চাইয়া (দেখিয়া) বইবায়। কুকিল হুরে ক'তা কইবায়॥

৫৩. উচিত্ কতায় বাবন বেজাব। তিক্ত (তপ্ত) বাত' বিলাই বেজার॥

৫৪. উন্দা (নিবীহ/নির্জীব) গরু গু কা'ইবার জম (< যম)।

৫৫. উস্তাদের মাইর হেস্ (< শেষ) রাইত'।

৫৬. উন্দর (নিরীহ) চাকর বাত্তিঅ লই (বেঁটে হলেও নিই)॥

৫৭. উলার (হুলা) গুমা (বীরত্ব) নাইলা খ্যাত' (পাট-ক্ষেতে)॥

৫৮. উলার গুমগুমি নাইলা খ্যাত'।

৫৯. উলা আর পুলা মুস্ (গোঁফ) উটিতেই গেলা।

এ

৬০. এক চুক্ কানা জা'র। বুদ্ধি অয় অপাব তার॥

৬১. এক পইছ্বাব ত্যাল, কেম্‌নে কেম্‌নে গেল?
মিয়ার দাড়ি, বিবির পা'উ তাতই পু'রাইল॥ (তুঃ এক পয়সার তেল কিসে খরচ হল। তোর দাড়ি, মোর পায়, আরো দিলাম ছেলের গায়ে। ছেলেমেয়ের বিয়ে হল সারা রাত গান হল। কোন্ আবাগী ঘরে এল বাকীটুকু ঢেলে নিল।)

৬২. এত্তই যদি আছ্‌লা তুর মন', হাগার বান্দ্‌লায় কেন'! (তুঃ ম/667)

৬৩. এমন জাগাৎ বইমু, কেউ না কইব উট্।
এমন কতা' কইমু, কেউ না কইব দ্যুৎ॥

ক, খ

৬৪. কইলে মা'য়ে মাইর খায়। না কইলে বাপ' কুত্তা খা'য়॥ (তুঃ বলি তো মায়ে মার খায়, না বলি তো বাপ কুকুরের মাংস খায়॥ ম / 106)

৬৫. কটোয়ালর্ বেটা আয় জায়। কুকুর মইল কানর দায়।
হুক (< শুক) মইল মুঙ্ক'র দুষ' (দোষে), সারি মইল হেই তরাস'।
আমি টকি (< ঠকি?) বকি না, কুন 'আপদ' পায় না। (বোবার শত্রু নাই)।

৬৬. ক'লা অইল গলার তল। বাকল' গেইল উগার তল।

৬৭. ক’ম পানির মাচ’ বেশি পা’নিত আবুডুবু কা’য়। (তুঃ কুয়োব বেঙ সাঁতারে পড়িযাছে। (ম / 495)

৬৮. কা’জ নাই বেটার বিয়া। হকল কুটুম ডাইক্ত গিয়া॥

৬৯. কাউয়ার ঠুট’ (কাকের ঠোঁটে) পাক্না আম। লইয়া ফি’বে গা’ম গা’ম (গ্রাম গ্রাম)

৭০. কাউয়ার বাদাত্ (কাকের বাসায়) কুলিব ছা’ও। জাত আন্মান্ কারে রাও॥
(তুঃ কাকের বাসায় কোকিলের ছা। জাতি স্বভাবে কাড়ে রা। ম / 145, ম / 451)॥

৭১. কাজ’ কাজি। লুম্বা দাড়িএ কাজি নায় (না-হয়)॥

৭২. কানাপুয়ার নাম পদ্মলুচন।

৭৩. কা’না গরু তাকি হুন আখাইল্ (গোশালা) বা’লা।

৭৪. কা’না টেরা, বাটি, আরামজাদার লাটি।

৭৫. কান্দে পুত’ দুদ (দুধ) পায়, চরে পাখ্খি মরে না।

৭৬. কাপড় দুইচে, নীলা দিচে, না গেলি কি মাইন্‌ব মাই! (স্ত্রীর বাপেব বাড়ি যাবার জন্য সুপারিশ)

৭৭. কা’র আখাইল কেডা দেয় দু’য়া।

৭৮. কা’লি কলম্ পাত্ তেগী লিখার জাত্।

৭৯. কিবা বাগর আগুইন, তার মাজ’ কাটল বীচি! (রূপ সম্পর্কে)।

৮০. কি’বা বাগ’র চ’ইতালি (মূল অর্থ দোলের অশ্লীল / গ্রাম্য গীত; চৈত্র > চেত + আল্ + ই) তাউ আবাব ‘গয়াস নগব’ (গ্রামবিশেষের নাম)।

৮১. কিলাই কাটল্ পাকাইত’ পার্‌তা নায়। (গায়ের জোরে সব কাজ হয় না)।

৮২. কে কারে জিগার করে, আতত্ টেকা অইলে।

৮৩. কেচু কু’রতে উঠে হা’ব।

৮৪. কা’ইলে (খাইলে) কা’ও, নাইলে বাবন বাড়ি দিলাও।

৮৫. খালে খাইবায়, নাইলে দেবতাবে দিবায়।

৮৬. খা’ড়াক্ খা’ড়া গা’ড়ির পর, গুরা (ঘোড়া) ছুটে তর্‌তর্।

৮৭. খানির আগ’ লরাইর পা’ছ।

৮৮. খানেঅলা আইলে খামু গুমানেঅলা আইলে গুমাইমু!

৮৯. খায়-উ, টগ্‌বগাইয়া চায়-উ! (তুঃ খায় আর জুলজুলেতে চায়। ম / 675)

৯০. খেয়া পার অইয়া, খেয়ানীকার হালা। (তুঃ কাজ সারিলে বাড়ই সালা। ম/139)

গ, ঘ

৯১. গাউ-এ মানে না আপ্‌নে মুরল্।

৯২. গাঙ্ পা'র অইয়া খেয়ানী হালা। (তুঃ উত্তীর্নেচ গতে পাবে নৌকায়াং কিং প্রয়োজনম্। M / 820)

৯৩. গি' কা'ইয়া বাবুন কানা।

৯৪. গু'পেলাইবার বা'গ (ভাগ্য / শক্তি) নায়, পিটাইবাব আন্দি। (তুঃ ভাত দেবাব ভাতাব নয, কিল মারিবার গোঁসাই। ম / 5)

৯৫. গুতাইয়া কাটল্ পাকানি।

৯৬. গুমটার তল্অ খেম্‌টা নাচ্।

৯৭. গুয়া খাউরা কথা।

৯৮. গুয়া নাটা পুয়া বায়, পুরী নাটা করলা মায়।

৯৯. গু'ষর (< ঘোষের) দই, হে চুকা ক'য়নি! (তুঃ আপন ঘোল কেহই টক বলে না। লণ্ড/১/১০৯)

চ, ছ

১০০. চা'গলর আট আংলা নেজ, গা'সও কা'য় মাচিঅ তাড়ায়। (ইচ্ছা থাকলে কাজ হয়।)

১০১. চা'ননি কইরা, মুক' পান দিয়া, অন্নপূর্ণা মন্দিব' জাও গিয়া। (বৌমাকে রান্নাঘবে যেতে উপদেশ)

১০২. চা'ম চিকন্ কুমরর বাকল, নেকি জুকি মার টক্কব।

১০৩. চাপঘাটি গুয়া, পাট ঘাটি পুয়া।

১০৪. চা'মর মুরা, বলদের খাইত। মাইর্‌লে তাকে (থাকে) আরাই রাইত্॥

১০৫. চিত্ হুকে গীত গায়, তিরি হুকে হুরী বারিজায়। (চিতের সুখে গান গায়, স্ত্রী-সুখে শাশুড়ীর বাড়ি যায়) ?

১০৬. চুট' চুট' বাবন ঠাউর নাক টিপার জম্। (ব্রাহ্মণ / পুরুত ঠাকুবের ছোটবা ভড়ং-এ ওস্তাদ)

১০৭. চু'ট বেলা মাইলাম্ না মাইরর ডর'।
বড় অইলে মাইলাম না মাইরর ডর'। (ছোটবেলা ছেলে শাসন করি নাই আদরে / মবার ভয়ে। বড় হলে মারি না নিজে মাব খাবার ভয়ে। অর্থাৎ যথাকালে শাসন উচিত)

১০৮. চু’পায় আর খুপায় মিল না পায়।

১০৯. চু’র গেল চুরর প’ত্ (পথ), আচুরা মইলা বেরা চুট’।

১১০. চুরর মন খিরা খেত’। (তুঃ অন্যের মন অন্য দিকে, চোরের মন বোচকার দিকে। ল / ৩-৫৪)

১১১. চু’র চু’র আলি (চোরে চোবে বন্ধুত্ব), এক চু’র বিয়া কবে আরেক চুরেব হালি (শালি) (তুঃ দে / ৩১৩৩। উচ্চারণেব পার্থক্য বাদ দিলে একই প্রবাদ)।

১১২. চে’ৎ চোৎ (ছ্যাৎ-ছোৎ)-তের, লেকি (লেখি) বাইক্‌লাম্ ‘বের’ (বেড়াতে)। কা’ইত’ পাইলাম এক বাকী কই বা’র ?

জ, ঝ

১১৩. জা’ত্ আকল বান্ড (< ভান্ড), খুয়াছ’ত কাণ্ড ? (জাত অনুসাবে আক্কেল, পাত্র অনুসারে স্বভাব)।

১১৪. জা’ত’ মুরগী ‘কর্‌কনাৎ’ (এক জাতের ছোট কালো মুরগী) বইদা (ডিম) পাবে আবাই আত্। (তুঃ বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। ম / 150)

১১৫. জা’র লাগি গেলাম গা’ট (ঘাটে), হেউ ছারে না, আমউ আইতা পারি না।

১১৬. জা’র লাগি করি চুরি, হেই কয় চুর !

১১৭. জা’র গরু প’রে উর’ (কাদায়), হে দ’রে লেজ-মুর’।

১১৮. জা’র হাগদা নাক মু’ক, হে নায় সালামের জুক ! (যার থেকে এ দেহ, সেই আজ সম্মানের যোগ্য নয় ? অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি অসম্মান ?)

১১৯. জা’বে পারিনা আতে (হাতে), তারে মারি বাত’ (ভাতে)।

১২০. জে’গা চাইয়া বয়না, তিন ঠাই নরে না।

১২১. জে’ নারী চালাক অয়, আগে জি (ঝি) বিয়াইয়া থয়।

১২২. জে’মন আমার আমাই (নাতনী), তেমনি নাতিন জামাই।

১২৩. জে’মনি দেবা, তেমনি দেবী।

১২৪. জে’ বারি কা’ইচি কান’, আর না জাইমু পরর দা’ন’ (ধান)। (ঠেকে শেখা)।

১২৫. জে’জা’ করবায় বান্দা, আপনার লইগা করিও দন্দা (ধন্দা)

১২৬. জো’য়ান কাল’ কসবী (কসাই), বুরা অইয়া তস্‌বী (মালাজপ) (তুঃ বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী। ম / 834)

১২৭. ঝা'কর কই ঝাক' (ঝাকের কই ঝাকে)।

১২৮. ঝি নাটা করলা মায়, পুয়া নাটা আরিবারি জায় (তুঃ গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট। ম / 541, ঝি নষ্ট ঠাটে-পাটে, বউ নষ্ট হাটে-ঘাটে। (দ / ৮৯১৭)

ট, ঠ

১২৯. টাটা (বাজ / বজ্র) পরি বগা মবে। ফ'কিরর কেরামতি যাবে (< বাড়ে)।

১৩০. টাটা পড়ি কানা বগ মবচে। ফ'কিব কয় কেরামত্ বারচে॥

১৩১. টেকা (টাকা) অইলে, বাগ'র দুদ মিলে। (তুঃ কড়ি হইলে বাঘেব চক্ষু মিলে। ম / 746)

১৩২. টেকা অইলে হকল কাম। টেকার নাম জয়রাম॥ (তুঃ অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণ- বৎমন্যাতে জগৎ)।

১৩৩. টেকা থাইক্‌লে বিয়া করে। কে কার জিগার (জিজ্ঞাসা) করে!

১৩৪. টেকা দেইখ্‌লে পাত্তরেও (পাথরেও) আ' (হা) করে!

১৩৫. টেকার নাম জয়রাম। টেকা থাইক্‌লে সব কাম।

১৩৬. টেকাৎ (ঠেকায়) পরলে, গাদার'ও বাপ ডাকে। (গাদা/ < গাধা)

১৩৭. টেলার নাম বাবাজী।

১৩৮. টেলা-টেলি (ঠেলা-ঠেলি) গর। দু'দে (দুধে) না বান্দে হর (সর)।

১৩৯. ঠগব গর' নিমন্তন্, আচাইলে বিশ্বাস।

১৪০. ঠক দুলালী, মুকপোড়া রেঙ্গা, কৌডিয়ার কাজ' নয়শো ঠেঙ্গা।

ড, ঢ

১৪১. ডরাইলে ডর। না ডরাইলে কিয়র ডর!

১৪২. ডেকা (যুবক) গরুয়ে বাগ চিনে না। (জোয়ান গরু বাঘকে ভয় করে না।)

১৪৩. ডেকা গরু বাগ চিন্‌ত না। (জোয়ান গরু বাঘকে গ্রাহ্য কবে না।)

১৪৪. ডাইক্‌মু হালা, আইব হালি। মাইর্‌মু থাপ্পর নে তুর কাপরা তুলি॥

১৪৫. ডুব দিয়া পানি খাই, হারা দিন রোজা রই। (তুঃ ডুব দিয়া জল খেলে একাদশীর বাপে জানে না। ম / 429)।

ত, থ

১৪৬. তাইর নথ নাড়াটাও বা'লা (স্ত্রীর প্রতি আদরে)।

১৪৭. তাই তুই পাদুরীর কাল আছিল বা'লা।
বোম্বা পাদুরীর কাল' (কালে) বসাত চা'ডাই লা॥

১৪৮. তাক্ কুত্তা বারমাস। বাত (ভাত) কাইবা (খাইবা) অগান মাস।

১৪৯. তাক্‌তে কাচি আবাইলে দাও (দা)।

১৫০. তাকি (থাকি) জার বারি (বাড়ি) মইল তার মা।
কান্দিলে টাই (ঠাঁই) পাই, না কান্দিলে না। (পরাশ্রয়ীকে পরের মনজুগিয়ে চলতে হয়।)

১৫১. তাস দাবা পাশা এ তিন'ই আকামর বাসা।' (তুঃ ঋক সংহিতা, ১০ / ৩৪ / ৫

১৫২. তিন আনার বন'কাম। বার আনার আপিঙ্॥

১৫৩. তুব্ পাটা ন্যাজ' কাট, নায় (না হয়) মুরিয়ে (মুরি / মুণ্ড) কাট, তাত্ আমার কি ?

১৫৪. তেল' জল' বাচ্চা বারে'। নাইলে বাচ্চা কিতা' ক'রে।

১৫৫. তেলির বুদ্দি হোল' (ষোল) চুঙ্গা, নাইয়র বুদ্ধি হরু (সরু) ডিঙ্গা।॥

দ, ধ

১৫৬. দ'লা (ধলা < ধবল) পুযার কালা বউ। কালা পুয়ার ধলা বউ।

১৫৭ দরিয়া তা'কি অনু (হনু) জ'ন (যখন) লংকার আইয়া পইল।
মন্দোদরী উইট্যা কয, ইতা কিতা অইল ? (কাজের সময় সজাগ না থাকলেই বিপদ ঘটে)

১৫৮. দরে (ধরে) ও আগিডাল। পরে ত' আছিয়াল॥

১৫৯. দাত আঁরাইলে দাতর কদর বুজি। (তুঃ ল্যাজ থাকলে গরু ল্যাজের মূল্য বোঝে না। লঙ্ / ৬৯। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম জানে না।)

১৬০. দাঁত নাই বেটার হুকাইন পুরা খায়।(শুটকী মাছ পোড়া খায)
আল (হাল) নাই বেটার 'বুই (ভুই / ভূমি) জুইবা থয়॥

১৬১. দিনে নেকে (লেখে) বাইত' পরে।
তার বিদ্দা (বিদ্যা) গা'দায় মারে॥

১৬২. দিনের মন্দ, রাইতকু আগার (হাগার)

১৬৩. দুষ্ট লুক’র মিষ্ট কতা, দীঘল ঘুমটা নারী।
পানার তলর হিতল পানি, তিনই মন্দকারী॥

১৬৪. দেকে হুনে কয়না, কুন’ আপদ পায় না। (তুঃ বোবার শত্রু নাই)

১৬৫. দুন্দ (ধাঁধা) দেইখ্‌ছ, পান্দ্ (ফান্দ) দেইক্‌ছনা।

ন

১৬৬. নদীত্ তরঙ্গ বা’রী (ভারি), ছিরি গুরু কাণ্ডারী। (বিপদেই শ্রী গুরু স্মরণ।)

১৬৭. নাই কপাল’ দিব’ কুনে। আছ’ কপাল’ নিব কুনে॥

১৬৮. নাইচ্‌ত’ না জান্‌লে উঁটান তেরা।

১৬৯. নাই মামুর তন্ কানা মামু ’বালা।

১৭০. নাক ছিটকানির বায়, লিখরার ডাইন’।
কুড়ালর পিছ্ আর গুয়া খাউরার সাম্‌ন— না জাইবায়॥

১৭১. নাপিতর্ আবু, কামারের দেবু, হুনারর (সোনারী) পরহু, বিশ্বাসং নৈবচ।

১৭২. নি-ভাগিয়ার টমক্ বেশি। কুরূপীয়ার হাজন (সাজন) বেশি। (তুঃ সাজলো রে বিনোদিনী, যেমন পেত্না তেমনি পেত্নী। দে / ৮২৫৮)

১৭৩. নি নাইয়ার হতেক (শতেক) নাউ (নাও / নৌকা)।

প, ফ

১৭৪. পরর মুর’ আরি (পরের মাথায় হাড়ি)। ইটা ইটা দুই লারি॥
(তুঃ পরের জিনিষ পায় / হেগো পোঁদে খায়। দে-৪৮৯৭)

১৭৫. পরর মুর’ নাগেশ্বরর ছিয়া (উদুঁখল/দণ্ড) (তুঃ পরের ঘরে খায়, আঠার মাসে বছর যায়। দে-৪৮৮৪, পরের ঘরে মঙ্গলবার। দে-৪৮৮৫)

১৭৬. মার বারি (বাড়ি) ফুটি জাউক গিয়া॥ (পরকে মেরে আপন কার্যসিদ্ধি)

১৭৭. পরর মন্দ, আপন ইত্ (হিত), না করিঅ কদাচিৎ।

১৭৮. পরর পুত’ নাও বায়। তেল তেলাইয়া আয় জায়। (তুঃ পরের ছেলে নৌকা বায়, গাছের আগা দিয়া যায়। দে-৪৮৯৮)

১৭৯. প’রর পুত’ পুত্‌পতি। যশোদা বর বাইগ্‌গমন্তি। (তুঃ না বিইয়ে কানাইয়ের মা। দে-৪৬০৬)

১৮০. পরর পুত নাও বায়— হাদা হাদা (খুব মজা) করে।
নিজর পুত’ নাও বায় কলিজাত্ দরে (< ধরে) (ব্যথা লাগে)

১৮১. পরর লাগি খুড়ে খাই (গর্ত খোড়ে)। পরি মরে আপ্‌না গাই॥ (তুঃ পরের জন্য গর্ত খোড়ে, আপনি তাতে পড়ে মরে। দে / ৪৮৯৫

১৮২. পারার আগ রান্দে বেটি হাইর আগ' কায় (খায়)।
তার গর' লক্‌কী না জায়।

১৮৩. পানিত্‌ ছেদ দিলে আটুত্‌ (হাটুতেই লাগে) আইয়া পরে।

১৮৪. পা'নির মাজ' পাউ দিলে বুর বুরাইয়া উটে। (খারাপ কাজ গোপন থাকে না।

১৮৫. পু'রীর হাই, মাউগ'র বাই। এর বারা কুটুম নাই॥

১৮৬. পেট' দিলে নষ্ট, বাবনে দিলে তুষ্ট।

১৮৭. ফ'কির মইলা ম্যালে', থাটাস মইলা ত্যালে।

১৮৮. ফি'কির মা'র জু'লি, পাইতা তায় টিলা টুলি॥

১৮৯. ফি'উনিয়া মানুইস্‌ আট' (হাটে) গেইছ্‌লা। মাইনস্‌ (মানুষ) দেইক্‌কা ফিরি আইছ্‌লা॥

ব, ভ

১৯০. ব'টর্‌ নাউ আগ গেলেউ জিৎ, পর' গেলেউ জিৎ। (ভট্‌ = ব্রাহ্মণ)

১৯১. বা'উরে (ভাসুরে) মায়া কইলা। খুয়ারদিন' (কুয়াশার দিনে) আগ' দিলা॥

১৯২. বা'গ্‌ নাই কপালে, মেকুর আগে (হাগে) পাখালে॥

১৯৩. বা'গ্‌ (ভাগ্য) নাই বেটির বর্‌ বর্‌ মাত্‌।

১৯৪. বাগ্‌ নাই বাগ', বাপ কাটেইন্‌নি হাগ' (আকাশে)!

১৯৫. বা'গ' (বাঘে) খাটরা, পেচয় তাবা খাউয়া॥ (তুঃ মায়ে খেদানো, বাপে তাড়ানো)

১৯৬. বাত্‌ দিবার বাগ (ভাগ্য / ক্ষমতা) নাই: কিলাইবার ঢাউর। (তুঃ ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারিবার গোসাঁই। ম / 5)

১৯৭. 'বা'ত' তিতা, দাত' নুন, কা'ন' ক'চু চু'ক' তেল।
তার গর' না বইদ্দ গেল॥

১৯৮. বা'ন' বুই হজ—

১৯৯. বান্দীর পে'ট জনম জা'র। কিতা দেব ধরম তার।

২০০. বা'প'র বারির দালান, আর হাই'র গরর ছাইচ খান॥ (হাই < স্বামী)

২০১. বাপ'র না গুতে, চুঙ্গা করি মুতে॥

২০২. বাপ বা'লা জা'র, বেটা বা'লা। মা বা'লা তার জি'(< ঝি)।
গাই বা'লা তার বাচুর বা'লা। দুদ্ বা'লা তার গি (< ঘি)। (তুঃ ন বীজাৎ জায়তে কিঞ্চিৎ। মহাভারত। As you sow, so you reap.)

২০৩. বাপ রুইয়ে পুতে চায়। নাতিয়ে খায় বা না খায়। (তালগাছ— দীর্ঘ দিনে ফল ধরে)

২০৪. বা'টর কাল' (ভাগের সময়) তিন পুরুইস্। কামর্ বেলি নায়।

২০৫. বা'টর (পথের) কিল বেটাউ (ছেলেও) কিলায়। কিসমতের খানি দুস্মনেও খিলায়।

২০৬. বাট্টি হারাম্জাদার লাট্টি।

২০৭. বাবনে কয়, আল্নি খা'ইল। পা'টায় কয় পরান গেইল। (তুঃ মর্টন ছাগল বলে প্রাণে মরিলাম, গৃহস্থ বলে, আলুনি খেলাম [40]। বা কাহাবো সর্বনাশ, কাহারো ভাদ্র মাস [39]

২০৮. বাবনের পে'ট টিকি পা'ব।

২০৯. বাবনর তিন কই। (এর সাথে একটি epigram বা ছোট কবিতা রয়েছে)

২১০. বার বাবন' তের ডেরা।

২১১. বাবন' হুইনলা হরাদর কতা। ছিরাই নিলা আলাদর (বিষধর সাপ) মাতা। (তুঃ শুনলা বামন চিড়ার নাম, থুইলা বামনা হাতের কাম। দে / ৯০০৮)

২১২. বা'লা ত' বালা, জগন্নাতর হালা।

২১৩. বারির জুব' কুত্তা খুজে।

২১৪. বি'ক্কার চাউল তর্পন' নাশ।

২১৫. বিল'নি মাচ্ নাই। হাইর কপালে বাগ নাই। (অলস স্বামীর প্রতি শ্লেষ)। (তুঃ মিন্মিনে প্রদীপ, পিটপিটে ভাতার দেখিতে পারি না : ম / 187)

২১৬. বিলাইর বাগ' চিকাও ছিড়ে।

২১৭. বে-আক্কলর আসি (< হাসি) তিনবার।

২১৮. বেটি আর মাটি, জন্জালর গাটি (< ঘাঁটি) (তুঃ মল নারী হল ছাই তবে জেন কলঙ্ক নাই। ম / 527)

২১৯. বেটি আর মাটি কন্দলীর (কোন্দল) গ'টি (ঘটি)।

২২০. বেটিগু চান্দ জেমন, বেটিগু মরা।

২২১. বেত'বান্দ্ পুয়ে না (স্বল্প আয়ে অভাব মেটে না।)(তুঃ ডাইনে আনিতে আনিতে বায়ে নাই। ম / 310)

২২২. বেতমিজের আরি (< হাঁড়ি)

২২৩. বেশি মা'তে মানু পাত্লা। গণ ম্যাগ' (বৃষ্টি) জালা (অঙ্কুরিত বীজ) পাতলা॥ (তুঃ সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর। (ভারতচন্দ্র) দে / ৮৪৪০)

২২৪. বেড়া-উ দা'ন কায় (ধান খায়), গরর-উ কান্ আচে। (তুঃ দেওয়ালেও কান আছে। দে / ৮৯৮০)

২২৫. বৌ গো বৌ, কামকর আইয়া। পাইরতাম্ না ঠইরন, টেঙগ' বর দিয়া (পায়ে ভর দিয়া) বৌ গো বৌ, খা'নি খাও আইয়া। আইআর (আসছি) ঠাইকরুন টেঙ্গ বর দিয়া।

ম

২২৬. মরদর (পুরুষ / স্বামী) মুব্বৎ (মুহব্বৎ) পাইতলা (< পাতিল, মাটির হাঁড়ি / হান্ডি) জানি (< কে) বাঙ্লে তারে জুরন্ জায়নি! (ভাঙলে তাকে কি জোড়া যায়?) তুঃ ছিন্ন স্নেহরসা ভবাম্ভিপুরুষ দুঃখানুবর্ত্যা পুনঃ। (অমরু শতক)॥ "সোনা ভাঙিলে আছে উপাত্র জুড়িয়ে আগুন তাপে। পুরুষ নেহা ভাঙিলে, জুড়িয়ে কাহার রূপে।' (শ্রীকৃঃ রাধাবিরহ)। আরও ম / ১২

২২৭. মা'য় বানায় বুত (ভূত)। বাপ / উস্তাদ বানায় পুত।

২২৮. মা বিবনে বা'প তালুই। (তুঃ মরা ভাতার তালুই জ্ঞান। লঙ-৩ / ম-৫০)

২২৯. মা তাড়াইন্, বাপ খেদাইন।

২৩০. মা বা'লা জার জি' বা'লা। বাপ্'বালা জার পুত বা'লা।

২৩১. মার কাচ' মামুর গ'রর (মামাবাড়ির) গাপ, না মারিউ বাপ'॥

২৩২. মায় রান্দইন্ যেমন তেমন, ভইনে রন্দেইন্ পানি। পাপিষ্টায় (স্ত্রী আদবে) রান্দইন খাইত' লাগে চেনি। (তুঃ সুয়া যদি নিম দেয়, সেই হয় চিনি। দুয়া যদি চিনি দেন, নিম হন তিনি। (দ / ৮৪১৫)

২৩৩. মা মরইন জি' জি কইরা (মেয়ের জন্য)। জি মরইন্ তার কানা হাইর লাইগা।

২৩৪. মানইষর মাজ' বাট্টি। কলার মাজ আট্টি। বাশব মাজ' কানাইত্। পুরুষর মাজ' হেনাপইত। (< সেনাপতি / বীর)

২৩৫. মামুর হালা, পিহার বাই; তার লগে সম্মুন্দ নাই।

২৩৬. মাকর মাইলে ধোকর অয়। (একটি ক্ষুদ্র কবিতার একছত্র) (তুঃ ম / 555) এবং 873 এরপব ৮ ছত্রের epigram)

২৩৭. মাতাইলে মাত্তাম (ঘুষখোর অফিসবাবুর বাচন)

২৩৮. মাতেনা (কথা বলে না) কইন্যায় ধতে (সচেতন)। গয়না পিন্দেনা বিনা ন'তে॥

২৩৯. মাইন্সে চিনে মাইনস্, উলসে (ছারপোকা) চিনে কাতা (কাঁথা)

২৪০. মাটিত্ থইলে খায়নি পিপড়ায়। মাতাথ থইলে খায়নি উকাউনে অথবা পুইয়াল। (আদুরে সন্তান সম্পর্কে) (পুইয়াল)

২৪১. মিয়ায় কইচন্ পুণ্ডির বাই। আনুন্দের আর পা'র নাই।

২৪২. মুক'চন্দ্রিমার কা'ল আগার (< হাগার) তলপ! (তুঃ দে / ৮৫৯৫)

২৪৩. মুখ কু'লি (খুলিয়া) কু'চ (কোচার) থুইচ! মুক তামিয়াও বুবা / গুঙ্গা, কান তাকিয়াও কালা।

২৪৪. মুল্লা খুজে ঈদর পরব। (তুঃ চোরা চায় ঈদ পরব। দে / ০১২৪। অবশ্য উদ্দেশ্য ভিন্নতর)

২৪৫. মুর আল্লা ধান্ধাখুব। আদম্রে আন্ধাকইরা বিলাইর চখুত্নূর। (আমার আল্লা খুব ফাঁকিবাজ। মানুষকে রাতে অন্ধ বানিয়ে বিড়ালের চোখে জ্যোতি দেন।)

২৪৬. মুরশিদ বলইন্ এশ্ক্ বিনে লাভ নাই। (গুরু বলেন প্রেম বিনা মুক্তি / লাভ নাই)।

২৪৭. মুরদ নাই বেটাব বর বর মাত্।

২৪৮. মুরে জে' বুজাইল— এমতে আর হেমতে। পাইতল / (পাতিল / হাড়ি) ভাঙ্গি ভাসিয়া মাচ পালাইচে, ছরু রইলা কেম্তে!

২৪৯. মুল্লার দউর মজিদ্ তক্।

২৫০. মুক' একখান বুক' আর খান।

২৫১. মুকখানি মিঠা জার, গ'র খানি নাটা তার॥

২৫২. মোটাসোটা আহাম্মকউ বা'লা।

২৫৩. মুর (< মোর) আছে। তুর (< তোর) আছে, আয় উর উর (= কাছাকাছি)। মুর নাই তুর নাই যা দূর দূর। (তুঃ হাসুইয়া কুটুম আছে কান্দইয়া কুটুম নাই)।

র

২৫৪. রইদ বেটা রাজা, মানইস্ করে তাজা।
আগুন বেটা কুইরা, মানইস রাকে' ধইরা॥
(শীতের রৌদ্র মানুষকে তাজা বা জড়তাহীন করে। শীতের দিনে আগুনের কাছে বসলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না।)

২৫৫. রারি (< রাড়ি = বিধবা) বেটির আটার' হাই (< স্বামী)। অর্থাৎ অনাথ বিধবাকে বহুজনের মন জুগিয়ে চলতে হয়॥

২৫৬. রূপ নাই জা'র (< যাহার), হাজন (< সাজন) বেশি তার।

২৫৭. রোহিত, মুদ্গর, ইলিসা, খলিসা, ঘাঘটশ্চৈব (ঘাঘট— একপ্রকার মাছ) পঞ্চ মৎস নিরামিষ্যা (নিরামিষাসী ভোজনবিলাসী লোভী ব্রাহ্মণের বিধানদান)।

ল

২৫৮. লাটির তন্ কঞ্চি দর। (তুঃ লাঠির থেকে কঞ্চি দড় / শক্ত)

২৫৯. লাফা নাই বাণিজ্জ্বৎ কচ্কচি হা'র (< সার)।

শ, ষ, স, হ

২৬০. শাইস্থা করতে চাও, অখুশী বৌ গছাও।

২৬১. সবাব পুতে (বা পরেব পুতে) পুত পতি, যশাদা বর (< বড়) বাইগ্যমতি (< ভাগ্যমতী)।

২৬২. সারলগব (সুসময়ের) বান্দ্ বা'লা। এক পা'দে মু'-কালা।

২৬৩. সুনা মাইর মুক'কা'নি মিটা। সারাদিন' (-অ) কা'ওইলা হুদা (শুধু) এক'কা'নি পিটা (< পিঠা)

২৬৪. সুম-শনি বাচি'। কাপড় পিন্দি নাচি।

২৬৫. হকালব মুটি (সকালে সামান্য খাবার), হাবাদিনব খাটি॥

২৬৬. হুউল মাচ'ব (শোল-মাছেব) লেজ কা'লা। কুন মুলুক' হউরী বালা?

২৬৭. হকল পা'ক্‌লে মিঠা। মানইস্ পাকৃলে তিতা। (বৃদ্ধরা সংসাবের বোঝা)। (তুঃ ভূমিব বালাই হুড়ো। গৃহস্থেব বালাই বুড়ো॥ ম / 511)

২৬৮. হকল মাচ' গু' খায়। লারিয়ার উপর বাউল যায়॥

২৬৯. হরকারে / সরকাবে খাউ। মাজিদে ঘুমাও। (তুঃ শয়নং যত্র যত্র, ভোজনং হট্টমন্দিরে॥

২৭০. হাড়িলা (চাষী) যত লরে। কড়ি তত পরে। (চাষীর পরিশ্রমেই ধনাগম ঘটে)।

২৭১. হাউরর্ মাজ' হাকালুকি (একটি নাম), আব সব কুযা।
বেটা অইল মামুদ মন্সূব আব সব পুয়া॥

২৭২. হউরর্ গরু বাবনকে (ব্রাহ্মণকে) দান, বাবন বলে কইল্যান কইল্যান॥

২৭৩. হাই (< স্বামী) মবছিল হন্জা'বেলা (সন্ধ্যা), উটই'ন্ কান্দি পুয়া বেলা (স্বামী সন্ধ্যায় মরেছিল স্ত্রী সারাবাত ঘুমিয়ে সকালে কাঁদতে শুরু করল) (তুঃ সাঁজের বেলা ভাতার ম'ল, হাঁদব চৌপহর। দে / ৮২৫৮)

২৭৪. 'হাগর' (< সাগর ?) ত্যারা, লাইরর্ (নিতম্ব / hip) ফুট॥

২৭৫. হাতার-পাতার (< পাথার) লাগাইচে'।

২৭৬. হাজ্‌তে হাজ্‌তে ফেচ্‌কুন্দা (ফিঙ্গে পাখি) রাজা। (তুঃ সাজতে গুজতে ফিঙ্গে রাজা (দে / ৮২৫৭)

২৭৭. হাজম্-পুয়া (সদ্য জন্মানো ছেলে) বাপ ডাকে না।

২৭৮. হাজী আর পাজী, একই্ কাজের কাজী॥ (তুঃ যত হাজী তত পাজী। দে / ৭০২০)

২৭৯. হাটর চাউল, গা'টর (ঘাটের) পানি। না কা'ইলে পে'ত্তয় (প্রত্যয় / বিশ্বাস) না মানি॥

২৮০. হাতর বারাত (নিকট) দন (ধন) তুইয়া রাজ্যি অয়রান (হযরান)।

২৮১. হারাদিন তা'কে বেটি, আনে আব বানে,
হাই-দেওর গ'র আইলি বাবাকুনি বানে॥

২৮২. হারাদিন (সমস্ত দিন) এনে মেনে (এখানে সেখানে), হাই (স্বামী) আইতে বারা বানে॥ (ধানবানে)।

২৮৩. হা'বর্ মা'থত (= সাপের মাথায়) বেঙর নাচন।

২৮৪. হাবে মারে লিকাত্! বাগ' মারে দেখাত্। (তুঃ সাপের লেখা বাঘের দেখা)

২৮৫. হারাবাত হাবমারি। বিয়ানে দেখি পুয়ার লেঙ্গি॥

২৮৬. হালর'(অ) নায়, বীজর' নায়॥

২৮৭. হালাহালি হালগ্রাম (শ্যালক-শ্যালিকা শালগ্রাম) তা'রা কাইলে (খাইলে) পুরর নাম।
মা-বাপ ডে-ফল (একজাতীয় বন্য ফল), তারায় কাইলে কিয়র নাম॥
(তুঃ বাছার কি দিব তুলনা। মায়ের হাতে তুলেব ডাড়ি, মাগের কানে সোনা॥ ম / 679)

২৮৮. হিচা পানিত্ রুয়া আর তাবিজ'র্ পুয়া॥ (অর্থাৎ সেচের জলে রোপিত ফসল এবং দৈবে পাওয়া সন্তান— অনির্দিষ্ট)

২৮৯. হিদিন গেচে' গাইয়া। অখুন কান্দ' হাইয়া থইয়া॥

২৯০. হিম তিতা, নিম তিতা, তিতা বাখর ছাল।
তার তা'কি অদিক তিতা, ভইনে ভইনে জাল॥

২৯১. হা'ত সমুন্দর গুরি (ঘুরিয়া) আইল। বাপর পুকুরত্ ডুবি মইল॥

২৯২. হুনছো নানি, হুনছো! সুবন্নব গয়না বিবির পেট'নি সয়না॥

২৯৩. হুনতায়, দেখ্‌তায়, কইতা না। গুতা কা'ইয়া মর্‌তা না (তুঃ বোবার শত্রু নাই)॥

২৯৪. হউরা খেত'অ, হিয়াল হান্দান (সরষের ক্ষেতে শিয়াল প্রবেশ করা)।

২৯৫. হউবার ডু'ল' (ডোল / ধান রাখার পাত্র) ভুতর্ বাসা। (তুঃ সরষের ভিতরেই ভূত)

২৯৬. হুনার অঙ্গ কালি হওন।

২৯৭. হউক না কাট'র বিলাই ইন্দুর ধ'রলেই অয়।

২৯৮. হুলোব কেউ নায়। মেনির খোন্দকার। (শক্তের ভক্ত, নরমে গরম)

২৯৯. হুতাশে জীবন ক্ষয়। খুদা দিলে আগুনে অ'য় (< হয়)

৩০০. হুক্কা জিপিনি (যেদিকে), ছিলিম্ হিপিনি (সেদিকে)।

[সংকেত: (১) তুঃ = তুলনীয়। (২) ম + উইলিয়ম মর্টন সংকলিত 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' থেকে উদ্ধৃত প্রবাদ — সংখ্যা সহ। (৩) লঙ/ল = জেম্‌স্ লঙ-এর প্রবাদমালা হ'তে উদ্ধৃত প্রবাদ সংখ্যা সহ। (৪) দে = সুশীল কুমার দে— বাংলা প্রবাদ হ'তে সংখ্যা সহ উদ্ধৃত]।

সুরমা-বরাক উপত্যকার প্রাচীন পুঁথি

শ্যামানন্দ চৌধুরী

॥ এক ॥

'পুঁথি' শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত। 'পুঁথি' বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝে থাকি মুদ্রণ যুগের আগেকার রীতিতে হাতে লেখা বিশেষ ধরণের গ্রন্থাবয়ব — যার পুট (দপ্তরীর ভাষায়) থাকে না। ভাষাতাত্ত্বিকরা শব্দটির উৎস হিসেবে 'পুস্তিকা' নামে সংস্কৃত শব্দটিকে নির্দেশ করেছেন। ধ্বনির বিবর্তনে 'পুস্তিকা' (স্ত্রী-প্রত্যয়জাত) একই সঙ্গে সমীভবন ও স্বরসঙ্গতিতে 'পোত্থিয়া' শব্দে রূপান্তর লাভ করে। যুক্তাক্ষরের লোপে পূর্বস্বরের দীর্ঘত্বে পরিবর্তন না ঘটলেও শেষের একক ব্যঞ্জন যুক্ত হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়ে যায়। তাই শব্দটির পরবর্তী রূপান্তর হয়— পোথী বা পুথী। বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী শেষবর্ণের দীর্ঘস্বর স্বাভাবিকভাবেই হ্রস্ব হয়ে যায় এবং পোথী শব্দটির বিকল্প রূপ হয় পুথি। স্বতোনাসিকীভবনে 'পুথি' শব্দটি কিছুদিন আধুনিক বাংলায় সহাবস্থান করেও 'পুঁথি' শব্দটি বর্তমানে এককভাবে স্থান অধিকার করেছে।

উপকরণের দিক থেকে বাংলাদেশের পুঁথি শিল্প সর্বভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুগামী। বিভিন্ন ধরনের উপকরণকে পত্র হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন ভাবে পুঁথি লেখা হতো। বাংলা পুঁথি মূলতঃ পাওয়া যায় ভূর্জ পত্র, তালপাতা এবং তুলোট কাগজে। প্রাচীন বাংলা পুঁথি বলতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত কয়েকটি প্রাচীন পুঁথিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় — যেগুলি ১১৯৮-১২০০ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন পুঁথি হিসেবে নেপাল রাজদরবার থেকে প্রাপ্ত নেওয়ারী অক্ষরে লেখা 'চর্যাপদ'-এর পুঁথি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে উদ্ধার করা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুঁথিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুঁথি লেখার জন্য চাল-পোড়ানো ভূষা কালি ও নানারকম গাছের রস থেকে তৈরী কষ কালি ব্যবহৃত হতো। লেখার সময় পুঁথির পাতায় অতিরিক্ত কালি পড়ে গেলে ঐ কালি শুষে নেবার জন্য বালির পুঁটুলি ব্যবহার করা হতো। লেখনী হিসেবে ব্যবহৃত হতো — কঞ্চি, খাগ ও পাখির পালক।

পুঁথি সাধারণতঃ দু'ধরনের :—

(১) কবি বা গ্রন্থকারের নিজের হাতে লেখা পুঁথি (autographic text)

(২) গ্রন্থকারের নিজের হাতে লেখা পুঁথির প্রতিলিপি (transmitted text)

প্রথম শ্রেণীর পুঁথি খুবই দুর্লভ। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের আকর হিসেবে আমরা যেসব পুঁথি পাই, তার অধিকাংশই মূল পুঁথির প্রতিলিপি। এ সমস্ত প্রতিলিপির প্রত্যেকটিই অবশ্য কবির নিজের লেখা পুঁথি (autographic text) দেখে নকল করা নয়। Transmitted Text – এর কোনো একটিকে 'আদর্শ পুঁথি' (Exemplar) ধরে নিয়ে প্রতিলিপি তৈরী করা হতো। পুঁথি নকল কবা মধ্যযুগের মসীজীবী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা ছিল। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লিপিকরেরা মূল পুঁথি থেকে তার 'কপি' তৈরী করে দিতেন। অসতর্কতা, বিভ্রান্তি, অজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে লিপিকরেরা অনেক সময় প্রতিলিপিতে নানা ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটাতেন। ফলে আদর্শ পুঁথি ও অনুলিখিত পুঁথির মধ্যে প্রায়ই নানারকম পাঠান্তর দেখা যায়। অনুলিখিত পুঁথিকে প্রকৃতি অনুসারে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—

(১) সুরক্ষিত প্রতিলিপি (Protected transmission)
(২) অরক্ষিত প্রতিলিপি (Hapazard transmission)
(৩) সংশোধিত প্রতিলিপি (Revised transmission)

পুথির পঠন-পাঠন বা গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু পবিচিত— অর্ধ পরিচিত শব্দের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে যায়। যেমন— ভণিতা, লিপিকর, গ্রন্থপুট, গ্রন্থপট্ট, লেতি, গায়েন, পুষ্পিকা, গ্রন্থসূত্র ইত্যাদি। এই শব্দগুলির মধ্যে 'পুষ্পিকা' কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূল রচনার অনুলিখন সমাপ্ত হবার পর মূল পুঁথির সঙ্গে লিপিকর আরও কয়েকছত্র যোগ করে দিতেন। এই সংযোজিত অংশের নাম 'পুষ্পিকা' (colophon)। 'পুষ্পিকা' পুঁথির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে লিপিকরের নাম, সময় তথা সংশ্লিষ্ট পুঁথি বা কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে যেমন উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমনি সমকালীন সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কেও নানা মূল্যবান তথ্যের আভাস পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য একটি পুঁথির তথ্য-নির্ভর পরিচয় বহুলাংশেই তার পুষ্পিকার উপর নির্ভর করবে। উদাহরণস্বরূপ একটি অপ্রকাশিত মনসামঙ্গল পুঁথির পুষ্পিকা এখানে উল্লেখ করা হল—

> "ইতি ১২৫৬ বাঙ্গালা মাহে ১৩ জৈষ্টি রুজ
> বৃহস্পতিবার ইতি নিজ পুস্তক শ্রী হরগোবিন্দ দেব
> অলদে মহনরাম দেব।"[১]

আদি ও মধ্যযুগেব বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস যে সমস্ত উপাদানেব উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তার প্রায় সম্পূর্ণটাই হাতে লেখা পুঁথি। কারণ তখন মুদ্রণ যন্ত্র ছিল না। পুঁথিব প্রতিলিপি তৈরীর গুরুদায়িত্ব লিপিকরদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এই লিপিকরদের মাধ্যমেই বহু পুঁথির প্রতিলিপি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। পুঁথি অনুসন্ধান ও সংগ্রহ ব্যাপকভাবে হলেও সব পুঁথিই সংগৃহীত হয়ে গেছে এমন কথা বলা যায় না। আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বহু তথ্যই এখনও অনাবিষ্কৃত। কিন্তু গবেষণার বিষয় নির্বাচনে পুঁথি বিষয়ক গবেষণায় ইদানীংকালে গবেষকদের মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। অথচ পুঁথি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন :—

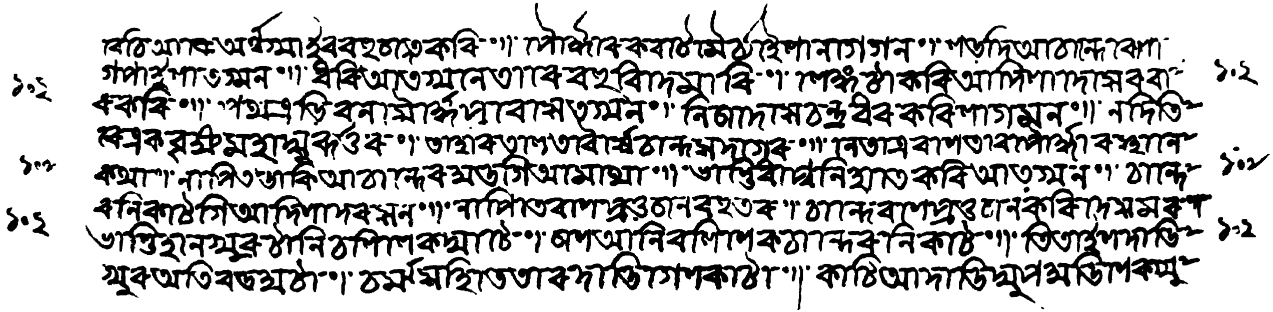

বরাক উপত্যকায় প্রাপ্ত মনসামঙ্গল পুঁথির একটি পৃষ্ঠা

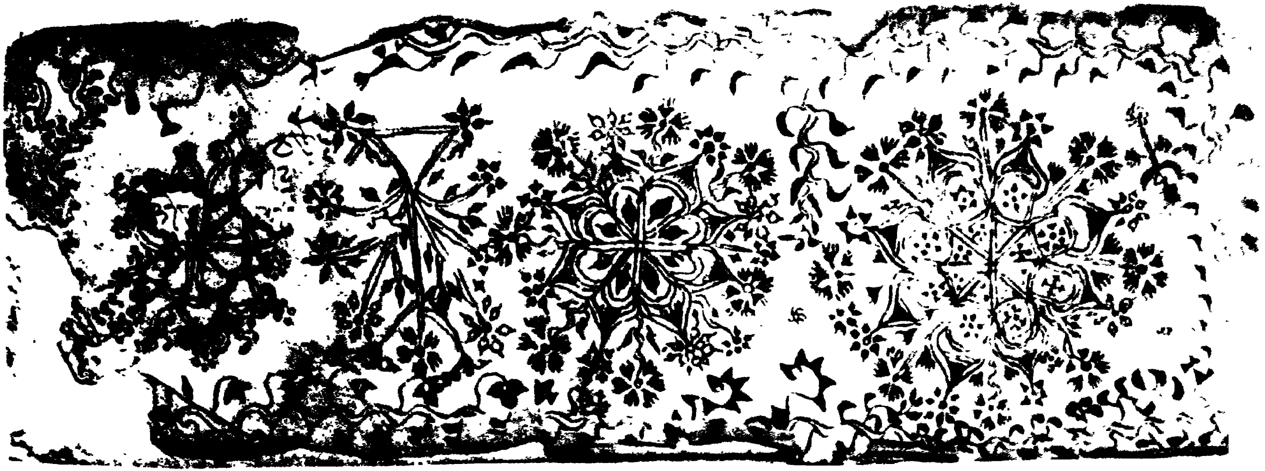

পুঁথির অলঙ্করণ

> "সুতরাং মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালাদেশে একটা প্রবল বাঙ্গালা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, তাহারা যেরূপ উদ্যম সহকারে বৈষ্ণব সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার জন্য তাহাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে; কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, **মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি গাথা ও দোঁহা সংগ্রহ করিতে হইবে**। ইহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে। অনেকবার হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে যাহারা এ পর্যন্ত্য কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই।"[২]

লক্ষণীয় দিক হল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সুরমা-বরাক উপত্যকার মত প্রান্তবর্তী অঞ্চল থেকেও পুঁথি সংগ্রহের কথা বলেছেন। বঙ্গীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রান্তীয় অঞ্চল থেকে পুঁথি সংগৃহীত হলেও পূর্বপ্রান্তবর্তী সর্বশেষ ভূখণ্ড বরাক উপত্যকায় পুঁথি নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নি। যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যের 'বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়' (এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত) গ্রন্থে এখানকার কিছু কিছু পুঁথির নাম আছে কিন্তু এ সমস্ত পুঁথির কোনো বিস্তৃত তালিকা এখনও পর্যন্ত প্রস্তুত করা হয় নি। প্রান্তবর্তী অঞ্চলে সংস্কৃতির উপাদানগুলি বহুলাংশেই অপরিবর্তিত ও আদিমরূপে থেকে যায়। সেদিক থেকে এই উপত্যকার পুঁথি সাহিত্যে মধ্যযুগের বঙ্গীয় সংস্কৃতির বহু নিদর্শনই যে আত্মগোপন করে রয়েছে একথা বলা বাহুল্য। অতএব বরাক উপত্যকায় পুঁথি সংক্রান্ত গবেষণা তথা সম্পাদনাব কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

।। তিন ।।

অবশ্য সুরমা বরাক উপত্যকায় পুঁথি নিয়ে যে একেবারেই চর্চা হয় নি একথা আমবা বলছি না। তবে যেটুকু কাজ হয়েছে তা মূলতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগে, প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে বা প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় এ অঞ্চলের পুঁথি সংক্রান্ত কোনো গবেষণা আমাদের নজরে পড়ে নি। এখানে পুঁথিচর্চার সূত্রপাত ঘটে শিলচর শিক্ষা পরিষদ-এব মুখপত্র 'শিক্ষাসেবক' (১৩৩২) কে কেন্দ্র করে। শিক্ষাসেবক-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এখানকার তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা। মূলধারাকে পুষ্ট করার জন্যই যে আঞ্চলিক গবেষণার প্রয়োজন এই সত্যকে সামনে রেখেই 'শিক্ষাসেবক' গোষ্ঠীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়েছিল। এজন্যই দেখা যায় শিক্ষা সংস্কৃতিমূলক সমকালীন বিভিন্ন আলোচনা যেমন 'শিক্ষাসেবকে' প্রকাশিত হয়েছে তেমনি পাশাপাশি লোকসাহিত্য, লোক

সংস্কৃতি, লোকক্রীড়া এবং পুঁথি বিষয়ক বিভিন্ন রচনাও 'শিক্ষাসেবকের' শ্রীবৃদ্ধি করেছে। এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গবেষকরা পুঁথি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন কিন্তু সেসবই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ। অবশ্য একটিমাত্র ক্ষেত্রেই একটি সম্পূর্ণ পুঁথি সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছিল। সেটি মহারাজ সুরদর্প নারায়ণের রাজত্বকালে (১৭০৮ — ১৭২০ খ্রীঃ) ভুবনেশ্বর বাচস্পতি কর্তৃক অনূদিত বৃহন্নারদীয় পুরাণের বঙ্গানুবাদ 'শ্রী নারদি রসামৃত'। প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'শিলচর নর্মাল স্কুল গ্রন্থ প্রচার সমিতি' কর্তৃক ১৯৪২ খ্রীঃ এটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু গবেষকরা এই মুদ্রিত গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দিহান। এ প্রসঙ্গে গবেষক ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্যের অভিমত হল—

> "পুঁথি সম্পাদনার প্রথম শর্ত হচ্ছে মূল পাঠ অবিকৃত রাখা। বরাক উপত্যকায় ১৯৪২ খ্রীঃ পূর্ববর্তী কালে পুঁথি বিষয়ক যেসব আলোচনা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে পুঁথির পাঠকে অবিকৃত রাখা হয়েছে, কিন্তু শ্রী নারদি রসামৃত সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রমদাচরণ মূলপাঠকে বদলে ফেলেছেন। ফলে গ্রন্থটি মূল পুঁথির একটি পরিমার্জিত সংস্করণে রূপান্তরিত হয়েছে। এতে গ্রন্থটির প্রমাণিকতাও অবশ্যই ক্ষুন্ন হয়েছে।"[৩]

পুঁথি সম্পর্কিত প্রকাশিত নিবন্ধগুলি হল :

(১) শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : জগন্নাথ দেবঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা : ১৩১৯ বঙ্গাব্দ : কলিকাতা।

(২) মহাকবি সঞ্জয় : জগন্নাথ দেব : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ২৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা : ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

(৩) বিবেকের যুদ্ধ : তারিণীচরণ দাস : শিক্ষাসেবক : ৭ম বর্ষ; ১ম সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ : শিলচর।

(৪) জয়ন্তিয়ার পুরাতত্ত্ব বিষয়ে দিগ্‌দর্শন : পুলিন বিহারী ভট্টাচার্য : শিক্ষাসেবক : ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ : শিলচর।

(৫) প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা : পুলিন বিহারী ভট্টাচার্য : শিক্ষসেবক : ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা : মাঘ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ : শিলচর।

(৬) ব্রহ্মজ্ঞান হাড়মালা হরপার্ব্বতী সংবাদ : প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : শিক্ষাসেবক : ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা : এবং ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা : ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ : শিলচর।

(৭) বাংলা পুঁথির লিপিকাল : যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য : উদর্ক : ২য় বর্ষ; ২য় সংখ্যা : ডিসেম্বর, ১৯৭০ : করিমগঞ্জ।

(৮) অষ্টাদশ শতাব্দীর অজ্ঞাত কবির অখ্যাত দুখানি রচনা : ডঃ জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য : স্মরণিকা : কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন : ৫ম বার্ষিক অধিবেশন : ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ : শিলচর।

(৯) প্রাগাধুনিক কালের কবি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের ‘কৌতুকবিলাস’ : অনুরূপা বিশ্বাস : স্মরণিকা : কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন : ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন : ১৩৯০-৯১ বঙ্গাব্দ : শিলচর।

(১০) বরাক উপত্যকার মনসা পুঁথি : ডঃ জন্মজিৎ রায় : অক্ষরবৃত্ত : ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা : আশ্বিন, ১৪০০ বঙ্গাব্দ : করিমগঞ্জ।

(১১) ঘোরচণ্ডীর পাঁচালী ও পূজাবিধি : দুটি গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি : ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য : অক্ষরবৃত্ত : ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ বিশেষ সংখ্যা : জানুয়ারী ; ১৯৯৫ : করিমগঞ্জ।

(১২) ডিমাসা রাজসভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি : শ্রী নারদি রসামৃত : ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য : অক্ষরবৃত্ত : শারদীয়া ১৪০২, সেপ্টেম্বর ; ১৯৯৫ : করিমগঞ্জ।

(১৩) হাড়মালা : নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদিত : লালা : কাছাড় : ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

(১৪) ‘চিকিৎসার্ণব’ বরাক উপত্যকার একটি অনালোচিত পুঁথি : অমলেন্দু ভট্টাচার্য : পূর্বায়ন : রজত জয়ন্তী পূর্তি সংখ্যা : হাইলাকান্দি : ১৯৯৫।

॥ চার ॥

বরাক উপত্যকার বিশাল পুঁথি ভাণ্ডারের মধ্যে আলোচিত পুঁথির সংখ্যা যে অতি নগণ্য দীর্ঘ সত্তর বৎসরে মাত্র চৌদ্দটি আলোচনাই তার প্রমাণ। অথচ উপাদানের অভাব নেই। পুলিন বিহারী ভট্টাচার্য ‘শিক্ষা সেবক’ পত্রিকায় (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) পুঁথির যে তালিকা প্রকাশ করেছিলেন সেই তালিকার উপর ভিত্তি করে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই উপত্যকার বিশাল পুঁথি ভাণ্ডারকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়—

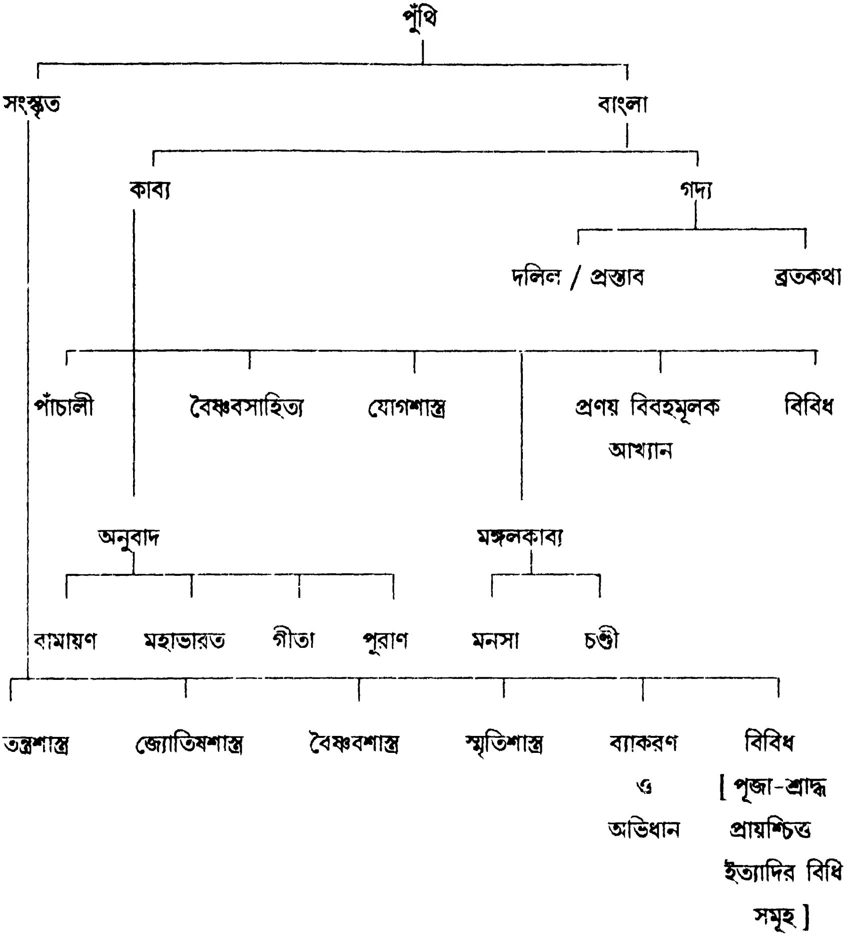
পুঁথি
সংস্কৃত
বাংলা
কাব্য
গদ্য
দলিল / প্রস্তাব
ব্রতকথা
পাঁচালী
বৈষ্ণবসাহিত্য
যোগশাস্ত্র
প্রণয় বিবহমূলক আখ্যান
বিবিধ
অনুবাদ
মঙ্গলকাব্য
বামায়ণ
মহাভারত
গীতা
পুরাণ
মনসা
চণ্ডী
তন্ত্রশাস্ত্র
জ্যোতিষশাস্ত্র
বৈষ্ণবশাস্ত্র
স্মৃতিশাস্ত্র
ব্যাকরণ ও অভিধান
বিবিধ [পূজা-শ্রাদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির বিধি সমূহ]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সুরমা বরাক উপত্যকায় প্রাপ্ত পুঁথি সমূহের আরেকটি তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন জগন্নাথ দেব। কিন্তু পুলিন বিহারী বা জগন্নাথ দেবের তালিকা দুটির কোনোটিকেই যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পুঁথি তালিকা বলা যায় না। কারণ পুঁথি অধ্যয়নের যে প্রকরণ ও পদ্ধতি তালিকা প্রণয়নেব ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উপবিউক্ত তালিকাদুটির কোনোটিতেই তা করা হয় নি। এ অঞ্চলের পুঁথি আলোচনায় লিপির কথাটিও উল্লেখযোগ্য। বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথিগুলি লেখা হয়েছিল মূলত মধ্যযুগীয় বঙ্গলিপিতে আর প্রণয়-বিবহমূলক আখ্যানগুলি সিলেটী নাগবী লিপিতে।

॥ পাঁচ ॥

সুরমা বরাক উপত্যকায় আদি ও মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে পুঁথির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটা বিশেষ যুগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর ছবি পাওয়া যায় এসমস্ত পুঁথিতে। যেমন বাইশা জাতীয় একটি অপ্রকাশিত মনসামঙ্গল পুঁথিতে চন্দ্রধবের যে বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে চাঁদ সদাগর অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে 'শুটকি সিদলও' সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন—

আমার বচন ধর   মাস কালাই ভরাভব
আদ্রক হরিদ্রা কুমড়া।
তিসি মেতি বিস্তর   এরে লয় সদাগব
আর লয় অনেক ছাগল।
ডিঙ্গাএ লাগাইয়া খিরা   জারে দিআ পাইবাএ হিরা
শুনি সাধু হইলা পাগল।
তুল ভরি নারিকল   সুটকি সে সিদল
কিনি লয় মান্দারের চকি।
কাষ্টের জে চকি দিবা   সুবর্ণের চকি পাইবা
সুনি চান্দ হইলা কৌতুকি।[১]

ঐ একই মনসামঙ্গল পুঁথিতে রান্নার যে বর্ণনা রয়েছে তাতে এমন কিছু পদের উল্লেখ আছে যা একান্তভাবেই আঞ্চলিক সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। যেমন—

প্রথমে নালিতা রান্দে মিসাল কাটহালি
মাগুর মৈৎ (স্য) রান্দে কৈন্যা কুসগু মিসালি।
হিম তিতা নিম তিতা বেতাঙ্গের আগ
ঘৃতে ভাজিল কৈন্যা উদাইয়ার সাগ।
দুগ্ধ দিআ দুগ্ধ লাড়ু আদা মিশাল
নিরামিস বেঞ্জন রান্দে সব অনে ভাল।
পাআস পিস্টক আদি কৈল জত বড়া
এইচা ভাজা সুন্দরি করিল গুড়গুড়া।
পাবিআ মৈর্চা দিআ কৈন্যা করিল আদা ঝুলা
জতনে রান্দিল তারে খাইতে চান্দের ভালা।
রান্দএ সুন্দরি কৈন্যা কর্ম্বের লড়ে সুনা
অধিক জতনে রান্দে সউল মৈৎর্চ্যের পনা।
উপল মৈৎস্য দিআ রান্দে লেয়রি আঙুল
হরিসে বান্দএ তবে মন কতুহল।[২]

বেতগাছের আগা (বেতাঙ্গের আগ), উদাইয়ার শাক, এইছা শাক, শোল মাছের পোনা ; উপল মাছ (বিশেষ প্রজাতির চেঙ মাছ) ও ‘লেওইর’ (একধরনের টক ফল) দিয়ে অম্বল ইত্যাদি যেসব রান্নার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রেই এসব পদ সংলগ্ন হয়ে গেছে স্থানীয় বঙ্গীয় জীবনের সঙ্গে। অঞ্চল বিশেষের ভূপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের খাদ্যাভাস গড়ে উঠে। পূর্ব প্রান্তবর্তী এ অঞ্চলেও তাই যে একান্ত নিজস্ব কিছু তরি-তরকারী তাদের আঞ্চলিক নাম নিয়ে স্থানীয় জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক।

শুধু খাওয়াদাওয়া নয়, চিকিৎসাপদ্ধতিরও পরিচয় রয়েছে পুঁথি সাহিত্যে। দেশীয় গাছ গাছড়া লব্ধ আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পাশাপাশি ঝাড়ফুঁকের একটা ব্যাপারও যে এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায় ‘চিকিৎসার্ণব’ পুঁথিতে সংকলিত নিম্নোক্ত মন্ত্রটি থেকে—

বডলু মিলাইবার মন্ত্র ॥
কাকে বলে মহাদ্দেব সুনিয়মর কথা
জমুনা পার হৈয়ে জায় এ বডল হৈল
আকুরিয়া বডল পাণি বডল সিলা বডল
সটুণি বডল চৌসষ্ঠি বডল
এই স্থান হণে অন্য স্থানে জাও
হাতে দিয়া লাম জদি এইখানে থাক
চল চল সিগ্রে চল কামাক্ষ্যার আজ্ঞা লও
জদি এখানে থাকি পাক কামাক্ষ্যার মাথা খাও
সিদ্ধি গুরুচরণ কামাক্ষ্যার আজ্ঞা।[৬]

ধারণা কবা যায় এই পুঁথিটি সে যুগেব অভিজাত পরিমণ্ডলেই রচিত হয়েছিল ; কারণ পুঁথির বচয়িতা গোবিন্দরাম ছিলেন ডিমাসা রাজপরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি ‘নৃপাত্মজ’ বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

সংস্কৃতে রচিত ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে ঐ একই পুঁথিতে আলাদা ভাবে প্রচলিত লৌকিকমন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে মনে হয় তৎকালীন চিকিৎসকেরা ঐতিহ্যগত চিকিৎসাবিদ্যার পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে ওঝা বা বৈদ্যের ভূমিকাও গ্রহণ করতেন।

‘ঘোরচণ্ডীর পাঁচালী’ পুঁথিতে ঘোরচণ্ডীর উদ্ভব বিষয়ে একটি ব্যতিক্রমী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। পাঁচালীতে উল্লিখিত কাহিনী অনুযায়ী চম্পকনগরের এক সওদাগর কর্তৃক ঘোরচণ্ডী এদেশে আনীতা হয়েছিলেন—

সাধু বলে চণ্ডি মাও করি নিবেদন।
আপনে চলহ তুমি চম্পক ভূবন ॥
তুমা বরে পাইলু মুহি রাজ্য সিঙ্গাসন।

তুমি গেলে সর্ব্ব রাজ্যে করিবা সেবন॥
সদাগরের স্তুতি দেখি তুষ্ট হৈল মন।
হস্থি কান্ধে উঠি মাও করিলা গমন॥[৭]

সওদারের স্ত্রী রূপাবতী একদিন দেবীর মন্দিরে গিয়ে 'সেবার দ্রব্য' দেখে লুব্ধ হয়ে সবকিছু খেয়ে ফেললে ক্রুদ্ধা দেবীর হাতে তার জীবনাবসান ঘটে—

একদিন দুর্চ্চারূনী দেবিপুরে গেল।
দেবির সেবার দ্রব্য জত সাক্ষাতে দেখিল॥
দেখি দুচ্চারিনি কন্যা বিচার না কৈল।
লোভি হৈয়া রূপাবতি সকলি খাইল॥
ইহা দেখি ঘোরচণ্ডী বড় ক্রোধ হৈলা।
গলা চাপি কর্ক্কসারে সেখানে বধিলা॥[৮]

প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নারী সমাজই ছিল মঙ্গল দেব-দেবীর উপাসক। পরে পুরুষেরা এসব দেব-দেবীর পূজা করেছিলেন। কিন্তু ঘোরচণ্ডীর পূজার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যতিক্রম হল এই দেবীর পূজা প্রচারে বিরোধিতা এসেছিল নারীসমাজের তরফ থেকে। স্থানীয় পুঁথি সাহিত্যে লব্ধ এই বিশেষ দিকটি নিয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। কারণ এতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নূতন মাত্রা সংযোজিত হতে পারে।

এছাড়াও সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য পুঁথিগুলি আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। লক্ষণীয় যে উক্ত চৌদ্দটি নিবন্ধে যে পুঁথিগুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলি সবই পদ্যে লেখা। গদ্যপুঁথিও এ অঞ্চলে রয়েছে। প্রান্তীয় অঞ্চলে গদ্যের রূপান্তরের ব্যাপারটি অনুধাবনের পক্ষে পুঁথিগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১২৪৭ বঙ্গাব্দে রচিত একটি অতি সংক্ষিপ্ত অপ্রকাশিত গদ্যপুঁথির সম্পূর্ণ পাঠ এখানে উদ্ধৃত হল—

শ্রীশ্রী দুর্গা

সন ১২৪৭ বাঙ্গলার বৈশাখ মাসের সপ্ত দিবসে
শ্রীল শ্রীযুত বাবু রসীক নন্দন রায় রসাসয়
কুলীন মহাসয়র অনুমতী আজ্ঞা পালনে
যুক্ক্যাযুক্ক্য বিবেচনা পুর্ব্বক ঐ পাটসালার
সাকল্য পাটনিকদের হিতের দায় দিবা
চতুর্থ ভাগ করত প্রহর নিরপীত্ত ক্রমে ধারানু
সক্কায় দুর্নীতি দমন প্রয়জণ এ নিতি
উপদেশ প্রস্তুত করা গেল

১ প্রথম ধারা

অশ্বিন নিতি উপদেস অবলকনে অবধা
নান্তর পাটনিকদিগের কর্ত্তব্য বিহিত জে
প্রত্তিয় দিবস জামিনি অতিতে এবঞ্চ কাক
* * * না ইত্যাদি পক্ষি নানাবিধ ষুললীত
সব্দ নিস্বাসের পুর্ব্বে ফলীতার্থ ব্রাম্যকাল
জেতৎকালের প্রবল সবল নিদ্রাতে
বুদ্দি ও চতুরতার অশেষ প্রকার অকুলা
নতা ও রাসতা প্রচার এমত অদ্ভুত
নিদ্রার বসীভুত থাকা অপ্রসংসা ভির্ম্ব
অন্যজ্ঞান হয় না পরিত্যজ্যে আপন ২ ব্যেব
সার অভ্যাসীত পুর্ব্ব পাট সম্পাদনান্তর
নিত্য সীয় পাট রিতি প্রণালী মতে প্রহর কাল
পর্জ্যন্ত করেন

২ দ্বিতিয় ধারা

কালাকাল স্নান তর্পণান্তে আপন ২ শ্রী শ্রী
শ্রীল ইষ্ট দেবতার পবম বোন্ধ দত্তের জে
তদ্দস ষুধা সশী জামীনিব তিমির হন্তা কারক
কেহ সংসার সাকারাবধি এ জাবৎ প্রাপ্ত হয়
নাহি অনুক্ষণ অহিক পারত্রিক মুক্তির
কারণ তস্য গুণের অন্যে সনের ভাব সাধ্য
সক্তি অন্তরে ভাবা ভাবনান্তর অন্যকর্ম্মে
চিত্তকে প্রবেস এবং ধাবমান অনা পুর্ব্বক
জাতি ধর্ম্ম কর্ম্মের পাণ্ডীত উপদেসানান্তর
সকৃত জোজনাতে দ্বিতিয় ১ প্রহর কাল
পর্য্যন্ত রত থাকোন

৩ ত্রিতিয় ধারা

সরিরের সুক ও মনের নিরর্থক কো ...... কও
আলস অতি ক্ষ্যেতির ভাবের ভাব অনু

ভব গণ্যে গ্রন্তের নিত্য সীয় পাট এত
সম কল্যা গ্রন্ত আবির্ত্তি দর্শে জে কেহ্ তণ
মধ্যে কোন প্রকরণের সব্দাদির সারৎ অর্থাৎ
প্রাণের আকিঞ্চনা এবং পুর্ব্ব পক্ষ্য করিলে
তৎক্ষনাৎ জথার্থ সিধ্যান্তের অধিকতা ক্ষেমতা
হয় তদানুকল্পে কামনাপুর্ব্বক সাধনার জন্ত্রণা
তিত্রিয় ১ প্রহরকাল পর্য্যন্ত করেন—

৪ চতুর্থ ধারা

ভবসাগরের মধ্যে বিদ্যা রত্নের তৃস্ব ধন এধন হ্রণ
করণের জোজ্ঞ শ্রেষ্ঠ জাতির সিষু ভির্ন্ন ইতর
লোকের সক্তি রহিত অনুক্ষণ ঐ অ * * * * *
উপার্য্যনেতে আপন ২ মনিঞ্জীয় মনরম আচরণের
বস্ত্র বিচৈক্ষণ বিচিত্র অপ্রতুল বিধাএ ব্যাকুল নিরানন্দ
না হইএ মর্ত্য অনিত্যের তাবৎ মোনিশ্বের অপরে
নেৎকার হইতে উদ্দার হওনা জন্যে অন্যোন্য পাঠ
সালাএ গমনাগমন পুর্ব্বক স্বিয় পাঠনিকদের
সঙ্গে অসেয় রঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে জে প্রকারে
বিদ্যা বির্দ্ধতার উপদেস বিসেস দৃষ্টমান আছে
ষুফল প্রাপ্তনের শ্রমের নিষ্টা চতুর্থ ১ প্রহর
কাল পর্য্যন্ত করেন — ৯

আঞ্চলিক .গদ্যের নিদর্শন ছাড়াও উক্ত গদ্য রচনাটির আবেকটি দিক হল একটি বিশেষ সময়ের সমাজ মানসের প্রতিফলন এখানে পাওয়া যাচ্ছে। ‘পাটনিক’ অর্থাৎ ছাত্ররা দিনের চার প্রহরে তাদের করণীয় কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে — এধারণা শিক্ষকদেব মনে আসা মাত্রই তাঁরা প্রস্তাবগ্রহণ পূর্ব্বক ছাত্রদের এ সম্পর্কে সচেতন কবে তুলেছেন। দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতির এই বিশেষ দিকটি নিঃসন্দেহে আলোচনাব দাবী রাখে।

এই গদ্য খুব প্রাচিন নয়। কিন্তু এর চেয়েও প্রাচীনতর গদ্য এখানে পাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ এঞ্চলেই গদ্যের ব্যবহার হয়েছিল আগে। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি স্মরণীয়—

> “কাজকর্মে বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম এবং ব্যাপক ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দ হইতে ত্রিপুরা-কাছাড় কামতা অঞ্চলেই পাইতেছি।”[১০]

শুধু তাই নয়, এর চেয়েও বড় আশা আমরা করতে পারি। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন এরকম অনুমান করেছেন যে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল পূর্বাঞ্চলে, —

> "আলো-মণ্ডলের কেন্দ্রবর্তী সূর্য্য, আলোর আদি খুঁজিতে গেলে যেরূপ পূর্বদিকেই মুখ ফিরাইতে হয়, বঙ্গসাহিত্যের আদি খুঁজিতে সেইরূপে পূর্ববঙ্গেই, আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে॥....
>
> "হিমালয় যেদিন সমুদ্রগর্ভ হইতে শির উত্তোলন করিয়াছিল, সেদিন শত শত নদ-নদী তাহার অঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত সবুজ শস্যের আভরণে ভূষিত করিয়াছিল; কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন সাম্রাজ্য তাতার ও তুর্কিস্থানের যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধ তখন হইতে টুটিয়া গেল। মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ে পূর্ববঙ্গের মঙ্গল ও গীতি সাহিত্যের শুভদিন অন্তর্হিত হইল— পূর্ব হইতে মুখ ফিরাইয়া এদেশ পশ্চিমাগত খোল ও করতাল বাদ্যে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি বন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। ..... বঙ্গ সাহিত্যের এই ব্যাপক প্রসার ও এই ব্যাপক সাহিত্যের গৌরব আমরা করিতে পারিতাম না, যদি শুধু পশ্চিমবঙ্গ ইহাদের লীলাভূমি হইত।"[১১]

কেবলমাত্র সাড়ে ছেচল্লিশটি চর্যাপদের মধ্যেই বাংলাসাহিত্যের আদি নিদর্শন সীমাবদ্ধ, আর কিছুই লেখা হয় নি একথা মেনে নেওয়া যায় না। কে জানে এ অঞ্চলের অনালোচিত পুঁথি সাহিত্যেই আদি যুগের আরও কোনো রচনা লুকিয়ে রয়েছে কিনা!

উল্লেখপঞ্জী

১। (ক) পুঁথির নাম :— পদ্মাপুরাণ।
  (খ) দৈর্ঘ্য — ৩৯ সে. মি.; প্রস্থ — ১৩.৫ সে. মি.।
  (গ) পত্রসংখ্যা — ২৪৬। উভয়পৃষ্ঠায় লিখিত।
  (ঘ) প্রতিপত্রে ৮ ও ৯ লাইন।
  (ঙ) পুঁথির উপাদান — তুলোট কাগজে লিখিত।
  (চ) হরফ — মধ্যযুগীয় বঙ্গলিপি।
  (ছ) ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহাঃ/ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ: ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ: পৃঃ — ৩৬।

৩। ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য — ডিমাসা রাজসভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিঃ শ্রী নারদি রসামৃত/ শারদীয়া অক্ষরবৃত্ত; ১৪০২: করিমগঞ্জ।

৪। ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য — বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস: অক্ষরবৃত্ত: ৩য় বর্ষ, ২য় অতিরিক্ত সংখ্যা: বৈশাখ; ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

৫। ঐ.

৬। ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য — 'চিকিৎসার্ণব' বরাক উপত্যকাব একটি অনালোচিত পুঁথি: 'পূর্বায়ন'— রজত জয়ন্তী পূর্তিসংখ্যা: হাইলাকান্দি: ১৯৯৫।

৭। ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য — ঘোরচণ্ডীর পাঁচালী ও পূজাবিধি: দুটি গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি/ অক্ষরবৃত্ত: ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ বিশেষ সংখ্যা: জানুয়ারী, ১৯৯৫।

৮। ঐ.

৯। (ক) পুঁথির নাম: নেই
  (খ) দৈর্ঘ্য — ৩৭.৫ সে. মি.; প্রস্থ — ২০.৫ সে. মি.
  (গ) পত্রসংখ্যা — ১। উভয়পৃষ্ঠায় লিখিত
  (ঘ) পুঁথির উপাদান — তুলোট কাগজে লিখিত।
  (ঙ) হরফ — মধ্যযুগীয় বঙ্গ লিপি।
  (চ) ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

১০। সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথমখণ্ড): পৃঃ ২০৭/ প্রথম আনন্দ সংস্করণ: ১৯৯১।

১১। দীনেশ চন্দ্র সেন — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: ২য় খণ্ড: পৃঃ ৬৮৮ — ৯০। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ সংস্করণ: ১৯৮৬।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১। জয়ন্ত গোস্বামী — প্রাচীন পুঁথি গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ। কলিকাতা: ১৯৯০।

২। ডঃ নির্মল দাশ — মধ্যযুগের কাব্যপাঠ: কলিকাতা। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

৩। মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া — বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা। বাংলা একাডেমী: ঢাকা। আষাঢ় ১৪০১/ জুন ১৯৯৪।

৪। কল্পনা ভৌমিক — পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা/ বাংলা একাডেমী: ঢাকা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯/ মে, ১৯৯২।

৫। দূর্বা দেব — শিক্ষাসেবক পত্রিকার লেখক ও বিষয়সূচী / শিলচর: ১৯৯৫।

প্রাচীনযুগে শ্রীহট্টের রাজনৈতিক সংযুতি

কামালুদ্দীন আহমদ

ইতিহাস প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক প্রবহমানতার কালভিত্তিক বিভাজনের নাম পর্যাবৃত্তায়ন। এই পর্যাবৃত্তায়নের বিন্যাস ঘটে সামাজিক বিকাশের বৈচিত্র্যময় এবং গ্রন্থিল বিন্যাস পরম্পরাকে অবলম্বন করে। সামাজিক অবস্থার অগ্রগতির ধারাটি আবার বিকাশপূর্ব, বিকাশশীল এবং বিকশিত প্রভৃতি অবস্থানে বিভাজন করা যায় যা প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক পর্যাবৃত্তেব সঙ্গে অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ। তাই পৃথিবী, কোন দেশ, জাতি বা বিশেষ ভূখণ্ডের ইতিহাস ধারাকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা হয়। ভারত ইতিহাসের এরূপ পর্যাবৃত্তায়নে ভারতে তুর্ক-আফগান শাসনকাল আরম্ভ পর্যন্ত যুগটি প্রাচীন যুগরূপে চিহ্নিত। অবশ্য আধুনিক গবেষণায় এরূপ কালভিত্তিক বিভাজন সঠিক নয বলে অভিমত পোষণ করেন অনেক বিদগ্ধ ইতিহাসবিদ। তাঁদের মতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিন যুগের প্রত্যেকটির কতকগুলো স্বতন্ত্র লক্ষণ আছে, এবং সেই লক্ষণগুলিই যুগচিহ্ন নির্দেশ করে, কোন শাসক গোষ্ঠীর উত্থানপতনের সঙ্গে পর্যাবৃত্তায়ন সম্পৃক্ত নয়। তাঁবা মনে করেন, ভারত ইতিহাসের প্রক্রিয়াটির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, তুর্ক-আফগান শাসনকাল শুরু হওয়ার অনেক পূর্বেই এদেশের ইতিহাস প্রবাহে মধ্যযুগের লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়েছিল। বক্ষ্যমান আলোচনায় সেসব জটিল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে না গিয়ে সাধারণভাবে প্রাচীন যুগ বলতে যে কাল বুঝায় তাই আলোচ্য। অর্থাৎ শ্রীহট্টে তুর্কী শাসন সম্প্রসারণ কাল পর্যন্ত যুগকে প্রাচীন যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইতিহাসে প্রাচীন যুগ আবার প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক— এই দুই পর্যাবৃত্তে বিভাজিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ এমন একটি যুগ যার সূচনা কোন্ সুদূর অতীতে হয়েছিল তা একমাত্র অনুমান নির্ভর। সে যুগের কোন লিখিত উপাদানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য যুগের সমাপ্তি সীমাটা মোটামুটি সংজ্ঞায়িতা। যখন থেকে কোন লিখিত নিদর্শনের সন্ধান মেলে, তখনই প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়। মানব সভ্যতার এই প্রাগৈতিহাসিক স্তরটি পৃথিবীর সকল দেশে সমকালে স্থায়ী ছিল না। এমনকি সকল দেশের সকল অঞ্চলে একই সময়ে প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের অবসান ঘটেনি। ভারতের সকল অঞ্চলের ইতিহাস পর্যালোচনায় এর ইতিবাচক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গত

কারণেই বলেছেন— "ভারত ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক স্তরটি আসাম সহ পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে প্রলম্বিত হয়েছিল।"[১] বর্তমান আলোচনার প্রতিপাদ্যে আলোচ্য অঞ্চল অর্থাৎ মধ্য ও আধুনিক যুগে খ্যাত সিলেট বা শ্রীহট্ট নামক ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক পর্যায় বাদ দিয়ে প্রাচীন যুগের অবশিষ্টাংশই অনুসৃত। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন একটি লিপি— যার কাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী বলে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত। তাহলে শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়েছিল ষষ্ঠ শতাব্দীতে। আর এই যুগ প্রলম্বিত হয়েছিল খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত। প্রচীন যুগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল যূথবদ্ধ মানুষের যাযাবর বৃত্তি এবং বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্তিকরণ ও তাদের বাহিত সাংস্কৃতিক প্রবাহসমূহের সংশ্লেষণের ফলে এক সমন্বিত সংস্কৃতি ধারার উদ্ভব। আলোচ্য অঞ্চলে এই প্রক্রিয়া চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল। তাহলে বক্ষ্যমান নিবন্ধের আলোচনা কাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। কিন্তু ইতিহাসের কোন বিশেষ পর্যাবৃত্তের সঙ্গে তার অতীত প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে অনুস্যূত। তাই বর্তমান আলোচনায় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কালের ইতিহাসের কিছু বিবরণ সমকালীন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রাপ্ত উপাদান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পাবে।

ভৌগোলিক অবস্থান :

যে অঞ্চলকে ভিত্তি করে ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত, সে অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও ইতিহাস প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে। তাই শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রাচীন যুগের ভৌগোলিক অবস্থান বর্তমান আলোচনার প্রাথমিক বিষয়বস্তু।

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য অঞ্চলটি বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অর্থাৎ সিলেট, মৌলবী বাজার, সুনামগঞ্জ, ও হবিগঞ্জ এবং ভারতের করিমগঞ্জ জিলায় বিভক্ত। বৃটিশ শাসনকালে অঞ্চলটি সিলেট বা শ্রীহট্ট জিলা, মোগল আমলে সিলেট্ সরকার নামক বাংলা সুবার একটি প্রশাসনিক অঞ্চল এবং সুলতানী যুগে একজন নবাবের শাসনাধীন প্রশাসনিক অঞ্চলরূপে বিখ্যাত ছিল। ভূপ্রকৃতিগতভাবে অঞ্চলটি বঙ্গসমভূমির পূর্বপ্রান্তিক সম্প্রসারণ। অঞ্চলটির উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় (বর্তমান মেঘালয় রাজ্য), দক্ষিণে পার্বত্য ত্রিপুরা (বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য), পশ্চিমে ময়মনসিংহ এবং পূর্বে কাছাড় (অর্থাৎ বর্তমান আসাম রাজ্যের কাছাড় ও হাইলাকান্দি জিলা)। প্রাচীনকালে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের সমভূমি ও শ্রীহট্ট নামক ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইতিহাসের উপাদান :

প্রাগৈতিহাসিক ধূসরতাক্লিষ্ট অতীতের বিবরণ এখনও অনাবিষ্কৃত থাকলেও ঐতিহাসিক যুগের কিছু উপাদান শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রাচীন যুগের ইতিহাস পুনর্নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। যে উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে শ্রীহট্টের প্রাচীন যুগের ইতিহাস নির্মাণ সম্ভব, সেগুলোকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) লিখিত উপাদান ও (২) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। আলোচ্য সময়সীমায় লিখিত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত। 'সি-ইউ-কি' এবং আল বিরুণীর 'কিতাবুল হিন্দ' ছাড়া ও হট্টনাথের পাঁচালিতে শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উপাদান পাওয়া যায়। এই লিখিত উপাদানগুলির নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে নিধনপুর তাম্রলিপি, পশ্চিমভাগ তাম্রলিপি, কালাপুর তাম্রশাসন, ভাটেরা তাম্রফলক এবং কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা ইতিহাস প্রবাহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বহন কবে চলেছে। গ্রন্থিত এবং উৎকীর্ণ উপাদানগুলির সমন্বয়ে প্রাচীন শ্রীহট্টেব বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস নির্মাণ করা যায়।

চীনদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করেন। তাঁব লিখিত বিবরণীব নাম সি-ইউ-কি। কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মন কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ৬৪০ খৃষ্টাব্দে কামরূপ ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণীতে উল্লেখিত শিলিচটলোকেই সিলেট বা শ্রীহট্ট বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁর বিবরণ থেকে সিলেটের রাজনৈতিক অবস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বৌদ্ধধর্মের উৎসের দেশ ভ্রমণে এসেছিলেন তীর্থযাত্রীর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে। কামরূপ ও সিলেট অঞ্চলে নিজে ভ্রমণ কবে এ অঞ্চলেব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কাজেই তাঁর বিবরণের নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহাতীত। পক্ষান্তরে আলবিরুণীর 'তাহাকিক-ই-হিন্দ্' বা 'কিতাবুল হিন্দ্' গ্রন্থখানির লেখা শেষ হয় ১০৩০ খৃষ্টাব্দে এবং আলবিরুণী নিজে এ অঞ্চল ভ্রমণ করেননি। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শ্রুত বিবরণই লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। হট্টনাথের পাঁচালী মূলত একটি স্তুতি গাথা। হট্টনাথ গৌড় রাজবংশের কুল দেবতা। গ্রন্থখানিতে হট্টনাথের স্তুতিগাথা ছাড়াও রাজবংশের ইতিহাসমূলক কাহিনীও রয়েছে। তবে স্তুতি গাথার সঙ্গে বিবৃত আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী পৌরাণিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন। প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৃহস্পতি ছিলেন গৌড়রাজের সভাপণ্ডিত। ইনি শ্রীহট্টে আর্যীকরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা দ্বিজ নিধিপতির অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন বলে কথিত হয়। প্রচলিত কাহিনী মতে, বৃহস্পতি রাজসভায় গৌড়ের ইতিহাস কীর্তন করেন। এই ইতিহাস মুখে মুখে বহু পণ্ডিতের স্মৃতি বহন করে পণ্ডিত রঘুনন্দন পর্যন্ত চলে আসে। রঘুনন্দনের প্রপৌত্র গণেশরাম শিরোমণি 'হট্টনাথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করেন। প্রায় একশত বছর পূর্বে আখালিয়ার কুলচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ী থেকে ভাটপাড়ার জাহ্নবী ভট্টাচার্য—

'হট্টনাথের পাঁচালী'র নষ্টোদ্ধার করেন।এই পাঁচালী শ্রুতি পর্যায়ে কয়েক শতাব্দী ছিল বলে এতে পরবর্তী প্রক্ষেপ বা মূল কাহিনীর কোন অংশে সতর্ক বা অসতর্ক বিয়োজনের সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করা যায় না। তথাপি পাঁচালীটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার গতিবিধি এতে নির্দেশিত। তাছাড়া ত্রিপুরার রাজমালা ও ভাটেরার তাম্রফলকের সঙ্গে পাঁচালি-বর্ণিত কাহিনীর অনেক সঙ্গতি পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি কালের ক্রমানুসারে বিন্যাস করলে প্রথমেই আসে নিধনপুর তাম্রশাসন। পঞ্চখণ্ড পরগণার নিধনপুর গ্রামে ১৯১২ থেকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৬ খানা তাম্রলিপি পাওয়া যায়। পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এগুলোর পাঠোদ্ধার করেন। তাম্রলিপিগুলি সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। সে সময়ে কামরূপের রাজা ছিলেন কুমার ভাস্কর বর্মন। তিনি এই তাম্রলিপিগুলোর মাধ্যমে তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভূতিবর্মন কর্তৃক ব্রাহ্মণদিগকে দানকৃত ভূমির দলিল নবায়ন করেন। হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ এবং নিধনপুর তাম্রলিপি পরস্পরের পরিপূরকরূপে সমকালীন ইতিহাসের উপর আলোকপাত করতে পারে।

কালাপুর তাম্রশাসনখানি কালের ক্রমানুসারে দ্বিতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ফলকখানি সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলে কমলাকান্ত গুপ্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩] এই তাম্রশাসন দ্বারা সামন্ত নৃপতি মারুণ্ডনাথ কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে কিছু ভূমিদান করেন স্থানীয় ব্রাহ্মণদের। মারুণ্ডনাথের সঙ্গে মারুণ্ড নৃপতি অভিধাযুক্ত হয়ে কুশিয়ারা নদীর দাক্ষিণাঞ্চলের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান নির্দেশ করছে। সিলেটের ভাটেরা নামক স্থানে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে (১৮৭২ খৃঃ) আবিষ্কৃত দুখানা তাম্রফলক শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। দক্ষিণ সিলেটের ভাটেরায় অবস্থিত একটি টিলা হোমের টিলা নামে কথিত। কোন কার্যব্যাপদেশে ঐ স্থানে খননকার্যের ফলে আকস্মিকভাবেই ফলক দু'খানা পাওয়া যায়। ঘটনাক্রমে ঐ সময় সুবিখ্যাত মারাঠা পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও তাঁর বোন পণ্ডিতা রমাবাঈ সিলেটে অবস্থান করছিলেন। সিলেটের ডেপুটি কমিশনার লটমন জনসন ফলক দু'খানা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে দেখান। সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি দু'খানি ইনিই প্রথম পাঠোদ্ধার করেন। ফলকদ্বয়ের উৎকীর্ণের তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। কিশোরীমোহন গুপ্তর মতে একটি তাম্রলিপি ১০৪৯ খৃষ্টাব্দে এবং অপরটি কয়েক বছর পরে উৎকীর্ণ হয়েছিল।[৪] তবে ফলকদ্বয়ের তারিখ একাদশ ও দ্বাদশ শতক হলে 'হট্টনাথের পাঁচালী'তে বর্ণিত রাজাদের নাম ও তাঁদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ফলকদ্বয়ের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

১৯৬০ এবং তৎপরবর্তী কালে সিলেট ও অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত কতকগুলো প্রাচীন মুদ্রা শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস প্রক্রিয়ার স্বাক্ষর বহন করে।

প্রাক্ ষষ্ঠ শতাব্দী যুগের রাজনৈতিক অবস্থা :

শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। প্রাচীন যুগের প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়টি অবশ্যই বিকাশ পূর্ব স্তর এবং সে স্তরের ইতিহাস প্রক্রিয়ার প্রবাহটি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। ষষ্ঠ শতাব্দীর কিছু পূর্বে শ্রীহট্ট অঞ্চলে সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু সে সময়ের ইতিহাস কিংবদন্তী নির্ভর এবং পরবর্তীকালে রচিত পৌরাণিক কাহিনী দ্বারা আচ্ছন্ন। তবে বিকাশপূর্ব পর্যায়ে এ অঞ্চলে যে আদি অষ্ট্রেলীয় জাতির বসবাস ছিল, সে তথ্য শুধুমাত্র অনুমান নির্ভর নয়। কারণ এদের বাহিত অষ্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি সিলেটী উপভাষা এবং লোকসংস্কৃতির অবকাঠামোকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, যার স্বাক্ষর এখনও বিরল নয়। পরবর্তী কালে বড়োদের বৃহৎ জনপ্রবাহ এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। আত্তিকরণের ফলে আদি অষ্ট্রেলিয়রা বড়ো জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিলীন হযেছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভোটব্রহ্ম ভাষীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেও অষ্ট্রিক ভাষা সংস্কৃতির চিহ্ন একেবারে লোপ হয়ে যায়নি। নৃতাত্ত্বিক আত্তিকরণ এবং সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণের এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করার পূর্বেই আর্যদের লাঙ্গলভিত্তিক সংস্কৃতির প্রভাব শ্রীহট্ট অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়ে এক নতুন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটিয়েছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমারের নিম্নোক্ত অভিমতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"The early history of Sylhet is not known, but it would appear that the fertile Surama Valley area attracted Aryan speaking settlers from west, Dacca and Mymensingh and beyond, and the Aryan language spread in the wake of the spread of agricultural communities, and in this way a wedge of Aryan language was spread through the plain lands of Sylhet between the Bodos of the East and those of Tripura."[৫]

সুনীতি কুমার কিন্তু এই আর্যীকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভের কাল নির্দেশ করেননি। ভি. এস. আগরওয়াল পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লেখিত 'সুরমস' জনপদকে সুরমা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত প্রাচীন শ্রীহট্ট বলে চিহ্নিত করেছেন।[৬] আগরওয়ালের অনুমান সঠিক হলে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেই আর্যাবর্তের রাজনৈতিক সংগঠনের ধাঁচে শ্রীহট্টে একটি জনপদ সংগঠিত হয়েছিল বলে ধরে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই শ্রীহট্টে আর্য সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু এর সমর্থনে অন্য কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। অপরদিকে টলেমী ও অপর একজন গ্রীক বণিকের সামুদ্রিক অভিযানের কাহিনীর ম্যাক ক্রিণ্ডেলকৃত অনুবাদ 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি' নামক গ্রন্থের বর্ণনায় প্রতিভাত হয় যে, কিরাদিয়া রাজ্যের সীমান্তে যে মেলা হত তাতে উত্তর দেশ থেকে তেজপাতা আমদানী

হত। প্রাচিন কিরাদিয়া রাজ্যকে বর্তমান ত্রিপুরা এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চল প্রাচিন শ্রীহট্ট বলে চিহ্নিত করা হয়। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীহট্ট অঞ্চলে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত আর্যদের লাঙ্গলভিত্তিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেনি। বলা বাহুল্য 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি'তে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ভৌগোলিক অবস্থা লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীহট্টে আর্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে পশ্চিমদিক থেকে। অর্থাৎ ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। শ্রীহট্টের ভৌগোলিক অবস্থান আচার্য সুনীতি কুমারের উপরিউক্ত সূত্রের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে। আর্য সংস্কৃতি বিস্তারের কালটি নির্দেশের প্রয়োজন এইজন্য যে, এই সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক বিকাশের ধারাটি সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত। শ্রীহট্ট সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে যখন আর্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে তখন উত্তর ভারতের আর্যদের কাছে এ অঞ্চলটি প্রাগ্জ্যোতিষ কামরূপ নামে পরিচিত ছিল বলে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। রামায়ণ-মহাভারতের সাক্ষ্য বাদ দিলেও খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত[৮] মার্কেণ্ডেয় পুরাণে প্রাগ্জ্যোতিষকে একটি জাতি[৯] এবং কামরূপকে অঞ্চল[১০] রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কামরূপের পাহাড়ে সূর্যদেবের মন্দির[১১] আর্য সংস্কৃতি বিস্তার লাভের সাক্ষর বহন করে। সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে গুপ্ত সম্রাটের কাছে কামরূপের বশ্যতা স্বীকারের উল্লেখ উত্তর-পূর্ব ভারতে আর্য সংস্কৃতি বিস্তারের সমর্থনসূচক ঘটনা। অবশ্য এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে যে কামরূপ নামক রাজ্য সংগঠিত হয়েছিল এবং তা যে আর্য সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে জ্ঞাত ছিল সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই। তবে সে সময় শ্রীহট্ট কামরূপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং শ্রীহট্টের প্রাক্-ষষ্ঠ শতাব্দী যুগের ইতিহাস এখনও ধূসরতামুক্ত হয়নি।

ষষ্ঠ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী কালের রাজনৈতিক অবস্থা :

কামরূপ রাজ্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট অঞ্চল যে কামরূপের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সে তথ্য কেবল অনুমান নির্ভর নয়। কামরূপের আর্যায়িত মঙ্গোলীয় বর্মণ বংশীয় রাজা মহাভূতি বর্মনের রাজত্বকালে যে শ্রীহট্ট কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ ভাস্কর বর্মণের নিধনপুর তাম্রফলক। নিধনপুর তাম্রফলকটি মূলতঃ ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদানের একটি দলিল। বিভাগপূর্ব করিমগঞ্জ মহকুমায় পঞ্চখণ্ড পরগণার নিধনপুর গ্রামে সাতটি তাম্রফলক একটি ধাতব শিলমোহর দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। আবিষ্কারের পর একটি ফলক হারিয়ে যায়। কামরূপরাজ ভূতিবর্মণ বা মহাভূত বর্মণ ভূমিচ্ছিদ্র রীতি অনুযায়ী চন্দ্রপুর বিষয়ের ময়ুরশাল্মলী অগ্রহার ক্ষেত্রের সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য তাম্রফলকে উল্লেখিত ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষদিগকে ভূমিদান করেছিলেন। মূল দলিলটি অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গিয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণদের আবেদনে ভূতিবর্মণের অধঃস্তন পুরুষ কুমার ভাস্করবর্মণ বৃদ্ধ

প্রপিতামহের দানপত্র নবায়ন করেছিলেন তাঁর কর্ণসুবর্ণ শিবির থেকে। ছটি ফলকে ২০৫ জন ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া গেছে। হারিয়ে যাওয়া সপ্তমটিতে আরো কিছু নাম ছিল। ময়ূরশাল্মলী অগ্রহার নামক যে বিশাল ভূখণ্ড ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হয়েছিল তার সীমানা নির্দেশে কৌশিক ও শুষ্ক কৌশিক এবং গাঙ্গিনিকা নামক ক্ষীণকায় স্রোতস্বিনীর উল্লেখ আছে।

প্রাচীন ভারতের শাসনব্যবস্থায় 'বিষয়' অঞ্চল বতমান জিলার সমার্থক। মৌর্যযুগে সাম্রাজ্যকে কয়েকটি দেশ এবং প্রত্যেকটি দেশকে কয়েকটি 'অহর' বা বিষয়ে ভাগ করা হত। 'দেশ' আধুনিক যুগের 'প্রদেশ'এর প্রাচীন রূপ। গুপ্তযুগে প্রদেশকে দেশ এবং ভূক্তি বলা হত। সাধারণতঃ পশ্চিম ভারতের প্রদেশগুলিকে দেশ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রদেশগুলিকে ভূক্তি বলা হত। দেশ বা ভূক্তিগুলি আবার বিষয়ে বিভক্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে প্রদেশকে ভূক্তি এবং জিলাকে বিষয় বলা হত। কামরূপের বর্মণ রাজাদের শাসনব্যবস্থা প্রাচীনকালেব সর্বভারতীয় কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত ছিল বলেই নিধনপুর তাম্রশাসনে 'চন্দ্রপুরী বিষয়'এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ভূক্তির উল্লেখ না থাকায় চন্দ্রপুরী বিষয়ের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ময়ূরশাল্মলী অগ্রহার ক্ষেত্রটি শ্রীহট্টে ছিল না বলে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদই সর্বপ্রথম অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত সি-ইউ-কিতে উল্লেখিত শি-লি-চ-ট-ল কে শ্রীহট্ট এবং উহা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল বলে অভিমত প্রকাশ কবেন।[১২] কনকলাল বরুয়া[১৩] এবং প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী (History of the Civilization of the People of Assam) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ও চন্দ্রপুরী বিষয়টি প্রাচীন শ্রীহট্ট বলে মেনে নিতে রাজি নন। অপরদিকে কিশোরীমোহন গুপ্ত অন্যান্যদের বক্তব্য খণ্ডন করেন[১৪] এবং তাঁকে সমর্থন করেন কয়েকজন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিধ। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, জে.সি. ঘোষ এবং আর. জি. ভাণ্ডারকার এঁদের অন্যতম।[১৫] নিধনপুর তাম্রফলককে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এঁরা চন্দ্রপুরী বিষয়ই প্রাচীন শ্রীহট্ট বলে দাবি পেশ করেছেন। তাঁদের এ দাবি পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত পশ্চিমভাগ তাম্রফলক দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। পশ্চিমভাগ তাম্রফলকে স্পষ্টভাবে পুণ্ড্রবর্ধন ভূক্তির শ্রীহট্ট মণ্ডলের চন্দ্রপুর বিষয়ের উল্লেখ চন্দ্রপুরী বিষয়ের অবস্থান নির্দেশ করেছে। এই তথ্যগুলি প্রমাণ করে যে, পূর্বে না হলেও ভূতিবর্মনের রাজত্বকাল (ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) এবং ভাস্কর বর্মণের রাজত্বকাল (সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ) পর্যন্ত শ্রীহট্ট কামরূপের অন্তর্গত একটি বিষয় ছিল। শ্রীহট্টের ইতিহাসবিদ্ অচ্যুতচরণ চৌধুরী যখন শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত লেখেন তখনও নিধনপুর তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়নি। চৌধুরী হিউয়েন সাঙের বিবরণীর বর্ণনা এবং তৎসম্পর্কে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্‌দের অভিমতের উপর ভিত্তি করেই মন্তব্য করেছেন যে, 'যে সময় হিউয়েন সাঙ্ শ্রীহট্ট দর্শন করতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে ভাস্করবর্মার সভায় গমন করেন, তৎকাল পর্যন্ত শ্রীহট্ট ও জয়ন্তী কামরূপ রাজ্যের অঙ্গ ছিল।'[১৬] তবে হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় আছে যে, সমতট থেকে উত্তর পূর্বদিকে সাগরপার্শ্বে পর্বত ও উপত্যকার পরপারে শি-লি-চ-ট-ল

দেশে তিনি পৌঁছেছিলেন।[১৭] অর্থাৎ শ্রীহট্ট তখন সমুদ্র সমীপবর্তী ছিল। সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি জিলার বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্টের জিলার অধিকাংশ নিম্নাঞ্চল জলমগ্ন থাকত এবং সমুদ্রসদৃশ ছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণ এবং নিধনপুর তাম্রফলকে উৎকীর্ণ বিষয়বস্তু একত্রিত করে অধ্যয়ন করলে সঙ্গত কারণেই মনে হয় যে, চন্দ্রপুরী বিষয়ের বিষয়পতির কার্যালয় শি-লি-চ-ট-লে বা শ্রীহট্ট শহরে হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, বিষয়ের শাসনভাব তৎকালে বিষয়পতির উপর ন্যস্ত থাকত এবং তিনি অবশ্যই কোন উন্নত স্থানে অবস্থান করতেন। নিধনপুর তাম্রলিপিটি চন্দ্রপুরী বিষয়ের বিষয়পতিকে সম্বোধন করেই প্রদত্ত হয়েছে।

গুপ্ত সামন্তরাজ্য :

কিন্তু সপ্তম শতাব্দীব শেষভাগে কামরূপে যখন বর্মণ বংশেব রাজত্বেব অবসান ঘটে এবং শালস্তম্ভ নতুন রাজবংশেব প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বর্মণ বংশীয় রাজাদের অধীনস্থ কামরূপেব অনেক অঙ্গই কামরূপ রাজ্য থেকে বেরিয়ে যায়। এ সময় শ্রীহট্টও কামরূপ রাজ্যেব অধীনতামুক্ত হয়। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমঙ্গল থানার কালাপুর গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনটি এই তথ্যই প্রমাণ করে। তাম্রশাসনটিতে কোন সন তারিখের উল্লেখ নেই। বিষয়বস্তুব বিন্যাস পদ্ধতি ও লিপির গঠন প্রণালী দেখে পণ্ডিতগণ লিপির উৎকীর্ণ কাল সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ বলে মনে করেন।[১৮] এই তাম্রলিপির মর্মমতে সামন্ত নৃপতি মারুণ্ডনাথ কুশিয়াবার দক্ষিণাঞ্চলে স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে কিছু ভূমি দান করেছিলেন। কালাপুর তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হয়েছে চৌতালী পরগণায়। অঞ্চলটি জঙ্গলাকীর্ণ। এই অঞ্চলে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, একটি ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ, একটি ইষ্টক নির্মিত কূপ এবং একটি বিষ্ণুমূর্তিও পাওয়া গেছে। তাই মারুণ্ডনাথ প্রদত্ত ভূমি চৌতালী পরগণায় ছিল বলে কমলাকান্ত গুপ্ত অভিমত প্রকাশ করেন।[১৯]

কালাপুর তাম্রশাসন প্রদাতা সামন্ত নৃপতি মারুণ্ডনাথের কুমাবামাত্যাধিকরণ, ভট্টারক, সামন্ত সৈনাপতি প্রভৃতি উপাধি এবং দানপ্রাপক ব্রাহ্মণদের নামের শেষে স্বামী উপাধি[২০] যুক্ত থাকায় তাঁকে ত্রিপুরার সামন্তরাজ লোকনাথের উত্তরাধিকারী বলে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করে থাকেন। তবে সামন্ত নৃপতি লোকনাথের আধিপত্য শ্রীহট্টে বিস্তারলাভ করেছিল কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। লোকনাথ ও মারুণ্ডনাথকে গুপ্ত রাজাদের সামন্ত বলে জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য মনে করেন।[২১] মগধে প্রতিষ্ঠিত পরবর্তী গুপ্ত বংশের রাজা আদিত্য সেনগুপ্ত অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার অধিকাব লাভ করেছিলেন। সে সময়ে পরবর্তী গুপ্ত বংশের আধিপত্য শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলে মনে হয় এবং মারুণ্ডনাথ সেই পরবর্তী গুপ্তদেব সামন্ত ছিলেন।

হরিকেল রাজ্য—

কালের ক্রমানুসারে পশ্চিমভাগ তাম্রলিপি কালাপুরের পরবর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। পশ্চিমভাগ তাম্রলিপিতে শ্রীহট্টের দশম শতকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। অষ্টম থেকে দশম পর্যন্ত দুই শতাব্দীর ইতিহাস প্রক্রিয়ার বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ উপাদান শ্রীহট্ট অঞ্চলে এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ ও তৎপরবর্তী সময়ে শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত কতিপয় মুদ্রা, কয়েকখানা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গ্রন্থাবলী, চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং-এর বর্ণনা এবং শ্রীহট্টের ভৌগোলিক সীমার বাইরে প্রাপ্ত দুটি তাম্রফলকের ভিত্তিতে এই দুই শতকের ইতিহাস নির্মাণের প্রবণতা ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত মুদ্রা, চট্টগ্রাম ও ময়নামতী তাম্রশাসন, আর্যমঞ্জুশ্রী মূলাকলপ, রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য, রূপচিন্তামণি কোষ, কর্পূর মঞ্জুরী, অভিধান চিন্তামণি ও ডাকার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ এবং ইৎ সিং-এর বিবরণ থেকে অবহিত হওয়া যায় যে, ভারতের পূর্ব সীমান্তে হরিকেল নামক একটি রাজ্য বর্তমান ছিল। কিন্তু সে রাজ্যটি শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিনা সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কতিপয় হরিকেল মুদ্রা শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত হয়েছে বটে, কিন্তু এতে হরিকেল রাজ্যের শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না। অষ্টম শতাব্দীতে রচিত আর্যমঞ্জুশ্রী মূলাকল্পে বঙ্গ, সমতট এবং হরিকেলকে স্বতন্ত্র প্রতিবেশী জনপদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[২২] প্রাচীন ভারতে মৌর্যদের রাজত্বকাল থেকে জনপদ বলতে স্বতন্ত্র রাজ্য বুঝাত না। মৌর্য শাসন ব্যবস্থায় জনপদ বিষয়ের নিম্নতর প্রশাসনিক স্তর ছিল। সুতরাং আর্যমঞ্জুরীমূলাকল্পে উল্লেখিত জনপদ কোন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল কিনা সে ব্যাপারটি বিতর্কিত হতে পারে। রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য এবং রূপ চিন্তামণি কোষ নামক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি মধ্যযুগীয় গ্রন্থে হরিকেল ও শ্রীহট্ট সমার্থক রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩] অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ চট্টগ্রাম তাম্রলিপির অনুসরণে রমণীমোহন শর্মা দেখিয়েছেন যে, বর্তমান শ্রীহট্ট জিলার প্রায় সকল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হরিকেল রাজ্যে কান্তিদেবের আধিপত্য ছিল।[২৪] এই লিপিতে ভদ্রদত্ত, ধনদত্ত এবং কান্তিদেব নামক তিনজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শাসকের নাম পাওয়া যায়। ধনদত্ত ও কান্তিদেব পরপর ভদ্রদত্তের উত্তরাধিকারী ছিলেন। আবার ময়নামতীতে আবিষ্কৃত আরেক তাম্রফলকে (১১৪১ শক = ১২৪৭ খৃঃ) রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেব নামক একজন শাসকের নাম পাওয়া যায়।[২৫] প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন যে, হরিকেল শ্রীহট্টেরই অপর নাম এবং শ্রীহট্ট রাজ্য যখন বঙ্গে সম্প্রসারিত হয়, তখন বঙ্গের অবশিষ্টাংশ হরিকেল নামে খ্যাত হয়।[২৬] এসব তথ্য এবং গবেষণামূলক আলোচনার উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত শ্রীহট্ট বঙ্গ সমতট অঞ্চলে হরিকেল রাজ্য বর্তমান ছিল।[২৭] কিন্তু অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই অভিমত মেনে নিলে কালাপুর ও পশ্চিমভাগ তাম্রলিপি প্রদত্ত তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বঙ্গ-সমতটের কোন কোন অঞ্চলে হরিকেল রাজ্যের অস্তিত্ব সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান থাকলেও শ্রীহট্ট অঞ্চলে তার বিস্তার অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বা দশম শতাব্দীর পরে ছিল বলে মনে হয় না।

বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শাসন—

দশম শতাব্দীতে বৃহত্তর সিলেট জিলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অধীনস্থ হয়। ১৯৬১ সালে বর্তমান মৌলবী বাজার জিলার রাজনগর থানার পশ্চিমভাগ গ্রামে আবিষ্কৃত একটি তাম্রলিপি এই তথ্যই পরিবেশন করে। পশ্চিমভাগ তাম্রলিপি নামে খ্যাত এই ঐতিহাসিক দলিলটি দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলে পণ্ডিতদের অভিমত। আরাকানী সূত্র থেকে জানা যায়, বৈশালী নগরের চন্দ্র রাজারা ৭৮৮ সালে রাজ্যচ্যুত হয়ে সমতটে বিতাড়িত হন। সমতট অঞ্চলে ঐ বংশীয় রাজারা দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন।[২৮] তাঁদের রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুর। পশ্চিমভাগ তাম্রফলক প্রদাতা মহারাজ শ্রীচন্দ্র দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন।[২৯] তাম্রফলকের মর্মমতে মহারাজ শ্রীচন্দ্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এই তাম্রফলকে মহারাজ শ্রীচন্দ্রের বংশতালিকাও উৎকীর্ণ আছে। রাজা পূর্ণচন্দ্রের পর সুবর্ণচন্দ্র এবং তৎপর মহারাজ শ্রীচন্দ্র রাজত্ব করেছিলেন। পশ্চিমভাগ তাম্রফলকটিও পূর্বোল্লেখিত তাম্রলিপিগুলির ন্যায় একটি ভূমিদানের দলিল। কিন্তু এর বিষয়বস্তু দশম শতকের শ্রীহট্টের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করে। শ্রীহট্ট নামটি পশ্চিমভাগ তাম্রফলকের পূর্বের কোন ঐতিহাসিক নিদর্শনে পাওয়া যায় না।

পশ্চিমভাগ তাম্রফলকের মর্মমতে দানকৃত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তির শ্রীহট্ট মণ্ডলের চন্দ্রপুর, গেরালা এবং পগার বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরের সঙ্গে বিক্রমপুরের রাজাদের প্রশাসনিক স্তরগুলির তুলনা করলে সহজেই দৃষ্ট হয় যে, তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় ভূক্তি (প্রদেশ) এবং বিষয় (জিলা) এর মধ্যে মণ্ডল নামক একটি মধ্যবর্তী স্তর ছিল। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনুসরণে স্তরটিকে বিভাগ বলা যেতে পারে। তাম্রফলকের বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, মণ্ডল স্তরটির অধীনস্থ অঞ্চলের আয়তন নিধনপুর তাম্রফলকে উল্লেখিত বিষয়াধীন অঞ্চলের আয়তন অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ছিল এবং মণ্ডলাধীন বিষয়গুলির আয়তন কামরূপ রাজ্য বা হর্ষবর্দ্ধন অথবা গুপ্তদের বিষয় থেকে ক্ষুদ্রতর ছিল। শ্রীহট্ট মণ্ডল কমপক্ষে তিনটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল এবং তিনটি বিষয়েই ভূমিদান করা হয়েছিল। ফলকের বর্ণনামতে দানকৃত ভূমির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:[৩০]

পূর্ব সীমায় বৃহৎ কট্টালী (দুর্গযুক্ত খাড়া পাহাড় বা টিলা), দক্ষিণ সীমান্তে মনি নদী, পশ্চিমে জুভঙ্গ খটক (খাল বা জলাশয়), কাটাপান্য খটক এবং বেত্রাঘুংঘি নদী এবং উত্তর সীমান্তে কোসিয়ার নদী। এই চতুঃসীমার অন্তর্গত ব্রহ্মপুর সুবিখ্যাত।

পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত বেত্রাঘুংঘী বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহের সীমা নির্দেশ করে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত ভেড়া মোহনা বা ধনেশ্বরীর প্রাচীন নাম বলেই অনুমিত হয়। পূর্বপ্রান্তের বৃহৎ কট্টালী বর্তমান করিমগঞ্জ ও বাংলাদেশের সীমা নির্দেশক আদম আইল বা পাথারিয়া পাহাড় বলেই মনে হয়। অধ্যাপক জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য কাছারী রাজাদের শেষ রাজধানী খাসপুরকে শ্রীহট্ট মণ্ডলের ব্রহ্মপুর বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস পান।[৩১] কিন্তু তিনি নিজেই আবার শ্রীহট্ট মণ্ডলে দানকৃত ভূমির পূর্বসীমার বৃহৎ কট্টালীকে পাথারিয়া বা দোহালিয়া পাহাড় বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩২] পাথারিয়া এবং দোহালিয়া এক পাহাড়ের দুটি নাম নয়। পাথারিয়া থেকে দোহালিয়ার দূরত্ব অনেক। দোহালিয়া পূর্বে অবস্থিত। যদি দোহালিয়াকেই দানকৃত ভূমির পূর্বসীমা বলে মেনে নেওয়া হয়, তথাপিও দানকৃত ভূমির চৌহদ্দির মধ্যে খাসপুর থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। এছাড়া খাসপুরের পূর্ব নাম যে ব্রহ্মপুর ছিল, তা জয়ন্তিয়া বুরঞ্জীতে উল্লেখিত ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের বিশ্বাসযোগ্যতাহীন একটি ঘটনার বর্ণনায় বিবৃত হয়েছে।[৩৩] এর পূর্বের কোন ঐতিহাসিক বিবরণে কাছাড়ের সমতলে ব্রহ্মপুর নামীয় কোন স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পশ্চিমভাগ তাম্রদলকে উল্লেখিত ব্রহ্মপুর কোন নির্দিষ্ট স্থান নাম নয়, দানকৃত ভূমি যে অঞ্চলে বিস্তৃত সে অঞ্চলেরই নাম।

এই লিপি থেকে জানা যায়— শ্রীহট্ট মণ্ডল অতল হ্রদ শ্রেণী সমাকীর্ণ দ্বীপরাজী। এখানে ইন্ধেশ্বর নৌবন্দর ছিল। বর্তমান মৌলবী বাজার জিলায় অবস্থিত হাইল হাওর, হাকালুকি প্রভৃতি নিম্নভূমি এখনও বর্ষাকালে বিশাল জলাশয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। দশম শতাব্দীতে এগুলোর আয়তন এবং গভীরতা বিশাল হ্রদসদৃশ থাকারই সম্ভাবনা। ইন্ধেশ্বর নামক স্থানটি জিলার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত থেকে অদ্যাবধি শ্রীহট্টের প্রাচীন ঐতিহ্যের মান ঘোষণা করছে।

পশ্চিমভাগ তাম্রলিপির বিষয়বস্তু প্রমাণ করে যে, বিক্রমপুরের চন্দ্র রাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মহারাজ শ্রীচন্দ্র প্রদত্ত তাম্রলিপি চন্দ্রপুর, গেরালা ও পগার নামক তিনটি বিষয়ে ভূমিদানের দলিল বিশেষ। দলিলের তিনটি পৃথক অংশে তিন বিষয়ে ভূমিদানের নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম অংশে চন্দ্রপুর মঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর অধ্যাপক, বিদ্যার্থী, জ্যোতির্বিদ, নর্তক-নর্তকী, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, করণিক, ঢক্কা বাদক, শঙ্খবাদক, চর্মকার, ক্ষৌরকার, স্থপতি এবং সূত্রধর প্রভৃতির জন্য মঠের বিভিন্ন নিয়মানুযায়ী ১২০ পটকা ভূমি বরাদ্দ হয়েছে। এক পটকা ৫০ একরের সমান।[৩৪] এই বর্ণনা থেকে জানা যায়, চন্দ্রপুর মঠটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় সদৃশ বিদ্যাপীঠ ছিল। দ্বিতীয় অংশে কয়েকটি দেশান্তরীয় মঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক, বিদ্যার্থী, জ্যোতিবিদ, ক্ষৌরকার, রজক, চর্মকার, মালাকার, করণিক, কর্মকার, কলু, চিকিৎসক প্রভৃতিকে বিভিন্ন সূত্রানুযায়ী ২৮০ পটকা ভূমি দান করা হয়েছে। আটটি দেশান্তরীয় মঠের চারটি বাঙ্গালায় বা বঙ্গে অবস্থিত ছিল। ফলকের তৃতীয় অংশে ভূমিচ্ছিদ্র রীতি অনুযায়ী ছয় হাজার ব্রাহ্মণ ও বেদ অধ্যয়নরত বিদ্যার্থীকে নিষ্কর ভূমি দান করা হয়েছে এবং ইন্ধেশ্বর নৌবন্দরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫২ পটকা ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

দানকৃত ভূমির পরিমাণ মোটামুটিভাবে ২২৬০০ একর।[৩৫] এই ভূমিতে ব্রাহ্মণ এবং কৃষকগণ বসবাস করতেন। এঁরা কিন্তু নিষ্কর প্রজা ছিলেন না। তাদিগকে ভূমি-রাজস্ব দিতে হত। রাজস্ব রাজকোষে না দিয়ে দানগ্রহীতাগণকে দেবার নির্দেশ তাম্রফলকে আছে। অর্থাৎ প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদিগকে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীহট্টে বিক্রমপুরের চন্দ্ররাজাদের শাসন একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, দশম শতকের শেষভাগ ও একাদশ শতকের প্রথমভাগে প্রথম মহীপাল (৯৭৭-১০২৭) দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বানগড় ও ত্রিপুরা লিপি থেকে জানা যায় যে, মহীপাল চন্দ্রবংশীয় উপাধিধারী রাজাদের হটিযে গৌড় বা উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন। ফলে শ্রীহট্টে চন্দ্রবংশীয় রাজত্বেব অবসান ঘটে। কিন্তু শ্রীহট্টে বাংলার পাল সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করেনি।

শ্রীহট্ট রাজ্যের উত্থান-পতন—

কামরূপ থেকে বেরিয়ে আসার পর শ্রীহট্টের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বঙ্গ-সমতটের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের নিববচ্ছিন্ন প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত পরবর্তী গুপ্তদের সামন্ত রাজ্য, বঙ্গসমতটের সম্মিলনে হরিকেল রাজ্য এবং বিক্রমপুরেব চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মণ্ডলরূপে শ্রীহট্টের বিভিন্ন অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই শ্রীহট্টের অধিবাসীদের স্বশাসিত রাজ্যের উত্থান ঘটে। পশ্চিম থেকে আগত আর্যভাষী অধিবাসীদের প্রভাবে প্রাচীন শ্রীহট্টের অধিবাসী অষ্টিক-বড়ো সঙ্কর জাতির মধ্যে যে আত্তিকরণ ও তাদের সংস্কৃতি প্রবাহে যে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সুদূর অতীতে আরম্ভ হয়েছিল, কামরূপের বর্মন বংশীয় রাজা, সামন্ত নৃপতি মারুণ্ড নাথ এবং বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় উপাধিধারী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সে প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। আর্যীকরণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় বড়োপ্রধানগণ আর্যায়িত নাম গ্রহণ করে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি পরিবাব বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজত্বের অবসানের পর একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীহট্টমণ্ডলে স্বতন্ত্র শ্রীহট্ট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভাটেরা নামক স্থানে প্রাপ্ত তাম্রফলক দু'টি এই ইতিহাস প্রক্রিয়ারই নিদর্শন। ভাটেরায় প্রাপ্ত প্রথম তাম্রফলকটি প্রদান করেছিলেন কেশবদেব ওরফে বিপুরাজ গোপীগোবিন্দ। ইনি তাঁর প্রদত্ত তাম্রফলক দ্বারা একটি শিব মন্দিরের জন্য ভূমি দান করেছিলেন। দ্বিতীয় তাম্রফলকটির প্রদাতা কেশবদেবের পুত্র ঈশানদেব একটি বিষ্ণু মন্দিরের জন্য ভূমিদান করেছিলেন। কাজেই তাম্রদলকদ্বয় চরিত্রগতভাবে ভূমিদানেরই দলিল। ফলকদ্বয়ের উৎকীর্ণের তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। তারিখ নির্দেশক অঙ্কগুলি পরিষ্কারূপে খোদিত নহে। ফলকে উৎকীর্ণ 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ'কে খৃষ্টাব্দের সঙ্গে সমীকরণ করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, রমেশচন্দ্র মজুমদার, এবং কিশোরীমোহন গুপ্ত ফলক দু'টির উৎকীর্ণের বিভিন্ন তারিখ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু কিশোরীমোহন গুপ্তের তারিখ দু'টিই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তাঁর মতে প্রথম ফলকটি ১০৪৯ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি এর কয়েক

বৎসর পরে উৎকীর্ণ হয়েছিল।[৩৬] আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কেশবদেব প্রদত্ত ফলকটির উৎকীর্ণের কাল ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ বলে মনে করেন।[৩৭]

ভাটেরা তাম্রফলকদ্বয় থেকে কোন চন্দ্রবংশীয় পাঁচজন রাজার তালিকা পাওয়া যায়। বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবগীর্বান। নবগীর্বানের পব গোকুলদেব, নাবায়ণদেব, কেশবদেব এবং ঈশানদেব পরপর রাজত্ব করেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বীরযোদ্ধা, দানশীল ও বিখ্যাত নরপতি। তাঁরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ জয় করেন এবং রাজাদের সামন্তে পবিণত করেন। তাঁদের সুসজ্জিত নৌবহর ছিল। প্রথম তাম্রফলকের মর্মমতে কেশবদেব শিবানুরক্ত ছিলেন এবং তাঁব উপাস্য শ্রীহট্টনাথের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৩৭৫ হাল ভূমি ও ২৯৬ বাড়ি দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে উৎসর্গ কবেছিলেন। দ্বিতীয় ফলকে রাজা ঈশানদেব কর্তৃক তাঁর উপাস্য মধু-কৈটভারির উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ মন্দির নির্মাণের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীহট্ট জিলায় সমস্ত মধ্যযুগ, বৃটিশ শাসনকাল ও পরবর্তী সময়ে ভূমি পরিমাপেব সর্বোচ্চ একক হাল নামে গৃহীত। হাল বলতে ৪.৮ একব ভূমি বুঝায়। হাল, কেদাব, পোয়া, যষ্টি, পণ, গণ্ডা, কডা প্রভৃতি শ্রীহট্টেব ভূমি পবিমাপেব সর্বোচ্চ থেকে নিম্নগামী একক। বর্তমান করিমগঞ্জ জিলায় (শ্রীহট্ট জিলার ভারতীয় অংশ) ভূবাসন কার্যালয়েব নথিপত্রে এখনও একরের সঙ্গে হালকেদাব প্রভৃতি একক ব্যবহার করা হয়। ভাটেবা তাম্রফলকেব পূর্বেব কোন ঐতিহাসিক দলিলে ভূমি পরিমাপের এই একক ব্যবহারের কোন নিদর্শন পাওযা যায না। তাহলে শ্রীহট্টে ভূমি পরিমাপের একক হিসেবে হাল কেদাব প্রভৃতি এ অঞ্চলেব অধিবাসীদেব মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং শ্রীহট্টের ভূমিজাত বাজাদের বাজত্বকালে তা রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ কবে বলে অনুমান করাটা অসমীচীন নয়।

স্বশাসিত শ্রীহট্ট রাজ্যের উত্থান বা পতন সম্পর্কে ভাটেরা তাম্রফলক বা অন্য কোন ঐতিহাসিক নিদর্শনে কোন উল্লেখ নেই। হট্টনাথের পাঁচালীতে উল্লেখিত চাব জন রাজা—অনন্তদেব বা নবগীর্বন্ত, গোকুল কিশোর, নরনারাযণ এবং গোবিন্দ রণকেশব এবং ভাটেবাব প্রথম তাম্রফলকের নবগীর্বান, গোকুল দেব, নারায়ণ ও কেশব দেবকে কেউ কেউ অভিন্ন মনে করেন।[৩৮] এই অভিন্নতা মেনে নিয়ে হট্টনাথের পাঁচালীর অনুসরণে নবগীর্বানের বংশ পরিচয় এবং রাজ্যপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে শ্রীহট্ট বাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার উপজাতীয় বংশ পরিচয় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কিন্তু হট্টনাথের পাঁচালীতে নবগীর্বন্তের পূর্বেকাব বাজা ও তাঁদের রাজত্বের যে বিস্তৃত কাহিনী বিবৃত আছে, তা কোন অবস্থাতেই ইতিহাসসম্মত হতে পারে না। নবগীর্বান সম্ভবতঃ বিক্রমপুরের চন্দ্র রাজাদের অধীনস্থ একস্থানীয় শাসক ছিলেন। মহীপালেব নিকট চন্দ্ররাজের পরাজয় ঘটলে শ্রীহট্ট অঞ্চলে পাল সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ না করায় তিনি এখানে এক স্বতন্ত্র বাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভাটেবা তাম্রফলকদ্বয়ের রাজাগণ নিজেদের বংশ পবিচয়ে চন্দ্রবংশ উল্লেখ কবার ফলে পূর্ববর্তী বিক্রমপুরের চন্দ্র বাজাদেব সঙ্গে তাঁদেব সম্পর্ক বা পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। শ্রীহট্ট রাজ্য সম্ভবতঃ ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা এবং বর্তমান

আসাম রাজ্যের কাছাড় ও হাইলাকান্দি জিলার সমতলভাগে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু জয়ন্তিয়া অঞ্চল শ্রীহট্ট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। ভাটেরার দ্বিতীয় তাম্রফলক প্রদাতা ঈশান দেবের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ নবগীর্বান বংশের কোন শক্তিশালী রাজা ছিলেন না বলে শ্রীহট্ট রাজ্য কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়। তবে পরবর্তীকালের গৌড়রাজ্য প্রাচীন শ্রীহট্ট রাজ্যের ক্ষীণাকার অবশিষ্টাংশ ছিল কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

খণ্ডরাজ্যের উত্থান ও ইতিকথা

শ্রীহট্ট রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণাঞ্চলে ত্রিপুরী রাজার রাজ্য বিস্তারলাভ করে। অবশিষ্টাঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান ঘটে।

ত্রিপুরারাজ্যের বিস্তার — ১১৯৫ সালে উৎকীর্ণ একটি লিপি থেকে জানা যায়— ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ ছেংফাচাগ বা ধর্মফা (হিন্দুনাম ধর্মধর) মিথিলা বা কান্যকুব্জ থেকে আগত দ্বিজনিধিপতিকে মনুকূল নামক বিরাট প্রদেশ দান করেছিলেন। লিপির বর্ণনামতে মনুকূলের পূর্বসীমায় লংলা পাহাড়, দক্ষিণে মনুনদী, পশ্চিমে গপলা এবং উত্তরে কুশিয়ারা নদী।[৩৯] কথিত আছে যে, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রিপুর রাজ ডুঙ্গুরফা বা দানকুরুফা, আর্যায়িত আদি ধর্মফা পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণতীরে হাকালুকিহাওরের নিকটবর্তী স্থানে বসতি করিয়েছিলেন।[৪০] এই স্থানটি পঞ্চখণ্ড নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণের নাম ছিল আনন্দ। দ্বিজনিধিপতিকে আনন্দের ষোড়শ অধঃস্তন বংশধর বলে অনেকে অনুমান করেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, সপ্তম শতাব্দীতে পঞ্চখণ্ডে ত্রিপুরারাজ আদি ধর্মফার রাজ্য বিস্তৃত হলে উহা ভাস্কররবর্মনের রাজত্বের পরবর্তী ঘটনা। কারণ এই পঞ্চখণ্ডেরই নিধনপুরে ভাস্কররবর্মনের তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। তবে সে সময় শ্রীহট্টে ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্তার দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি বলে মনে হয়। কেননা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই শ্রীহট্ট সামন্ত নৃপতি মারুণ্ডনাথের শাসনাধীন হয়।

যাহোক, শ্রীহট্ট রাজ্যের পতনের পর মনুকূল প্রদেশ দানের ঘটনা থেকে অনুমিত হয় যে, শ্রীহট্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কুশিয়ারা নদী পর্যন্ত ভূখণ্ড ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান আসামের করিমগঞ্জ জিলা ও বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের মৌলবী বাজার জিলা ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত হয়। এই অঞ্চলের এরূপ রাজনৈতিক অবস্থান ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান থাকে।

১১৯৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ত্রিপুরা লিপির বর্ণনামতে, দ্বিজনিধিপতি মনুকূল প্রদেশের অধিকারী হন। তিনি স্বীয় জন্মভূমি ইটাওয়ার স্মরণে অঞ্চলটির ‘ইটা’ নামকরণ করেন বলে কথিত হয়। ইটা পরবর্তীকালে একটি স্বশাসিত খণ্ডরাজ্যে পরিণত হয় এবং ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে খাজা ও সমান কর্তৃক সুবিদনারায়ণকে পরাভূত করে কবলিত না করা পর্যন্ত ইটা রাজ্যের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

বর্তমান করিমগঞ্জ (ভারত) ও মৌলবী বাজার (বাংলাদেশ) জিলাদ্বযেব দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে মগধ নামক একটি বাজ্যের উত্থান সম্পর্কে হট্টনাথের পাঁচালীতে উল্লেখ আছে। মগধেব উত্থান-পতন সম্পর্কে নানাবিধ কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। প্রচলিত কাহিনী মতে অঙ্গদেশেব যুবরাজ ছত্রসিংহকে গৌড়বাজ ধর্মধ্বজ, ব্রহ্মাচলরাজ ব্রহ্মজিৎ ও ত্রৈপুররাজ ধর্মধব একমত হয়ে ত্রিপুবা ও গৌড়ের সংযোগস্থলে কিছু ভূমি দান করেছিলেন। ঐ ভূমি আদম আইল পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। মাগধী ছত্রসিংহ এ অঞ্চলে মগধ নাম দিয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য (সামন্ত রাজ্য) প্রতিষ্ঠা কবেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁব শিশুপুত্র ও কন্যা কাঞ্চনমালাকে বাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তাঁর মৃত্যুব পব বাজ্যটি সোনাই কাঞ্চনপুব নামে প্রসিদ্ধিলাভ কবে। উত্তর ত্রিপুরায় অবস্থিত কাঞ্চনমালার হাওব প্রচীন সোনাই কাঞ্চনপুবেব স্মৃতি-বাহক বলে অনুমান করা যেতে পারে। এই সোনাই কাঞ্চনপুরেব পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চল পববর্তীকালে প্রতাপগড় বা পরতাবগড় নাম ধাবণ কবে ত্রিপুরার এক সামন্ত বাজ্যে পবিণত হয়। চতুর্দশ শতকেব শেষ ভাগে প্রতাপগড় যখন মীর্জা মালিক নামক এক ভাগ্যান্বেষী যুবক লাভ করেন, তখন পোড়াবাজা নামক এক উপজাতীয় রাজা এইবাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।

মৌলবীবাজার জিলার ভানুগাছ নামক স্থানে প্রাচীন দুর্গেব ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায় এবং এটা ভানুনাবাযণ সিংহ নামক ত্রিপুরারাজের সঙ্গে সম্পর্কিত যুবরাজেব কীর্তি বলে কথিত হয়।

শ্রীহট্ট বাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ শ্রীহট্ট ত্রিপুরা রাজ্যেব অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল এবং ত্রিপুরারাজেব অধীনেই এ অঞ্চলে অনেকগুলি স্বশাসিত সামন্ত বাজ্য গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়।

গৌড, লাউড় ও জয়ন্তিযা— প্রচীন শ্রীহট্ট বাজ্যেব পতনেব পর কুশিয়াবা নদী পর্যন্ত শ্রীহট্টেব দক্ষিণ অঞ্চলে ত্রিপুবা রাজ্য সম্প্রসাবিত হলেও উত্তরাঞ্চলে তিনটি বাজ্যের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর শ্রীহট্ট ও মধ্য শ্রীহট্টেব দক্ষিণে কুশিয়াবা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে গৌড, উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলে লাউড এবং উত্তব-পূর্বাঞ্চলে জয়ন্তিযা বাজ্যেব পত্তন হয়েছিল প্রাচীন শ্রীহট্ট রাজ্যের পতনের পর। একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদশন, দু'টি প্রাচীন গ্রন্থ ও একটি তন্ত্র ছাড়া এই রাজ্যগুলির ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বাজ্যগুলিব পতনেব ইতিহাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হলেও তাদের উৎপত্তি ও বিকাশেব ইতিহাসটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। শ্রীহট্ট রাজ্যের পতন থেকে সিকান্দাব গাজী কর্তৃক গৌড গোবিন্দেব পবাভবের কাল পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক একশতাব্দীর ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই যুগের উপব যথেষ্ট আলোকপাত কবে হট্টনাথেব পাঁচালী। চিরাগত কাহিনীর উপর ভিত্তি করে গনেশরাম শিরোমণি বা গণেশ্বব দ্বিজ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই গ্রন্থ লিখেছিলেন।[৪১] হট্টনাথের পাঁচালীর কাহিনীটি প্রখ্যাত পণ্ডিত বৃহস্পতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গৌড়ের রাজসভায় বর্ণনা করেছিলেন বলে কথিত হয়। কাজেই হট্টনাথের পাঁচালীর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর। কাজেই এতে বিভিন্ন কাহিনীব

প্রক্ষেপ থাকার সম্ভাবনা। তাছাড়া ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিক বর্ণনায় পূর্বাপর সঙ্গতির অভাব পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট হয়। সুতরাং হট্টনাথের পাঁচালীতে বিবৃত বিভিন্ন কাহিনীর সমাবেশ শ্রীহট্টের ত্রয়োদশ শতকের প্রকৃত ইতিহাস প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ইতিহাস প্রক্রিযায় যে সব রাজপুরুষ বা কীর্তিমান ব্যক্তি বিশেষ অবদান যুগিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের নামও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে এবং শ্রুতিনির্ভর কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করতে কবিব কল্পনাই সমধিক প্রশ্রয় পেয়েছে। তথাপি অতি সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন কবলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীহট্টে কামরূপের বিস্তার সম্পর্কে পাঁচালী রচয়িতা অবহিত ছিলেন। প্রাচীন শ্রীহট্ট বাজ্যেব ক্ষয়িষ্ণুতার সুযোগ নিযে উত্তবাঞ্চলে কোন পার্বত্যপ্রধান রাজ্য প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন— তা পাঁচালী বর্ণিত কাহিনী থেকে অনুমান করা যায়। হট্টনাথেব পাঁচালী মতে অতি প্রাচীনকালে কৃষক নামে জনৈক তিব্বতীয় যুববাজের (উপজাতীয়) রাজত্বের কাহিনী বর্ণিত আছে। কৃষকেব পুত্র গুহক। গুহকের তিনপুত্র লড্ডুক, গুড়ক ও জয়ন্তক। গুহকের মৃত্যুব পব তাঁর বাজ্য তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। লড্ডুকেব বাজ্য লাউড়, গুডকেব রাজ্য গৌড এবং জয়ন্তকেব রাজ্য জয়ন্তিয়া নামে প্রসিদ্ধিলাভ কবে। কাহিনীটি সুষ্ঠুভাবে পবীক্ষা কবলে এব মধ্যে কিছু ইতিহাসেব উপাদানেব সন্ধান পাওযা যায। তিনটি বাজ্যের উৎপত্তিতে পার্বত্য কোন জাতিব প্রভাব ছিল। তাছাডা পাঁচালীর ধাবাবাহিক বর্ণনায আর্যীকবণ প্রক্রিয়ার প্রগতি সহজেই দৃষ্ট হয।

ত্রয়োদশ শতাব্দী এবং তাব পববর্তী কালে বিরাজমান জয়ন্তিয়া, লাউড ও গৌড বাজ্যের মধ্যে শেষোক্তটি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সিলেট শহব এবাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজা গুড়কেব পর শ্রীহস্ত ও কৃত্তিপাল গৌড়ের বাজা হন। তাব পরবর্তী চারজন রাজার নাম জানা যায় না। এদেব পরে সিংহাসনে আরোহণ কবেন ভূত বিষ্ণুদেব। তিনি ছিলেন বোবা। তারপরের চারজন রাজার নাম—- অনন্তদেব বা নবগীর্বস্তু, গোকুল কিশোর, নবনারায়ণ এবং গোবিন্দ বণকেশব। গোবিন্দ বণকেশবের পব তাঁর প্রথম পুত্র যাদব এবং যাদবের পব দ্বিতীয় পুত্র কংসনাবায়ণ বাজা হন। তৎপব প্রবীর, ভূজবীর এবং ক্ষেত্রপাল পবপব রাজত্ব কবেন। হট্টনাথেব পাঁচালী বর্ণিত একাহিনীর ঐতিহাসিকতা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এ কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা মেনে নিলে ক্ষেত্রপালকে গুড়কেব সপ্তদশ অধঃস্তন বংশধর বলে মেনে নিতে হয়। তখন গৌড় রাজ্যের উৎপত্তি অন্ততঃ অষ্টম শতাব্দীতে হয়েছিল বলে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হয়। অথচ পশ্চিমভাগ কিংবা ভাটেরা তাম্রফলকে গৌড়েব কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ক্ষেত্রপাল ববাক নদী থেকে একটি খাল কাটিয়ে লোভা প্রভৃতি পার্বত্য নদীর সংযোগে একটি নদীব সৃষ্টি করেন এবং স্বীয় রানীব সুরম্যার নামানুসারে এর নামকরণ করেন সুরমানদী। এই কিংবদন্তীর মধ্যে কিছু সত্য নিহিত আছে বলে মনে হয়। কারণ সুরমা এই বিংশ শতাব্দীতেও ‘কাটাগাঙ’ নামে জনসাধাবণের নিকট পবিচিত। নদীটি প্রকৃতিজাত হলে শতাব্দীর পব শতাব্দী ধরে তার এই পরিচিতি থাকত না। কাজেই ক্ষেত্রপালের ঐতিহাসিকতা সন্দেহমুক্ত না হলেও অবিশ্বাস্য নহে।

ক্ষেত্রপালের অধঃস্তন পঞ্চম বংশধর হলেন গৌড়গোবিন্দ যিনি ইতিহাসখ্যাত পুরুষ। গৌড়গোবিন্দ ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সিকান্দার গাজী কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন। কাজেই উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান থাকারই সম্ভাবনা। তাহলে ক্ষেত্রপাল দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। ক্ষেত্রপালের দুই পুত্র — ব্রহ্মজিৎ ও ধর্মধ্বজ। ক্ষেত্রপালের মৃত্যুর পর উভয় ভ্রাতার মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হয়। ধর্মধ্বজ পাটগৌড়ের রাজা হন এবং ব্রহ্মজিৎ নতুন রাজধানী স্থাপন করে তার নাম রাখেন ব্রহ্মাচল। বর্তমান 'বরমচাল' ব্রহ্মাচলের অপভ্রংশ বলেই অনুমিত হয়।

হট্টনাথের পাঁচালীর বর্ণনায় গৌড় ও ব্রহ্মাচলের পরবর্তী ইতিহাস নিম্নরূপ :

ধর্মধবজ ও ব্রহ্মজিৎ উভয় ভ্রাতা মিলে ভাটেরার হোমের টিলায় এক বৈদিক খণ্ড সম্পন্ন করেন। ঐ যজ্ঞে ত্রৈপুররাজ ধর্মধর সর্বাধ্যক্ষ পদে বৃত হয়েছিলেন। বাৎস্য দ্বিজনিধিপতি এ যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ব্রহ্মজিতের পর তৎপুত্র ইন্দ্রজিৎ এবং ইন্দ্রজিতের পর তাঁর পুত্র জয়ানন্দ ব্রহ্মাচলের রাজা হন। জয়ানন্দের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দ রাজা হন। তাঁর মন্ত্রী রাজসিংহ কনিষ্ঠ উপানন্দকে আনন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে প্ররোচিত করেন। ক্ষোভে ও ঘৃণায় আনন্দ রাণী অন্নপূর্ণা ও পুত্র গোবিন্দকে রেখে রাতের অন্ধকারে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। উপানন্দ ব্রহ্মাচলের রাজা হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অমরসিংহ গৌড়ের রাজা গোবর্ধন ও ত্রিপুরার পার্বত্য সর্দারদের সহায়তায় উপানন্দকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সুযোগে পার্বত্য সর্দারগণ ব্রহ্মাচল লুটপাট করে। তখন আনন্দপুত্র গোবিন্দ বারজন সঙ্গী নিয়ে পলায়ন করেন। এদিকে ত্রিপুরারাজ রতনমাণিক্য অমরসিংহকে শাস্তিদানের জন্য ব্রহ্মাচল আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেন এবং ব্রহ্মাচল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অপরদিকে গৌড়ের সিংহাসনে ধর্মধ্বজের পর রাজধ্বজ, গৌড়ধ্বজ ও গঙ্গাধ্বজ পরপর আরোহণ করেন। গঙ্গাধ্বজ গোবর্ধন নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি জ্ঞাতিভ্রাতা উপানন্দের হত্যায় অমর সিংহের সহায়ক হয়েছিলেন। ত্রিপুরার পার্বত্যসর্দারগণ ব্রহ্মাচল লুটপাটের পর গৌড় আক্রমণ করে। গোবর্ধন তাদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। গৌড়ে ত্রিপুরার পার্বত্য সর্দারদের শাসন প্রবর্তিত হয়। আনন্দপুত্র গোবিন্দ তার সঙ্গীদের নিয়ে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে থেকে সামরিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে পার্বত্য সর্দারদের হাত থেকে গৌড় উদ্ধার করেন। তৎপর তিনি ব্রহ্মাচলও অধিকার করেন।

হট্টনাথের পাঁচালী বর্ণিত এই ঘটনাবলীর মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক সত্যতা নিহিত আছে। প্রথমতঃ, ত্রিপুরারাজের যজ্ঞের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে যজ্ঞে ব্রহ্মজিৎ ও ধর্মধরের উপস্থিতি গৌড় ও ব্রহ্মাচল রাজ্যের সামন্ত অবস্থানের সূচক। পরবর্তীকালে ব্রহ্মাচলে ত্রিপুরারাজের পরোক্ষ শাসন প্রবর্তনও ইতিহাসসম্মত বলে অনুমিত হয়। গৌড়রাজ্যে পার্বত্য সর্দারদের উপদ্রবে মাৎস্যন্যায়ের উদ্ভব সম্ভবতঃ কোন কল্পিত ব্যাপার নয়। এসময়েই গৌড় গোবিন্দের উদ্ভবও

ইতিহাস প্রক্রিয়ারই অগ্রগতি বলে মনে হয়। গৌড় গোবিন্দের উৎপত্তি সম্পর্কে হট্টনাথের পাঁচালীর বর্ণনা সন্দেহাতীত না হলেও গৌড় গোবিন্দের উত্থান এবং তার পরাজয়ের ইতিহাস সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বর্তমান বৃহত্তর সিলেটের উত্তব পঞ্চমাঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত লাউড় রাজ্যের পত্তন ও ইতিহাস সম্পর্কে হট্টনাথের পাঁচালীতে দীর্ঘকাহিনী বিবৃত আছে। কিন্তু এ কাহিনী সঠিক ইতিহাস নির্ভর নয় বলেই মনে হয়। তবে দ্বাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবাজ্যে যথাক্রমে বিজয়মাণিক্য ও দিব্যসিংহের রাজত্বের কাহিনী অবশ্যই ইতিহাসসম্মত। বিজয় মাণিক্যের রাজত্বকালেব একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রার উপব বাংলায় লেখা আছে— "রাজা বিজয়মাণিক্য শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেব্যা শক ১১১৩"। এতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, বাজা বিজয়মাণিক্য (রাণীলক্ষ্মীদেবী) ১১৯১ খৃষ্টাব্দে লাউড়ে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। জগন্নাথ নামক জনৈক বিপ্র বিজয় মাণিক্যের আশ্রয়ে বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। বাজা দেবসেবাব জন্য কিছু ভূমি জগন্নাথ বিপ্রকে দান করেছিলেন। জগন্নাথেব নামানুসারে সেই ভূমিই জগন্নাথপুব নামে খ্যাত হয় বলে কথিত আছে। লাউড় বাজ্যের উত্থানের ইতিহাস যেমন তমসাচ্ছন্ন, পতনেব ইতিহাসও তেমনি। তবে পঞ্চদশ শতকে দিব্যসিংহের রাজত্বেব কাহিনী থেকে মনে হয় এরাজ্যের অস্তিত্ব পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়েব পাদদেশে অবস্থিত জয়ন্তিয়া রাজ্যেব উত্থানের কাহিনী হট্টনাথেব পাঁচালীতে বিবৃত থাকলেও এই রাজ্যটি গৌড় ও লাউড অপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। জৈমিনী মহাভাবত, মন্ত্রচূড়ামণি ও কামাখ্যাতন্ত্র প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে জয়ন্তিয়া রাজ্যের উল্লেখ আছে। কামাখ্যাতন্ত্রে কামরূপ রাজ্যের বিস্তার বর্ণনায় বলা হয়েছে—

"ত্রিপুরা কৈকিকাচৈব জয়ন্তী মণি চন্দ্রিকা
কছাড়ী, মাগধীদেবী অশ্মানী সপ্তপর্বতাঃ।

অর্থাৎ ত্রিপুরা ফুকি, জয়ন্তী, মণি, চন্দ্র, কাছাড় ও মগধ এই সাত পর্বতবেষ্টিত কামরূপ। একাদশ শতাব্দীতে জয়ন্তিয়া রাজ্যে কামদেব নামক একজন বাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর আমন্ত্রণে মালবদেশের বাজা মঞ্জুরাজের রাজধানী থেকে কবিরাজ নামক অথবা উপাধিধাবী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি জয়ন্তিয়া রাজসভায় আগমন কবেন। কামদেবের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবিরাজ বাঘব পাণ্ডবীয় গ্রন্থ বচনা করেন। উক্ত গ্রন্থেব প্রথম সর্গ ২৫ শ্লোকটি নিম্নরূপ :

আনেতা মধ্যদেশাৎ প্রবচন বিদুষাৎ সোমপাং ব্রাহ্মনানা
মারোঢ়া মর্তামূর্তা সুরপতি সদসো মণ্ডলং মালবত্যাঃ
জেতাভূমে জয়ন্তীপুর পুব মথন শ্রী পদাম্বুজ ভৃঙ্গঃ
সোহশিক্ষা পালনেতুঃ স্বকুল কুলাগিরিং যোহনু-লেভেট শোভঃ।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ভাটেরা তাম্রফলক বর্ণিত শ্রীহট্ট রাজ্যের উত্থানকালেও জয়ন্তিয়া রাজ্যের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। এই রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক ব্রাহ্মণ রাজপরিবারের শাসনাধীন ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। এই রাজবংশের শেষ চারজন রাজা— কেদারেশ্বর রায়, ধনেশ্বর রায়, কন্দর্প রায় এবং জয়ন্ত রায়ের নাম পাওয়া যায়।[১২] তৎপর পর্বত রায় নামক জনৈক পার্বত্য রাজা জয়ন্তিয়া অধিকার করেন। বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের সময় পর্যন্ত জয়ন্তিয়া রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত ছিল।

প্রাচীন শ্রীহট্টের প্রায় আটশত বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনায় যে ঐতিহাসিক ব্যাপারটি লক্ষিত হয়, তা হল শ্রীহট্টের স্বাতন্ত্র্য। ঐতিহাসিক যুগের প্রথম পর্যায়ে শ্রীহট্ট কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এখানকার ইতিহাস প্রক্রিয়া কামরূপের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্নতর ছিল। বিক্রমপুরের চন্দ্র উপাধিধারী রাজাদের অধীন থাকলেও শ্রীহট্ট একটি স্বতন্ত্র মণ্ডলরূপে বিখ্যাত ছিল। আর শ্রীহট্ট রাজ্যের উত্থান ত অবিসংবাদিতরূপে স্বাতন্ত্র্যের সূচক। রাজনৈতিক পরিস্থিতি এরূপ থাকলে সংস্কৃতিগতভাবে শ্রীহট্ট সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই উত্তর ভারতের প্রভাবাধীন ছিল।

—: উৎস নির্দেশনা :—

১. S.K. Chatterji — The Place of Assam in the History and Civilisation of India. G.U 1970 P.9.

২. ফজলুর রহমান —— সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ মৌলভী বাজার, সিলেট - ১৯৯১. পৃঃ ৩০

৩. Kamalakanta Gupta — Copper Plates of Sylhet, Sylhet 1967. Pp - 69–74.

৪. K.M. Gupta -- "Bhatera Copper Plates" — Epigraphia Indica. Vol. IX. P. 356.

৫. S.K. Chatterji -- Kirata Janakrti. Asiatic Society 1974 P. 126.

৬. V.S. Agarwal -- India as Known to Panini — 2nd Edition- Varanasi 1963. pp. 35–8. জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্যের—— The Ancient Political Structure of the Barak valley নিবন্ধে উল্লেখিত। The NEHU Journal of Social Sciences of Humanities — Vol. X No. 3 April - June 1992. Reprint P.6.

৭. Mc. Crindel's Periplus of the Ereethrean Sea. 148. 149 এবং অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি— শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — প্রথম খণ্ড — সম্পাদনা — সুজিৎ চৌধুরী — সম্পাদিত ও সংযোজিত পুনর্মুদ্রণ — গুয়াহাটি ১৪০২ পৃঃ ২৭-২৮.

৮. পারজিটার — মার্কেণ্ডেয় পুরাণের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা কলিকাতা ১৯০৪ পৃঃ XIV.

৯. প্রাগুক্ত — পৃঃ ৩৫৭.

১০. প্রাগুক্ত — পৃঃ ৫৮১.

১১. প্রাগুক্ত

১২. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য — কামরূপ শাসনাবলী পৃঃ ৬৬

১৩. K.L. Barua - Indian Culture. Vol. I. No. 3. January 1935 Pp. 421–32.

১৪. Indian Culture. Vol. II

১৫. M.M. Sharma — Inscriptions of Ancient Assam. Gauhati. 1978. Pp 66.....

১৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম খণ্ডন পুনর্মুদ্রিত পৃঃ ৩০

১৭. S. Beal's life of Heuen Tsang. P. 138

১৮. Kamala Kanta Gupta. Copper Plates of Sylhet Pp. 169–74

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. প্রাগুক্ত।

২১. The NEHU Journal of Social Science and Humanities Vol. X. No. April–June. 1992. Reprint Pp. 20–21

২২. সুনির্মল দত্ত চৌধুরী — গঙ্গা থেকে সুরমা — কলিকাতা ১৯৮৮ পৃঃ ৫১

২৩. NEHU Journal. P. 22

২৪. Tripura in the Pre–Manikya Period' — Proceedings of NEIHA 6th Session. Agartala. 1985. P. 62

২৫. প্রাগুক্ত।

২৬. পাল সেন যুগেব বংশচরিত — কলিকাতা - ১৯৮২ পৃঃ ১০৬

২৭. NEHU Journal. Vol X. No. I. Reprint. P. 21

২৮. সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ — পৃঃ ২৮

২৯. Copper Plates of Sylhet. PP. 101-10

৩০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৬

৩১. NEHU Journal. Vol. X. No. 2 Reprint. P. 24

৩২. প্রাগুক্ত।

৩৩. সূর্যকান্ত ভূঞা (সঃ) জয়ন্তিয়া বুরঞ্জী — গৌহাটী — ১৯৬৩ পৃঃ ১১

৩৪. সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ — পৃঃ ২৮

৩৫. Copper Plates of Sylhet. P. 123

৩৬. Epigraphia Indica Vol. IX. P. 356

৩৭. Kirata Janakrti — P. 127

৩৮. সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ — পৃঃ ৩৩

৩৯. Copper Plates of Sylhet. P. 60

৪০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত— ১ম খণ্ড (পুনর্মুদ্রিত) পৃঃ ৩৪ — ৩৭

৪১. সুধীর সেন — বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙ্গালীদের অবদান গৌহাটী — ১৩৭৮ পৃঃ ২১

৪২. E.A. Gait. A History of Assam. — 2nd Edition Reprint Gauhati 1962. P. 262

প্রতিবেদন : একটি লুপ্তপ্রায় বাংলা বর্ণমালা প্রসঙ্গে

কল্যাণ কুমার গুপ্ত

লোকসাহিত্যের বিশেষতঃ সিলেট কাছাড়ের প্রবাদ, ধাঁধাঁ (পই), ছড়া ইত্যাদি সম্পর্কে সবসময়ই একধরনের আগ্রহ আমার ছিল। চাকুরী জীবনে পেশাগত কাজে ব্যস্ত থাকায় এসব দিকে আর তেমন মনোযোগ দিতে পারিনি, কিন্তু আকর্ষণটা থেকেই গিয়েছিল। চাকুরী জীবনের শেষ দু'বছর আমার কর্মস্থল ছিল শিলচর। মাটির টানেই সম্ভবত নেশাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল; সমমনস্ক বন্ধু বান্ধবরাও উৎসাহিত করতে এগিয়ে এলেন। শুরু হল অনুসন্ধান। সে সুবাদেই ১৯৯২-এর সরস্বতী পুজোর দিন একটি পুরনো বই হাতে এলো— ভাষাটা বাংলা কিন্তু হরফ আলাদা।

সিলেট-কাছাড়ের উপভাষায় লেখা বইটি মুদ্রিত হয়েছে সিলেটী নাগরী অক্ষরে। উপভাষাটি বাংলার প্রান্তিকায়িত অঞ্চলের বলেই বর্ণমালাটি বাংলা বর্ণমালারই একটি ভিন্নতর রূপ। সেদিনই নূতন করে আবার আমার অক্ষর পরিচয় হল।

বইটি হাতে আসার পর স্বাভাবিক কারণেই উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, খোঁজাখুঁজি করতেই আরও কয়েকটি মুদ্রিত বই, হাতে লেখা পুঁথি ইত্যাদি পেযে যাই। সম্ভব স্থলে ছাপানো বইগুলো ফটোকপি করে রেখেছি, হাল্কা কাগজে লেখা বলে হাতে লেখা পুঁথিগুলো ফটোকপি করতে পারিনি।

সীমিত কয়েক বছরের অনুসন্ধানের ফলে আমার মনে হয়েছে সিলেটী নাগরীর আরেকটি রূপান্তর হচ্ছে শ্রীহট্টীয় মোসলমানী অক্ষর। হরফ দুটির অক্ষর গঠন, অক্ষর সংখ্যা ইত্যাদির পার্থক্য আছে।

দেবনাগরী বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষরের বিকৃত রূপ ও বাংলা অক্ষরের পরিবর্তিত রূপের সমাহারে গড়ে উঠেছে সিলেটী নাগরী বর্ণমালা। স্বরবর্ণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণের জন্য কোনো আলাদা অক্ষর নেই। ই, ঈ, উ, ঊ-র জন্য একটি করে অক্ষর। ও, ঔ এই দুটি অক্ষর নেই। শ, ষ এবং স-র জন্য একটি করে অক্ষর। বাংলা ড এবং দ এই দুটি অক্ষর অবিকৃত-রূপে আছে। বর্ণমালায় মাত্রার ব্যবহার আছে, আছে যুক্তাক্ষর।

শ্রীহট্টীয় মোসলমানী বর্ণমালায় মোট অক্ষরসংখ্যা হচ্ছে ৩৮। এর মধ্যে স্বরবর্ণের সংখ্যা ৬: দীর্ঘ এবং হ্রস্ব বর্ণের জন্য আলাদা আলাদা অক্ষর নেই। শ, ষ, স-র জন্য একটি অক্ষর। ড, ঢ ও দ এই তিনটি বাংলা হরফ অবিকৃত। অক্ষরে মাত্রার ব্যবহার নেই।

সংখ্যাজ্ঞাপক কোনো আলাদা চিহ্ন নেই। বাংলা সংখ্যাই দুটো বর্ণমালায় ব্যবহৃত হয়। বর্ণমালাগুলোর উদ্ভবের মূলে যাই থাকুক না কেন আঞ্চলিক উচ্চারণের সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণমালার অক্ষর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ বর্ণমালাটি উচ্চারণভিত্তিক। অক্ষরের সংখ্যা ও গঠন দেখে আমার অনুমান শ্রীহট্টীয় মোসলমানী বর্ণমালাই আদি ও প্রাচীন। সিলেটী নাগরী হচ্ছে নবীকৃত রূপ।

যে সমস্ত ছাপানো বই ও হাতে লেখা পুঁথি আমি দেখেছি তার বেশীর ভাগই সিলেটী নাগরী অক্ষরে লেখা। এই আঞ্চলিক হরফ মুদ্রণ যন্ত্রেও ব্যবহৃত হত। এরকম কিছু মুদ্রিত রচনার ফটোকপি আমার সংগ্রহে আছে।

সিলেটী নাগরী বর্ণমালাকে ভিত্তি করে একসময়ে সিলেট কাছাড় অঞ্চলের লোকায়ত সাহিত্যে একটি বেগবান ধারা গড়ে উঠেছিল। আমার অনুমান, প্রথমদিকে সিলেটী নাগরী কেবলমাত্র মুসলমান সমাজেই প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজের একাংশেও হরফটির ব্যবহার শুরু হয়।

আমার সংগ্রহে 'আগাজ পুঁথি হরিবংশ'-এর যে প্রতিলিপিটি আছে তাঁর রচয়িতা দীন ভবানন্দ। আমার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে সিলেটী নাগরীতে ছাপানো বেশীরভাগ গ্রন্থই হচ্ছে জিকির বা ভক্তিমূলক গানের সংকলন। কিছু ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং সম্ভবত কিছু রচনা লোকায়ত মন্ত্র বিষয়ক। সিলেটী নাগরীতে মুদ্রিত লোকপ্রিয় গ্রন্থটি 'হালতুন্নবী'। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য বলে কেউই এটি হাতছাড়া করতে চান না। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের হালতুন্নবী গ্রন্থটি ছিন্ন— প্রথম এবং শেষদিকের কয়েকটি পাতা নেই।

সিলেটী নাগরীতে ছাপানো বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা উর্দু-ফার্সীর মত এবং পড়তেও হয় ডান থেকে বাঁয়ে।

আমার ধারণা, হজরত শাহজালালের পর যে সব মুসলমান ধর্মপ্রচারক সিলেটে আসেন তাঁরই প্রথম শ্রীহট্টীয় মোসলমানী অক্ষরের প্রচলন করেন। পরে সিলেটী নাগরীর উদ্ভব হলে মোসলমানী অক্ষরের প্রচলন কমে যায়। যে কোনো কারণেই হোক সিলেটী নাগরীর জনপ্রিয়তা ছিল অনেক বেশী। মুদ্রিত গ্রন্থসংখ্যা দেখলেই এই জনপ্রিয়তার স্বরূপটি বোঝা যায়। পরবর্তীকালে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে বাংলা হরফই জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং ঔপভাষিক এই বর্ণমালাটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে মৌলানা, দরবেশ, ফকির, মুস্কিল-আসান, গুণিনেরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই হরফ ব্যবহার করে থাকেন। এরকম কয়েকজনকে আমি দেখেছি, তবে একথাও সত্যি যে, বর্তমানে মুসলমান সমাজে এর ব্যবহার খুবই সীমিত এবং হিন্দু সমাজে একেবারেই নেই।

কর্মজীবনের শেষ দুবছর কাছাড়ে থাকাকালে এ অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

সম্পর্কে তথাকথিত গুণী-জ্ঞানীদের মনোভাব আমাকে ব্যথিত করেছে। এসম্পর্কে তাঁরা উদাসীন তো বটেই এমনকি কেউ কেউ এই সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কুরুচিপূর্ণ সৃষ্টি বলেও মনে করেন।

আগ্রহী পাঠকদের জন্য বাংলা প্রতিরূপ সহ শ্রীহট্টীয় মোসলমানী এবং সিলেটী নাগরী বর্ণমালা এবং 'হালতুন্নবী' ও 'হবিবংশ'-এর দুটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া হল। লেখাটি পড়ে আমার সংগ্রহ সম্পর্কে কেউ যদি আগ্রহী হন তাহলে এই গ্রন্থের প্রধান সম্পাদক শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাবেন, সহায়তা করতে আমি সবসময়েই প্রস্তুত।

সংযোজন :— প্রতিবেদক কল্যাণকুমার গুপ্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে বরাক উপত্যকায় এসেছিলেন। তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি আজন্ম লালিত আকর্ষণের তাড়নায় আঞ্চলিক সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদানসমূহের খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে ; সংগ্রহ করেছেন পুঁথিপত্র। তাঁর সেই অভিজ্ঞতাই একান্ত আত্মগত ভঙ্গিতে তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর এই প্রতিবেদনে আন্তরিকতার অভাব নেই, কিন্তু তথ্যগত কিছু অপ্রতুলতা রয়ে গেছে। তাই 'সিলেটী নাগরী' সম্পর্কিত কিছু অতিরিক্ত তথ্য এই সঙ্গে সংযোজিত হল।—

সম্পাদক,
শ্রীহট্ট কাছাড়েব প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা।

১। "সিলেটী নাগরীর বর্ণসংখ্যা ৩৩। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও সৈয়দ মুর্তজা আলী প্রত্যেকেই বলেছেন বর্ণ সংখ্যা ৩২। বাংলা 'ং' অক্ষরের স্থলে সিলেটী নাগরীতে যে চিহ্ন দেওয়া আছে, তাকেও তো হিসাবের মধ্যে আনতে হবে, সুতরাং এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩। যথা আ, ই, উ, এ, ও, ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, র, ল, শ, হ, ড়, ং। সিলেটী নাগরীতে দেব নাগরীর মোট ১৬টি বর্ণ বর্জিত (৭টি স্বরবর্ণ — অ, ঈ, ঊ, ঋ, ঌ, ঐ, ঔ ; ৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ— ঙ, ঞ, ণ, য, (য়), অন্তঃস্থ ব, ষ, স, ঢ়, ঃ।" — উষা রঞ্জন ভট্টাচার্যঃ **শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ ও পত্রিকাঃ ১৪০০ বঙ্গাব্দঃ কলিকাতা : পৃ : ৪৮ — ৪৯**

২। ডঃ আব্দুল ভূঞার অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ থেকে সিলেটী নাগরী সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

"We may classify the printed as well as the manuscripts written in Sileti or Jalalabadi Nagri under the following heads:

(1) Narratives (2) Biographies (3) Contemporary Events (4) Social Portrait

(5) Legend (6) On Learning Nagri (7) On Spiritual matter (8) Religious topics on Islam (9) Philosophical topics (10) Historical topics (11) General education and character building (12) On the theories of 'life hereafter' (13) Stories (General) (14) Love Stories (15) Poems influenced by Vaisnavism." — **‘শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ ও পত্রিকা’** গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৬০.

৩। **হালতুন্নবী :** “উহা বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর জীবন কাহিনীব বর্ণনামূলক ‘পুথিকাব্য’। পয়ার ত্রিপদী ছন্দে ‘বয়েল ডিমাই’ সাইজে স্বচ্ছ সাবলীল ধারা বিবরণীতে ২৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

“সৈয়দ মোর্তাজা আলী সাহেবের মতে “হালতুন্নবী সিলেটী নাগবী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় পুস্তক। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্বেব বর্ণনা ও হজবত মোহাম্মদ (দঃ) জীবনী..” এবং তাঁর মহাশূন্য (মেহবাজ) পবিভ্রমণ বর্ণিত আছে।

“সিলেট জেলাব এমন কোন গ্রাম নেই যে গ্রামে ২/১০ খানা ‘হালতুন্নবী’ ছিল না। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ‘বিশ্বনবী’ ‘মোস্তফা চবিতের’ মত পুথিখানা সর্বজন সমাদৃত ও বহুল প্রচারিত।

“বিগত সংগ্রামকালে ‘সিলেটী নাগবী’ ছাপাব একমাত্র সিলেট ইসলামীযা প্রেস ধ্বংস হয়ে যাওয়ায বর্তমানে পুথিখানা বাংলা হরফে প্রকাশ করা হয়েছে। ইহা পুথির জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

“১২৬২ বাংলা সনে পুথি রচনা শেষ হয়। পুথিখানাকে সঠিক নির্ভুল তথ্যবহুল করতে গিয়ে কবি যে সব আরবী ফারছি কেতাবেব সাহায্য নিয়েছিলেন, তাহা হল

“মৌলুদ শবীফ আব শিমায়েল তিরমিজি।
অহিউল কুলুব আর নবুয়ত মারিজী॥
জুমাউল উছুফ আব তফছিব আজিজিয়া।
হেকাযেত ইমান আব কাছাছুল আম্বিয়া॥”......

চৌধুরী গোলাম আকবব সাহিত্যভূষণ: **সিলেটী নাগরী পরিক্রমা :** জালালাবাদ লোকসাহিত্য পবিষদ, সিলেট: জুলাই ১৯৭৮ : পৃঃ ৫৪-৫৫

৪। **‘সিলেটী নাগরী’ মুদ্রণ প্রসঙ্গ :** “খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগ পর্যন্ত সিলেটী নাগবী হস্তলিখিত পর্য্যায়ে ছিল। সিলেট শহব মহল্লা হাওয়া পাড়া নিবাসী মৌলবী আবদুল করিম সাহেব ১৮৬০-৭০ সনে ইউরোপ পরিভ্রমণ কবে দেশে ফিরে এসে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ‘সিলেটী নাগরী’ মুদ্রণ প্রয়াসী হয়ে ‘হবফ’ তৈরীব ব্যবস্থা করেন :

● বন্দরবাজার ইসলামীয়া প্রেস নামক ছাপাখানা তৈবী কবে

- সিলেটী নাগরী পুথি ছাপা
- পুথির ব্যবসা শুরু করেন
- পরবর্ত্তীকালে সিলেট নাইওর পুলস্থ সারদা প্রিন্টিং ও পাব্লিশিং
- কলিকাতার ১৬ নং গার্ডেনাব লেনস্থ জেনারেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
- শিয়ালদহস্থ হামিদী প্রেসে 'সিলেটী নাগবী' ছাপার ব্যবস্থা ছিল। তবে ইসলামিয়া প্রেস এ কাজে একমাত্র ব্রতী ছিলেন বলা যায়।

"১৯৪৭ ইং সনে পাকিস্থান, হিন্দুস্থান রূপে ভারত বিভক্তিব পব সিলেটেব সারদা প্রিন্টিংয়েব হিন্দু মালিক হিন্দুস্থানে চলে যান। কলিকাতার সহিত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

"ইসলামিয়া প্রেসই এ কাজে এককভাবে ব্রতী থাকেন। কিন্তু ১৯৭১ সনেব মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বোমা পতনে ইসলামিয়া প্রেস বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথে 'সিলেটী নাগরী' ছাপার পথ চিররুদ্ধ হয়ে গেছে।" — **সিলেটী নাগরী পরিক্রমা :** পৃঃ ৩২ — ৩৩

৫। 'সিলেটী নাগরী পবিক্রমা' গ্রন্থে "সিলেটী নাগবীর উৎপত্তি" অধ্যায়ে জর্জ গ্রীয়াবসন, বি.সি. এলেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সুকুমার সেন, অচ্যুৎচরণ চৌধুবী, আহমদ হাসানদানী, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, আশরাফ হোসেন প্রমুখেব মন্তব্যসহ এ বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা আছে। 'সিলেটী নাগরী পুঁথির রচয়িতা, মুদ্রিত পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি' অধ্যায়ে ৮৮টি ছাপা পুঁথি ও ২৪টি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ বযেছে।

শ্রীহট্টের মুসলমানী বর্ণমালা

শ্রীহট্টের মোসলমানী · ' অক্ষর।

স্বরবর্ণ

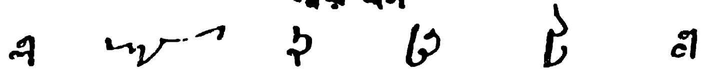

অ আ ই উ এ ঐ

ব্যঞ্জনবর্ণ

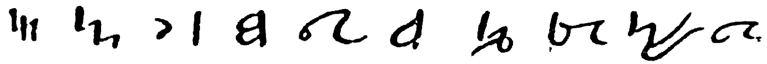

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

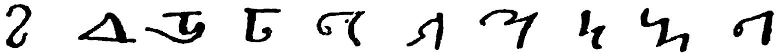

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

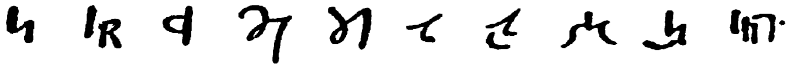

প ফ ব ভ ম র ল স হ ক্ষ

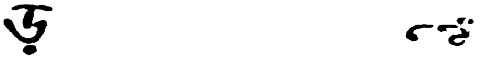

ড় অং

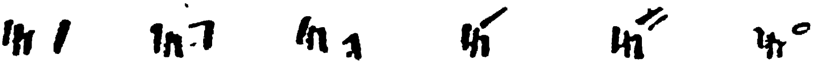

কা কি কু কে কৈ কং

সিলেটী নাগরী অক্ষর

১৫১ (মিরণ-এর ?)

১৪৮ (আমার মানুষ)

১৪৭ ([illegible])

[আমার বন্ধু ও [illegible]]

৫৫ [illegible]

৫২ [illegible]

৮৫, -৯২ ([illegible]

১৮৮ ([illegible]

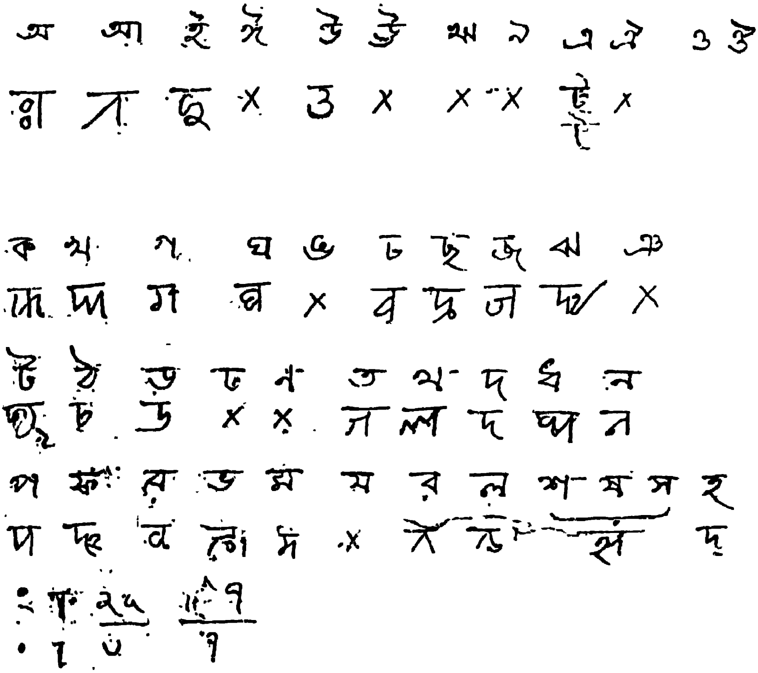

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ

मुनुग गनुीन मुङत नगीन मुनगं ✿
नगीनेते घाटेन्ज गात्र बा मेम्मीघे तात्र ॥
वातीने न्जघीनु घाम्ह न्जटेगान ग्नगान ✿
बानुीवान घीगा वाम्त म्तनीघीनु म्मा ॥
गुम्रा ताना वमी नत म्तनी मीनुा नुमा ✿
म्संत गते माम्त तागे म्तनीनु न्जनुाटे
न्जगे तान वटेन्जब मुङव न्जनुा ममी वा✿

—✿—

✿ मुगनतेन ✿

✿ मुम मीनुाङवान ✿

✿ वटेन्जब ✿

मटेमा मुङनुा नवी तान ग्नात गाम्न न्जगे ॥
वाम तान मनों गेनुा बान ग्नव नुम्ते ✿
न्जनवेन म्साटेमा गते नवी गम्ञमान ॥
न्जगीना वामीनुा टेम माङ नाम्मीवान ✿
ञनु गुघनु नुगा म्गा मुम मीनुाङत ॥
माङ नीन्ज घने नाम्ते टेम्नव म्तनीते ✿
ताटेम्ह ग्नमुन मुने माङ गात बग ॥
मम्तम्ताटे न्जम्रीन्ज मीनुा नुञीन म्तानब ✿
मानुा मानुा मुनुा नत वाघ्री वाघ्री नुङनुा ॥
बधीने टेतीम मागी म्तेमु बामी नुीनुा ✿
वाम नङनुे वेठा बीता माङ मुङन्ज नाबी ॥
बवीमीन वाम गाङ मुने मीव नुबी ✿
मीम्नुाङंमु माडीन मुम मनु गुघन न्जन ν

ꠁꠔꠤꠝ ꠎꠣꠛꠣꠘ꠆. ꠇꠤꠟꠦ ꠡꠧ ꠘꠥꠣꠟ ꠀꠝꠣꠘ ꠫
ꠢꠘꠤꠛ ꠁꠡꠘ ꠢꠣꠖ ꠔꠣꠔꠦ ꠢꠣꠟꠤꠝꠣ ꠀꠎꠤꠟ ॥
ꠢꠣꠟꠤꠔꠦ ꠇꠣ ꠢꠣꠘꠦ ꠡꠣꠘꠧ ꠡꠧꠞ ꠇꠣꠢꠤ ꠢꠤꠟ ꠫
ꠡꠧꠞꠘ ꠛꠦꠐꠣ ꠇꠣꠢꠤ ꠢꠤꠟ ꠡꠘꠤꠀ ꠁꠘꠡꠣꠘ ॥
ꠢꠣꠟꠤꠝꠣꠄ ꠛꠥꠟ ꠡꠣꠟꠤ ꠇꠎꠤꠛ ꠀꠝꠣꠘ ꠫
ꠡꠡꠟ ꠛꠟꠤꠎ ꠇꠘꠦ ꠇꠣꠟꠣ ꠢꠥꠟꠣ ꠘꠥꠖꠘꠀꠋ ॥
ꠀꠝꠣꠘꠦ ꠇꠣ ꠢꠤꠟꠣ ꠡꠦꠞ ꠢꠘꠤꠛ ꠢꠦꠡꠤꠀ ꠫
ꠡꠣꠟꠤ ꠢꠣꠔꠦ ꠘꠣꠇꠣ ꠢꠥꠇꠦ ꠢꠤꠢꠥ ꠇꠦꠝꠣ ꠇꠣꠟ ॥
ꠢꠣꠟꠤꠝꠣ ꠡꠛꠥꠟ ꠡꠖꠟꠣ ꠀꠇꠤꠛꠣꠘ ꠎꠣꠛꠣꠟ ꠫
ꠇꠣ ꠢꠣꠖꠀ ꠘꠣꠛꠣꠘ ꠢꠥꠖꠀ ꠡꠘꠤꠟꠣ ꠡꠛꠥꠟ ॥
ꠡꠣꠡꠣ ꠢꠘꠦ ꠎꠞꠀꠘ ꠢꠥꠖꠟꠣ ꠡꠢꠤꠔꠦ ꠘꠢꠥꠟ ꠫
ꠀꠝꠤꠟ ꠇꠎꠤꠛ ꠇꠣꠟꠣ ꠛꠤꠛꠤ ꠢꠣꠟꠤꠝꠣꠘ ॥
ꠢꠘꠞꠟꠤꠡ ꠡꠣꠘꠦ ꠇꠤꠀ ꠘꠢꠥꠟ ꠀꠟꠣꠘ ꠫
ꠇꠡꠣꠡꠣ ꠎꠣꠒꠤ ꠘꠛꠤ ꠘꠥꠖꠀ ꠢꠦꠡꠦ ꠛꠟꠤ ꠇꠣꠄ ॥
ꠀꠇꠛ ꠔꠣꠝꠣꠡꠣ ꠢꠟꠦ ꠢꠦꠡꠣꠖꠟ ꠀꠟꠣꠄ ꠫
ꠎꠀꠘꠤꠘ ꠡꠣꠡꠣ ꠎꠤꠟ ꠇꠤꠢꠣꠔꠦ ꠘꠣꠛꠣꠘ ॥
ꠢꠒꠤ ꠘꠖꠔ ꠇꠣ ꠢꠣꠘꠤꠔ ꠢꠣꠐꠤ ꠇꠣꠖꠛꠣꠘ ꠫
ꠇꠣꠖꠔꠦ ꠛꠟꠤꠟ ꠘꠦꠎꠣ ꠛꠣꠔꠡꠦꠘ ꠝꠔꠦ ॥
ꠡꠝꠣꠟ ꠔꠣꠔꠔꠥꠛ ꠢꠥꠖꠟꠣ ꠢꠣꠟꠤꠝꠣ ꠡꠢꠥꠔꠦ ꠫
ꠢꠣꠟꠤꠝꠣꠘ ꠛꠡꠘꠤ ꠡꠛꠦꠘ ꠢꠥꠖꠟ ꠛꠘꠝꠔ ॥
ꠇꠘꠦ ꠛꠣꠘꠦ ꠡꠘꠣꠎꠔ ꠛꠣꠒꠤꠟ ꠖꠇꠝꠔ ꠫
ꠢꠣꠟꠤꠝꠣꠘ ꠇꠣꠘꠤꠛꠦ ꠡꠧꠞ ꠢꠥꠖꠟꠦ ꠛꠤꠝꠣꠘ ॥
ꠢꠥꠘꠘꠔꠦ ꠎꠥꠖꠀ ꠢꠤꠟꠦ ꠀꠘꠣꠝ ꠢꠥꠖꠔ ꠔꠣꠘ ꠫
ꠢꠤꠇ ꠢꠤꠇ ꠀꠇꠣꠄꠛ ꠢꠦꠡꠦ ꠢꠣꠟꠤꠝꠣꠄ ॥
ꠇꠣ ꠘꠣꠇꠧ ꠡꠧ ꠢꠄꠢꠣ ꠢꠥꠖꠟꠣ ꠡꠣꠢꠥꠇ ꠘꠣ ꠇꠣꠄ ꠫

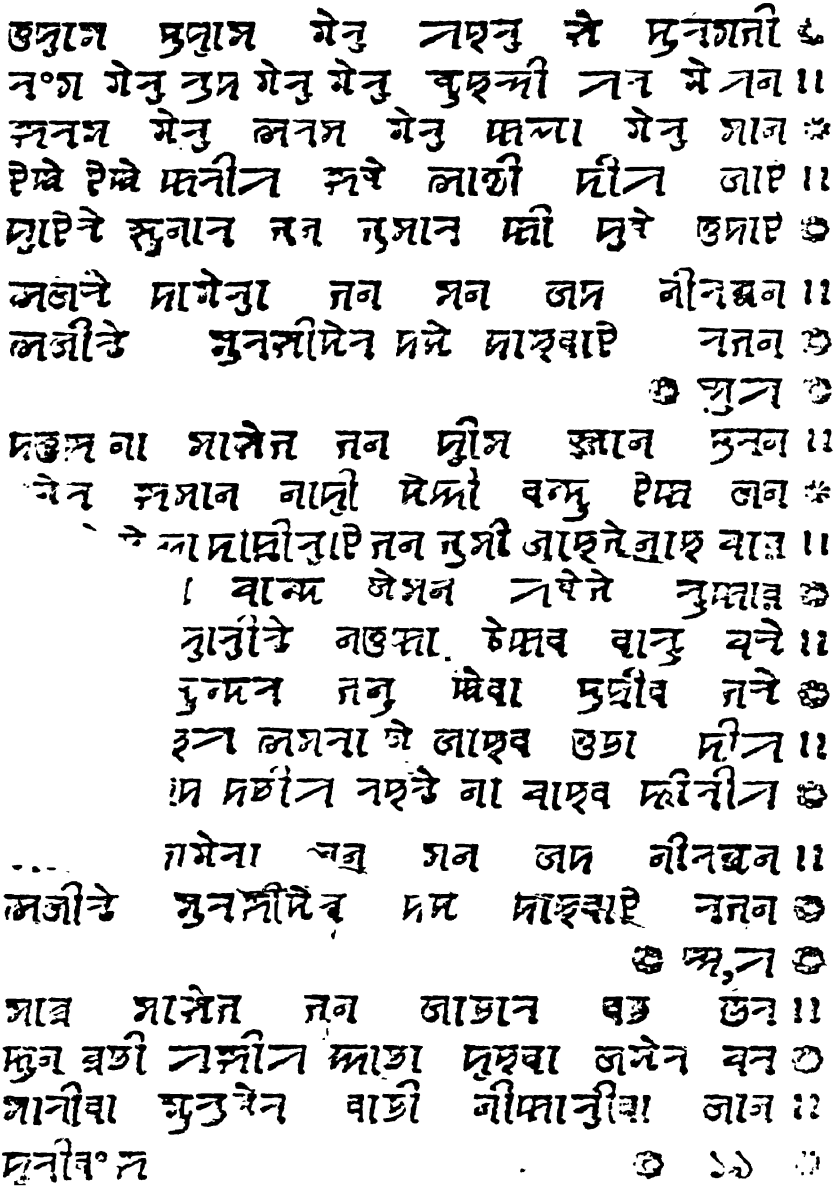

ꠔꠣꠘꠦ ꠇꠘ꠆ꠖꠣꠁꠘꠢꠛꠣ ꠔꠘ ꠘꠝꠣꠘ ꠄꠁ ꠟꠛꠦꠘ ꠉꠥꠝꠣꠘ *
ꠖꠣꠌꠣꠢꠔꠦ ꠟꠛꠦꠘ ꠝꠣꠁꠘ ꠖꠥꠢꠛꠣꠄ ꠇꠣꠎꠘ ॥
ꠇꠦꠖꠥ ꠘꠣ ꠎꠣꠢꠛꠣ ꠔꠘ ꠘꠥꠝꠣꠘ ꠡꠋꠉꠔꠤ ꠖꠥꠡꠘ ❁

ꠟꠎꠘꠦ ꠖꠣꠉꠦ ꠘꠣ ꠔꠛ ꠝꠘ ꠎꠘ ꠇꠤꠘꠛꠘ ॥
ꠟꠎꠤꠘꠦ ꠉꠥꠘꠡꠤꠖꠦꠘ ꠖꠡꠦ ꠖꠣꠢꠛꠣꠄ ꠘꠔꠘ ❁

❁ ꠗꠥꠀ ❁

ꠇꠣꠘꠥꠉꠥꠘ ꠝꠣꠡꠦꠔ ꠔꠘ ꠇꠥꠡꠤꠘꠥꠣꠄ ꠇꠣꠒꠦ ꠘꠣꠛ ॥
ꠛꠣꠘꠤꠎꠦ ꠘꠡꠤꠘ ꠔꠘ ꠘꠥꠡꠤ ꠘꠣ ꠛꠥꠇꠤꠘꠥꠣꠄ ꠟꠣꠛ ❁
ꠡꠣꠗ ꠘꠥꠡꠤ ꠛꠥꠛꠗ ꠖꠣꠉꠘꠥ ꠛꠎꠛꠘꠥ ꠘꠥꠝꠣꠘ ꠝꠎ ॥
ꠇꠣꠘꠛꠣ ꠘꠣꠋꠉꠣꠄ ꠟꠎꠣ ꠟꠎꠣ ꠖꠣꠘꠤꠖ ꠘꠎꠘ
ꠇꠥꠟꠣ ꠘꠥꠟꠦ ꠇꠢꠦ ꠘꠎꠥ ꠘꠥꠡꠣꠘ ꠉꠥꠘ
ꠖꠣꠡꠤꠛꠣ ꠡꠇꠘꠥ ꠘꠥꠇꠦ ꠖꠦꠇꠤꠘ ꠘꠥꠖꠣꠋ
ꠛꠇꠤꠖꠣꠘꠦ ꠖꠤꠛ ꠒꠣꠇ ꠟꠣꠢ ꠛꠣꠒꠦ ꠘꠥꠉꠣ
ꠇꠤ ꠛꠎꠣꠎ ꠇꠣꠉꠣꠢꠘꠥꠣꠄ ꠘꠥꠡꠦ ꠔꠣꠘꠥꠣꠡ ꠖꠦ.
ꠔꠣꠘꠦ ꠇꠤ ꠛꠘꠥꠛꠣꠄ ꠎꠘ ꠘꠥꠡꠤ ꠔꠣꠘ
ꠛꠘꠤꠎꠦ ꠘꠡꠤꠘ ꠇꠦꠘꠦ ꠡꠣꠗ, ꠖꠥꠢꠘ

ꠟꠎꠘꠦ ꠖꠣꠉꠦꠘꠥ ꠔꠘ ꠝꠘ ꠎꠥꠖ ꠛꠣꠘꠀꠘ ॥
ꠟꠎꠤꠘꠦ ꠉꠥꠘꠡꠤꠖꠦꠘ ꠖꠡꠦ ꠖꠣꠢꠛꠣꠄ ꠘꠔꠘ ❁

* ꠗꠥꠀ *

ꠛꠢꠔꠣꠘ ꠝꠣꠡꠦꠔ ꠔꠘ ꠛꠔꠡꠘ ꠖꠥꠢꠘꠥ ꠒꠥꠘꠛ ॥
ꠔꠘꠦꠘ ꠡꠝꠣꠘ ꠘꠣꠢ ꠖꠦꠇꠤ ꠛꠘ꠆ꠖꠥ ꠄꠇ ꠎꠘ ❁
ꠖꠣꠄꠘꠦ ꠇꠣꠡꠦꠘ ꠔꠘ ꠔꠘꠦ ꠇꠦ ꠛꠣꠘꠥ ꠖꠥꠘꠤꠘ ॥

মুসলমানী বর্ণমালার হস্তাক্ষরে লিখিত বই-এর এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

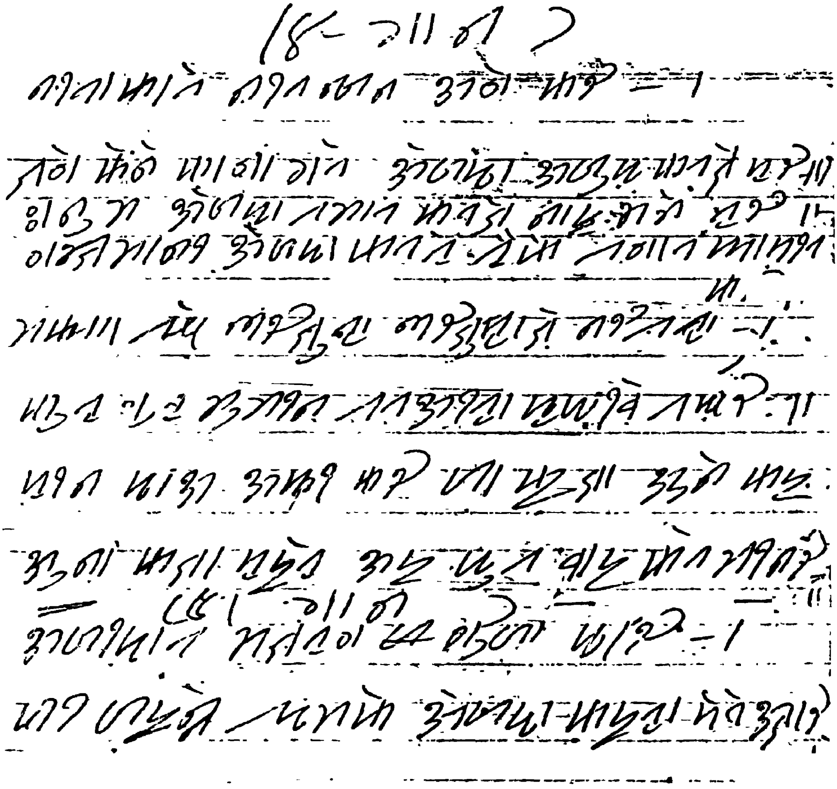

[illegible] =||

[illegible]
[illegible]
[illegible] =||
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] =||
[illegible]
[illegible]
[illegible] =||

সিলেটী নাগরী অক্ষরে লিখা বই-এর
বাংলা প্রতিরূপ, একটি পৃষ্ঠা

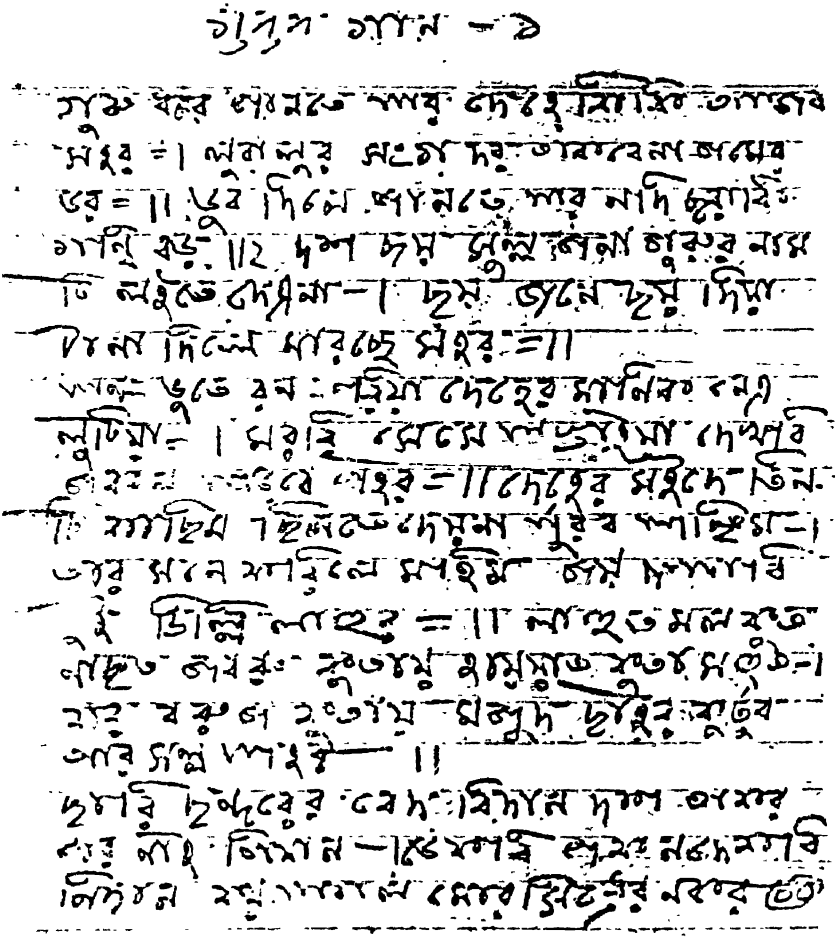

১৭৪ন = ২ [illegible]

এ বয়সে খুন খোদার বড় নাচে আমার নামটি লেখা। আমারে কেউ চিনতে গেলে সোজা রাস্তা হবে বাঁকা।। দেখলে আমার মুখের হাসি কত লোক হয় জংগলবাসী। পইরাছি পীরিতের ফাসী তবু না সে পাইছে দেখা।। মুনসী ও মৌলানা কাজী আমি সবের নায়ের মাঝি। আমার হাপত লেখছে আছে অনু পায়না ইন্দিছ ফেকা।। আমি লই খোদার নাম খোদায় করেন আমার কাম। পাগল জালাল বলেছেন ভাংগাইতে লাগে লেঠা।।

পরিশিষ্ট—১

সুরমা-বরাক উপত্যকা বিষয়ক গ্রন্থ

(একটি অসম্পূর্ণ তালিকা)

সংকলক : অমলেন্দু ভট্টাচার্য

সুরমা-বরাক উপত্যকাব সমাজ-ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি অর্থনীতি-জনবিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর। বর্তমান সঙ্কলনে এরকমই কিছু গ্রন্থের পরিচিতি দেওয়া হল— বলা বাহুল্য তালিকাটি আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন গ্রন্থাগাব এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে যেসব বই পাওয়া গেছে শুধুমাত্র সেগুলোই এখানে উল্লিখিত হল। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন দিক নিয়ে একাডেমিক গবেষণাও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের Ph. D এবং M. Phil ডিগ্রীপ্রাপ্ত এরকম ৪০টি অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধের একটি তালিকা 'বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের' চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকার' (১৪০০ বঙ্গাব্দ) 'পরিশিষ্ট-ছ' অংশে মুদ্রিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত আরও বিশদ তথ্য আছে উক্ত সম্মেলনের 'গবেষণা পরিষদ পত্রিকার' প্রথম সংখ্যায় (১৪০২ বঙ্গাব্দ)। আগ্রহী পাঠক/ গবেষকদের কথা মনে রেখেই অসম্পূর্ণ সত্ত্বেও তালিকাটি প্রকাশ করা হল।

বাংলা

(১) **অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি জীবনী ও সাহিত্য :** সুবীর কর। যুগশক্তি প্রকাশনালয়, করিমগঞ্জ। ১৯৯১। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের রচয়িতা অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির জীবন ও সাহিত্যকর্মের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা।

(২) **আসামে মহাপ্লাবন :** সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রাচ্য শিক্ষা পরিষদ, শিলচর। ১৯২৯। ১৯২৯ ইংরেজীতে (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) বরাক উপত্যকায় যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, সেই বন্যার বিস্তৃত বিবরণ, বন্যাপরবর্তী ত্রাণকার্য, বন্যা নিবারণের উপায় ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বেশ কিছু আলোকচিত্রও সংযোজিত হয়েছে।

(৩) **কবি গীতিকাঞ্জলী (প্রথম খণ্ড) :** প্রসন্ন কুমার চন্দ। প্রকাশক প্রণয় কুমার চন্দ। সুরমা-বরাক উপত্যকার দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বিশিষ্ট কবিয়াল প্রসন্ন কুমার চন্দের ৩৭টি কবিগানের সংকলন।

(৪) **কবি-প্রণাম :** সম্পাদক-নলিনী কুমার ভদ্র, অমিয়াংশু এন্দ, মৃণালকান্তি দাশ, সুধীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ। বাণীচক্র ভবন, শ্রীহট্ট। ১৯৪১। রবীন্দ্রনাথের বরণীয় স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিবেদনের উদ্দেশ্যে শ্রীহট্টের খ্যাতিমান লেখকদের রচনাসম্ভারে পূর্ণ পুস্তক। মোট রচনার সংখ্যা-২৩। পরিশিষ্ট অংশে রয়েছে আরও ৭টি রচনা। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র ও একটি অপ্রকাশিত কবিতা এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

(৫) **কবি সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত :** ডঃ মুনীন্দ্র কুমার ঘোষ সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৯। সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটিতে সঞ্জয় মহাভারতের প্রামাণিকতা ছাড়াও ২২৮ পৃষ্ঠার দীর্ঘ ভূমিকায় কবি পরিচয়, কাব্যমূল্য, ভাষাপরিচয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সম্পাদকের সিদ্ধান্ত হল 'সঞ্জয়ের মহাভারত পূর্ববঙ্গে বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে অত্যধিক জনপ্রিয়ভাবে প্রচলিত ছিল।'

(৬) **কাছাড়ের ইতিবৃত্ত :** উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ। অসম প্রকাশন পরিষদ। গুয়াহাটি — ৩। ১৯৭১। কাছাড় জেলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস। প্রাচীন পর্ব থেকে ডিমাসা রাজবংশের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

(৭) **কাছাড়ের কান্না :** পরিতোষ পাল চৌধুরী। প্রকাশক আলো পাল চৌধুরী। শিলচর — ১। ১৯৭২। বর্তমান বরাক উপত্যকার আর্থ-সামাজিক বিকাশের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

(৮) **কাছাড়ের জন বিন্যাস :** ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিকা ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায়। বি.সি. গুপ্ত রোড, শিলচর --- ২। ১৯৮৮। বরাক উপত্যকার (অবিভক্ত কাছাড় জেলা) জন বিন্যাস সংক্রান্ত তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা।

(৯) **গঙ্গা থেকে সুরমা :** সুনির্মল দত্ত চৌধুরী। নাভানা। কলিকাতা --- ৭২। ১৯৮৮। ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে চক্রপাণি দত্ত একটি উল্লেখযোগ্য নাম। চক্রপাণি দত্ত শ্রীহট্টে এসেছিলেন। তাঁরই দুই পুত্র শ্রীহট্টে থেকে যান। এই দত্ত বংশাবলী ভিত্তিক ইতিহাসের একটি অনালোচিত অধ্যায় আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

(১০) **দেবীযুদ্ধ :** শরচ্চন্দ্র চৌধুরী। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। কলিকাতা - ৯। সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ - ১৩৭৭। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর রূপকে রচিত কাব্যগ্রন্থ। স্বাদেশিক ভাবধারাপূর্ণ এই কাব্যটিকে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

(১১) **দেশী ভাষা বিদ্যা যার :** ইমাদ উদ্দিন বুলবুল। মিলন প্রকাশনী। কদমতলা : রংপুর। শিলচর - ৯। ১৯৯৫। বরাক উপত্যকায় সংঘটিত ১৯৬১ ইং ভাষা আন্দোলনের মূল্যায়ন বিষয়ক গ্রন্থ। শেষাংশে সংকলিত হয়েছে এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু দলিলের তালিকা।

(১২) **ধনুক ধারীর পাঁচালী :** মুদ্রিত এই গ্রন্থটির ৫ থেকে ৪০ পৃঃ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। ফলে গ্রন্থ সম্পর্কিত কোনো তথ্যই জানা যায় নি। বরাক উপত্যকার অন্যতম সুপ্রাচীন তীর্থস্থান ভুবন পাহাড়ের মাহাত্ম্যসূচক এই পাঁচালীতে ভুবন তীর্থের উৎপত্তির কথা বলা

হয়েছে। শিব এই পাহাড়ে লাঙ্গল সৃজন করেছিলেন বলেই ভুবন তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। এটাই পাঁচালীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

(১৩) **পুরাণ বোধোদ্দীপনী :** যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। ১৩৫৪ সাল। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ, শ্রীহট্ট। পুরাণবোধোদ্দীপনী ব্রহ্মাবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের গদ্যানুবাদ। অনুবাদক কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে অনূদিত এই গ্রন্থটি এ অঞ্চলের গদ্য সাহিত্যচর্চার নিদর্শন।

(১৪) **প্রসঙ্গ শ্রীহট্ট :** রামরঞ্জন ভট্টাচার্য। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। কলিকাতা - ৯। ১৯৮৮। শ্রীহট্টের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেব ইতিবৃত্ত। গ্রন্থটি ৩৩ টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

(১৫) **প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন :** সুরেন্দ্রনাথ সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪২। উত্তর-পূর্ব ভারতেব বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের সমযকার পত্রের সংকলন। সংকলিত পত্রের সংখ্যা ১৬৯। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পত্রগুলির ইংরেজী মর্মানুবাদ রযেছে। এই সংকলনে কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ১৩টি ও গোবিন্দ চন্দ্রের ১৬টি চিঠি সংকলিত হয়েছে।

(১৬) **প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য কিংবদন্তীর পুনর্বিচার :** সুজিৎ চৌধুরী। প্যাপিরাস। কলিকাতা ঃ ৪। ১৯৯০। সমাজে মাতৃ প্রাধান্যের অবলুপ্তি ঘটেছিল এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে। মূলতঃ ববাক উপত্যকাব লোকশ্রুতিকে ভিত্তি করে এই পালাবদলের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। সংকলিত চারটি প্রবন্ধই অন্তঃসূত্রে গ্রথিত।

(১৭) **বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি :** সম্পাদক - রাজমোহন নাথ। আসাম বঙ্গ যোগী সম্মিলনী ; কলিকাতা। ১৯৬৪। নাথপন্থেব বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথির সংকলন। প্রাচীন সমতট রাজ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং শ্রীহট্ট কাছাড় অঞ্চলে প্রাপ্ত বেশ কিছু প্রাচীন পুঁথিব উল্লেখ রযেছে এই গ্রন্থে।

(১৮) **বন্যার কবিতা ও দুর্ভিক্ষ সঙ্গীত অর্থাৎ সন ১৩৩৬ বাঙ্গালার বন্যার ধ্বংস কাহিনী :** মোহাম্মদ আশরাফ্ হোসেন। প্রকাশক — মোহম্মদ আল্তাফ হোসেন। পং - ভানুগাছ ; গ্রাম — খোশলপুর। ১৩৩৬। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বন্যার বিবরণ সম্বলিত গানের সংকলন গ্রন্থ।

(১৯) **বরাক উপত্যকার বারমাসী গান :** অমলেন্দু ভট্টাচার্য। কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর। ১৩৯১। কুড়িটি আঞ্চলিক বারমাসী গানের সংকলন। ভূমিকায় বারমাসী গানেব উৎপত্তি সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে।

(২০) **বাউল কবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ :** যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী। সরস্বতী বুক ডিপো। আগরতলা। ১৯৮৮। সুরমা-বরাক উপত্যকার জনপ্রিয় লোককবি রাধারমণেব বিভিন্ন বিষয়ক ৮৯৮ টি গানের সংকলন। পবিশিষ্ট অংশে রয়েছে রাধারমণেব বংশলতিকা, আত্মপরিচিতিমূলক ত্রিপদী, স্বরলিপির নমুনা।

(২১) **বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙ্গালীদের অবদান :** সুধীর সেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। গৌহাটী শাখা। ১৩৭৮। আসামের বাংলা সাহিত্য চর্চার ধারাবাহিক বিবরণ।

(২২) **বিদ্রোহকাল ১৮৫৭ ও সুরমা-বরাক উপত্যকা :** সুবীর কর। প্রকাশক বিমান দে। করিমগঞ্জ। ১৯৯০। বরাক উপত্যকায় সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা।

(২৩) **বৃদ্ধাধাত্রীর রোজ নামচা :** সুন্দরী মোহন দাশ। প্রকাশক— প্রেমানন্দ যোগানন্দ দাশ। ৫৭/১/১এ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৪২। সুন্দরীমোহন দাশ ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক। পেশাগত প্রয়োজনে অজস্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। আত্মজীবনীমূলক এই গ্রন্থে সেসব মানুষের কথা ছাড়াও আঞ্চলিক সংস্কৃতিব বিবরণ রয়েছে।

(২৪) **মহারাণী ইন্দুপ্রভার মোকদ্দমা :** নারায়ণ নাথ (সংকলক)। প্রকাশক — ঈশ্বরচন্দ্র দেব চৌধুরী। বোয়ালিপার, হাইলাকান্দি। ১৩৪১ বঙ্গাব্দ। মহাবাণী ইন্দুপ্রভা উদয়রাম চৌধুরী ও ভবানন্দ শর্মার বিরুদ্ধে যে নালিশ জানিয়েছিলেন সেই মামলার দলিল। দলিলে উল্লিখিত তারিখ ১৭মে ১৮৫১ ইং।

(২৫) **মুখের ভাষা বুকের রুধির :** অমিতাভ চৌধুরী। গ্রন্থপ্রকাশ। কলিকাতা — ১২। নূতন সংস্করণ ১৯৭২। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে কাছাড়ে সংঘটিত হয়েছিল ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। সাংবাদিকতার সূত্রে লেখক এখানে এসে সেই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের মনোজ্ঞ বিবরণ তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে।

(২৬) **যে পথ দিয়ে এলাম :** মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত। প্রকাশক — রফিক আহমেদ। সম্পাদক — কাছাড় জেলা পরিষদ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি — শিলচর। ১৯৯৪। কমিউনিস্ট নেতা মৃণালকান্তি দাশগুপ্তের আত্মজীবনী। সুবমা উপত্যকার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথায় যেসব তথ্যের তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলি ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান।

(২৭) **রামকুমার চরিত :** শ্রীহট্ট-বাসি-শর্ম্মনঃ। সরস্বতী লাইব্রেরী, শিলচর। ১৩২৬। সুরমা-বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট কবি রামকুমার নন্দী মজুমদারের তথ্যবহুল জীবনী গ্রন্থ।

(২৮) **শিক্ষাব্রতীর আত্মকথা :** নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। কলিকাতা - ৯। ১৩৭৪। প্রায় আশি বৎসর বয়সে রচিত এই স্মৃতিকথায় লেখকের বাল্যশিক্ষা এবং কর্মজীবনের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। সুরমা-বরাক উপত্যকার জীবনচর্যা, ধর্ম সংস্কৃতি, বিশেষতঃ শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ সময়ের বস্তুনিষ্ঠ রূপ বিধৃত হয়েছে এই গ্রন্থে।

(২৯) **শিক্ষাসেবক পত্রিকার লেখক ও বিষয়সূচী :** দূর্বা দেব। North Eastern Centre for Advanced studies, Silchar। ১৯৯৫। শিলচর শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'শিক্ষাসেবক' একটানা সতেরো বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা ছাড়াও আঞ্চলিক ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির

অধ্যয়ন করেছিলেন শিক্ষাসেবকের লেখকগোষ্ঠী। সেই পত্রিকাব বিস্তৃত লেখকসূচী সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

(৩০) **শিলচর পৌরসভার ইতিহাস :** দেবব্রত দত্ত। শিলচর পৌরসভা — ১৯৮২। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় জেলা ইংরেজ কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে গড়ে উঠে বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শিলচর শহর। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্টেশন কমিটি গঠনের মাধ্যমে শিলচর পৌরসভার জন্ম হয়। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে পৌবসভার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লিখিত এই গ্রন্থে মূলতঃ পৌরসভার বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রস্তাবসমূহেব বিবরণ সংকলিত হয়েছে।

(৩১) **শ্রীমহারাসোৎসব গীতমালা :** রাজা গোবিন্দচন্দ্র ধ্বজ নারায়ণ। নিখিল কাছাড় হৈড়িম্ব বর্মন সমিতি; শিলচব। ১৯৫৫। শেষ কাছাড়ীরাজা গোবিন্দচন্দ্র রচিত রাস উৎসবের গানের সংকলন।

(৩২) **শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস (১ম খণ্ড) :** সুজিৎ চৌধুরী। প্যাপিরাস। কলিকাতা - ৪। ১৯৯২। শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন পর্বের ইতিহাস। যেহেতু এ অঞ্চলের ইতিহাস রচনায় প্রথাগত সূত্রেব অভাব রয়েছে তাই ধর্মাচার, লৌকিক তীর্থস্থান এবং জনশ্রুতির সতর্ক বিশ্লেষণের সাহায্যে ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। অবশ্য পাশাপাশি প্রথাগত সূত্রেরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(৩৩) **শ্রীহট্ট গৌরব :** জয়নাথ নন্দী মজুমদার। বেজুড়া, শ্রীহট্ট। ১৩৪৩। দুইখণ্ডে বিভক্ত পদ্যে রচিত এই গ্রন্থে শ্রীহট্টেব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

(৩৪) **শ্রীহট্ট পরিচয় :** রণেন্দ্রনাথ দেব। প্রকাশক— প্রযত্নে পূর্ণব্রত ঘোষ। ৭২, বালিগঞ্জ প্লেস : কলিকাতা— ১৯। ১৯৮৩। শ্রীহট্টের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত। দুই পবে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব 'শ্রীহট্টেব ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয় পর্বে আধুনিক যুগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করেছেন লেখক।

(৩৫) **শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র :** যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ, শ্রীহট্ট। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ। শ্রীহট্ট কাছাড় থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত যাবতীয় পত্রিকার বর্ণানুক্রমিক তালিকা। হাতে লেখা পত্রিকার তালিকাও এতে সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটির শেষাংশে রয়েছে সম্পাদকদের (স্কুল বা কলেজ ম্যাগাজিনের এবং হাতে লেখা পত্রিকার সম্পাদকদের নাম ছাড়া) নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা।

(৩৬) **শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ ও পত্রিকা :** উষাবঞ্জন ভট্টাচার্য। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। কলিকাতা— ৯। ১৪০০ বঙ্গাব্দ। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১৬ই কার্তিক 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ'এর জন্ম। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ থেকে পরবর্তী তেবো বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীহট্ট

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে পরিষৎ পত্রিকার প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও লেখকসূচী সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে আটটি নির্বাচিত প্রবন্ধ।

(৩৭) **শ্রীহট্টীয় কথ্যভাষা :** ব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। বড় লেখা, শ্রীহট্ট। ১৩৩৬। শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা।

(৩৮) **শ্রীহট্টীয় প্রবাদ প্রবচন :** শশিমোহন চক্রবর্তী (সম্পাদিত)। শ্রীহট্ট সম্মিলনী। ১২, হিন্দুস্তান রোড; কলিকাতা— ২৯। ১৯৭০। বর্ণানুক্রমে সজ্জিত আঞ্চলিক প্রবাদেব সংকলন। সংকলিত প্রবাদের সংখ্যা ১৭০৬। প্রতিটি প্রবাদের সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দেব অর্থ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়া আছে।

(৩৯) **শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন : স্মৃতিকথা**— চঞ্চল কুমার শর্মা। ওবিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলিকাতা— ৯। ১৯৮৪। শ্রীহট্টের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ বয়েছে এই গ্রন্থে।

(৪০) **শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত :** অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি। পূর্বাংশ— উপেন্দ্রনাথ পাল চৌধুবী; কলিকাতা। ১৩১৭। উত্তরাংশ— সরস্বতী লাইব্রেরী, শিলচর। ১৩২৪ বঙ্গাব্দ। দুই খণ্ডে বিভক্ত এই সুবিশাল আকব গ্রন্থটি প্রাচীনকাল থেকে বৃটিশ অধিকারকাল পর্যন্ত সময়ের শ্রীহট্টের তথ্যবহুল ইতিহাস। পূর্বাংশের উপসংহার অংশে কাছাড়ের কথায় কাছাড়েব সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সংযোজিত হয়েছে। উত্তরাংশের আলোচ্য বিষয় বিবিধ বংশ বর্ণন।

(৪১) **শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস :** কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুবী। সারদা প্রেস। ১৯৪০। শ্রীহট্টেব প্রাচীন পর্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ভূমিকায় লেখক বলেছেন 'এই পুস্তকের কতগুলি সূত্র অবলম্বনে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করিলে তাম্রফলক, প্রাচীন লিখা, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন জিনিস ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি।'

(৪২) **শ্রীহট্টের ভট্টসঙ্গীত :** যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। যাদবপুর বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। ১৯৮৯। ভট্টসঙ্গীত বা ভট্ট কবিতা একটি লুপ্ত লোকায়ত ঐতিহ্য। ভট্ট কবিদের পেশা ছিল একটি বিশেষ আঙ্গিকে কবিতা রচনা করা। গ্রন্থটি আটত্রিশটি ভট্ট কবিতার সংকলন। কবির সংখ্যা সতেরো। পরিশিষ্ট অংশে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

(৪৩) **শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত :** গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৬। শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের সংকলন গ্রন্থ। দীর্ঘ ভূমিকায় শ্রীহট্টেব পরিচিতি এবং সংকলিত গানগুলির প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে।

(৪৪) **সংস্কৃতির রঙ-রূপ :** কামালুদ্দীন আহমদ। দিগ্বলয় প্রকাশন, করিমগঞ্জ। ১৯৯০। ববাক উপত্যকার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের অবদান বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধের সংকলন।

(৪৫) **সার্ধ শতকের বরাক উপত্যকা : সাহিত্য ও সমাজ**— জন্মজিৎ রায়। অক্ষর সাহিত্য প্রকাশনী। করিমগঞ্জ। ১৯৯৪। বরাক উপত্যকার সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি মূলতঃ উনিশ শতকের বরাক উপত্যকার প্রেক্ষাপটে রচিত।

(৪৬) **সুরমা উপত্যকার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস :** চঞ্চল কুমার শর্মা। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী (প্রাঃ লিঃ)। কলিকাতা— ৯। ১৯৯০। সুরমা উপত্যকায় স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে সংঘটিত বামপন্থী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের তথ্য নির্ভর ইতিহাস। চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে নেতৃবর্গের পরিচিতি।

(৪৭) **সোণাধনের গীত :** রাজমোহন নাথ, বি-ই তত্ত্বভূষণ কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ। ১৯৪৭। সোণাধনের গীত জৈন্তা রাজপরিবারের প্রেম কাহিনীমূলক গীতিকা। ১৯৪২ ইংরেজীতে সম্পাদক গানটি সংগ্রহ করেছিলেন কানাই খলিফার কাছ থেকে। গায়কের মতে এই গীতিকার আদি রচয়িতা শ্রীধর বানিয়া।

(৪৮) **স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি :** নীরদ কুমার গুপ্ত। শক্তিপ্রেস, শিলচর। ১৯৭৪। শ্রীহট্ট জেলার অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিকথা নির্ভর ইতিহাস। নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারত ছাড় আন্দোলন পর্যন্ত সবকটি পর্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী।

(৪৯) **স্মৃতি ও প্রতীতী :** ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। কলিকাতা - ৯। ১৯৮২। ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর স্বহস্ত লিখিত জীবনকথার পরিমার্জিত রূপ। বিংশ শতকের সূচনাপর্ব থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত ঘাত-প্রতিঘাত পূর্ণ সময়ের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ রয়েছে রচনাটিতে।

(৫০) **হাড়মালা :** নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী। শ্যামলা ভিলা, উমেদনগর, লালা। ১৯৭১। নাথ ধর্মের একটি প্রাচীন পুঁথি বিষয়ক গ্রন্থ। মূল পুঁথিটি সংগৃহীত হয়েছে লালা, বিষ্ণুপুরের হরপ্রসাদ নাথের ব্যক্তিগত পুঁথিশালা থেকে।

(৫১) **হিন্দুশাস্ত্রীয় শ্রাদ্ধাদির কীর্তন গীতিকা :** সংকলক হৈড়িম্বরাজ গোবিন্দচন্দ্র। প্রকাশক— নলিনীন্দ্র কুমার বর্মন। বিজয়পুর—বড়খলা, কাছাড়। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ। মহারাজা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণ ছিলেন কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে গীত এই কীর্তন গীতিকাটি তাঁরই সংকলিত। সম্পাদক নলিনীন্দ্র কুমার বর্মন 'দুই তিনটি মূল অনুলিপি' অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। ক্ষুদ্রায়তন এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

(৫২) **হেড়ম্বরাজ্যের ঋণদান বিধি :** পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এম. এ. বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত। প্রকাশক— হরগোবিন্দ সেন। গ্রাম-ভাঙ্গার পার, পোঃ— বিহাড়া : কাছাড়। ১৩২৮ বঙ্গাব্দ। প্রতিবাদ্য বিষয় মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্রের আমলের আর্থিক আইন। বাংলা গদ্যে

লিখিত এই আইন জারী করার তারিখ ১৭৩৮ শকাব্দের ১লা ফাল্গুন। প্রাচিন এই পুঁথিটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পরিশিষ্ট অংশে দাস-দাসী বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র পুঁথি সংযোজিত হয়েছে।

(৫৩) **হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি:** পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ এম. এ. কর্তৃক সম্পাদিত। গৌহাটী বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা। ১৩১৭ বঙ্গাব্দ। হেড়ম্বরাজ্যে প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ধারা গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়। দুটি প্রাচীন বাংলা পুঁথির মূল পাঠ আলাদা আলাদাভাবে সংকলিত হয়েছে। সংকলিত দুটি পুঁথিই খণ্ডিত। 'ক' পুঁথিতে সংকলিত আইনসমূহ জারী করা হয়েছিল ১৭৩৯ শকাব্দের ১লা বৈশাখ মহারাজা গোবিন্দ চন্দ্রের আমলে। 'খ' পুঁথিতে এরকম কোনো সন তারিখের উল্লেখ নেই। ২৭ পৃষ্ঠার দীর্ঘ ভূমিকায় সম্পাদক হেড়ম্ব রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা করেছেন।

অসমীয়া

(১) **কছাৰী ৰাজ্য উত্থান আৰু পতন:** ডঃ জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য। অসম সাহিত্য সভা। যোৰহাট—১। ১৯৯৩। আদিপর্ব থেকে ডিমাসা রাজবংশ পর্যন্ত কাছাড়ের ধারাবাহিক তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস।

ইংরেজী

(১) **Antiquities of Cachar:** Rajmohan Nath, Publisher— Lopita Nath. Rajville; College Road, Silchar. 1981. বরাক উপত্যকার প্রচীন পুরাকীর্তি সমূহের বিবরণ। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় ক্ষুদ্রায়তন এই পুস্তিকাটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

(২) **Cachar District Records:** D. Dutta, Publisher— D. Dutta. Vakil Patty, Silchar. 1969. ১৮৩৪ থেকে ১৮৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়সীমার প্রশাসনিক পর্যায়ে লেখা বিভিন্ন বিষয়ক চিঠির সংকলন। এই সংকলনটি আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার একটি মূল্যবান উপাদান।

(৩) **Cachar under British Rule in North East India:** Jayanta Bhusan Bhattacharjee. Radiant Publishers, New Delhi— 19 1977. কাছাড় জেলায় বৃটিশ অধিগ্রহণ কালীন সময়ের ইতিহাস। আলোচ্য সময়সীমা ১৭৬৫ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ। গ্রন্থটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

(৪) **Copper Plates of Sylhet— Vol.I (7th—11th Century A.D.):** Kamala Kanta Gupta M. Sc., B.L., Sylhet; 1967। নিধনপুর, কালাপুর, পশ্চিমভাগ ও ভাটেরা তাম্রলিপি সমূহের মূলপাঠ ও টীকাটিপ্পনী সম্বলিত প্রামাণ্য গ্রন্থ। রোমান ও বাংলা দুরকম লিপিতেই তাম্রফলকগুলির মূলপাঠ দেওয়া হয়েছে।

(৫) **History of the Catholic Missions in North East India (1890—1915):** Translated and Edited by G. Stadler and S. Karotemprel. Firma KLM (Pvt. Ltd.), Calcutta— 12, 1980 । উত্তর পূর্বাঞ্চলে ক্যাথলিক মিশন গড়ে উঠার ইতিবৃত্তমূলক এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সুরমা উপত্যকা সংক্রান্ত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। উল্লিখিত তথ্যসমূহ এই পর্বের সমাজ ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান।

(৬) **Report on the Eastern Frontier of British India:** Capt. R. Boileau Pemberton. Deptt. of Historical and Antiquarian Studies in Assam. Gauhati. 1966 । বিভিন্ন অধ্যায় ও উপঅধ্যায়ে ভাগ করা বিস্তৃত প্রতিবেদন সমৃদ্ধ এই গ্রন্থে ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ রয়েছে। আলোচ্য অঞ্চলসমূহের মধ্যে কাছাড, মণিপুর, আসাম, আরাকান, জয়ন্তীয়া ইত্যাদি রয়েছে।

(৭) **Social and Polity Formations in Pre-Colonial North-East India:** J. B. Bhattacharjee. Bikash Publishing House (Pvt. Ltd.), New Delhi— 14. 1991. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাক-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা ও সমাজ ইতিহাস বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি অন্তঃসূত্রে গ্রথিত।

(৮) **Sylhet District Gazetteer:** B. C. Allen. 1905। তদানীন্তন সিলেট জেলার সরকারী জেলা গেজেটিয়ার।

(৯) **The Gazetteer of Cachar:** B C. Allen, Shillong. 1905 । তৎকালীন কাছাড় জেলার প্রথম সরকারী গেজেটিয়ার।

(১০) **The Mutiny Period in Cachar:** Dr. Sujit Choudhury (Ed), Tagore Society for Cultural Integration, Silchar, 1981. বরাক উপত্যকায় সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া-সংক্রান্ত গ্রন্থ। গ্রন্থে বিধৃত বিবরণটি কে সংকলন করেছিলেন তা জানা যায় নি। এ অঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার দৈনন্দিন বিবরণ রয়েছে গ্রন্থটিতে।

(১১) **The Queens of Cachar or Herambo and the History of the Cachari:** Nalinindra Kumar Barman. Historical and Cultural Research Somity, Barkhola, Bijoypur; Cachar. 1974 । কাছাড়ের ইতিহাসের একটি বড় অধ্যায় জুড়ে আছে ডিমাসা রাজবংশ। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সেই রাজবংশের ইতিহাস।

(১২) **Tribals in Transition— A Socio Economic Study:** Pranay Jyoti Goswami. Jawahar Publishers and Distributors, New Delhi— 16. 1995। বরাক উপত্যকার ডিমাসা সম্প্রদায়ের আর্থ সামাজিক জীবন-সংক্রান্ত গ্রন্থ। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রীয় অধ্যয়নের মাধ্যমে রচিত এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান রয়েছে।

পরিশিষ্ট— ২

লেখক - পরিচিতি

শ্রী কমলাকান্ত গুপ্ত : বাংলাদেশের (শ্রীহট্ট) সুখ্যাত ঐতিহাসিক ও লিপিতত্ত্ববিদ শ্রী কমলাকান্ত গুপ্ত শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের সুধী সমাজেও সুপরিচিত। পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি একজন পথিকৃৎ। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বহু অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ তাঁর পুস্তিকা 'শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস'। তাঁর 'Coppor-plates of Sylhet' (1967) শ্রীহট্ট তথা পূর্ব বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্বেষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য আকর গ্রন্থ। অধুনা তিনি কলকাতাবাসী। অশীতিপর বয়সে আজও তিনি অক্লান্ত ইতিহাস গবেষক। লিপিতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে মান্য ও সম্মানিত। বহু প্রাচীন তাম্রলিপির পাঠোদ্ধারই শুধু নয়, ঐতিহাসিক মূল্য ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে নতুন চিন্তার পথনির্দেশ করেছেন। নানা পত্র পত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'The Agraharaksetra of Mayurasalmala' (1976), 'The Mainamati Copper Plate Inscriptions of the Khadga and Early Deva-times— 7th and 8th century AD'(1979), বাংলার পাল রাজা মহেন্দ্রপালের 'নবাবিষ্কৃত জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন - নবম শতাব্দী'(১৯৯০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর একটি মূল্যবান পুস্তিকা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব শ্রীহট্টের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা' (১৯৬৬)। এই পুস্তিকা সম্পর্কে একটি আলোচনা এই সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত হলো। তাছাড়া এই গ্রন্থে তাঁর আরেকটি লেখা 'ইতিহাসের আলোকে শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত বিষ্ণু (ত্রিবিক্রম) মূর্ত্তি' (১৯৮৭) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

ডঃ সুজিৎ চৌধুরী : করিমগঞ্জ রবীন্দ্রসদন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক এই লেখক একজন প্রখ্যাত গবেষক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত নিবন্ধ লিখে থাকেন। এসব লেখার বিষয় যেমন বিচিত্র, তেমনি তথ্যপূর্ণ। লেখকের গবেষণার পরিধির মধ্যে আছে লোকধর্ম, লোকাচার, এবং পৌরাণিক কিংবদন্তীর উৎস সন্ধান, বিবর্তন ধারার পর্যবেক্ষণ, ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়ন। সাংবাদিকতার সঙ্গেও তিনি যুক্ত আছেন। তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতার স্থাপিত সংবাদপত্র 'যুগশক্তির' তত্ত্বধান করে থাকেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ — **'প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার'** (এই সংকলন গ্রন্থের প্রতিটি নিবন্ধ তাঁর বাস্তববাদী চিন্তা এবং সমাজবিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের সাক্ষর বহন করেছে) ; The Mutiny Period in Cachar'; 'Ranachandi and Nimata', 'Transformation of Dimasa Deities'. সম্প্রতি অচ্যুতচরণ চৌধুরীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-এর প্রথম খণ্ড তাঁর সম্পাদনায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়েও তাঁর গবেষণা

বিস্তারিত। কাছাড়ের গুহাতীর্থ ভুবনপাহাড়ের বিষয়ে তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা নিবন্ধ উল্লেখযোগ্য (দ্রষ্টব্য: 'Bhuban Tirtha: A Cult-Spot on the Hill Top' in ***Archaeology of North-Eastern India,*** NEHU History series No.1, 1991). এই লেখকের একটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ 'বিদ্যাপতির ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিনী' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৮৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা)। তাঁর অন্য একটি প্রকাশিত গ্রন্থ **'শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস,** ১ম খণ্ড (প্যাপিরাস, কলিকাতা - ৪, জানুয়ারী ১৯৯২ ইং)।

ডঃ জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য: প্রবন্ধকার বর্তমানে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (শিলচর) উপাচার্য। পূর্বে তিনি North Eastern Hill University-এর ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ডঃ ভট্টাচার্য পূর্বোত্তর ভারতের একজন অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক। নানা গবেষণা সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত। গরোখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত (১৯৮৭) Indian Historical Congress-এর সুবর্ণজয়ন্তী সমারোহে ইতিহাস বিভাগের Modern India শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। Institute of Historial Studies (Calcutta)- এর তিনি একজন ফেলো। তাছাড়া Indian Council of Historical Research এরও তিনি সদস্য। দেশ-বিদেশের নানা পাত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ — Cachar under British Rule in North-East India; The Garos and the English এবং Social and Polity formations in Pre-Colonial North East India.

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী: রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থাগারের (শিলং) সম্পাদক এই প্রাবন্ধিক অরুণাচল প্রদেশের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। কাজের সূত্রে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এল্‌উইন-এর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তখন থেকেই উপজাতি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার শুরু। অন্যান্য বিষয়েও বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে — Arunachal Panorama; Arunachal Through The Ages; The Tribal Culture and History of Arunachal Pradesh এবং The Khasi Canvas. বিভিন্ন সংকলনে তাঁর সেমিনার পত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি এই লেখকের আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ***Ki Khun Khasi Khara*** (The Khasi People)

শ্রী সুনির্মল দত্ত চৌধুরী: লেখক অরুণাচল প্রদেশ সরকারের গেজেটিয়ার দপ্তরের প্রাক্তন সম্পাদক। ইতিহাসের ছাত্র হলেও অন্তরের যোগ সাহিত্যের সঙ্গে। নানা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ — Arunachal Pradesh District Gazetteers— 4 volumes এবং 'গঙ্গা থেকে সুরমা'। প্রকাশিতব্য গ্রন্থ — 'সময়ের পথ বেয়ে' এবং অরুণাচল প্রদেশের আরেকটি জেলা গেজেটিয়ার। বিভিন্ন খণ্ডে সমগ্র অরুণাচল প্রদেশের তথ্যসমৃদ্ধ গেজেটিয়ার রচনা ও সম্পাদনা তাঁর একটি বিশেষ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা।

ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য: শিলচর গুরুচরণ কলেজের বাংলার অধ্যাপক এই প্রাবন্ধিকের গবেষণার বিষয় লোকসাহিত্য, লোকগাঁধা ও লোকাচারের উৎস সন্ধান এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। বরাক উপত্যকার গ্রামে গ্রামে ঘুবে হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহ করা তাঁর অন্যতম নেশা।

প্রকাশিত গ্রন্থ — বরাক উপত্যকার বারমাসী গান (সং), অ - মালিনী বা নারী শক্তি, বরাক উপত্যকার প্রথম মৌলিক উপন্যাস (সং)। উল্লেখ্য যে প্রায়শতাধিক বছর পূর্বে রচিত শেষোক্ত এই উপন্যাসটির রচয়িতা ৺সুরেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী এই লেখকের মাতামহ। নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে চলেছে — তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সংকলনে লেখকের দুটি মূল্যবান রচনা, সুরমা-বরাক উপত্যকাব নৌকাপূজা, এবং বারমাসী-গান বিষয়ে মৌলিক চিন্তাশ্রিত নিবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্প্রতি এই লেখকের সহ-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে বরাক উপত্যকার অধুনা বিস্মৃত কবি রামকুমাব নন্দী মজুমদারেব (১৮৩১-১৯০৪) কবিকৃতি— 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য (শিলচর অগ্রহায়ণ ১৪০২)

শ্রী অজিত কুমার চক্রবর্তী: বর্ত্তমানে গরিফা (নৈহাটি) নিবাসী, আদিতে যশোরের সন্তান। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীর সুবাদে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফরের ব্যাপক সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সূত্রেই বরাক উপত্যকা, সংলগ্ন ত্রিপুরা রাজ্য, সুরমা উপত্যকা (ভারত) প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন শ্রীহট্ট-বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি, উপভাষা, লিপি (সিলেটি নাগ্‌রী) ইত্যাদি বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছে এবং গভীর অনুশীলনে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত শ্রীহট্টের ছড়া ও প্রবাদ দুটি নিবন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ মৌলিকতার দাবী রাখে। একই বিষয়ে 'প্রৈতি' পত্রিকা (তাঁরই সম্পাদনায়), বাংলা আকাদেমি পত্রিকা এবং পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য লোকসংস্কৃতি পবিষদেব মুখপত্র 'লোকশ্রুতি' পত্রিকা প্রভৃতিতে তাঁব প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব সঙ্গে ইনি যুক্ত রয়েছেন। মূলতঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র, তাঁর বিশেষ আগ্রহ ভাষাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির প্রতি।

রচিতগ্রন্থ: ১। 'গল্পগুচ্ছের পুনর্মূল্যায়ন' ; ২। 'রবীন্দ্র সাহিত্যের চারভুবনের কিনারে'। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'নানা চোখের আলোয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার'।

ডঃ এন. সি. নাথ (নাথতত্ত্বরত্ন): বর্ত্তমানে ধলেশ্বর, আগরতলা (ত্রিপুরা) নিবাসী। ইনি অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা। নাথধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে গভীর গবেষণা ও অনুশীলনের জন্য ইনি 'নাথতত্ত্বরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। উল্লিখিত বিষয়ে তাঁর অভিনিবেশ ও রচনার পরিধি সুদূর বিস্তৃত। শুধু ধর্ম ও সাহিত্য নয়, নাথ ঐতিহ্য ও নাথ সম্প্রদায়ের সুপ্রাচীন ইতিহাসের অনুসরণ তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত তাঁর নিবন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসা ও অভিনিবেশের সাক্ষর আছে।

এই লেখকের রচিত কিছু গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। এর মধ্যে রয়েছে 'বল্লাল চরিতম্' ও 'লক্ষ্মণ সেন চরিত'। নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাদের সঙ্গে বল্লাল সেনের সংঘর্ষ ইত্যাদি বিষয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য বল্লালচরিতম্ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। 'লক্ষ্মণ সেন চরিত'-এ যোগীদের প্রতি তাঁর আকৃষ্ট হবার কথা ও সম্মান প্রদর্শনের বৃত্তান্ত আছে। গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হলে ইতিহাসের অজানা তথ্যের উন্মোচন হবে আশা করা যায়।

ডঃ কামালুদ্দীন আহমদ: বর্ত্তমানে করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত আছেন। স্থায়ী নিবাস, কানিশাইল, জিলা ও ডাকঘর করিমগঞ্জ (আসাম)। বাড়ির নাম 'আহমদ মঞ্জিল'। শিক্ষার শুরু দৌলতপুর পাঠশালা, তারপর ক্রমান্বয়ে করিমগঞ্জ সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, করিমগঞ্জ কলেজ (অধুনা এই কলেজেরই তিনি অধ্যক্ষ), গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। মূলতঃ ইতিহাসের ছাত্র পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল ও পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক আলোচনাচক্রে যোগদান করেছেন। আমাদের বলার বিষয়, তাঁর অধীত বিদ্যা শুধু ইতিহাসে নিবদ্ধ নয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। পত্র-পত্রিকায় বিচিত্র বিষয়ে নিয়মিত নিবন্ধ লিখে থাকেন। নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও 'দিগ্বলয়' নামক ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করে থাকেন। উদার ও সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

ডঃ কামালুদ্দীনের প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত তালিকা এইরূপ: The Art and Architecture of Assam, সংস্কৃতির রঙরূপ (বরাক উপত্যকার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের অবদান বিষয়ে তিনটি নিবন্ধের এই সংকলন), বাংলাদেশে সাতদিন (ভ্রমণ কাহিনী), ও অতলান্ত (উপন্যাস)। সম্প্রতি তাঁর একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ 'শ্রীহট্টের মধ্যযুগীয় সাহিত্য' **শ্রীভূমি শ্রীহট্ট** গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন দুর্গাপুর শ্রীহট্ট সম্মিলনী (বিধান নগর, দুর্গাপুর: ৭১৩২১০, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পশ্চিমবঙ্গ)। আহমদ সাহেবের এই রচনায় একটি মূল্যবান তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তথ্যটি এই:

'চৈতন্যযুগে শ্রীহট্টে বৈষ্ণব সাহিত্যের যে জোয়ার এসেছিল, সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাটার টানে অনেকটা হীনবল হয়ে থাকলেও স্তব্ধ হয়ে যায় নি। এ পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি ভবানন্দ। তাঁর কাব্যের নাম 'হরিবংশ'। সিলেটি নাগরী হরফে গ্রন্থটির সঙ্গীতাংশের এক সংস্করণ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে, মহম্মদ আফজল কর্ত্তৃক 'মুজমা রাগ হরিবংশ' নামে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি সতীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। .... শব্দচয়নে শ্রীহট্টীয় কথ্যভাষার প্রয়োগ কবির শ্রীহট্টীয় বাসস্থানের পক্ষে ইতিবাচক সমর্থন'।

আমাদের কৌতূহলের কারণ, বর্ত্তমান গ্রন্থে অন্যত্র সিলেটি নাগরী অক্ষরে 'হরিবংশের' একপৃষ্ঠার প্রতিলিপি (photostat copy) প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ জন্মজিৎ রায়: করিমগঞ্জ (আসাম) নীলমণিরোড নিবাসী এই লেখক করিমগঞ্জ কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের

সাক্ষর বহু নিবন্ধে ছড়িয়ে আছে। বাংলা ভাষার অতি প্রচলিত কিছু শব্দের উৎস সম্পর্কে বিতর্কে যোগ দিয়ে তিনি 'দেশ' পত্রিকায় দু'টি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মূল্যবান পত্র লিখেছিলেন তিন বৎসর আগে। ভাষাতত্ত্ব ও বানান সংস্কার বিষয়ে সেমিনারে নিয়মিত আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। অধিকন্তু তিনি একজন বৈয়াকরণিক। বর্ত্তমান গ্রন্থে সংকলিত 'সিলেটি উপভাষা' বিষয়ক তাঁর সুশৃঙ্খল (methodical) ও তুলনামূলক আলোচনা পাঠকদেব ঔৎসুক্য বাড়াবে, সন্দেহ নেই।

জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অধিকার সুবিদিত। জ্যোতিশাস্ত্র সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত নিবন্ধ লিখে থাকেন। প্রাচীন লিপি বিষয়ে, বিশেষত তাম্রলিপি ইত্যাদির, বিজ্ঞানসম্মত পাঠ তাঁর গবেষণার অন্যদিক। প্রাচীন পুঁথি ও তাম্রলিপির কালনির্ণয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহী। জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন ও চর্চ্চা সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁর সহায়ক হয়ে থাকে।

তাঁর আরও একটি পরিচয়, তিনি কবি। তাঁর নিজেব স্বীকারোক্তি এই রকম, 'বাংলা ও ইংরাজি গদ্যচর্চ্চার মধ্যান্তপর্বে যাঁরা কবিতা লেখেন, আমি তাঁদেব দলভুক্ত'। তাঁর কবিতাব মূল সুর romantic. প্রকাশিত কবিতা সংকলন, 'অন্দব থেকে বারান্দা' (কলিকাতা, ১৯৭২) ও 'মগ্নকণ্ঠ ভগ্নস্বব' (কলিকাতা, ১৯৯৩, প্রবন্ধ সংকলন, 'সার্ধ শতকেব ববাক উপত্যকা: সাহিত্য ও সমাজ (করিমগঞ্জ ১৯৯৪)।

অধ্যাপক আবুল হোসেন মজুমদার: এই লেখক হাইলাকান্দি, নজরুল সবণি নিবাসী। ইনি লালা (কাছাড়) রুরেল কলেজে ইংবাজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। অধ্যাপনা ছাড়াও সাহিত্য এবং সমাজতত্ত্বমূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'অনুষঙ্গ' প্রকাশ ও সম্পাদনা করে থাকেন। রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগ ও ব্যাপক অধ্যয়ন তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পত্র-পত্রিকায় নিযমিত নিবন্ধ লিখে থাকেন। এ সব নিবন্ধের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র, তেমনি নিবন্ধকারেব অধ্যয়ন, মনন, ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। ববাক উপত্যকা সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন সংস্থাব ইনি একজন সক্রিয় সদস্য। এই সংস্থা দ্বাবা প্রকাশিত বিভিন্ন স্মরণিকা গ্রন্থে তাঁব নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হযেছে।

বর্ত্তমান সংকলনে সন্নিবেশিত মরমীয়া সাধক ও লোককবি হাছন্ রাজা বিষয়ক নিবন্ধটি তাঁর অপক্ষপাত, উদার ও সমন্বযবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষব বহন করছে। অদ্বৈত বেদান্ত এবং ঐশ্লামিক দর্শনের কিছু মূল সিদ্ধান্তের তুলনামূলক আলোচনা, বিবোধাভাস সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য প্রদর্শন, তাঁব দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অন্তর্দৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিন্দু ও ঐশ্লামিক দুই দর্শনেই তাঁর অনায়াস বিচবণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমানে লেখক রবীন্দ্রনাথের কালচেতনাব সঙ্গে টি. এস. এলিয়ট ও ইকবালের কালচেতনাব তুলনামূলক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

অধ্যাপক মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য: কর্মজীবনে ইনি শিলং শঙ্করদেব কলেজে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনায় রত আছেন। ভাষা বিজ্ঞান ও লিপি তাঁব গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। এই সূত্রে ইতিহাস চর্চ্চা, তাম্রলিপি প্রভৃতির পাঠ ও কালনির্ণয় তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের বিষয়।

পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ লেখা ছাড়াও , তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের একজন অক্লান্ত কর্মী। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শিলং শাখার সম্পাদকের দায়িত্বে কর্মরত আছেন। পরিষদের সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে 'কর্মশালার' তিনি উদ্ভাবক ও পরিচালক। এই কর্মশালায় সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে স্বরচিত রচনাপাঠ, যথা কবিতা, গল্প, সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য বর্ত্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত শ্রদ্ধেয় কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের পুস্তিকাকারে প্রকাশিত অতি মূল্যবান রচনা 'শ্রীহট্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপূর্ব ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা'-র অনুলিখন প্রস্তুত করেছেন। এই পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল সিলেট (বাংলাদেশ) থেকে এবং ভারতে সহজে উপলব্ধ নয়। এই মূল্যবান রচনা বর্ত্তমান সংকলনের পাঠকদের উপহার দেবার জন্য অনুলেখক ভট্টাচার্য বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

ডঃ গৌরী সেন : লেখিকা শিলং কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে নিয়মিত লিখে থাকেন। বিবাহসূত্রে শ্রীহট্টের সঙ্গে সম্পর্কিত এই লেখিকা শ্রীহট্ট কাছাড়ের লোকসংস্কৃতি ও স্ত্রী আচার তাঁর গবেষণার বিষয় নির্বাচন করেছেন। 'শ্রীহট্টের স্ত্রী আচার ও প্রাসঙ্গিক গান' সম্পর্কে গবেষণা করে সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়েছেন। গবেষণার বিষয় নির্বাচনে তাঁর লোকসংস্কৃতি-গবেষক স্বামীর প্রভাব থাকা সম্ভব। লেখিকার স্বামী নর্থ-ইষ্টার্ণ হিল ইউনিভার্সিটির লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত শ্রীহট্টের মেয়েলি আচার সম্পর্কিত রচনা লেখিকার গভীর অভিনিবেশ, তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলশ্রুতি। তুলনামূলক আলোচনা তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্রী শ্যামানন্দ চৌধুরী : শিলচর নিবাসী এই লেখক কর্মক্ষেত্রে প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, পশ্চিম শিলচর কলেজ, বড়যাত্রাপুর। ১৯৯৩ সালে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেছেন। মধ্যযুগের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহী। প্রখ্যাত গবেষক ও অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, পুঁথির শ্রেণীভাগ ও বিজ্ঞানসম্মত পাঠ ও পুঁথির লিপি শৈলী বিষয়ে গবেষণায় বর্ত্তমানে নিযুক্ত আছেন। এই সংকলনে সন্নিবেশিত তাঁর পুঁথি-সংক্রান্ত রচনাটি বিশেষ উপভোগ্য ও এ বিষয়ে জ্ঞানবর্ধক।

বর্ত্তমান সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ এবং সক্রিয় সহযোগিতার জন্য তাঁর কাছে এই গ্রন্থের সম্পাদকগণ ও উদ্যোক্তারা বিশেষ ঋণী।

শ্রী কল্যাণ কুমার গুপ্ত : বর্ত্তমানে যাদবপুর, কলিকাতা নিবাসী, এই লেখক কর্মজীবনে আসাম সরকারের বনবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ আমলা। প্রাচীন গ্রন্থ ও হাতেলেখা পুঁথি সংগ্রহ তাঁর অবসর কালের চিত্তবিনোদনের অন্যতম পন্থা। বাল্যকাল থেকেই বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রখ্যাত শিক্ষক ও গাণিতিক শ্রীহট্ট সন্তান প্রয়াত ক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের

পুত্র, শিলং সহরে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে এবং স্কুলের শিক্ষাও এই সহরেই সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর সংগ্রহে সিলেটি নাগরী ও অধুনা লুপ্ত মুসলমানী অক্ষরে হাতে লেখা পুঁথির ভাণ্ডাব রয়েছে। সংগ্রহ যতটা করতে পেরেছেন, এ নিয়ে গভীর গবেষণাব অবসর ততটা পাননি। উপযুক্ত ও সত্যিকারের আগ্রহী গবেষকদের তাঁর সংগ্রহের পুঁথি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ দিতে ও সাহায্য করতে তিনি উন্মুখ। পুঁথি সংগ্রহ ছাড়াও পরিবেশ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে অবসর জীবনে পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে থাকেন।

এই সংকলনে তাঁর সংক্ষিপ্ত লেখাটি গ্রন্থের উদ্যোক্তাদের অনুরোধে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করেছেন। এই রচনার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হাতে লিখা ও ছাপা ‘সিলেটি নাগরী’ অক্ষরের নিদর্শনগুলি এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের উৎসাহ বর্দ্ধন কববে, সন্দেহ নেই।